প্রবন্ধ-মঞ্জরী।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট ভারতমিহির যন্ত্রে

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১২ সাল।

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

ভূমিকা।

ভারতীর আরম্ভ হইতে ভারতীতে, এবং সাধনা প্রভৃতি অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায়, আমার লিখিত যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি বাছিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা গেল। ইহার কোন কোন প্রবন্ধ সাময়িক ভাবে উপরঞ্জিত, পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন; এবং কোন কোন প্রবন্ধে, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন সকল যে ভাবে আলোচিত হইয়াছে, এখন হইলে আমি হয়-ত সে ভাবে আলোচনা করিতাম না; কালসহকারে মতেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এ কথা বলা বাহুল্য। "কলিকাতার সারস্বত সম্মিলন" এই প্রবন্ধ-সম্বন্ধে দুই একটা কথা, সাধারণের অবগতির জন্য, বলা আবশ্যক বিবেচনা করি। যে সময়ে বঙ্গদর্শনের পূর্ণ প্রভাব, সেই সময়ে বর্ত্তমান "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ"-এর আদর্শে "কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন" নামে একটি সাহিত্য-সমালোচনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ইহার কয়েকটি অধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি তখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রায় সমস্ত সাহিত্যসেবীই এই সভায় উৎসাহ-সহকারে যোগ দিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু ইহার নাম "অ্যাকাড্যামি অফ্ বেঙ্গলি লিটারেচার" রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা গৃহীত হয় নাই। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার সভাপতি ছিলেন। তিনি প্রথমেই ভৌগোলিক পরিভাষা নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই "সারস্বত-সম্মিলন" মুকুলিত না হইতে হইতে অঙ্কুরেই বিলীন হইল।

সূচী।

——)০(——

প্রবন্ধ-মঞ্জরী।

ইংরেজী ও হিন্দু-সভ্যতা।

ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাসে বকল্ সাহেব বলেন যে, ধর্ম্ম-নীতির উপর সভ্যতার উন্নতি তেমন নির্ভর করে না, জ্ঞানের উন্নতিতেই সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি। তিনি স্বকীয় মত সমর্থনার্থ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যখন সভ্যতা ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত ও উন্নত হইতেছে তখন তাহার কারণ এরূপ কোন বস্তু হইতে পারে না যাহা পরিবর্ত্তনশীল বা উন্নতিশীল নহে। চারিদিকের আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী যদি অপরিবর্ত্তিত ভাবে থাকে, তাহা হইলে কোন একটী অচল কারণ হইতে সচল কার্য্য কখনই প্রসূত হইতে পারে না। ধর্ম্মনীতি এইরূপ একটী অচল কারণ, ইহা হইতে সভ্যতারূপ সচল কার্য্য কখনই সমুদ্ভূত হইতে পারে না। অন্যের ভাল করিবে—পরের উপকারের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবে—প্রতিবাসীকে আপনার মত ভাল বাসিবে—শত্রুকেও মার্জ্জনা করিবে—ইন্দ্রিয় দমন করিবে—পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করিবে—এই সমস্ত উপদেশই ধর্ম্মনীতির সার উপকরণ; এই সকল উপদেশ সহস্র সহস্র বৎসর হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তথাপি আর একটী নৈতিক সত্য একাল পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইল না; কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে সেরূপ বলা যাইতে পারে না। জ্ঞান কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সীমায় আসিয়া বিশ্রাম করে না। উহা চির-উন্নতিশীল।

অধুনাতন সভ্যতম ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্ম-নীতি-ঘটিত এরূপ একটী সত্যও জানা নাই যাহা পুরাকালের লোকেরা জানিতেন না ; কিন্তু জ্ঞান-সম্বন্ধে এখনকার লোকেরা জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে নূতন নূতন সত্য কেবল আবিষ্কৃত করিয়াছেন এমত নহে, চির-প্রচলিত সত্যানুসন্ধানের প্রণালী পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং এরূপ নূতন নূতন বিজ্ঞান শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা পুরাকালীন মহা-পণ্ডিতদিগের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বকল্ সাহেব আরও বলেন যে, জ্ঞান অপেক্ষা নীতি শুদ্ধ যে উন্নতিশীল এমত নহে, উহার ফলও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। বুদ্ধি দ্বারা যে সকল সত্য উপার্জ্জিত হয়, তাহা সকল দেশেই যত্নপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করা হয়, এই জন্য তৎসমুদায় মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়ে, এবং বংশপরম্পরাক্রমে সকলেই তাহার ফলভোগেও সমর্থ হয়। কিন্তু আমাদিগের নীতি হইতে যে সকল সৎকার্য্য প্রসূত হয়, তাহার ফল তত দূর-প্রবাহী নহে, ব্যক্তিবিশেষেই তাহা আবদ্ধ থাকে। বকল্ সাহেব আরও বলেন যে, কোন কোন স্থলে নীতি হইতে মঙ্গল হওয়া দূরে থাক্ প্রত্যুত অমঙ্গলেরও উৎপত্তি হয়। কোন একজন অনভিজ্ঞ লোকের যদি উদ্দেশ্য সৎ হয়, এবং যদি সেই উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষমতাও তাহার যথেষ্ট থাকে, তাহা হইলে প্রায়ই তাহা দ্বারা মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই সংসাধিত হয়। কিন্তু যদি ঐ লোকের আন্তরিক অকৃত্রিম আগ্রহ কোনরূপে কমাইতে পার, তাহার নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্যের সহিত কোন স্বার্থপূর্ণ হীন উদ্দেশ্য মিশাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে তৎ-কর্ত্তৃক যে অমঙ্গল সংসাধিত হয়, অনেক পরিমাণে তাহার লাঘব হইতে পারে। একজন অনভিজ্ঞ লোক ভাল ভাবিয়া একটা অমঙ্গল কার্য্য করিতে যাইতেছে, তুমি যদি কোনরূপে তাহাকে ভয় দেখাইতে পার, তাহা হইলে হয়তো সে ভীত হইয়া সেই কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারে। কিন্তু সে যদি কোন প্রকারে ভীত না হয়, সে যাহা ভাল মনে করিয়াছে যদি তাহা অবাধে সংসাধন করিবার

অবসর ও সুবিধা পায়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা কি অনিষ্ট না ঘটিতে পারে। বকল্ সাহেব বলেন যে, যে সকল রোমক্ সম্রাট্ ধর্ম্মের জন্য খৃষ্টীয়ানদিগের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভাল লোক ছিলেন; অর্থাৎ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল।

নীতি ও জ্ঞান-সম্বন্ধে বকল্ সাহেবের কি মত, এবং তিনি স্বমত সমর্থনার্থ যেরূপ যুক্তি-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। এক্ষণে আলোচনা করা আবশ্যক এই মতটী কতদূর সঙ্গত। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন যে, নীতিরূপ অচল কারণ হইতে সভ্যতারূপ সচল কার্য্য কখনই প্রসূত হইতে পারে না। নীতি যে অচল অপরিবর্ত্তনীয়, ও অনুন্নতিশীল তাহার প্রমাণ কি? মানব-ইতিহাস পাঠে বরং ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, জন-সমাজে নৈতিক জ্ঞান ক্রমশঃই উন্নতি-লাভ করিয়া আসিতেছে। এক একটী অসভ্য জাতির ইতিহাস আলো-চনা কর, দেখিবে প্রতিহিংসা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি নীচ পশু-প্রবৃত্তি তাহাদের প্রধান কার্য্য-প্রবর্ত্তক। ডভ্ সাহেব টস্মানীয় বন্যজাতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, "তাহাদিগের কোন প্রকার নীতিজ্ঞান ছিল না।" অষ্ট্রে-লীয়গণ সম্বন্ধে আয়ার্ সাহেব বলেন "কোন্‌টি ন্যায় এবং কোন্‌টি বা অন্যায় এরূপ কোন নীতি-বোধ আদৌ না থাকায়, তাহাদের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের এইমাত্র নিয়ম ছিল যে. সংখ্যা ও বলে শ্রেষ্ঠ হইলেই শত্রু-দিগকে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য, নচেৎ নয়।" বর্টন সাহেব বলেন যে, "পূর্ব্ব অষ্ট্রীয়ায় নীতি-জ্ঞানের অস্তিত্ব মাত্রও নাই। কোন একটি সাংঘাতিক সঙ্কল্প সাধন করিতে না পারিলেই তদ্দেশবাসী মনুষ্যদিগের অনুতাপ উপস্থিত হয়, তদ্‌ভিন্ন অনুতাপ যে কি পদার্থ তাহারা জানেও না। তাহাদের মধ্যে ডাকাইতি সম্মানের কার্য্য, এবং হত্যাকার্য্য যতই নিষ্ঠুররূপে সাধিত হয় ততই প্রশংসনীয়, এবং যে ব্যক্তি এইরূপ হত্যা

করিতে পারে সেই প্রকৃত বীরপুরুষ।" এরূপ অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, বাহুল্য-ভয়ে বিরত হইলাম। অসভ্যদিগের মধ্যে নীতিজ্ঞান যে মূলেই নাই, এ বিষয়ে অনেক মতামত উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের নীতির যে অত্যন্ত হীনাবস্থা তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। অধুনাতন অসভ্যগণের অবস্থা আলোচনা করিয়া আমরা এইরূপ ন্যায্য অনুমানে উপনীত হইতে পারি যে, অধুনাতন সভ্যজাতির পূর্ব্বপুরুষেরা যখন ঘোর অসভ্যতা-অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যেও ধর্ম্মনীতির এইরূপ হীনাবস্থা ছিল। বকল সাহেব কি বলিতে চাহেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা যৎকালে সর্ব্বাঙ্গে উল্কি পরিয়া দিগম্বর-বেশে নৃত্য করিতেন, তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম-নীতির যেরূপ অবস্থা ছিল, এখনও সেইরূপ আছে, তদপেক্ষা কি কিছুমাত্র উন্নত হয় নাই? সুপ্রসিদ্ধ সর্ জন্ লবক্ তাঁহার "সভ্যতার উৎপত্তি ও মানবজাতির আদিম অবস্থা" বিষয়ক গ্রন্থে, অনেক আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "জাতি-মাত্রেরই সাধারণ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, নৈতিক ভাব ক্রমশঃ গভীরতা প্রাপ্ত হয়।" কোন অসভ্যতম জাতির মধ্যেও কোন না কোন এরূপ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মাইতে পারেন যিনি তৎকালীন কিম্বা তজ্জাতীয় মনুষ্য অপেক্ষা দুই এক পদবী উন্নত এবং যাঁহার মনে দুই একটা অভিনব নৈতিক জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে মাত্র। মনে কর, তিনি স্বীয় সমাজ-মধ্যে সেই সকল নূতন সত্য প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বজাতীয়েরা অপেক্ষাকৃত অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী, সুতরাং তাঁহার উপদেশগুলি সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইল না। হয়তো তাঁহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশে তাঁহার সন্তানসন্ততির মধ্যে নৈতিক জ্ঞান কথঞ্চিৎ সঞ্চারিত হইল; ক্রমে এই নৈতিক জ্ঞান তাঁহার পুত্রপৌত্র প্রভৃতি বংশপরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হইল। ক্রমে এই জ্ঞান গভীরতা প্রাপ্ত হইয়া দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল—ক্রমে এই বিশ্বাসের

আদর্শে তাহাদের আচার ব্যবহার গঠিত হইয়া জাতি-সাধারণের উন্নতি সাধন করিল। নৈতিক উন্নতির পদ্ধতিই এইরূপ। নীতিজ্ঞানের আবিষ্কার হইলেই হইল না—ঐ জ্ঞান যতক্ষণ না ব্যবহারে পরিণত হয়, ততক্ষণ উহা কোন উপকারে আইসে না। যতক্ষণ নীতি, জ্ঞানের সীমা-মধ্যে অবস্থিতি করে, ততক্ষণ তাহার সার্থকতা নাই—যখনই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তখনই তাহার সার্থকতা। বকল্ সাহেব বলেন, কতকগুলি নৈতিক উপদেশ একই ভাবে সহস্র সহস্র বৎসর প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তথাপি কোন নূতন নৈতিক তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইল না! সুতরাং নীতির ক্রমোন্নতি হইতেই পারে না। এই যুক্তিটী কতদূর অসঙ্গত বোধ হয় পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। যখন অসভ্যজাতির ইতিহাস পাঠে প্রতিপন্ন হয় যে, নৈতিকজ্ঞান ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়াছে, তখন আমরা এই উনবিংশতি শতাব্দীতে যে নীতিজ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি তাহার প্রমাণ কি? আরও নূতন নূতন নীতি-তত্ত্ব যে ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে। আর সহস্র বৎসর পরে সভ্যতার কিরূপ উন্নতি হইবে, কল্পনা করিয়া দেখিলে এই উনবিংশতি শতাব্দীর স্পর্দ্ধিত সভ্যতা যে অসভ্যতা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে তাহারই বা আশ্চর্য্য কি। ভাল, তর্কের অনুরোধে আপাততঃ স্বীকার করা গেল যে, নীতি-জ্ঞানের যতদূর উন্নতি হইতে পারে তাহা এক্ষণে হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, নীতি যতক্ষণ ব্যবহারে পরিণত না হয়, ততক্ষণ তাহার সার্থকতা নাই। নীতির উন্নতি ও নীতি-জ্ঞানের উন্নতি সমান কথা নহে। একজন ইংরাজ আজন্মকাল বাইবেলের এই উপদেশটী শুনিয়া আসিয়াছেন যে "যদি কেহ তোমার বাম গণ্ডে চপেটাঘাত করে, তাহা হইলে আর এক চড় খাইবার জন্য দক্ষিণ গণ্ডটী ফিরাইয়া দিবে"—কোন ইংরাজ কি এই উপদেশের দিক্ দিয়াও যান? দক্ষিণ

গণ্ড ফিরাইয়া দেওয়া দূরে থাক্, তিনি হয়তো এক চড়ের পরিবর্ত্তে দশ চড় সুধ শুদ্ধ ফিরাইয়া দেন। সেই জন্য বলি, ইংলণ্ডে নীতি-জ্ঞানের যদিও বা উন্নতি হইয়া থাকে, প্রকৃত নীতির উন্নতি হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে নীতিজ্ঞানরূপ বীজ পতিত হইলে তাহা অঙ্কুরিত হইতে সময় লাগে—যদিও বা অঙ্কুরিত হয়, তাহা বিশ্বাস ও কার্য্যে পরিণত হইয়া সাধারণ সমাজ-মধ্যে বদ্ধমূল হইতে অনেক বিলম্ব হয়। মনুষ্যের মানসিক ভাব-সকল পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত ও গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বিশ্বাস ও কার্য্যে পরিণত হয়।

বকল্ সাহেব বলেন যে "নীতি অপেক্ষা জ্ঞান কেবল যে উন্নতিশীল এমত নহে, ইহার ফলও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। বুদ্ধিদ্বারা যে সত্য উপার্জ্জিত হয় তাহা সকল দেশেই যত্নপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সেই জন্য তৎসমুদায় মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়ে ও বংশ-পরম্পরা তাহার ফলভোগেও সমর্থ হয়। কিন্তু আমাদের নীতি হইতে যে সকল সৎকার্য্য প্রসূত হয় তাহা তত দূর-প্রবাহী নহে।" এ কথাও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। জ্ঞান অপেক্ষা নীতির ফল কোন অংশেই স্বল্পস্থায়ী নহে। জ্ঞানের ফল যেরূপ জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, নীতির ফল সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কেননা উহা অলক্ষিতরূপে গূঢ়ভাবে মনুষ্যসমাজে কার্য্য করে। যেরূপ কোন একটী পুস্তক পাঠে জ্ঞান লাভ হয়, সেইরূপ কোন একজন সাধু লোকের দৃষ্টান্তে, শত শত লোকের জীবনে সুনীতি গূঢ়ভাবে সংক্রামিত হইয়া তাহার ফল পুরুষপরম্পরায় প্রবাহিত হয়। বরং পুস্তক-সকল রাষ্ট্রবিপ্লবে ধ্বংস হইয়া জ্ঞানের লোপ হইতে পারে, কিন্তু একটী জাতি একেবারে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হইলে আর তাহাদের আচার-ব্যবহারগত সুনীতি বিলুপ্ত হয় না। আমাদের ভারতবর্ষে অনেক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ কাল-স্রোতে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের কতকগুলি আচার

ব্যবহারে যে সকল সুনীতি বদ্ধমূল রহিয়াছে, তাহা বিপ্লবের পর বিপ্লবেও কিছু মাত্র ধ্বংস হয় নাই।

জ্ঞান ও নীতি পরস্পর পরস্পরের উন্নতি-সাপেক্ষ, কিন্তু এই উভয়ের সমগ্র উন্নতি ভিন্ন প্রকৃত সভ্যতা কখনই সমুদিত হয় না। স্বতন্ত্রভাবে এই উভয়েরই সাধনা আবশ্যক। একটীর সাধনা করিলে অপরটীর আপনা আপনি উন্নতি হইবে এরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। যেমন কোন ব্যক্তি-বিশেষের বুদ্ধি ও হৃদয় উভয়ই সমুন্নত না হইলে কখনই তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয় না—সেইরূপ সমাজমধ্যে জ্ঞান ও নীতির সমগ্র উন্নতি না হইলে, প্রকৃত সভ্যতার উদয় হয় না। জ্ঞান অর্জ্জনশীল, নীতি রক্ষণশীল। জ্ঞান পিতার ন্যায় বাহির হইতে নানা সত্য আহরণ করিয়া সমাজের পুষ্টি সাধন করে, নীতি মাতার ন্যায় স্নেহ প্রেম ভক্তি-বন্ধনে সমস্ত সমাজকে একত্র আবদ্ধ করিয়া রাখে। একটী প্রকৃতি আর একটী পুরুষ। একটী জননী আর একটী জনক। জ্ঞানের গতি স্বাধীনতার দিকে, নীতির গতি সম্মিলনের দিকে। একজনের কার্য্য আহরণ, আর একজনের কার্য্য বিতরণ। জ্ঞানের ফল নীতি দ্বারা পরিশোধিত না হইলে স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও অহঙ্কারে পরিণত হয়, এবং জ্ঞানদ্বারা নীতি নিয়মিত না হইলে নীতির উদ্দেশ্য বিফল হয়, এবং কোন কোন স্থলে দুর্নীতিতে পরিণত হয়। এই জন্য নীতি ও জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা না করিলে সমাজমধ্যে প্রভূত অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়; এবং সেই জন্য প্রকৃত সভ্যতাও কখন সমুদিত হইতে পারে না। ইংরাজি সভ্যতার মধ্যে নীতি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য নিবন্ধন স্বল্প-নৈতিক জ্ঞানের যে অবশ্যম্ভাবী ফল স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও অহঙ্কার তাহা বিলক্ষণরূপে ইংরাজ-সমাজমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইংরাজ-সমাজ সম্বন্ধে একজন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসিস্ গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই প্রস্তাবের উপসংহার-ভাগে উদ্ধৃত

করিবার বাসনা রহিল। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, যাহা এ স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা কতদূর সত্য।

অধুনাতন ইংরাজি সভ্যতা জ্ঞান-প্রধান, এবং ভারতবর্ষীয় সভ্যতা নীতি-প্রধান। এই জন্য উভয়ই আংশিক ও অঙ্গহীন। ইংরাজ-সমাজ-মধ্যে জ্ঞান, নীতি দ্বারা পরিশোধিত না হওয়ায়, তাহার ফল যেরূপ স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও অহঙ্কারে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ অধুনাতন হিন্দুসমাজে, জ্ঞান দ্বারা নীতি নিয়মিত না হওয়ায় নীতির ফল বীর্য্যহীনতা, অলসতা ও দাসত্বে পরিণত হইয়া অনেক স্থলে নীতির উদ্দেশ্য বিফল হইয়া গিয়াছে। "দান করিবেক" ইহা একটী নৈতিক উপদেশ; কিন্তু জ্ঞানের কথা না শুনিয়া অপাত্রে দান-প্রথা অস্মদ্দেশে প্রচলিত থাকায় কত অমঙ্গল হইতেছে, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রণালী, স্নেহ, প্রেম, পারিবারিক ঐক্য প্রভৃতি নীতির উপকরণে গঠিত হইয়াছে; কিন্তু জ্ঞান দ্বারা, নিয়মিত না হওয়াতে তাহা হইতে প্রভূত অশুভ ফল উৎপন্ন হইতেছে। হিন্দু পরিবার-মধ্যে যিনি কর্ত্তা তিনিই পরিশ্রম-পূর্ব্বক উপার্জ্জন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার সেই পরিশ্রমের ফল ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র, অধিক কি সুদূর জ্ঞাতি পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞানবিরহিত নীতির প্রভাবে আমাদের দেশে দারিদ্র্য,আলস্য ও নিরুদ্যম প্রশ্রয় পাইতেছে মাত্র; যদি এই নীতির সহিত জ্ঞান সংযুক্ত হইত, এবং এক পরিবারের অন্তর্গত থাকিয়া সকলেই সমান পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিত, তাহা হইলে পারিবারিক ঐক্য ও শ্রম-বিভাগের ফলে পরিবারের ধন, শৃঙ্খলা ও বল বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইত সন্দেহ নাই; এবং নীতি-বিরহিত জ্ঞানে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে তাহা পাঠকেরা চুক্তি-বিবাহ, স্ত্রী-পরিত্যাগ, ও পিতৃমাতৃ-ভক্তির অভাব, পৃথকান্ন-পরিবার-প্রণালী প্রভৃতি ইংলণ্ডের কতকগুলি সামাজিক

কুনীতি ও কুপ্রথার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, জ্ঞান ও নীতির মধ্যে যে পরিমাণে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে, সেই পরিমাণে প্রকৃত সভ্যতার উদয় হইবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সময় জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ন, চিকিৎসা, কাব্য, সাহিত্য, ব্যাকরণ, নীতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের প্রভূত অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মনীতির উন্নতি হইয়াছিল, সেই পুরাকালীন আর্য্যসভ্যতা জ্ঞান ও নীতির সামঞ্জস্য নিবন্ধন প্রকৃত সভ্যতার পথে যে অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এবং সেই স্রোত যদি অবাধে চলিয়া আসিত, তাহা হইলে অধুনাতন ভারতবর্ষীয়-সভ্যতা যে পৃথিবীর আদর্শ-স্বরূপ হইত, তাহা আমাদিগের বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। জ্ঞানের হীনতা প্রযুক্ত যেরূপ অস্মদ্দেশীয় অধুনাতন সভ্যতা, সেইরূপ নীতির ন্যূনতা প্রযুক্ত ইংরাজি সভ্যতা অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। নীতিশিক্ষার জন্য আমাদিগকে ইংরাজের দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে না। আমাদের দেশে নীতির অভাব নাই আমরা ইংরাজদিগের নিকট যেরূপ জ্ঞান শিক্ষা করিতে পারি, তাঁহারা আমাদিগের নিকট সেইরূপ নীতি শিক্ষা করিতে পারেন। নৈতিক সভ্যতায় আমরা যে তাঁহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পণ্ডিত মনিয়ার উইলিয়মস্ সাহেব একস্থলে তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"দুর্নীতি-পরায়ণ ইতর ইয়ুরোপীয়গণের দুরাচার যতদূর অনিষ্টকর, ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে যাহারা নিকৃষ্টতম প্রকৃতির লোক তাহাদিগের দুরাচার ততদূর অনিষ্টকর কি না সন্দেহস্থল। ভারতবর্ষীয় ভৃত্যেরা বিশ্বাসী, সৎ, এবং প্রভুভক্ত। প্রভুর নিকট হইতে সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইলে তাহারা ইংরাজ ভৃত্যদিগের অপেক্ষা প্রভুর প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হয়। তাহারা ইয়ুরোপীয়দের অপেক্ষা ইতর প্রাণীর প্রতি

অধিক যত্ন প্রদর্শন করে। ইয়ুরোপীয়দের অপেক্ষা তাহারা স্বভাবতঃ শিষ্টাচারী, অধিকতর মিতাহারী, অধিকতর পিতৃমাতৃভক্ত, এবং উচ্চ-পদস্থ, বৃদ্ধ ও বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাবান্। আমি একটী জাহাজের কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তিনি ভারতবর্ষীয় ও ইংরাজদের মধ্যে কোন্ জাতীয় নাবিক্ পছন্দ করেন ? তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন"—ভারতবর্ষীয ; কারণ, তাহারা ইংরাজদিগের অপেক্ষা অধিকতর বশ্য, আজ্ঞাবহ ; তাহারা ইংরাজদের ন্যায় পশুবৎ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে না, এবং তাহাদের ন্যায় মাতালও হয় না।"

ফলতঃ যাহা দ্বারা সমাজের প্রকৃত সুখ বা শুভ বর্দ্ধন এবং প্রকৃত দুঃখ বা অশুভ নিরাকরণ হয়, তাহাই যদি প্রকৃত সভ্যতা শব্দের বাচ্য হয়, তাহা হইলে জ্ঞান ও নীতির সামঞ্জস্য ব্যতীত সে সভ্যতা কখনই পৃথিবীতে সমুদিত হইতে পারে না।

প্রকৃত সভ্যতা কি তাহা এতক্ষণ বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। এক্ষণে ইংরাজী সভ্যতা কি উপকরণে গঠিত, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ইংরাজী সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়া আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাই, কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, উহা "বিষকুম্ভং পয়োমুখং"। ইংরাজী সভ্যতা-প্রভাবে বাহ্য সুখ-সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু মনুষ্যের আভ্যন্তরিক প্রকৃতির উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রমশঃই অবনতি হইতেছে।

ইংরাজী সভ্যতা-প্রভাবে ইংরাজ-সমাজের উন্নতি কি অধোগতি হইতেছে তাহা ইংরাজদিগের মুখেই শুনা যাউক। ওয়ার্লড্ নামক ইংলণ্ডের একটী প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্র বলেন :—"সমাজে সম্ভ্রান্ত-শ্রেণীর মধ্যে যে সকল ভয়ানক প্রবঞ্চনা ক্রমাগত অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ইতিহাস একবার পাঠ করিয়া দেখ—যে সকল জলবিম্ববৎ অস্থায়ী প্রবঞ্চক ব্যবসায়ি-দল বিশ্বাস-প্রবণ লোকদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া তাহাদিগের সর্ব্ব-

নাশ ও আপনাদিগের স্বার্থসাধন করে, তাহাদিগের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দেখ। আমাদের কারাগারের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর—দেখিবে তাহা জ্ঞানশূন্য নীচ পশুবৎ নিষ্ঠুর আচরণের জন্য দণ্ডিত কয়েদীদিগের দ্বারা পূর্ণ। আমাদের বিক্রেতাগণ খাদ্য দ্রব্যের সহিত অস্বাস্থ্যকর-দ্রব্য-মিশ্রণ-প্রণালীর কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহা সমালোচনা করিয়া দেখ এবং সমৃদ্ধ লণ্ডন নগরের অধিকাংশ স্থান যে সকল জঘন্য কুটীরে পূর্ণ, সেই সকল কুটীর-নিবাসীদিগের হীন নীতির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর এবং তাহার পর বল দেখি আমাদের ধর্ম্মের ফল কি হইয়াছে? আমাদের চা-পানের সভার অভাব নাই—ধর্ম্মপ্রচারক সভার অভাব নাই—আমাদের Soup Kitchen আছে—আমাদের বাইবেল বিতরণের সভা আছে—বৃহদায়তন দ্বারবিশিষ্ট সুদৃশ্য অনেক গির্জ্জা আছে, এবং সেই সকল গির্জ্জার ঘণ্টা সমস্ত দিনই টুং টাং, ঢং ঢং করিয়া উপাসকদিগকে ডাকাডাকি করিতেছে সত্য, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, লোকের মনের ভাব কি খৃষ্টধর্ম্মানুগত? অতীব দুঃখের সহিত বলিতে হইবে—না। উচ্ছৃঙ্খলতা এখনকার কালের প্রাণ বলিলেও হয়। কেবল তাহার উপরিভাগে ধর্ম্ম এবং শিষ্টাচারের একটী দুর্ভেদ্য আবরণ আছে মাত্র। আমরা যুদ্ধপ্রিয় মৃত্যু-ভয়-শূন্য উদারপ্রকৃতি বীর-পুরুষ নহি—আমরা নীচ ক্ষুদ্র হিসাবী লোক—পয়সা কুড়ানই আমাদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের এ কালে ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষা বিদ্রূপ অধিক কার্য্যকরী এবং ভর্ৎসনা অপেক্ষা ব্যঙ্গ অধিক প্রয়োজনীয়—আমাদের এ কালে সুইন্‌বর্ণের কবিতাই প্রণয়-কথার চূড়ান্ত আদর্শ এবং বর্লেস্ক্‌ নাট্যই প্রকৃত দৃশ্য-কাব্যরূপে পরিগৃহীত হয়। আমাদের একাল অস্বাভাবিকতার কাল, অসারতার কাল ও সন্দিগ্ধতার কাল। এই সন্দিগ্ধতা অকপট আগ্রহের মৃত্যুস্বরূপ—এই অসারতা ফলবত্তার বিঘ্নস্বরূপ এবং এই অস্বাভাবিকতা সত্যের শত্রুস্বরূপ। অতএব এই কালের নিকট

হইতে পয়সা কুড়ান ভিন্ন আর কি আশা করা যাইতে পারে? এখন পয়সারই রাজত্ব, পয়সারই একাধিপত্য। সভ্যতা জিনিসটি মন্দ নয়, উন্নতিও নিতান্ত প্রয়োজনীয় বটে—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি—জন-সাধারণের ভাব-গতির অবনতি হইয়াছে; যে সকল গুণ না থাকিলে মনুষ্যের মহত্ত্ব হয় না, সেই অকপট মনের আগ্রহ, সরলতা এবং জলন্ত উৎসাহ আমরা হারাইয়াছি। আমাদের একালে কোন চাঁদার খাতা খুলিতে গেলে তাহার প্রথমেই বড় বড় নাম থাকা চাই, সাধারণ হিতের জন্য কোন গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার ভিত্তি সংস্থাপনের জন্য বড় লোকের উপস্থিতি আবশ্যক, ধর্ম্মোপদেষ্টা খুব নামজাদা না হইলে তাঁহার বক্তৃতা শোনা হয় না—দান যতই সামান্য হউক না, তাহার বিজ্ঞাপন মহা আড়ম্বরে চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হয়।”

ঐ পত্র আর এক স্থলে বলেন যে “আমাদের বৃহৎ বৃহৎ নীতি-গ্রন্থ আছে সত্য, কিন্তু এই সকল নীতি-উপদেশ কার্য্যে কতদূর পরিণত করা হয়? নীতি ও ধর্ম্ম যতক্ষণ না জীবনের কার্য্য সকল নিয়মিত করে, ততক্ষণ তাহাদের কোন মূল্যই নাই। আমাদের কি বিশ্বাস ও আচরণে কোন মিল আছে? পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্য-প্রণালীর সংস্কার লইয়া এত বৎসর ধরিয়া যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে তাহার কারণ কি?—অন্যের ধন চুরি করা পাপ, এই উপদেশটী এখানকার লোকে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন—কিন্তু অন্যের নিকট আপনাদের স্বাধীন মত বিক্রয় করা তাঁহারা দূষ্য বলিয়া মনে করেন না। এবং এই জন্য পার্লিয়ামেণ্টে সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে। উৎকোচ গ্রহণ হইতে ইংরেজজাতিকে বিরত করিবার চেষ্টায় কত পার্লিয়ামেণ্ট-সভার অধিবেশন স্থগিত হইয়া গেল—কত মন্ত্রিদলের পতন হইল—কত প্রতিভাশালী ব্যক্তি বৃথা মাথা খুঁড়িয়া মরিলেন। এ দেশের অপরিমিত পান-দোষ দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়াছে, এবং এখানকার বিচারপতিগণ স্ত্রী-নির্য্যাতক

স্বামীদিগকে এরূপ দয়ার চক্ষে দেখেন যে, তাঁহারা মনে করেন যে দুই এক মাসের কারাদণ্ড দিলেই স্ত্রীর মাথা গুঁড়া করিবার জন্য স্বামীর যে দোষ তাহা সম্পূর্ণরূপে ক্ষালিত হয়।"

স্যাটার্‌ডে-রিভিউ নামক ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সমালোচনী পত্রিকা এক স্থলে বলেন—"এই সভ্যকালে আমরা জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছি যে, নর্ত্তকী ও বেশ্যাদলের সংখ্যা ক্রমশঃই দ্রুতগতি বৃদ্ধি পাইতেছে। স্ত্রীলোকের অযথোচিত আধিপত্য এবং বিবাহের নিয়মভঙ্গ ক্রমশঃই বাড়িতেছে—বিলাস ও কোমলতা এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, জগতের ইতিহাসে তাহার আর সাদৃশ্য নাই, বোধ হয় রোমীয় অবনতির শেষ অবস্থায় যেরূপ ঘটিয়াছিল, কেবল তাহারই সহিত তুলনা হইতে পারে। এখনকার কালে যে উপায়েই হউক, ধনোপার্জ্জন করিতেই হইবে, এবং লোকের এতদূর অধীরতা বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, তাড়িৎবার্ত্তাবহও তাহা নিবৃত্তি করিতে পারে না। এখনকার সাহিত্য অপদার্থ পুনরুক্তি ও বিলাস-ভাবে আকীর্ণ এবং বাণিজ্য-ব্যবসায় নিরঙ্কুশ নিষ্ঠুর প্রতারণায় পরিপূর্ণ।"

নিকল্‌স্‌ সাহেব তাঁহার মানব-শরীরতত্ত্ব গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় বলেন—"প্রতি বৎসর লণ্ডন নগরের রাজপথে তিন শতেরও অধিক ভ্রূণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল অবিবাহিতা স্ত্রীলোকেরাই যে গর্ভ নষ্ট করে তাহা নহে—বিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগকেও এই ভয়ানক নিষ্ঠুর কার্য্যে লিপ্ত দেখা যায়।" তিনি ঐ গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় আরও বলেন যে "ইংলণ্ডের জঘন্য লাম্পট্য এবং অপবিত্রতার গভীর কলঙ্ক সমাজের কোন শ্রেণী বিশেষ, পদ-বিশেষ বা বয়ঃক্রম বিশেষে বদ্ধ নাই। তবে বিলাসপরায়ণ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকের মধ্যে দুর্নীতির যেরূপ স্পষ্ট ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ অন্য শ্রেণীর মধ্যে দৃষ্ট হয় না।" ঐ গ্রন্থের ৬৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন যে "লণ্ডন নগরে ১৮,০০০, এবং সমস্ত ইংলণ্ডে ৫০,০০০ বেশ্যার বাস।" ৩৮ পৃষ্ঠায় বলেন "লণ্ডনের প্রধান প্রধান

রাজপথ সকল বেশ্যালয়ে পূর্ণ—উহার পূর্ব্ব দিকস্থ সেণ্ট জর্জ্জ্ অঞ্চলে ২৩০ বাটীর মধ্যে ১৫০ বাটী বেশ্যালয়।" ৬৯ পৃষ্ঠায় বলেন "প্রত্যেক দুর্গের চতুর্দ্দিকে বেশ্যাগণের উপনিবেশ, প্রত্যেক সৈন্য-নিবাস বেশ্যালয়ের মধ্যে সংস্থাপিত।"

সুবিখ্যাত লেখক হ্যাজ্‌লিট্ "জন্ বুলের চরিত্র' নামক প্রবন্ধে এই রূপ বলেন—"সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জন্ বৃষ * একটা নিরেট মূর্খ, দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য প্রকাণ্ড গোঁয়ার—শত বৎসরের দাসত্ব ভোগ না করিলে তাহার আর চৈতন্য হইবে না। তিনি চান যে লোকে তাঁহাকে স্বদেশানুরাগী বলে, কেন না তিনি আর সকল দেশকেই ঘৃণা করেন;—তাঁহাকে বিজ্ঞ বলে, কেন না তিনি আর সকল লোককেই নির্ব্বোধ মনে করেন;—তাঁহাকে সৎ বলে, কারণ তিনি আর সকল লোককেই জুয়াচোর মনে করেন! যদি সমস্ত জীবন খুঁৎ খুঁৎ করিয়া কাটাইয়া দেওয়াই মানব-চরিত্র-গত উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয়, তবে জন-পুঙ্গব তাহার খুব নিকটে পৌঁছিয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে প্রহার করেন, তাঁহার প্রতিবাসীর সহিত বিবাদ করেন, তাঁহার ভৃত্যগণকে জঘন্য গালাগালি দেন, এবং সময় কাটাইতে ও মনকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে মাতাল হয়েন—অথচ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁহার ন্যায় নির্দ্দোষ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ধর্ম্মশীল ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি সমস্ত খৃষ্টীয়মণ্ডলীর মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। তাঁহার আইনের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে তিনি অত্যন্ত গর্ব্ব করেন, অথচ সমস্ত ইয়ুরোপ অপেক্ষা ইংলণ্ডেই অধিক লোক ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করে। তিনি স্বদেশীয় মহিলাগণের সতীত্ব লইয়া বড়ই অহঙ্কার করেন, অথচ সমস্ত ইয়ুরোপের রাজধানী একত্র করিলে যত না হয়, শুদ্ধ লণ্ডনের রাজপথে তাহা অপেক্ষা অধিক বেশ্যার নিবাস। তাঁহার অনেক সুখের দ্রব্য আছে বলিয়া তিনি গর্ব্ব করেন,

* ইংরেজজাতি জনবুল অর্থাৎ বৃষ নামে আখ্যাত হয়।

কেন না পৃথিবীর মধ্যে এমন অসুখী মনুষ্য আর দ্বিতীয় নাই। জন-সমাজে তাঁহার কোন আমোদ হয় না, এই নিমিত্ত তিনি নিজ বাটীর বিজন অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বেই আমোদ খোঁজেন—আর সেখানে যে তিনি হতবুদ্ধি হইয়া থাকিবেন সে তো কথাই আছে, সেখানে যে তিনি মুখ ভার করিয়া থাকিবেন, তাতে তো তাঁর অধিকারই আছে, এবং সেখানে তিনি যত-ইচ্ছা হাস্যাস্পদ হইতে পারেন, কারণ সেখানে কেহ হাসিবার লোক নাই। বুষ-মহাশয় অষ্ট-প্রহর এরূপ জঘন্য শপথ করেন যে ফরাসিরা তাঁহাকে "Monsieur God damn me" উপাধি দিয়াছেন। বুষ মহাশয়ের এক দলের উপর আড়ি থাকিলে, মতের মিল না হইলেও তিনি তাঁহার বিরুদ্ধদলের সহিত সম্পূর্ণরূপে যোগ দেন—তাঁহার শত্রুতা যেমন অমূলক কারণের উপর স্থাপিত, তাঁহার অন্ধ উৎসাহও তেমনি প্রচণ্ড। ইংলণ্ডের ইতর লোকের ন্যায় অদ্ভুত হাস্যাস্পদ পদার্থ আর জগতে নাই; উহারা যেরূপ নিজ উদ্দেশ্য না জানিয়া কাজ করে এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।" বক্‌ল সাহেব যিনি ইংরাজী সভ্যতার বিষম পক্ষপাতী, তিনিও বলেন যে "ইংরাজ-সমাজ যাঁহারা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন,—সেই সকল ভিন্ন মতাবলম্বী ও ভিন্ন প্রকৃতির পর্য্যবেক্ষকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, মিথ্যা-শপথ যাহা ইংলণ্ডে সচরাচর উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং তত্রস্থ শাসন-প্রণালী যাহার অব্যবহিত স্রষ্টা, তাহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এতদূর প্রচলিত যে উহা জাতীয় ভ্রষ্টাচারের আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মানব-সাক্ষ্যের মূল্য হ্রাস করিয়াছে এবং মনুষ্যগণ পরস্পরের উপর স্বভাবতঃ যে বিশ্বাস স্থাপন করে তাহাও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে।" বিষপ্ বর্ক্‌লি, গ্রেট্ ব্রিটনের ধ্বংশ-নিবারণ নামক প্রবন্ধে, মিথ্যা শপথ-প্রথা ইংরাজ-জাতির অবনতির একটী প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—দোষটী আমাদের জাতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে;

পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই যাহার মধ্যে মিথ্যা-শপথ-প্রথা এতদূর প্রচলিত; এখানে লোকেরা যেমন সহজে আহার বিহার করে, তেমনি সহজে শপথ-ভঙ্গ করে—গভর্ণমেণ্ট যতই কেন উপায় উদ্ভাবন করুন না, যতক্ষণ এই মিথ্যা-শপথ ও উৎকোচ-গ্রহণরূপ মহাপাপের ভার আমাদের স্কন্ধে থাকিবে ততদিন আমাদের কখনই মঙ্গল হইবে না।” সর্ উইলিয়ম হ্যামিল্টন্ তাঁহার দর্শন শাস্ত্রের বাদানুবাদ নামক গ্রন্থের ৫৫৩ পৃষ্ঠায় বলেন—“কিন্তু যদি মিথ্যা-শপথ বিষয়ে ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য হয়, তাহা হইলে ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, বিশেষতঃ অক্স্ফোর্ডের * বিশ্ববিদ্যালয়টী যে আবার ইংলণ্ডের মধ্যে অগ্রগণ্য তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। * * * * অক্স্ফোর্ডকে এক্ষণে মিথ্যাশপথের জাতীয় শিক্ষালয় বলিলেও হয়।”

থ্যাকারে তাঁহার ভ্যানিটি-ফেয়ার অর্থাৎ “ফক্কিকারির হাট বাজার” নামক উপন্যাসের ৩০৬ পৃষ্ঠায় বিদেশে ইংরাজদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে বলেন—“ফ্রান্স কিম্বা ইটালি দেশের প্রত্যেক নগরে দেখিতে পাইবে যে, আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ সেই ইতর ধরণের দাম্ভিকতা-পূর্ণ নবাবি চাল-চোল ও ভড়ং ভাড়ং দেখাইয়া তত্রস্থ নিরীহ সরাই-ওয়ালাদিগকে জুয়াচুরি করিয়া ফাঁকি দিতেছে—বিশ্বাস-প্রবণ ব্যাঙ্ক-অধ্যক্ষদিগের নিকট জাল চেক্ চালাইতেছে; গাড়ী-ওয়ালাদিগের গাড়ী, স্যাক্রাদিগের গয়না-পত্র, গোবেচারা পান্থদিগের সহিত তাস খেলিয়া তাহাদিগের পয়সা কড়ি—এমন কি সাধারণ পুস্তকালয়ের পুস্তকগুলি আত্মসাৎ করিতেছে।” এই সকল বিখ্যাত ইংরাজ-লেখকদিগের মুখেই ইংরাজ সমাজের পরিচয় পাওয়া গেল। ইংরাজ-সমাজের বিষয় ইংরাজেরা যেরূপ ভাল করিয়া বলিতে পারেন সেরূপ আমরা কখনই পারিব না—অতএব ইহার পর ইংরাজ-সমাজ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র।

এই ইংরাজ-সমাজের আদর্শ সভ্যতা আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত যেন তাহার প্রবল স্রোতে আমাদের জাতীয় সদ্‌গুণ এবং আমাদের সুনীতি-মূলক আচার-ব্যবহারগুলি ভাসিয়া না যায়। যে সকল গুণ আমাদের জাতীয় চরিত্রের অলঙ্কার-স্বরূপ, তাহা যেন আমরা এই মহা বিপ্লবের মধ্যে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করি। ধর্ম্মভাব, আত্মমর্য্যাদা-বোধ, আত্মোৎসর্গ, বিশ্বস্ততা, মমতা, বন্ধুতা, কৃতজ্ঞতা, দয়া দাক্ষিণ্য, বদান্যতা, পিতৃমাতৃ-ভক্তি, এই সকলই হিন্দু-চরিত্রের বিশেষ গুণ। ইংরাজদিগের মধ্যে যাঁহারা সত্য-প্রিয়, অপক্ষপাতী ও সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারাও ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

এসিয়াটিক্ সোসাইটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি কর্ণেল্ সাইক্স বলেন—"সদভিমান ও আত্মমর্য্যাদা-বোধ হিন্দু-চরিত্রের একটী বিশেষ লক্ষণ। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে লাল-পল্টন্ নামক বঙ্গীয় সৈন্যদল, যাহারা পলাসির ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা বিদ্রোহী হইয়া তাহাদিগের ইংরাজ নায়কদিগকে প্রথমে বন্দী করে। পরে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া চলিয়া যায়। তাহারা বলে যে, তাহাদিগকে যে পুরস্কার অঙ্গীকার করা হইয়াছিল সেই অঙ্গীকার পালন না করাই তাহাদের বিদ্রোহের কারণ। তৎপরে ইউরোপীয় নাবিক-সৈন্যদল ও ট্রিব্যালিয়নের সিপাহী-পল্টন বিদ্রোহীদিগের অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আনে। সেনাপতি মেজর-মন্‌রো তাহাদিগের বধ-দণ্ডের আজ্ঞা প্রচার করেন। আটজন বিদ্রোহী সিপাহীকে কামানের মুখে বাঁধিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহাদিগের মধ্যে গ্রেন্যাডিয়র-নামক দীর্ঘকায় সৈন্যদলের তিন জন সৈনিক ছিল। তাহারা এই অনুরোধ করিল যেন তাহাদিগকে দক্ষিণ দিকস্থ কামানগুলিতে বন্ধন করা হয়। কেননা তাহারা বরাবর দক্ষিণ দিকে থাকিয়াই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। তাহারা বলিল তাহাদিগের

শেষ অনুরোধটী এই—যেন তাহারা মরিবার সময়েও স্বকীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মরিতে পারে। সেনাপতি তাহাদিগের এই অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে তাহাদেরই প্রাণদণ্ড হইল।

জেনেরাল্ ব্রিগ্ বলেন যে, ভরতপুর-দুর্গ অবরোধের সময় ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে আমাদের সৈন্যেরা চারিবার ঐ দুর্গ আক্রমণ করে, কিন্তু চারিবারই তাড়িত হয়; পরে পঞ্চম আক্রমণের আজ্ঞা প্রচার হইল। এই সময় লর্ড-লেকের আর্দ্দালি এক জন হাবেলদার সেই দিন তাহার সৈন্যদলে যোগ দিবার জন্য লর্ড-লেকের অনুমতি প্রার্থনা করিল। প্রথমে লর্ড-লেক তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন—কিন্তু অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করায় যাইতে অনুমতি দিলেন। সে বলিল—'যদি আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারি তাহা হইলে সাহেব আমার মুখ আর কখনই দেখিতে পাইবেন না'—সেই সৈন্যদল দুর্গের প্রাকারে আরোহণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগের পৃষ্ঠ-রক্ষক কেহ না থাকায় হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু একমাত্র সেই হাবেলদার অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে চলিয়া আসিবার জন্য কত অনুরোধ করিল—কিন্তু সে ঐ কথাতে কর্ণপাতও করিল না। তাহাদিগকে এইমাত্র বলিল,—আমাকে কোথায় তোমরা ছাড়িয়া যাইতেছ তাহা লর্ড লেককে বলিও; এই বলিয়া প্রাকারোপরি অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বন্দুক দাগিতে লাগিল—পরক্ষণেই বিপক্ষগণের গুলির আঘাতে নিহত হইল। (ব্রিগ্ সাহেবের পত্র ৪৫ পৃষ্ঠা)

লর্ড-লেক্ ভরতপুর-দুর্গ অনেকবার আক্রমণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া আর একবার আক্রমণ করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। দুর্গ-প্রাকার ভেদ করা অসাধ্য এই কথা বলিয়া ইউরোপীয় সৈন্যদল আক্রমণে অসম্মত হইল—কিন্তু সিপাহী-সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য নির্গত হইল। এ আক্রমণেও লর্ড-লেক কৃতকার্য্য হইলেন

না। তিনি এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন,—'যদিও সিপাহী-সৈন্যেরা গত কল্যকার আক্রমণে সাহস ও অধ্যবসায়ের জাজ্বল্যমান পরিচয় দিয়াছে এবং তিন-তিনবার দুর্গ-প্রাকারে ব্রিটিস্ পতাকা উড্ডীন করয়াছে তথাপি জয়লাভের পক্ষে যে সকল বাধা বিঘ্ন আছে তাহা দুরতিক্রমণীয়।

এই অবস্থায় যখন সেনাপতি লেক্ পলায়নের আজ্ঞা দিলেন, তখন সিপাহীরা প্রথমতঃ কিছুতেই সম্মত হইল না—তাহারা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল—"হয় এই স্থান আমরা অধিকার করিব নয় মরিব।" এই প্রতিজ্ঞানুসারেই তাহারা কার্য্য করিল—তাহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও অধিক ঐ যুদ্ধে আহত ও নিহত হইল। সেনানায়কগণ পুনঃ পুনঃ পলায়নের আজ্ঞা প্রচার করায় তবে অবশিষ্ট সিপাহী-সৈন্য পলায়নে স্বীকৃত হইল। পৃথিবীর মধ্যে কি কোনও সৈন্য-দল কোন কালে স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষার্থ এই সিপাহী-সৈন্য অপেক্ষা অধিক মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছে ?

রাজপুতদিগের মধ্যে তো দেখা যায় তাহারা প্রাণান্তেও শত্রুহস্তে আত্ম-সমর্পণ করে না। যখন নিতান্ত নিরুপায় হয়, তখন অসি-হস্তে শত্রুগণকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করে এবং তাহাদের মধ্যে একজনও জীবিত থাকিতে পরাঙ্মুখ হয় না। রাজপুত-রাজ্যের সহিত মুসলমান-দিগের যুদ্ধে তো ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। এইরূপ একটী ঘটনা আমার নিজ জ্ঞানে ঘটিয়াছিল। গাইকবাড়ের করদ, কাটেওয়ার অঞ্চলের চইয়া-প্রদেশের রাজপুত-অধিপতি প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হয়। গাইকবাড়ের সহিত ইংরাজেরা যে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ ছিল তাহারই নিয়মানুসারে বিদ্রোহী রাজপুতকে বলদ্বারা বশীভূত করিবার জন্য গাইক-বাড় ইংরাজদিগকে অনুরোধ করেন। এই হেতু ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-গণ রাজার দুর্গ অবরোধ করিল এবং শীঘ্রই কামানের গোলায় দুর্গ-প্রাকার ভেদ করিল। দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে—ইংরাজ-সৈন্য

রাজাকে আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু রাজা ও দুর্গস্থ সৈন্যেরা আপন আপন স্ত্রীপুত্রগণকে বধ করিয়া তাহাদিগের মৃতদেহ কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিল এবং তাহাদের উষ্ণীষ দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া এবং মস্তকের শিখা আলুলায়িত করিয়া অসি-হস্তে দুর্গ হইতে নির্গত হওত ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল। ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। একটী রাজপুতও জীবিত রহিল না—পরে ইংরাজগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে গিয়া ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের দেহ তখন কূপমধ্য হইতে উত্তোলন করা হইয়াছে, কিন্তু কেহই জীবিত নাই। তাহার মধ্যে কেবল রাণী মুমূর্ষ অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার পায়ে একগাছি বৃহৎ সোনার-মল ছিল। যে সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে প্রথম দেখিতে পান, তিনি তাঁহাকে নিরাপদ মনে করিয়া অন্যান্য কূপ দেখিবার জন্য গমন করেন। সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন যে রাণীও গতাসু হইয়াছেন—তাঁহার যে পায়ে মল ছিল সে পাও নাই, সে মলও নাই। সৈন্যাধ্যক্ষ এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, অপরাধীকে যে কেহ ধৃত করিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কার দিবেন এইরূপ ঘোষণা করিলেন। কিছুকাল পরে কাটেওয়ার প্রদেশে নবনগর যখন আক্রমণ করা হয় তখন দুর্গস্থ বিপক্ষ সৈন্যগণ আত্মসমর্পণ করিবার পূর্ব্বে যে শেষ কামান ছুঁড়িয়াছিল সেই কামানের গোলায় আমাদের একজন গোলন্দাজ নিহত হয়—আমাদের আর একজন গোলন্দাজ অমনি বলিয়া উঠে—'চইয়াতে ঐ ব্যক্তি যেমন রাণীর পা কাটিয়াছিল তেমনি তাহার ফল ফলিয়াছে।' ইহাকেই কি ধর্ম্মের বিচার বলে না?

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল আ্যাডাম্‌সের অধীন এক দল সৈন্য ভাগলখণ্ড প্রদেশে এন্তরি-দুর্গ আক্রমণ করে,—দুর্গস্থ বিপক্ষ সৈন্যগণ প্রাণপণে তাহার প্রতিরোধ করে। একজন উপস্থিত সৈন্যাধ্যক্ষ বলেন—দুর্গমধ্যে ১৫০

জন মাত্র সৈন্য ছিল; গোলার আঘাতে দুর্গ-প্রাকারে যে রন্ধ্র হইয়াছিল, সেই রন্ধ্রদেশ রক্ষা করত চারি ঘণ্টা কালেরও অধিক তাহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিল। যখন প্রায় সমস্ত স্থানটী ইংরাজ-কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল, তখন তাহারা দুর্গের নানা স্থলে অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়া সমস্ত স্থানটীকে একটী বিশাল অগ্নিক্ষেত্রে পরিণত করিল। এই অগ্নি-রাশির মধ্যে তাহারা যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং যখন রক্ষার আর কোন উপায় নাই, তখন দুর্গপতি পাছে শত্রুহস্তে পতিত হয়েন এই আশঙ্কায়-স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষার্থ বারুদে অগ্নি সংযোগ করিয়া স্বীয় দেহকে গগন-মার্গে উড়াইয়া দিলেন।

আত্মোৎসর্গ ও প্রভুভক্তি হিন্দুদিগের চরিত্র-গত আর একটী প্রধান লক্ষণ।

অর্ম্ সাহেব তাঁহার ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্তে ক্লাইব কর্ত্তৃক আর্কট সংরক্ষণের বর্ণনাকালে যে দুইটী গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হিন্দু চরিত্রের মহত্ত্ব প্রতিপাদান করে। একবার শত্রুগণ-কর্ত্তৃক এই দুর্গ আক্র-মণ-সময়ে তাহাদিগের সেনাপতি দুর্গের পরিখার মধ্যে পড়িয়া যায়। ঐ ব্যক্তি আক্রমণ-কালে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করে, এই হেতু তাহার অধীনস্থ সৈন্যেরা তাহার এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিল যে তাহাদের মধ্যে একজন ৪০টা বন্দুকের গুলি-বৃষ্টির মুখে, পরিখায় নাবিয়া তাহাকে তুলিয়া আনে।

আর একটী ঘটনাও মর্ম্মস্পৃক্। এই আর্কট-দুর্গ ৫০ দিন পর্য্যন্ত অবরুদ্ধাবস্থায় থাকে—দুর্গাভ্যন্তরস্থ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্য-গণের অন্নাভাবে ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। অর্ম্ বলেন, 'আমি এই প্রসিদ্ধ অবরোধের ইতিবৃত্তে এমনি একটী বিশ্বাস-যোগ্য ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি, যাহাতে হিন্দু-চরিত্রের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই অবরোধের সময় আহার্য্য দ্রব্যের এত

অনাটন হইয়া পড়ে যে, সকলের আশঙ্কা হইয়াছিল পাছে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত হইয়া শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। এই সময়ে সিপাহীরা ক্লাইবকে বলিল "আমরা ফেন খাইয়াই থাকিতে পারিব—ইংরাজদিগের জন্য ভাত দরকার।" সিপাহীরা অনেক স্থলে জাতি-গত স্বার্থপরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইউরোপীয়গণের সহিত ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইয়া কতবার ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল করিয়াছে! জেলালাবাদে সাহসী সেনাপতি সেলের অধীন দুর্গাভ্যন্তরস্থ কোম্পানির সৈন্যগণ যখন অবরুদ্ধ অবস্থায় অনাহারে কষ্ট পাইতেছিল, তখন তাহারা মধ্যে মধ্যে দুর্গ হইতে বলপূর্ব্বক নির্গত হইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতে যে সকল মেষ চরিত তাহাদিগকে ধরিয়া আনিত। ইহার মধ্যে কতকগুলি, সিপাহী-দিগের অংশে পড়ে—কিন্তু তাহারা সর্ব্ব-শ্লাঘ্য আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়া বলিল, "আমাদের জীবন ধারণের জন্য মাংস নিতান্ত আবশ্যক নহে—মাংসাহার আমাদের অভ্যাসও নহে, অতএব যেগুলি আমাদের অংশে পড়িয়াছে সে সকল ইউরোপীয়গণকেই দেওয়া হউক।"

টিপু স্থলতান বেড্‌নোর অধিকার করিলে ইংরাজ সেনাপতি ম্যাথুস সসৈন্যে তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। এই সময় টিপু নিজে সৈন্য-দলে প্রবিষ্ট করিবার জন্য সিপাহীদিগকে অনেক প্রলোভন দেখান—কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সিপাহী-দিগকে ইউরোপীয় বন্দিগণ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছিল—তাহাদের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী প্রভৃতি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল। কিন্তু একজন বন্দী ইংরাজ-সেনানায়ক পরে প্রকাশ করে যে, প্রতি রাত্রে সিপাহীরা এই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, ক্রোশ-ব্যাপী পুষ্করিণী সকল সন্তরণ পূর্ব্বক, সতর্ক-রক্ষকদিগের চক্ষু এড়াইয়া, টিপু-স্থলতানের নিকট হইতে যৎসামান্য যে খোরাকি-পয়সা পাইত তাহার মধ্যে যাহা কিছু বাঁচাইতে পারিয়াছিল তাহা সঙ্গে লইয়া, ইউরোপীয়

বন্দিগণের শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে উপহার প্রদান করে। তাহারা ইংরাজ-সৈন্যগণকে বলে—"আমরা যা-তা খাইয়াই জীবন ধারণ করিতে পারি—কিন্তু তোমাদিগের মাংস আবশ্যক।"

ম্যালকম্ সিপাহীদিগের সম্বন্ধে আর একটী গল্প বলেন। দাক্ষিণাত্যে নিজামের সৈন্যগণ একটী গ্রাম লুঠ করে এবং গ্রামবাসিগণ অনাহারে মৃতপ্রায় হয়। ম্যালকম্ তাঁহার সিপাহী-সৈন্যদলের কতক-গুলিকে রক্ষক-স্বরূপ ঐ গ্রামে প্রেরণ করেন—ঐ সিপাহীরা আপনা-দিগের আহার্য্য চাউল হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া অনাহারী গ্রামবাসী-দিগকে বিতরণ করে।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লাসোয়ারি যুদ্ধের পর সৈন্যগণের মধ্যে আহত ও পীড়িতের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, হাঁস্পাতালের দ্বারা আর কোন সাহায্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই অবস্থায় সেনাপতি এই আহত ও পীড়িতদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে সিপাহীদিগকে অনুরোধ করিলেন। সিপাহীরা প্রফুল্লচিত্তে এই অনুরোধ রক্ষা করে।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি মন্‌সন্ যখন হোল্‌কারের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সসৈন্যে পলায়ন করিতেছিলেন, তখন হোলকার ইংরাজদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য সিপাহীদিগকে বলিয়া পাঠান। সিপাহীরা যদিও সেই সময় ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিতেছিল এবং হোলকারও তাহাদিগকে অনেক ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল, তথাপি তাহারা ইংরাজের লবণ খাইয়াছে বলিয়া ইংরাজদিগের পক্ষ কিছুতেই পরিত্যাগ করে নাই।

১৮১৭ খৃঃ কির্কির যুদ্ধে আমার অধীনে যে সৈন্যদল ছিল, পেষোয়ার চরেরা তাহাদিগকে ধনদ্বারা বশীভূত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সিপাহীরা সেই সব কথা আমার নিকট বলিয়া দেয়।

আমার বন্ধুর নিকট হইতে একটী পত্র পাই, তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রকাশ করিতেছি—

আমি সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভেই বোম্বাই নগরে উপনীত হই এবং ঐ মাসের শেষে আমার অধীন সৈন্যদল পারস্য দেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। তাহাদের অবিশ্বস্ততা সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক জনরব উঠিয়াছিল— কিন্তু আমি আনন্দের সহিত বলিতেছি তাহারা যেরূপ সাহস ও সদাচারের পরিচয় দিয়াছে তদ্দ্বারা তাহাদের বিশ্বস্ততা বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। এমন কি মৃত সর্ হেন্‌রি হ্যাবেলক্ এই ২৬ সংখ্যক বোম্বাই সিপাহী সৈন্যদিগকে ভূয়োভূয় প্রশংসা করেন। * * * দাক্ষিণাত্য ও খান্‌দেশ প্রদেশে যখন ভীলদিগের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন এই সৈন্যদল তাহাদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করে। এই প্রদেশটী এরূপ পর্ব্বতময়, জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও খালখন্দে বিভক্ত, যে এখানে ভীলদিগের সহিত আঁটিয়া উঠা ভার—কিন্তু এই সিপাহী-সৈন্যদল তাহাদিগকে পদে পদে পরাভূত করে। ইহারা ইংরাজ-সেনানায়কদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য কতই আগ্রহ প্রকাশ করে; যখন আমার পার্শ্ব ঘেঁষিয়া গোলাগুলি ছুটিতেছিল, তখন একজন ব্রাহ্মণ-সিপাহী আমাকে আপনার শরীরের অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। আর এক সময় একজন মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক, তাহার কাপ্তেনের প্রতি বিপক্ষের একজন বন্দুক লক্ষ্য করিতেছে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—এবং সেইখানে দাঁড়াইবা মাত্র সেই বন্দুকের গুলি কাপ্তেনের গায়ে না লাগিয়া তাহার শরীরে প্রবেশ করিল।

এইরূপ বিশ্বস্ততার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা হিন্দু-চরিত্রের আর একটী লক্ষণ।

মেজর্ ফলেট্ ২৫ সংখ্যক বোম্বাই সিপাহি সৈন্যদলের নেতা হইয়া আমেদনগর হইতে আসীরগড়ে যাত্রাকালীন ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েন। মেজর ফলেট্ যদিও একজন কঠোর নিয়ন্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার অখণ্ড ন্যায়পরতা-নিবন্ধন সৈন্যগণের এতদূর অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন যে, রাজপুত ও ব্রাহ্মণ-সৈনিকেরা তাহাদিগের জাতীয় নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগের সেনাপতির মৃতদেহ ডুলি হইতে নামাইয়া গোরের মধ্যে স্থাপন করে এবং তাহারা নিজে গোরমধ্যে অবতরণ করিয়া ঐ মৃত শরীরকে তন্মধ্যে উত্তমরূপে প্রসারিত করিয়া তাহার উপর মাটি চাপা দেয়। যদিও এই মৃত ম্লেচ্ছদেহস্পর্শে তাহারা আপনাদিগকে অপবিত্র মনে করিয়া পরে তাহার যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হয়, তথাপি জাতীয় সংস্কারের অনুরোধে তাহাদিগের মৃত কাপ্তেনের সৎকার করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই। সেই দিন অপরাহ্ণে কতকগুলি ইংরাজ-সেনা-নায়ক সেই সমাধি-স্থলে শিলা-খণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছে দেখিয়া সিপাহীরা-তাহাদিগের শিবির হইতে বেগে নির্গত হইয়া একটী ক্ষুদ্র স্মরণ-স্তম্ভ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে ইংরাজ সৈন্যদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিল।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সেনানায়ক সিতোয়েল্ কোহাটের নিকটে যুদ্ধে হত হইলে তাঁহার অধীনস্থ সিপাহীরা তাঁহার মৃত শরীর উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য অক্ষুব্ধচিত্তে স্বকীয় জীবন উৎসর্গ করে।

আমি যখন গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক ষ্ট্যাটিষ্টিকাল রিপোর্টারের পদে নিয়োজিত হইয়াছিলাম তখন প্রায় বৎসরের মধ্যে আট মাস আমাকে শিবিরে শিবিরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে একটা ব্যাঘ্র দুইজন কৃষককে দন্তাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে; এই সাঙ্ঘাতিক অবস্থায় তাহারা আমার শিবিরে আনীত হয়। আমি তাহাদিগের ক্ষতস্থানে প্রতিদিন ঔষধাদি

দিতাম। পরে তাহারা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে তাহাদিগকে তাহাদের গ্রামে পাঠাইয়া দিলাম। আর যে কখন তাহাদিগের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে এরূপ মনেও করি নাই। মে মাসের শেষে আমি পুণা-অঞ্চলাভিমুখে যাত্রা করিতেছি এমন সময়ে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে সেই দুইজন কৃষক পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা আমার গতিবিধির সন্ধান লইয়া ৫ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া কতকগুলি পাত্রে মধু, টাট্‌কা মাখন ও দুগ্ধ—অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার উপহার-স্বরূপ আমার নিকট লইয়া আসিয়াছে।

উপচিকীর্ষা হিন্দুচরিত্রের আর একটি লক্ষণ। গত সিপাহী-বিদ্রোহের মধ্যেও যে উপচিকীর্ষার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যৎকালে গোয়ালিয়ারে সিন্ধিয়া-সৈন্য-দলের মধ্যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন লেফ্‌টেনেণ্ট,···সত্বর অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক কাওয়াদের স্থানে যেমন উপস্থিত হইবেন অমনি সিপাহিদল হইতে গুলি বর্ষণ হইল—তাঁহার অশ্ব হত হইল এবং চারিজন সিপাহী দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিল। পরে তাহারা তাঁহাকে ছাউনির বাহিরে লইয়া নদী পার হইয়া একটা কম্বল দিয়া বলিল "যাও, জীবন লইয়া আগ্রাভিমুখে পলাও।" কিন্তু তিনি তাঁহার স্ত্রীকে রোগ-শয্যায় পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন—স্ত্রীকে ছাড়িয়া যাইতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। উহার মধ্যে দুইজন সিপাহি বলিল "আচ্ছা, আমরা তোমার স্ত্রীকে এখানে আনিয়া দিতেছি," এই বলিয়া তাহারা প্রস্থান করিল। কিয়ৎকাল পরে সেই রোগক্লিষ্টা স্ত্রীলোকটীকে তাহারা সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি তাঁহার রুগ্না স্ত্রীকে কি করিয়া লইয়া যাইবেন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, আমাদের দুজনকেই গুলি কর। কিন্তু গুলি করা দূরে থাকুক, তাহারা কম্বলের শয্যা প্রস্তুত

করিয়া তাহার উপর রুগ্না স্ত্রীলোককে শুয়াইয়া, বন্দুকে ঐ কম্বলের শয্যা ঝুলাইয়া কোন নিরাপদ স্থানে তাঁহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিল।

কোন বন্ধুর পত্র হইতে নিম্নলিখিতটী উদ্ধৃত করিতেছি—

গত সিপাহী বিদ্রোহের গোলযোগের বিষয় স্মরণ করিবার সময় পঞ্চবিংশতি সিপাহী-সৈন্যদলের মহত্ত্বের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। ২৩শে তারিখের যুদ্ধে ঐ সৈন্যদলের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। তাহারা সর্ব্বপ্রকার আঘাতে আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের হাঁস্পাতালে গমন করে। তাহাদিগের হস্তপদ বৃহৎ গোলার আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বন্দুকের গুলিদ্বারা বিদ্ধানুবিদ্ধ হয় এবং শরীরের মাংসেও সাঙ্ঘাতিক আঘাত লাগে। এই সকল লোক আহত হইয়া প্রখর সূর্য্যোত্তাপে কেহ বা শুইয়া, কেহ বা বসিয়া কল্পনাতীত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিল এবং অম্লান বদনে দেখিতেছিল যে, তাহাদের পূর্ব্বে যে সকল আহত ব্যক্তি হাঁসপাতালে আসিয়াছে তাহাদিগকে লইয়াই অস্ত্র-চিকিৎসকেরা ব্যস্ত আছেন। এই দৃশ্যটি কেমন মহত্ত্বপূর্ণ!—তাহারা সকলে এইরূপ বলিতেছে যে "আমাদের কষ্ট কিসের? আমরা অনেক দিন সরকারের লবণ খাইয়াছি—আমরা মরিলে কি ক্ষতি? আমরা ভাল কাজ করিয়াছি—আমরা মরিলে সরকার অবশ্য আমাদিগের পরিবারের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিবেন।" এক জনের স্কন্ধাস্থি-সন্ধি হইতে অজস্র ধারে রক্ত নির্গত হইতেছিল—বলাধানের জন্য তাহাকে জল-মিশ্রিত ব্রাণ্ডি প্রদত্ত হয় কিন্তু তাহার পার্শ্বে আর একজন যন্ত্রণায় গোঙরাইতেছিল; পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি উদারতার পরিচয় দিয়া বলিল—"আগে আমার ভাইকে দাও।"—তৎপরে সে তাহা পান করিয়া বলিল "আমি আহত হইয়াছি তাহাতে ক্ষতি নাই, কারণ আমি জানি সরকার আমাকে ভুলিবেন না।" অস্ত্রচিকিৎসক সেই আহত ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও অঙ্গ ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা

বীরোচিত ধৈর্য্য-সহকারে তাহা সহ্য করিল। ক্লোরোফরম্ দিয়া তাহাদিগকে অচেতন করা হয় নাই, অথচ যখন সেই ভয়ানক ছুরিকা তাহাদের শরীর হইতে কোন অঙ্গ-বিশেষ বিচ্ছিন্ন করিতেছিল, তখন তাহাদিগের মুখ হইতে একটি হা-হুতাশও নির্গত হয় নাই। তাহারা যুদ্ধের সময় যেরূপ ধীর সাহসী ও নির্ভীক, সেইরূপ অস্ত্রচিকিৎসকের বিষম যন্ত্রণাজনক অস্ত্রাঘাতেও তাহারা ধৈর্য্য, দৃঢ়তা ও চিত্তপ্রসাদের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছিল!

হল্ট ম্যাকেন্‌জি একটি আশ্চর্য্য ঘটনার কথা আমার নিকট উল্লেখ করেন। কোন দাঙ্গায় দুই ভ্রাতা দণ্ডনীয় হয়; ইহার মধ্যে একজনের অতি সামান্য দণ্ড হয়—আর একজনের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। যাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য অপর ভ্রাতা তাহার নামে পরিচয় দিয়া স্বয়ং ফাঁশিকাষ্ঠে আরোহণ করিবার চেষ্টা করে।

ম্যাকেনজি বলেন, ইংলণ্ডের নিউগেট কারাগারের ইতিবৃত্তে বোধ হয় ঈদৃশ ঘটনা কদাপি দৃষ্ট হয় না।

বদান্যতা হিন্দুচরিত্রের আর একটি লক্ষণ। ভারতবর্ষে (Poor Law) অর্থাৎ দারিদ্র্য নিবারণের জন্য কোন বিশেষ রাজ-বিধি নাই,—কোন কালে ছিলও না। এদেশে কেহ কখন বাধ্য হইয়া ক্ষুধিতকে অন্ন ও উলঙ্গকে বস্ত্র দান করে নাই। ভূমি যতই ফলবতী হউক না কেন—লোক-সমাজের যতই উন্নত অবস্থা হউক না কেন—বিংশতি কোটি লোকের মধ্যে দীন দরিদ্র থাকিবেই থাকিবে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ যেরূপ দুর্ভিক্ষ মহামারী ও অশেষ যুদ্ধবিপ্লবের রঙ্গভূমি, তাহাতে এখানে দরিদ্রের সংখ্যা তো আরও অধিক হইবারই কথা। তথাপি এখানে যে দারিদ্র্য-কষ্ট নিবারণ হইতেছে তাহার একমাত্র কারণ এই যে, হিন্দু-সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা দানশীলতা একেবারে বদ্ধ-

মূল হইয়া গিয়াছে। খৃষ্ট জন্মিবার ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম অধিষ্ঠান হইতে আবহমান কাল পর্য্যন্ত—বৌদ্ধ পুরোহিতেরা কমণ্ডলু-হস্তে ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে! ইউরোপে ভিখারীগণকে যেরূপ কঠোর অর্দ্ধ-চন্দ্র খাইতে হয় ভারতবর্ষে সেরূপ নহে। এখানে ভিখারীগণের যাচ্ঞা নিষ্ফল হয় না; তাহারা বিশ্বস্ত চিত্তে ভিক্ষা করে—তাহারা বিলক্ষণ জানে যে এখানে লোকেরা ধর্ম্মের জন্যই দান করে। সর্ জন ম্যালকম বলেন, প্রসিদ্ধ আলা-বাইয়ের বদান্যতা এতদূর ছিল যে তিনি হোলকার রাজ্যের অনেক স্থানে যে কেবল নিজ হস্তে প্রতিদিন দরিদ্রগণকে দান করিতেন এমত নহে, তিনি পথ-প্রান্তে তৃষিত পথিক-দিগের জন্য অসংখ্য জলছত্র ও সরাই নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার উপচিকীর্ষা মনুষ্য জাতিতে বদ্ধ ছিল না। যে সকল পক্ষিগণকে কৃষকেরা নিজ নিজ ক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিত, তাহাদিগের জন্য তিনি স্বতন্ত্র শস্যময় ক্ষেত্র সকল উন্মুক্ত রাখিতেন। এইরূপ পশুদিগের প্রতি দয়াভাব যে শুধু পক্ষী-জাতিতে বদ্ধ এমত নহে, যাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন—ধর্ম্মের ষাঁড় সকল নগরের পথে ঘাটে মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছে এবং অবাধে পথপ্রান্ত-স্থিত দোকানদারের শস্য-পূর্ণ চাঙ্গারি মধ্যে মুখ দিতেছে—দোকান-দারগণ তাহাদিগকে প্রহার না করিয়া শুধু ধমকাইয়া তাড়াইয়া দিতেছে। * * *। পুষ্করিণী, সরাই, জলছত্র, অন্নছত্র প্রভৃতি জনহিত-কারী সাধারণ কার্য্যে কত লোকে কত ব্যয় স্বীকার করিতেছে, তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

পিতামাতা ও আত্মীয় কুটুম্বদিগের প্রতি অনুরাগ হিন্দুচরিত্রের আর একটি প্রধান লক্ষণ।

১৭৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ হইতে একদল সিপাহী-সৈন্য হায়দ্রাবাদে প্রেরিত হয়। তাহারা তাহাদিগের বেতন হইতে কিয়দংশ টাকা লইয়া

স্ত্রীপরিবারগণকে দিবার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করিয়া যায়। কাপ্তেন উইলিয়াম্‌স্‌ বলেন যে, এ বিষয়ে তাহাদিগের চরিত্র ও আচরণ আদর্শ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। তাহারা কেবল যে স্বীয় স্ত্রীপুত্রগণকেই তাহাদিগের আয়ের অধিকাংশ দেয় এরূপ নহে; তাহাদিগকে তো দিতেই হইবে।* কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকে স্বীয় বৃদ্ধ পিতামাতা ও দরিদ্র আত্মীয় স্বজনকেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে সাহায্য করে। তাহারা পিতামাতা আত্মীয় স্বজনকে এত অধিক দান করে যে, বিদেশ-যাত্রাকালে পাছে তাহারা নিজে অর্থাভাবে কষ্ট পায় এই জন্য গভর্ণমেণ্টকে সময়ে সময়ে তাহাদের আয়-ব্যয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। বঙ্গদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, এই তিন স্থানের সৈন্যগণের মধ্যেই এইরূপ সদ্ব্যবহার লক্ষিত হয়।

শিষ্টাচার হিন্দু-চরিত্রের আর একটী প্রধান লক্ষণ। সর্‌ জন ম্যালকম বলেন—ভারতবর্ষীয়গণ সকল জাতি অপেক্ষা অধিক শিষ্টাচারী। তাঁহারা প্রায় কখনই শিষ্টাচারের ব্যতিক্রম করে না। তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া প্রথমেই কাজ-কর্ম্মের প্রসঙ্গ উপস্থিত করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের বিষয়, আভিজাত্য বা ব্যক্তিগত কোন বিশেষ অভ্যাস বা রীতি-নীতির কথা ভদ্রের সহিত কথোপ-কথনে উপস্থিত করিতে নাই; পরিচ্ছদ বা কোন কুটুম্বের মুখশ্রী লইয়া কোন কথা বলা রূঢ়তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিজের সম্মুখে অলঙ্কার, অশ্ব, হস্তী, প্রভৃতি যান বাহনের প্রশংসা করিলে বক্তাকে নম্রভাবে নিরস্ত করিয়া দেওয়া একটি শিষ্টাচারের নিয়ম। কিন্তু আমাদের মধ্যে

* প্রধান সেনাপতি সর্‌ চার্লস নেপিয়রের কালে কোন্‌ সৈনিক পুরুষ তাহার বিলাতস্থ মাতাকে আপনার বেতনের কিয়দংশ প্রতিমাসে প্রেরণ করাতে প্রধান সেনাপতি এই আচরণ অনুকরণ-যোগ্য বলিয়া সাধারণ-সৈন্য-সমীপে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ আচরণ ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অনেকেই জানেন আমরা কেমন উদারতা সহকারে এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি 'নিগর' এই ঘৃণা-ব্যঞ্জক শব্দটি অকাতরে প্রয়োগ করিয়া থাকি।

প্রসিদ্ধ পার্সি পোত-নির্ম্মাতা জ্যাম্‌সেটজি এই নিগর্-শব্দ-প্রয়োগ লইয়া একটি যে তীব্র শ্লেষ-পূর্ণ উত্তর দিয়াছিলেন, জেনেরাল ব্রিগস্ তাহার উল্লেখ করেন। জ্যাম্‌সেটজি একজন সামান্য ছুতার মিস্ত্রী হইতে পোত-নির্ম্মাতার পদে আরোহণ করেন। তিনি একমাত্র এতদ্দেশীয়দিগের কায়িক শ্রমের সাহায্যে রয়াল-নেভির জন্য একটি জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ জাহাজ ভাসাইবার যোগ্য হইলে, তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার অনুচরগণ এবং নৌ-বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে নিমন্ত্রণ করেন। জ্যাম্‌সেটজি নিমন্ত্রিতদিগের জন্য সমস্ত আয়োজন করিতে করিতে জাহাজের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং গর্ব্ব ও সন্তোষ-সহকারে উহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি তদুপরি আরোহণপূর্ব্বক জাহাজের খোলের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া এই কথাগুলি খুদিয়া রাখিলেন,—"১৮০০ খৃষ্টাব্দে একজন কদাকার নিগর কর্ত্তৃক এই জাহাজ নির্ম্মিত হয়।" সে সময় তিনি এ কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই, কিন্তু অনেক বৎসর পরে যখন জাহাজ আবার ডকে ফিরিয়া আসিল তখন তিনি সকলকে সেই খোদিত লিপি দেখাইয়া দিলেন এবং তাহার মধ্যে যে একটি গূঢ় ভর্ৎসনা নিহিত ছিল তাহার ব্যখ্যা করিয়া দিলেন।"

উপরোক্ত সমস্তই সাইক্‌সের প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিলাম। ভরসা করি, দীর্ঘতা বশত পাঠকের বিরক্তিকর হয় নাই।

আমাদের ভূতপূর্ব্বে গভর্ণর জেনেরল ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ পার্লিয়ামেণ্টে সাক্ষ্য দিবার সময় হিন্দু চরিত্র-সমন্ধে যাহা ব্যক্ত করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—

"কেহ কেহ অনেক কষ্ট করিয়া এখানকার সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই-

রূপ একটি সংস্কার জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, ভারতবর্ষবাসী-দিগের মধ্যে নীতিজ্ঞানের অত্যন্ত হীনাবস্থা এবং যে সকল পাপাচার মনুষ্য-প্রকৃতিকে কলঙ্কিত করে, সেই সমস্ত তাহাদিগের কর্ত্তৃক অবাধে সচরাচর অনুষ্ঠিত হয়! আমি যে শপথ গ্রহণ করিয়াছি তাহার উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার দৃঢ়তা-সহকারে বলিতেছি যে, তাহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা অসত্য এবং সম্পূর্ণরূপে অমূলক। ভারতবর্ষ-বাসীদিগের কথা বলিতে গেলে হিন্দুদিগকে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা আবশ্যক, যেহেতু ভারতবর্ষ-নিবসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু; ইহাদিগের মধ্যে মুসল-মানও অনেক আছে, কিন্তু তাহারা স্বতন্ত্র সমাজে অবস্থান করে। হিন্দুরা অতি ভদ্র, পূর্ব্বোপকারী ব্যক্তি তাহাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করিলেও তাহারা প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যগ্র হয় না বরং কেহ সদ্ব্যবহার করিলে তাহার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়। মনুষ্য-হৃদয়ের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-সকল পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে যেরূপ দৃষ্ট হয়, ইহাদের মধ্যে তদপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক দৃষ্ট হয় না। তাহাদিগের মধ্যে কুসংস্কার আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের ন্যায় আমাদের সংস্কার নয় বলিয়া, তাহারা আমাদিগের সম্বন্ধে কিছুই মন্দ মনে করে না। তাহাদিগের উপাসনা-প্রণালী হীন হইলেও তাহাদিগের ধর্ম্ম-মধ্যে যে সকল উপদেশ আছে তাহা জন-সমাজের উৎকৃষ্টতম উদ্দেশ্য-সাধন-পক্ষে উপযোগী।”

ইংরাজদিগের মধ্যে যাঁহারা সত্যপ্রিয় তাঁহারা স্বীয় সমাজ ও আমাদিগের সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্বতন্ত্র রূপে উদ্ধৃত করিয়াছি। নীতি-বিষয়ে, তাঁহাদের সমাজ অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় সমাজ যে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট তাহা তাঁহাদের বাক্যেই এক প্রকার সপ্রমাণ হইতেছে। বুদ্ধি-জ্ঞান-বিষয়ে আমরা যে এক্ষণে তাঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছি তাহা আমরা অস্বীকার করি না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জ্ঞান ও নীতি যদিও পরস্পর পরস্পরের

উন্নতি-সাপেক্ষ, তথাপি প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সাধনা আবশ্যক। জ্ঞানের উন্নতিতে নীতিরও যে কিয়ৎপরিমাণে উন্নতি হয় তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই, যে পরিমাণে জ্ঞানের উন্নতি হয় সেই পরিমাণেই যে নীতির উন্নতি হইবে, জ্ঞান নীতির মধ্যে এইরূপ কোন বাধ্যবাধক সম্বন্ধ নাই। তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে ইংরাজেরা নীতি-বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠ হইত সন্দেহ নাই। কারণ তাহারা আমাদিগের অপেক্ষা জ্ঞান-বিষয়ে অনেক পরিমাণে উন্নত। আমাদের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে শরীর মন হৃদয় তিনই পরস্পরের উন্নতি-সাপেক্ষ; কারণ এই তিনই পরস্পর পরস্পরের সহিত জড়িত হইয়া আছে। শরীরের উন্নতিতে মনেরও কিয়ৎপরিমাণে উন্নতি হয় বটে, কিন্তু কেহ যদি মনে করেন যে, ব্যায়াম দ্বারা শরীর সুস্থ ও সবল হইলেই মন সাধনা-ব্যতীত আপনা হইতেই বুদ্ধি জ্ঞানে পুষ্ট হইবে, তিনি যেরূপ মহাভ্রমে পতিত হয়েন, সেইরূপ যিনি মনে করেন, যে পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইবে, সেই পরিমাণে হৃদয়ের বৃত্তি-সকলও উন্নত হইবে, তিনিও তদ্রূপ মহাভ্রমে পতিত হয়েন। নীতির মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানের অংশ আছে সত্য, কিন্তু ভাবই উহার মূল উপকরণ—ভাবই উহার পত্তন ভূমি, এবং ভাবই উহার প্রাণ। এই জন্যই আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, একজন লোক হয়তো সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি পণ্ডিত, অথচ সে নীতি-বিষয়ে পশু অপেক্ষাও অধম—আর একজন নিতান্ত নির্ব্বোধ অনক্ষর মূর্খ অথচ সে নীতি-বিষয়ে উপরি উক্ত পণ্ডিত অপেক্ষাও অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। বেকনের ন্যায় অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত বোধ হয় পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দুর্নীতি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইংরাজ-কবি পোপ লিখিয়াছেন;—

"If parts allure thee think how Bacon shined,
The wisest, brightest, the meanest of mankind."

ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে যখন এইরূপ বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তখন ব্যক্তি-বিশেষের সমষ্টি জাতি-বিশেষের মধ্যেও যে এইরূপ বৈষম্য থাকিতে পারে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি, এবং ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষীয় জনসমাজ-মধ্যে যে এইরূপ বৈষম্য আছে তাহাও আমরা একপ্রকার দেখাইয়াছি।

দয়া, ভক্তি, প্রেম, ন্যায়পরতা প্রভৃতি হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি-সকল দ্বারা পরিচালিত হইয়া মনুষ্য যে সকল কার্য্য করে এবং যাহা ভাল বলিয়া হৃদয়ও আপনা হইতেই সায় দেয়, তাহাই যে সুনীতিমূলক কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হৃদয়ের এই সকল উৎকৃষ্ট ভাব হইতে যে সমস্ত কার্য্য স্বতঃই উৎপন্ন হয় সেই সকল কার্য্যের ফলাফল যখন আমরা আবার বুদ্ধি-দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখি যে তদ্দ্বারা জন-সমাজের কোন হানি হয় না, প্রত্যুত প্রভূত মঙ্গল হয়, তখন সেই সকল-কার্য্য যে সুনীতি-মূলক তাহা জ্ঞান-দ্বারা আমরা পরে দৃঢ়ীভূত করিয়া লই মাত্র। মিথ্যা কহিবে না—ইহা একটি নৈতিক উপদেশ; পার্ব্বত্য জাতি ও সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যেরা যে, মিথ্যা কথা প্রাণান্তেও কহে না—তাহারা কি সমাজের ভাবী অনিষ্ট চিন্তা করিয়া ঐরূপ আচরণ করে?—এরূপ বিচার-শক্তি তাহাদিগের নাই। আবার যখন কোন বুদ্ধি-জ্ঞান-সম্পন্ন সুসভ্য ব্যক্তি ইহার ফলাফল-বিচারে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি দেখিতে পান যে, সত্য কথা বলিলে জনসমাজের সর্ব্বাংশে মঙ্গল হইবারই সম্ভাবনা। অতএব দেখা যাইতেছে, হৃদয় হইতে যে সকল নীতি সমুদ্ভূত হয়, বুদ্ধি তাহাকে পরে দৃঢ়ীকৃত করে মাত্র। অতএব শুধু জ্ঞানের উন্নতিতে নীতির উন্নতি হয় না, সর্ব্বাগ্রে হৃদয়ের উন্নতি আবশ্যক।

বিষয়-রাশির সহিত সংঘর্ষণে জ্ঞান যেরূপ ক্রমশঃ উদ্বোধিত হয়, হৃদয়ের ভাবও সেইরূপ ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি লাভ করে। সাধনা, অভ্যাস ও অবস্থা-বিশেষে স্মৃতি, তুলনা, কল্পনা প্রভৃতি মনুষ্যের বিশেষ-বিশেষ বুদ্ধি-বৃত্তি-সকলের যেরূপ উন্নতি হয়—হৃদয়ের বৃত্তি-সম্বন্ধেও সেরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়।

বকল সাহেব বলেন, কুনীতি অপেক্ষা অজ্ঞান হইতে জন-সমাজের অধিক অনিষ্ট হয়। তিনি বলেন—একজন লোকের অভিপ্রায় সৎ হইলেও তদ্দ্বারা এরূপ-সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে যাহা জন-সাধারণের পক্ষে অতীব অনিষ্টকর। ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি বলেন, পূর্ব্বতন রোমীয় সম্রাটগণের মধ্যে যাঁহারা খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রতি দারুণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন; অর্থাৎ তাঁহারা জনসমাজের মঙ্গল-কামনায় নিঃস্বার্থভাবে ঐরূপ পীড়ন করিয়াছিলেন। সদভিপ্রায়-সত্বেও অজ্ঞানতা-বশতঃ যে অনেক মন্দ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, একজন লোক অজ্ঞান অথচ সৎ—আর একজন জ্ঞানবান্ অথচ অসৎ—এই উভয় লোকের মধ্যে কাহার দ্বারা জগতের অধিক অমঙ্গল হয়? একজন জ্ঞানবান্ অসৎ লোক এরূপ কৌশলে আর এক জনের সর্ব্বনাশ করিতে পারে যে, সেই নিপীড়িত ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে না যে তাহার সর্ব্বনাশ হইতেছে, কিম্বা এত বিলম্বে বুঝিবে যে, তখন প্রতিবিধানেরও আর কোন উপায় নাই। ইতিহাস ইহার সাক্ষী। যখন আক্‌বর-শা ভারতবর্ষের সিংহাসনে প্রথম অধিরূঢ় হয়েন, তখন তাঁহার রাজকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে নাই এবং বুদ্ধিরও তাদৃশ পরিণতি হয় নাই। * এই জন্য তিনিও প্রথমে আলা-উদ্দীন প্রভৃতি অত্যাচারী মুসলমানের ন্যায় ধর্ম্মান্ধ হইয়া হিন্দুদিগের মন্দির-সকল চূর্ণ করিয়া সেই সেই স্থানে মস্‌জিদ্ স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান আক্‌বর আপনার এই ভ্রম শীঘ্রই বুঝিতে

* He was long ranked with Shabudin, Alla, and other instruments of destruction, and with every just claim; and like these, he constructed a Mumba for the Koran from the altars of Eklinga."

Tod's Rajasthan Vol.I—p. 324.

পারিলেন। তিনি দেখিলেন, হিন্দুদিগের ধর্ম্মের উপর স্পষ্টতঃ এরূপ অত্যাচার করিলে স্বীয় রাজত্ব রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। এই জন্য তিনি প্রকাশ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে অপক্ষপাতিতা দেখাইয়া ভিতরে-ভিতরে হিন্দু-ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। * তিনি নানা প্রলোভন দেখাইয়া স্বীয় পরিবার মধ্যে রাজপুত-মহিলাগণের সহিত বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন। চতুর আক্‌বর এই এক রাজ-নীতির বলে রাজপুতদিগের রাজ্যসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা ও ধর্ম্মের উপর অলক্ষিতভাবে এবং বিনা আড়ম্বরে জয় লাভ করিলেন। কাহারও স্বাধীনতা হরণ করা যদি বিষম অনিষ্টজনক কার্য্যমধ্যে গণনীয় হয়, তাহা হইলে আক্‌বর-শা রাজপুত-জনসমাজের যে বিষম অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার পূর্ব্বে কোন মুসলমান সম্রাট বাহুবলে রাজপুতদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতে পারে নাই। আক্‌বর-শা † বুদ্ধিবলেই তাহাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিবল না থাকিলে তিনি এই অনিষ্ট সাধনে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। সেকন্দর-শা নেপোলিয়ন প্রভৃতি রাজদস্যুগণ যাঁহারা মানব-মণ্ডলীর স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছিলেন,

* Oodoy—'legros' was the first of his race who gave a daughter in marriage to a Tartar. The bribe for which he bartered his honour was splendid; for four provinces yeilding 200,000£ of annual revenue, were given in exchange for Tod Bae at once doubling the fisc of Marwar. With examples as Amber and Marwar, and with less power to resist the temptation, the minor chiefs of Rajasthan with a brave and numerous vassalage, were transformed inlo Satraps of Deli.

Do—p. 335.

† Akbar was the real founder of the empire of the Moguls, the first successful conqueror of Rajpoot independance.

Do—p. 324.

বাহুবলের সহিত তাঁহাদিগের বুদ্ধি-বল না থাকিলে কখনই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

বকল সাহেব বলেন—জ্ঞানের উন্নতিতেই পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হয়, তাহাতে নীতির প্রায় কোন হস্ত নাই। তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি এই কথা বলেন যে, ইউরোপে যে এত যুদ্ধ-বিগ্রহ কমিয়াছে তাহার কারণ বারুদের আবিষ্কার, আডাম-স্মিথ-কর্ত্তৃক বার্ত্তা-শাস্ত্রের মত-পরিবর্ত্তন এবং বাষ্পীয় শকট ও অর্ণবানের সাহায্যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংস্রব স্থাপন ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার বলিবার তাৎপর্য্য এই—যেহেতু এই সমস্ত ব্যাপার জ্ঞানের ফল, অতএব জ্ঞানের উন্নতিতেই যুদ্ধ-রূপ অমঙ্গল তিরোহিত হইয়াছে।

বকল যে সময় সভ্যতার ইতিহাস লিখিয়াছিলেন তখন প্রায় চত্বারিংশ বৎসরব্যাপী শান্তির পর ইউরোপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতিদ্বয় তুর্ক ও রুশীয়দিগের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছিল, তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন বুঝি জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সভ্যদেশ হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ চির-কালের জন্য অন্তর্হিত হইল। কিন্তু বকল সাহেব যদি জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার মতের অসারতা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন। ইউরোপের মধ্যে, যে দুই জাতি সর্ব্বাপেক্ষা সভ্যতম, জর্ম্মাণ ও ফরাসি, তাহাদিগের মধ্যে সে দিন কি ভয়ানক যুদ্ধই না হইয়া গেল। এক্ষণে তো রুশিয়া তুর্কির মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধানলে সমস্ত ইউরোপ যে আবার প্রজ্বলিত হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে। গত জর্ম্মাণ-ফরাসি যুদ্ধের নৈতিক কারণ অনুসন্ধান করিলে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে যে, জর্ম্মাণ-জাতির প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি এবং ফরাসি-জাতির অযথা আত্মাভিমানই সেই যুদ্ধের মূল-কারণ।

বাষ্পীয় শকট ও অর্ণবযানের প্রভাবে ইউরোপে কি কিছুমাত্র যুদ্ধ-বিগ্রহের হ্রাস হইয়াছে? প্রত্যুত এখন এইরূপ বোধ হয় যেন যুদ্ধ-

বিগ্রহের জন্যই বাষ্পীয় শকট প্রভৃতির সৃষ্টি ; কারণ প্রায়ই দেখা যায় যেখানে আর কোন প্রয়োজন সাধিত হইতেছে না সেখানে কেবল যুদ্ধবিগ্রহের সৌকার্য্যার্থেই লৌহবর্ত্মের জাল বিস্তৃত হইতেছে। বরং এক্ষণে যেরূপ জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, সেই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হত্যা-সাধক নানাবিধ কৌশলময় যন্ত্রেরও সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যত দিন ইউরোপে স্বার্থপরতার প্রাদুর্ভাব থাকিবে, যতদিন না সেখানে সমগ্র মানব-জাতির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও মমতার উদয় হইবে, তত দিন যে তথা হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ একেবারে তিরোহিত হইবে এরূপ আশা আমরা কখনই করিতে পারি না। এই অনুরাগ, এই মমতা, ধর্ম্ম-নীতিরই অন্তর্ভূত। অতএব বকল সাহেব যে বলেন, জ্ঞানের উন্নতিতেই যুদ্ধবিগ্রহ কমিয়াছে তাহা যুক্তি-সঙ্গত নহে। ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কেবল বাষ্পীয় শকট প্রভৃতির বহুলতা হইলেই হয় না—জনসাধারণের হৃদয়ের উন্নতি সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। বাষ্পীয় শকট প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে গতিবিধির সুবিধা হইয়া, পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎ-পরিমাণে সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত হইতে পারে বটে এবং এইরূপে জনসাধারণের হৃদয়ের উন্নতি সাধন-পক্ষে সহায়তা হইতে পারে সত্য, কিন্তু ইহা অন্যান্য উপায়ের মধ্যে একটী উপায় মাত্র। যদি এই সকল উপায়ে যুদ্ধবিগ্রহের উপশম হয়, তবে ইহার অব্যবহিত কারণ কি, জানা আবশ্যক ; ধর্ম্ম-নীতিই যে ইহার অব্যবহিত কারণ তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। মনুষ্য-সমাজে যে পরিমাণে অমঙ্গল-সকল তিরোহিত হইয়া মঙ্গলের রাজ্য বিস্তৃত হয়, সেই পরিমাণে জনসমাজে প্রকৃত সভ্যতার উদয় হয়। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, ধর্ম্মনীতি ব্যতীত কেবল জ্ঞান-দ্বারা জনসমাজের অমঙ্গল দূরীকৃত হয় না, অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, জ্ঞান ও নীতির সামঞ্জস্য-ব্যতীত জনসমাজে প্রকৃত সভ্যতারও অভ্যুদয় হয় না।

ফের্ডিনা-ডে-লেসেপ এবং সুয়েজের খাল।

সামান্য ঘটনা হইতে কত অভাবনীয় মহৎ ব্যাপারের জন্ম হয়—সুয়েজের খাল তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এখন সকলের মুখেই তো সুয়েজ-খালের কথা শুনা যায়, এবং বাস্তবিকও ইহার নির্ম্মাণে যন্ত্রবিদ্ শিল্পীদিগের শিল্পনৈপুণ্যের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই। কিন্তু কিরূপে এই মহৎ ব্যাপারের প্রথম সূত্রপাত হইল এবং ফের্ডিনা-ডে-লেসেপের মনে ইহার কল্পনা প্রথম কিরূপে উদয় হইল তাহা ঠিক জানিতে হইলে, যে সময় ফরাসিস্‌রা মিসরদেশ জয় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান শতাব্দীর সেই প্রাক্‌কালীন বর্ষগুলির প্রতি আমাদের মনশ্চক্ষুকে নিয়োগ করিতে হয়। যদিও নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মিসরের জয়সাধনে কৃতকার্য্য হন নাই তথাপি বোধ হয় কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐ দেশের ব্যাপারে তাঁহার বরাবর ঔৎসুক্য ছিল। তাঁহার পররাষ্ট্রবিভাগের মন্ত্রী ট্যালের্‌াঁর পরামর্শ-অনুসারে নেপোলিয়ান, ডেলেসেপ্ নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার প্রতিনিধি কার্য্যকারকরূপে "কায়রো" নগরে স্থাপন করেন। তাঁহার এই নিয়োগে পৃথিবীর একটি ভাবী লভ্যের সূত্রপাত হইল। লেসেপ অতি কার্য্যদক্ষ বিচক্ষণ লোক ছিলেন। মহম্মদ-আলিকে মিসরের শাসন-কর্ত্তার পদে অধিরোহণ করিতে সহায়তা করায় তিনি ফ্রান্সের একটি মহৎ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন, মহম্মদ-আলি যখন প্রথম মিসরে আইসেন তখন অতি দরিদ্র ছিলেন। তিনি লেখা-পড়া আদৌ জানিতেন না—কিন্তু তাঁহার স্বভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল এবং তাঁহার সৈনিক-সুলভ দৃঢ়তা ছিল। এই দুই গুণ থাকাতেই মাম্‌লুক-দিগের বিনাশের পর—তিনি ঐ উচ্চ পদে অধিরূঢ় হয়েন। ১লা মার্চ ১৪১১ খৃষ্টাব্দে ১৬০০ মামলুক "কায়রো"-নগরে নিহত হয়—কেবল

তাহাদের মধ্যে একজন অশ্বারূঢ় হইয়া দুর্গ-প্রাকারের উপর দিয়া লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক পলায়ন করে। লেসেপ কত কাল মিসরে ছিলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে ইহা নিশ্চয় যে তিনি ফ্রান্সের সহিত সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। ভের্সাই নগরে ১৯শে নবেম্বরে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। এই পুত্রের নাম ফের্ডিনা-ডে লেসেপ্। ইনিই সুয়েজ-খালের অনুষ্ঠান করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রদান করেন। দৌত্যকার্য্যে এবং যন্ত্রবিদ্যায় তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। তাঁহার বুদ্ধির প্রথম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মিসরের বৃত্তান্ত শুনিতে লাগিলেন—এবং ঐ দেশের ব্যাপারে তাঁহার ঔৎসুক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে তিনি ফরাশিস্ প্রতিনিধি-কার্য্যকারকের পদে তথায় নিযুক্ত হইলেন। ফের্ডিনা-ডে-লেসেপ্ তাঁহার পিতার পরিচয়-সূত্রে মহম্মদ-আলির নিকট যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইলেন। মহম্মদ-আলির অনেক ত্রুটি-সত্ত্বেও তাঁহাকে মিসরের নবজীবনদাতা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আলির মৃত্যুর পর ইব্রাহিম-পাশা তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। ইব্রাহিম-পাশা যুদ্ধব্যাপারের জন্য প্রখ্যাত।—তাঁহার পর আব্বাস-পাশা। তিনি অ্যালেক্জাণ্ড্রিয়া হইতে কায়রো পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকটের লৌহপথ নির্ম্মাণ করেন। এই লৌহপথের নির্ম্মাণে মিসরের বাণিজ্য নব-উদ্যম প্রাপ্ত হয়। তাহার পর, মহম্মদ আলির পুত্র সায়েদ-পাশা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মিসরের শাসনকর্ত্তার পদে অধিরূঢ় হয়েন। তিনিও মিসরের অনেক উন্নতি সাধন করেন।

সৌভাগ্যক্রমে মিসরের অনেক শাসনকর্ত্তার সহিত লেসেপের ক্রমান্বয়ে আলাপ পরিচয় হয়, এবং এই সূত্রে তথাকার বাণিজ্য-ব্যবসায়ের সুবিধা-সম্বন্ধে তিনি বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি যখন সে দেশে ছিলেন, তখন ভূমধ্যসাগর ও লোহিত-সাগরের মধ্যে পরস্পর

যোগ করিয়া, জাহাজ চলিবার একটি খাল নির্ম্মাণের কোন সুবিধা হইতে পারে কি না তাহাই তিনি ক্রমাগত চিন্তা করিতেন। কিন্তু এই কল্পনাটি একেবারে নূতন নহে। পূর্ব্বকালে ফ্যারাওদিগের রাজত্ব-সময়ে নীল নদী এবং লোহিত-সাগর যোগ করিয়া একটি খাল ছিল। যদিও বালুকায় সেই স্থানটি একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে তথাপি ইতস্ততঃ এখনও তাহার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কিন্তু লেসেপ যাহা কল্পনা করিলেন তাহা প্রকাণ্ড ব্যাপার। সমুদ্রে সমুদ্রে বরাবর যোগ করিয়া যাহাতে বড় বড় জাহাজ অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে এই সঙ্কল্পটি তিনি মনোমধ্যে পোষণ করিলেন। নদীর কিম্বা হ্রদের সহিত যোগ করিয়া খাল প্রস্তুত করা তো সহজ কথা—কিন্তু দুইটি সমুদ্রের দুইটি মুখ খুলিয়া দিয়া জল আনয়ন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। লেসেপ্ দেখিলেন, যেখানে পাহাড়-পর্ব্বত নাই—এমন স্থল-ব্যতীত এই সঙ্কল্পটিকে কার্য্যে পরিণত করা একেবারেই অসাধ্য।

অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিলেন যে, তত্রস্থ মরুভূমির কিয়দংশ এবং লোহিত-সাগরের সংলগ্ন কিয়দংশ স্থানে সমুদ্রের লবনাক্ত জলরাশি পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল; তাহার চিহ্নস্বরূপ তিনি দেখিতে পাইলেন, এখানে-ওখানে কতকগুলি গর্ত্ত বালিতে বুজিয়া গিয়াছে এবং তাহার মধ্যে এখনও লবণের এক-একটি সূক্ষ্ম আবরণ পড়িয়া আছে।

তবে এত দিন কেন সুয়েজ-খাল নির্ম্মিত হয় নাই—তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, মিসর দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তত অনুকূল ছিল না; ইউরোপের রাজাদিগের মধ্যে রেষারিষি প্রবল ছিল, এবং জনসাধারণের এই একটি সংস্কার ছিল যে, লোহিত-সাগরের এবং ভূমধ্য-সাগরের সমতল এক নহে। কিন্তু লেসেপ দেখিলেন, উভয়েরই সমতল সমান—এবং তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইল যে, বাষ্প ও তাড়িৎবার্ত্তাবহের সাহায্যে একটি প্রশস্ত খালের মধ্যদিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায়ের বিলক্ষণ সুগমতা হইবে।

ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যের সুবিধা করাই—সুয়েজ-খাল নির্ম্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য। কতিপয় শতাব্দী-পর্য্যন্ত প্রাচ্য-খণ্ডের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য অধিকাংশই এসিয়ার স্থলপথ দিয়া চলিত। বাণিজ্য-দ্রব্যসকল প্রথমতঃ এসিয়ার স্থলপথ দিয়া আসিয়া পরে জাহাজ করিয়া বিনিস্-নগরে চালান হইত। পরে বিনিস্ হইতে ইউরোপের উত্তর প্রদেশে নীত হইত। ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে উত্তমাশা-অন্তরীপের আবিষ্কার হইলে পর—এই বিরক্তিজনক ও বহুব্যযসাপেক্ষ বাণিজ্যের পথটি বন্ধ হইয়া যায়। তখন জাহাজ-সকল একেবারে ভারতবর্ষে সোজা যাতায়াত করিতে লাগিল এবং এইরূপে পৃথিবীর বাণিজ্যে মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। ক্রমে বিনিস্, নুরেম্বর্গ-ব্রুজ প্রভৃতি প্রাচ্য-বাণিজ্যের অধিষ্ঠান নগরগুলির প্রাধান্য লোপ হইল। এইরূপ চলিতেছিল—এমন সময়ে আর একটি মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল।

এ-পর্য্যন্ত, উত্তমাশা-অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া বাণিজ্যের জাহাজগুলি যাতায়াত করিত—এবং কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আলেকজাণ্ড্রিয়া হইতে কায়রো পর্য্যন্ত লৌহপথ স্থাপিত হওয়াতে পর্য্যটকদিগেরও অনেক পরিমাণে সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু লেসেপের সঙ্কল্পিত প্রস্তাবে প্রাচ্য-বাণিজ্যে আর একটি মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবার সূচনা হইল। উত্তমাশা-অন্তরীপের পথটি একেবারে উঠাইয়া দিয়া, বাণিজ্য-জাহাজ-চলাচলের উপযুক্ত খাল নির্ম্মাণ করিয়া, আফ্রিকা-খণ্ডকে একটি মহাদ্বীপে পরিণত করা তাঁহার সঙ্কল্প হইল।

দৌত্যকার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইয়া লেসেপ ইউরোপ প্রত্যাগমন করিলেন, এবং কিরূপে সুয়েজের যোজক-দেশ ভেদ করা যায় তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে এইরূপ বলিয়াছিলেন:—"১৮৪৯ হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-খণ্ডের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায়-সম্বন্ধে যাহা

কিছু জানিবার বিষয় আছে তত্তাবৎই আমি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলাম। আমি দেখিলাম, প্রতি দশবৎসরে বাণিজ্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইতেছে এবং ভাবিলাম যে এই সময় সুয়েজ-খাল নির্ম্মাণ করিলে ঐ বাণিজ্যের আরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।" এই বিশ্বাসটি মনে বদ্ধমূল হইলে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-সাএদের শাসনকর্ত্তৃপদে অধিরোহণের সময় তিনি মিসর-দেশে যাত্রা করিলেন। নানা প্রকারে তিনি সায়েদের উপকার সাধন করায় সায়েদের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইল। এত দিনের পর তাঁহার আশা হইল, তাঁহার সঙ্কল্পটি অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য সায়েদের নিকট অনুমতি পাইলেও পাইতে পারেন। সায়েদ যখন একবার লিবিয়ান-মরুভূমির উপর দিয়া যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হন, তখন লেসেপ্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং বলেন, সাধারণের সাহায্যে এই বৃহৎ ব্যাপারটি সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু শাসনকর্ত্তার অনুমতি পাইবার পূর্ব্বে শাসনকর্ত্তার পারিষদবর্গকে অগ্রে সন্তুষ্ট করা আবশ্যক হইল। তাঁহার পারিষদ্‌গণ "মস্তিষ্কের চালনা-অপেক্ষা অশ্বের চালনায় অধিকতর দক্ষ ছিলেন।" লেসেপ্ বলেন—"আমি কোন সুযোগ পাইয়া শাসনকর্ত্তার তাঁবুতে গিয়া উপনীত হইলাম। বন্ধুর শিলাখণ্ডের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত—কামান রাখিবার স্থান-বিশিষ্ট দুর্গের ন্যায় একটি উচ্চ স্থানে ঐ শিবির সন্নিবেশিত ছিল। আমি কথায় কথায় বলিয়াছিলাম, ঐ দুর্গের এমন একটি স্থান আছে যেখান হইতে অশ্বারূঢ় হইয়া লম্ফ প্রদান করিলে নীচে একটা বারণ্ডায় গিয়া পড়া যায়। শাসনকর্ত্তামহাশয় এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া আমার প্রস্তাবটি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, ঐরূপ ঘোড়ায় চড়িয়া তুমি এখনি তোমার তাঁবুতে গমন কর এবং প্রস্তাবিত খালের সমস্ত বিষয় লিখিয়া আমাকে দেখাও। শাসনকর্ত্তা

তখন মন্ত্রিগণ ও পারিষদ্‌গণ-দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। আমি লম্ফ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম—এবং আমার অশ্ব এক লম্ফ দিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিল এবং ক্রম-নিম্ন-ভূমি দিয়া দ্রুতবেগে আমার তাঁবুতে গিয়া পৌঁছিল। আমার রিপোর্ট অনেক দিন হইতে প্রস্তুত ছিল, আমি তাহা লইয়া শাসনকর্ত্তার তাঁবুতে পুনরায় উপস্থিত হইলাম। খালের সম্বন্ধে আমার মন্তব্য-কথা আমি দেড় পৃষ্ঠার মধ্যে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলাম। তৎপরে যখন ঐ বিবরণ-লিপি শাসনকর্ত্তা তাঁহার পারিষদ্‌গণকে পড়িয়া শুনাইলেন এবং তাঁহাদিগের পরামর্শ চাহিলেন, তখন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে কহিলেন যে, "মহম্মদ আলির বংশের সহিত যাঁহার চিরকালের বন্ধুত্ব, তাঁহার প্রস্তাব কখনই অনমু-মোদনীয় হইতে পারে না, অতএব প্রস্তাবটি গ্রাহ্য করা যাইতে পারে।" ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি খাল কাটিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে বিধিমতে ডমরুমধ্য-স্থানের (Isthmus) তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া কোন্ স্থান দিয়া খাল কাটিতে হইবে তাহার পথ নিরূপণ করিবার সময় উপস্থিত হইল। লেসেপ এবং আর তিন জন ফরাশিস্ যন্ত্রবিৎ-শিল্পী এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। এই চারি জনের পানীয় জল এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য বহন করিবার জন্য ৬৫টি উষ্ট্র এবং তদুপযুক্ত অনুচরগণের প্রয়োজন হইল। জীবন্ত ভেড়া ও মুর্গি অনেক সঙ্গে চলিল। তাঁহা-দের পথের উল্লেখ করিয়া লেসেপ্ বলেন যে "তাঁহাদের সঙ্গে যেসব জন্তু গিয়াছিল তদ্‌ব্যতীত এই ভয়ানক মরুপ্রদেশে একটি মক্ষিকাও নাই।" তিনি বলেন যে "আমরা রাত্রিতে খাঁচা হইতে মুর্গিদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিতাম—কারণ, আমরা বেশ জানিতাম যে প্রাতঃকাল হইলেই আমাদের জীবজন্তুগুলি যেখানেই থাকুক আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে। ঐ বিজন প্রদেশে কেহই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে চাহিবে না—ওখানে একলা থাকাও যা'

মৃত্যু-মুখে পতিত হওয়াও তা'। আমরা যখন প্রাতঃকালে আমাদের তাঁবু উঠাইতাম, তখন যদি কোন মুর্গি পিছনে পড়িয়া থাকিত—অমনি সে ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার খাঁচায় ঢুকিবার জন্য উষ্ট্র-পৃষ্ঠে উড়িয়া আসিত।”—অনুসন্ধানের পর্য্যটন শেষ করিতে দুইমাস-কাল লাগিয়াছিল। অবশেষে এইরূপ স্থির হইল যে, খালের পথ নির্ণয় করিবার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশের সমবেত সুদক্ষ যন্ত্রবিৎ-শিল্পীদিগের বিবেচনার উপর নির্ভর করা যাউক। তাঁহারাও রীতিমত অনুসন্ধান করিয়া লেসেপের সমভিব্যাহারে অ্যালেকজাণ্ড্রিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিসরের শাসনকর্ত্তা পুরদ্বারে আসিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। এই সময় একটি চমৎকার দৃশ্য উপস্থিত হইল। লেসেপ্ বলেন, “যখন সায়েদ শুনিলেন যে দেশদেশান্তর হইতে সমবেত শিল্পীগণ নীল-নদীর জলের সাহায্য-ব্যতীত খাল হইতে পারে এইরূপ মত দিয়াছেন তখন দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন করিলেন এবং অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিলেন।”

এই ফরাশিস্ বীর, খাল কাটিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপে প্রত্যাগমন করিলেন এবং এতদুপলক্ষে একটি সম্ভূয়-সমুত্থানের দল স্থাপন করিবার জন্য সাধারণের মনকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

তিনি পদে-পদে যেরূপ বাধাবিঘ্ন প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন তাহাতে আর কেহ হইলে তখনি ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিত, কিন্তু তিনি কিছুতেই নিরাশ হইলেন না। কতকগুলি প্রতিপত্তিশালী ইংরাজ-যন্ত্রশিল্পী এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন যে, খাল এবং খালের মুখে আদপে কাদা আসিয়া না জমে তাহার উপায় করিতে ও মাটি কাটাইতে এত অধিক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা যে, উহাতে কিছুমাত্র খর্চ্চা পোষাইবে না। আরও এই আপত্তি ও সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, এই ব্যাপারে সাহায্য করিলে, ইংরাজদিগকে ফরাশিস্ গভর্ণমেণ্টের হাতে গিয়া পড়িতে হইবে।

পার্লামেণ্টে ঐ সম্বন্ধে যে সব বক্তৃতা হইয়াছিল তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ৭ই জুলাই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড পামর্ষ্টন বলেন—"তুর্কির সহিত মিসরের বিচ্ছেদ আরও সহজে সাধন করা এই সঙ্কল্পিত ব্যাপারের রাজনৈতিক পরিণাম হইবে। আরও, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের আক্রমণ-পক্ষে সুবিধা হইবে,—এই দূর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই ব্যাপারে ফরাসিরা হস্তক্ষেপ করিয়াছে। এ-সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, কেননা, এই বিষয়ে যে ব্যক্তি কিছুমাত্র মনোযোগ দিয়াছে সেই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবে। আমার এই মাত্র বিস্ময় হইতেছে যে, লেসেপ্ ইংরাজ-মহাজনদিগের বিশ্বাস-প্রবণতার উপর এত দূর নির্ভর করিয়া আছেন যে, তিনি মনে করিয়াছেন, ইংলণ্ডের বাণিজ্য-প্রধান নগরগুলি পরিভ্রমণ করিবামাত্রই ইংরাজদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই সংগৃহীত অর্থে এমন একটি ব্যাপার সাধন করিবেন যাহা ইংরাজদিগের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী।" দশ দিন পরে লর্ড পামার্ষ্টন আরও এইরূপ বলেন "ইংরাজ-ধনীদিগের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যে সকল জলবুদ্‌বুদ্‌বৎ ব্যবসায়ের মৎলব বাহির হয়—আর যে সকল ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিলে আর যাহারই লাভ হউক ইংরাজদিগকে নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কথা—সেই সকল মৎলবের মধ্যে ইহাও একটি।" এই অযোগ্য কঠোর উক্তিগুলি যদিও সর্ব্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই, তথাপি কতকটা নৈরাশ্যের কারণ হইয়াছিল, বিশেষতঃ উহা যে লেসেপের মর্ম্মচ্ছেদ করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই খাল কাটিতে ইংরাজদিগের যে কত সুবিধা হইবার কথা, আশ্চর্য্য তাঁহা পামর্ষ্টন বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিবন্ধকাচরণে এই ব্যাপারের সমস্ত অনুষ্ঠানভার ফরাশিস্‌দিগের হাতে আসিয়া পড়িল এবং অবশেষে এই সুয়েজ-খালটি ফরাশিস্‌দিগেরই চিরন্তন কীর্ত্তি-প্রবাহ-রূপে প্রবাহিত হইল।

লেসেপের প্রথম হইতেই ইচ্ছা ছিল যে, পৃথিবীর সকল জাতিই সমানরূপে এই খালের ফল ভোগ করে। এই জন্য, যে সত্ত্বয়সমুত্থান-সম্প্রদায় স্থাপিত হয় তাহার তিনি "সুয়েজের বাণিজ্য-খালের সর্ব্বজাতি-সাধারণ কোম্পানি" এই নামটি প্রদান করেন। চুক্তিপত্রে এইরূপ সর্ত্ত ছিল যে, "কোন ব্যক্তি-বিশেষের কিম্বা জাতি-বিশেষের কোনরূপ প্রাধান্য না দিয়া বাণিজ্য জাহাজ মাত্রেই নির্ব্বিশেষে এই খালে যাতায়াত করিতে পারিবেক"—আরও, "এই কোম্পানি কোন জাহাজকে—কোন সম্প্রদায়কে কিম্বা কোন ব্যক্তিকে এরূপ কোন সুবিধা কিম্বা ক্ষমতা দিবেন না যাহা অন্য জাহাজদিগকে প্রদত্ত হয় নাই"—মিসরের শাসনকর্ত্তার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, খালের দুইধারে কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি ৯৯ বৎসরের জন্য ঐ কোম্পানির অধিকারে থাকিবে। এই রূপে কোম্পানি স্থাপিত হইলে এবং ২৫ হাজার ফরাশিস্ স্বাক্ষরকারী এবং মিসরের গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক টাকা সংগ্রহ হইলে পর, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে খালের কার্য্য আরম্ভ হয়। এই খালের উদ্দেশে আবার নানা আনুষঙ্গিক কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। বন্দর, দীপ-মন্দির, সহস্র সহস্র শ্রমজীবীদিগের বাসস্থান-প্রভৃতি অধুনাতন সভ্যতার যাহা কিছু উপকরণ তৎসমস্তই এই মরুভূমিতে আনীত হইল—সেই যেখানে পূর্ব্বে একটি ঘাস কিম্বা এক বিন্দু জলও পাওয়া যাইত না। কিন্তু সায়েদ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী ইস্মাএল যদি এই বৃহৎ ব্যাপারে যথোচিত সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে কিছুই হইয়া উঠিত না। যেখানে কোম্পানি ইস্মেলিয়া-নামক নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সেই মধ্যবর্ত্তী স্থানে নীল-নদী হইতে "মিঠে" জল আনিবার জন্য ২৫ ক্রোশ দীর্ঘ আকারের একটি খাল কাটিতে হইয়াছিল। এই খালটি কাটিবার জন্য, পাশা ৮০ হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া দেন। সামুদ্রিক খাল কাটিতে গিয়া আরও এক বৃহৎ কাণ্ড উপস্থিত হইল।

১৮ হাজার অশ্ব-বল-পরিমাণের বাষ্পবলে চালিত হইয়া, প্রতিমাসে ১২ হাজার টন্ কয়লা পুড়াইয়া, ২৮৫টা মাটি-কাটিবার যন্ত্র অবিরাম চলিতে লাগিল। এই বৃহৎ ব্যাপারটি সম্পন্ন করিবার জন্য যে কত শ্রম, কত উদ্যম, কত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল তাহা ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মনে করিয়া দেখ, সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত ৯৯ মাইল দীর্ঘ এবং বৃহৎ জাহাজ চলিতে পারে এরূপ প্রশস্ত এবং গভীর একটি খাল, কঠোর বালুময় মরুভূমি হইতে কাটিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে—এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটি ভাবিতে গেলে কি মন স্তম্ভিত হইয়া যায় না? প্রতিমাসে ইহার যে মাটি কাটাই হইত তাহা পরিমাণে ২৭৬৩০০০ Cubic yard হইবে। লেসেপ্ তাঁহার প্যারিসের শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বলিয়াছিলেন—"যে মাটি কাটাই হইত তাহা পরিমাণে এত অধিক যে ম্যাড্লিন-হইতে বাস্টিই-পর্য্যন্ত সমস্ত "বুলবার"-স্থিত (Boulevard) বাড়ীর একতালা পর্য্যন্ত উহার দ্বারা একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতে পারে।" তিনি আরও বলেন—"যে সকল সাহসী পুরুষ ও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদিগের যাহা উচিত প্রাপ্য তাহা যেন আমরা তাঁহাদিগকে দিই।"

খাল কর্ত্তনে ও তাহার আনুষঙ্গিক কার্য্য সকল শেষ করিতে সার্দ্ধ দশ বৎসর লাগিয়াছিল। লেসেপ সমস্ত কাল সঙ্গেসঙ্গে থাকিয়া, যখন যে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, কিরূপে তাহা অতিক্রম করিতে হইবে বরাবর তাহার পরামর্শ ও উপদেশ দিয়া আসিয়াছিলেন। অবশেষে খাল খুলিবার দিন উপস্থিত হইল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে তৎকালীন ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী য়ুজেনি এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে মহাসমারোহ-সহকারে খাল খোলা হইল। এত দিনের পর, লেসেপের মনস্কামনা পূর্ণ হইল—তাঁহার মহাস্বপ্ন সফল হইল। যাহাতে জাহাজের অত্যন্ত ভিড় হইয়া গতিবিধি বন্ধ হইয়া না যায়

এই আশঙ্কায় জাহাজের যাতায়াত পক্ষে কতকগুলি কড়াকড় নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল। তাহার মধ্যে এই একটি নিয়ম হইল যে, ১৬ ঘণ্টা ধরিয়া জাহাজের গতিবিধি হইবে, তাহার অধিক নহে। দুই সমুদ্রের সমতল সমান নহে বলিয়া পূর্ব্বে যে আশঙ্ক হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত অমূলক। দুই প্রান্তের স্রোত প্রায় সমানরূপে প্রবাহিত হয়; তবে লোহিত সমুদ্র হইতে যে জল আইসে তাহার একটু স্রোতোবেগ অধিক। কিন্তু উত্তর দিক হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহার বেগে এই স্রোতোবেগ মন্দীভুত হইয়া যায়; সুতরাং নৌচালনের কোন অসুবিধা হয় না। বালি ভাসিয়া আসিয়া খালকে বুজাইয়া ফেলিবে—এই যে আর একটি ভয় ছিল, তাহারও বিশেষ কারণ দেখা যায় না। "মিঠে"-জলের যে খালটি কাটা হইয়াছে তাহার দুই ধারে বরাবর বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। এই বৃক্ষগুলি বড় হইলে মেঘকে ঘনীভূত করিয়া বৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আনিবার পক্ষে পরে সহায়তা করিতে পারে। অতএব আমাদের বিলক্ষণ ভরসা হয়, অনতিকাল মধ্যেই এই বিস্তীর্ণ মরুভূমি ফলবতী হইয়া ফলফুলে সুশোভিত হইবে। এই খাল খোলা অবধি এমন একবারও হয় নাই যে জাহাজের যাতায়াত একেবারে স্থগিত হইয়া গিয়াছে। বাণিজ্যের সুগমতা-পক্ষে পূর্ব্বে যে আশা করা হইয়াছিল তাহার অধিক ফললাভ হইয়াছে। বণিকেরা এবং পোত-স্বামীরা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের কত সুবিধা হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াত শীঘ্র হওয়ায় জিনিসের ভাংচুর ও ক্ষয় কমিয়াছে, সাধারণ ব্যয়ের লাঘব হইয়াছে এবং ইন্‌স্যুরেন্সের সাশ্রয় হইয়াছে। এই সকল সুবিধার বিনিময়ে কোম্পানিকে জাহাজের মাসুল এবং অন্যান্য খর্চ্চা দিতে হয়। দিন দিন এত জাহাজের গতিবিধি বৃদ্ধি হইতেছে যে আর এ খালে সংকুলান হয় কি না সন্দেহ। হয় তো আর কিছু দিন পরে ইহার পরিসর বৃদ্ধি করিবার কথাও উত্থাপিত হইবে।

সমুদ্র দিয়া পোর্ট-সায়েদের নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা যায় যে, সারি সারি জাহাজ দাঁড়াইয়া আছে, এবং বন্দর ও খালের ভিতর প্রবেশ করিবার কখন্ তাহাদিগের পালা আইসে—তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোম্পানির নিয়মানুসারে, সকল জাহাজ একত্র খুলিয়া যাইতে পারে না—এক-একটি করিয়া পর্য্যায়ক্রমে খুলিয়া যায়। আবার বিপরীত দিক হইতে কোন জাহাজ আসিলে কোন-কোন স্থানে অপর দিকের জাহাজকে কিছুকাল থামিতে হয়। সুয়েজ-খালের বাণিজ্য-বিবরণে দেখা যায় যে, ৩৩টা জাহাজ এক দিনের মধ্যে খালের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ২৭ জুলাই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৪৩২টা জাহাজ, খালের হয় এ-দিক, নয় ও-দিক হইতে যাতায়াত করিতে দেখা গিয়াছে। যে সকল জাহাজ খাল দিয়া যাতায়াত করে তাহার অধিকাংশই ইংরাজদিগের। যদি সর্ব্বশুদ্ধ ২৫টা জাহাজ ধরা যায় তবে তন্মধ্যে ১৮টা ইংরাজদিগের হইবে। ফলতঃ যে জাতির গভর্ণমেণ্ট, খালের প্রস্তাবটিকে একেবারে ফুঁ-দিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেই জাতিই এক্ষণে খালের অধিক ব্যবহার করিতেছেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে যে সকল জাহাজ খালের মধ্যে দিয়া যাতায়াত করে তন্মধ্যে ইংরাজদিগের ৮১০, ফরাশিস্‌দিগের ৮৩৭, ও অষ্ট্রীয়দিগের ৭০ এবং অন্যান্য জাতীয়দিগের অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এই সুয়েজের খালে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের কত সুবিধা হইয়াছে তাহা লেসেপ্‌স্ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন "মনে কর একটি জাহাজ বোম্বাই হইতে ছাড়িয়া সুয়েজখাল দিয়া লিবরপুলে আসিয়া উপনীত হইল এবং সেখানে তাহার তুলার বোঝাই নামাইয়া দিল। তখনই সেই তুলা মানচেষ্টারে চালান হইয়া কাপড়ে পরিণত হইয়া আসিল। ৯ দিন পরে সেই একই জাহাজ ঐ কাপড়ের বোঝাই লইয়া সুয়েজ-খালের পথ দিয়া আবার ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিল। এইরূপে দেখা গিয়াছে, ৭০ দিনের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে তুলা লইয়া

তাহাকে কাপড়ের আকারে পরিণত করিয়া আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া পাঠান যায়।" এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের কোন বিপদ হইলে এখান হইতে সিপাহিসৈন্য শীঘ্র চালান করিবার পক্ষে খালের পথ কেমন উপকারী তাহা এইবার বেশ দেখা গিয়াছে।

প্রথমে যখন খালের প্রস্তাব হয় তখন ৪ কোটি টাকা ইহার আনুমানিক ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়; কিন্তু এক্ষণে ইহার নিয়মিত খরচ দ্বিগুণ পড়িয়া গিয়াছে—এতদ্ব্যতীত সুয়েজ-বন্দর প্রভৃতিতে ইজিপ্টের অনেক ব্যয় হইয়া গিয়াছে। অংশ (share) বিক্রয় এবং কর্জ্জ করিয়া যে মূলধন উঠান হয় তদ্ব্যতীত খাল পরিষ্কার রাখিবার জন্য কর্দ্দম উঠাইতে ও খালের পাড় প্রস্তরাদির দ্বারা বাঁধাইতে বিপুল অর্থ অজস্র ব্যয় হইতেছে। বিশেষতঃ পোর্ট সায়েদে খালের মুখ পরিষ্কার করিয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়। কারণ, নীল-নদ হইতে কর্দ্দম, স্রোতে পরিচালিত হইয়া সমুদ্রের এই ভাগে আসিয়া সঞ্চিত হয়, এবং উত্তরের বাতাসে উহা তীরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সমস্ত কারণে, নিজ খালের ব্যবসায়ে তেমন লাভ নাই; কিন্তু এই খালের পথটি উন্মুক্ত হওয়ায় সাধারণ বাণিজ্যের যে প্রভূত উন্নতি হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই; এবং এই মহৎ উপকারের জন্য, পৃথিবীর তাবৎ জাতিই সেই ফরাশিস্ মহাপুরুষ লেসেপের নিকট চির-ঋণে আবদ্ধ।

ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

পারিস্-নগর-প্রবাসী কোন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনশীল শ্রেষ্ঠ কুলোদ্ভব হিন্দু যুবক সম্প্রতি আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপতি মহাশয়কে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন ও সেই পত্র-সম্বলিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভারতবর্ষীয়দিগের দ্বারা তৎলাভের বিশিষ্ট উপায়-সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় যে একটি যুক্তিগর্ভ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা গত আশ্বিন মাসের তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায় প্রকটিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি উপাদেয় ও সময়ের উপযোগী।

তিনি বলেন "ইহা অতি সুখের বিষয় যে, শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আজকাল একটি স্বাধীনতার ভাব উদ্বোধিত হইতেছে এবং এই ভাবটি আমরা ইংরাজদিগের নিকট হইতেই শিক্ষা পাইয়াছি। ইংলণ্ডের সংস্রবে যদি আমরা আর কোনও উপকার না পাইয়া থাকি, অন্তত এই উপকারটি আমাদের সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই যে জাতীয় স্বাধীনতার ভাব ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতেছে, ইহাতে আমাদের যতই আহ্লাদ হউক না—আমাদের আর একটি দিক আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। যে সকল নিয়ম পালন না করিলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, সেই সকল নিয়ম পালন পক্ষে আমাদের কতদুর চেষ্টা হইতেছে? এখনতো কেবল সভা-সমিতিতেই স্বাধীনতা-সম্বন্ধে মহা-আড়ম্বরে বক্তৃতা হইতেছে—সংবাদ-পত্রে অনর্গল লেখা চলিতেছে এবং কবিতা নাটকের ছড়াছড়ি হইতেছে—কিন্তু কাজে কি হইতেছে? আমাদিগের স্বদেশ-বৎসলদিগের দেশানুরাগ কি শুদ্ধ বাক্যেই বদ্ধ থাকিবে? বক্তৃতা কবিতা প্রভৃতির উপকারিতা আছে বটে, কিন্তু উহাই

কি যথেষ্ট?—উহার সঙ্গেসঙ্গে কার্য্য চাই। যে সকল উপায়ে স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে, তাহা অবলম্বন করা আবশ্যক। স্বাধীনতা লাভের যে সকল নির্দ্দিষ্ট অকাট্য নিয়ম আছে অগ্রে তাহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।” অবিকল অনুবাদ না করিয়া আমরা তাঁহার প্রবন্ধের প্রথমাংশের স্থূল মর্ম্ম ব্যক্ত করিলাম। এবং এপর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কিন্তু তার পরেই তিনি এই মর্ম্মে বলিতেছেন যে “জোর যার মুলুক তার” কিম্বা “বল যার অধিকার তার” এই নিয়মটি উদ্ভিদ্-জগতে, জীব-জগতে, এমন কি সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে কার্য্য করিতেছে। বলবান্ দুর্ব্বলের স্থান অধিকার করিবেই করিবে। ডার্উইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মই এই। এই নিয়মটি যেমন প্রকৃতির মধ্যে, তেমনি মনুষ্যসমাজে বিলক্ষণ খাটে। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্যস্থল। যাঁহার বল আছে তাঁহারই অধিকারের কথা মুখে আনিবার অধিকার আছে।

“Only he dares speak of right or rights who has might, exclaims she in her book of revelations which we term History”

প্রকৃতি জননী অথবা ইতিহাসের এই শাসন-বাক্য যিনি লঙ্ঘন করিতে সাহসী হন তিনি তাহার ফলভোগ করেন---অবাধ্য শিশুর ন্যায় বেত খাইয়া আবার সিধা পথে ফিরিয়া আইসেন। “কিন্তু আমরা লেখক মহাশয়ের এই মতের সহিত সম্পূর্ণরূপে সায় দিতে পারি না। “জোর যার মুলুক তার”—এই নিয়ম উদ্ভিদ্-জগতে, পশু-জগতে এবং পশুবৎ অপূর্ণ পূর্ব্বতন মানব-সমাজে খাটিতে পারে, কিন্তু সুসভ্য সুপ্রতিষ্ঠ মনুষ্য-সমাজে এ নিয়ম শোভা পায় না। এই নিয়মের নেতৃত্ব ও ঔচিত্য স্বীকার করিলে সভ্য-সমাজের একেবারে ভিত্তিমূলে আঘাত করা হয়। এই নিয়মানুসারে সম্পূর্ণরূপে চলিতে গেলে অরাজকতা

বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়া সমাজ-বন্ধন একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এ নিয়মকে প্রশ্রয় দিলে চৌর্য্য দস্যুতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এক জন বলবান্ দস্যু এক জন দুর্ব্বলের ধন বলপূর্ব্বক অপহরণ করিলে সেই ধনে কি ঐ দস্যুর অধিকার জন্মে? "বল যার অধিকার তার"—এই নীতি-সূত্রটি মানিতে গেলে ঐ দস্যুর অপহৃত ধনে অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিবেন? সেইরূপ যদি কোন বলবান্ জাতি কোন দুর্ব্বল জাতির দেশ কাড়িয়া লয়, তাহা হইলে সেই জাতি কি দস্যুতা-অপরাধে অপরাধী নহে? এক জন সামান্য দস্যুর সহিত তাহার প্রভেদ কি?—সংখ্যায় অধিক এই মাত্র। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-অধিকারের যে মূল নিয়ম, জাতিগত সম্পত্তি-অধিকারেরও যে সেই একই মূল-নিয়ম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে দেশের যে অধিবাসী, সেই দেশ সেই অধিবাসীদিগেরই স্বাভাবিক ন্যায্য সম্পত্তি। এইরূপ যদি দেশ-অধিকারের ন্যায়-সঙ্গত একটি স্বাভাবিক নির্দ্দিষ্ট সীমা না থাকে, বলই যদি অধিকারের নিয়ম হয়—তাহা হইলে পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহের আর অবধি থাকে না। যুদ্ধানল চিরকালই প্রজ্বলিত থাকে—"সভ্যতা" বলিয়া একটি শব্দ আর মানব-ইতিহাসে কুত্রাপি স্থান পায় না।

মানব-সমাজের সভ্যতা বা উন্নতির ইতিহাসকে তিনটি কালে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম।—সংগ্রাম-প্রধান কাল।

দ্বিতীয়।—স্বার্থ-প্রধান কাল।

তৃতীয়।—ন্যায়-ধর্ম্ম-প্রধান কাল।

আর এক কথায়ঃ—

প্রথম।—তামসিক কাল।

দ্বিতীয়।—রাজসিক কাল।

তৃতীয়।—সাত্ত্বিক কাল।

সাংগ্রামিক কালের বহু পূর্ব্বের যে কাল, সে কাল মনুষ্য-সমাজের ইতিহাসে ধর্ত্তব্যই নহে—যেহেতু সে সময়ে মনুষ্যের সমাজ-বন্ধন আদৌ হয় নাই। যখনি জনসমাজে রীতিমত যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হয়, তখনই বুঝা যায় মনুষ্যদিগের মধ্যে একটি সম্মিলনের ভাবও উৎপন্ন হইয়াছে, কারণ বিনা-সম্মিলনে কোন বৃহৎ যুদ্ধ-ব্যাপার কখনই সংঘটিত হইতে পারে না; এবং যখনই মনুষ্যের মধ্যে এইরূপ সম্মিলন আরম্ভ হয়, তখনই বুঝা যায়, সমাজ-বন্ধনের কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। সেই সাংগ্রামিক-কালে যখন কোন জাতির মধ্যে কোন বলবান্ পুরুষ উত্থিত হইয়া কতকগুলি লোককে আপনার কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়া শুদ্ধ আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিবার জন্য, কিম্বা কোন নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, অন্য জাতির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত, তখন প্রধানতঃ শারীরিক বলেরই প্রতিযোগিতা ছিল। এই যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা সে সময়ে মনুষ্য-সমাজের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা মানব-সমাজের বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে প্রথম সংমিশ্রণ আরম্ভ হইল, বলের প্রতিযোগিতায় বলের বৃদ্ধি হইল, পরস্পরের ভাল পরস্পর অনুকরণ করিতে লাগিল, জেতৃজাতি বিজিত জাতির নিকট কতকটা উপকার লাভ করিল এবং বিজিত জাতিও জেতৃজাতির নিকট অনেক বিষয়ে উপকৃত হইল। সংগ্রামে অনেক অশুভ ফল সত্ত্বেও সকল কালেই বিশেষতঃ অসভ্যকালে ইহারও যে বিশিষ্ট উপকারিতা আছে তাহা কে না স্বীকার করিবে? এই যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতেই বিভিন্ন জাতি-দিগের মধ্যে সম্মিলন আরম্ভ হয়, বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়, জাতীয় স্বার্থভাবের প্রথম সঞ্চার হয়, এবং এইরূপে জনসমাজ সভ্যতার দ্বিতীয় সোপানে উত্থিত হয়।

সভ্যতার এই দ্বিতীয় কাল, জাতীয় স্বার্থের কাল। সাংগ্রামিক

কালের লোকে যেরূপ প্রধানতঃ নীচপ্রবৃত্তির অধীন হইয়াই অন্য জাতির সহিত সংগ্রাম করে, যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ করে, রক্তের পিপাসু হইয়াই রক্তপাত করে, একালের লোক সেরূপ করে না। একালে যুদ্ধ-বিগ্রহ উচ্চতর স্বার্থের অধীন। স্বজাতীয়দিগের জন্য ধন লাভের পন্থা বাহির করিবার নিমিত্ত, বাণিজ্যের সুবিধার নিমিত্ত, এক-কথায় উচ্চতর স্বার্থের নিমিত্ত যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ আবশ্যক হয়, তবেই এই কালের লোক যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়।

ক্রমে পৃথিবীতে যত জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হয় ততই ব্যক্তিগত নীচ প্রবৃত্তি সকল মন্দীভূত হয়, জাতিগত অতিরিক্ত স্বার্থপরতার হ্রাস হয়, তখন এক জাতির স্বার্থ অপর জাতির স্বার্থের সহিত বিরোধী হয় না, প্রত্যুত সকল জাতিরই এক স্বার্থ হইয়া উঠে; তখন ন্যায়, ধর্ম্ম, মঙ্গলের অখণ্ড রাজত্ব পৃথিবীতে স্থাপিত হয়; তখন আর শারীরিক বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না, তখন পৃথিবীর সকল জাতিই পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পৃথিবীতে নির্ভয়ে সুখে সঞ্চরণ করে। কিন্তু এই ন্যায়-ধর্ম্ম-প্রধান কাল, এই সাত্ত্বিক কাল, এই সত্যকাল, এই স্বর্গীয় কাল, পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইতে এখনও বহুবিলম্ব আছে ;—এত বিলম্ব যে, সে এখন আমাদের কল্পনাতেও আইসে না। কিন্তু সমস্ত মানব-সমাজের গতি যে ঐ দিকে, তাহার নিদর্শন এখন হইতেই দেখা যাইতেছে।

সমগ্র পৃথিবী যত দিন না সভ্যতার এক-সমভূমিতে দণ্ডায়মান হইবে, ততদিন এই ন্যায়-ধর্ম্মের কাল পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইবে না। পৃথিবীর একাংশে যদি এই জ্ঞান-ধর্ম্ম-কাল আবির্ভূত হয়, আর অন্যভাগে যদি সাংগ্রামিক কাল কিম্বা স্বার্থকাল বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে, যে অংশে জ্ঞান-ধর্ম্ম-কালের আবির্ভাব হইয়াছে, সে কালটি সেখানে কখন বহুদিন স্থায়ী হইতে পারে না। পূর্ব্বতন ভারতবর্ষ তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

পূর্ব্বতন ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-মূলক সভ্যতার প্রথম আভাস প্রকাশ পাইয়াছিল। তৎকালীন হিন্দুগণ এই সার বুঝিয়াছিলেন যে "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ"। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন ন্যায়-ধর্ম্মের বর্ম্মে তাঁহারা সুরক্ষিত আছেন, বিদেশীয় লোক আসিয়া যে তাঁহাদিগের দেশ আবার আক্রমণ করিবে, এ কথা তাঁহাদের মনে আদৌ উদয় হয় নাই, তাঁহারা দিব্য নিশ্চিন্ত ছিলেন, পার্থিব বিষয়ে বড় মনোযোগ দিতেন না, পারমার্থিক বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন। বিদেশীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে রীতিমত প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহারা বিদেশীয়দিগের হস্তে সহজে পরাভূত হইলেন। এই আক্রমণের ফল এই হইল, বৈদেশিকেরা সুসভ্য হিন্দুদিগের সংস্রবে সভ্যতা-সোপানের এক ধাপ উপরে উত্থিত হইল—এবং সুসভ্য হিন্দুগণের সভ্যতা ও উন্নতি বৈদেশিকদের অত্যাচারে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সভ্যতার ইতিহাস পাঠে এই একটি বিষয় শিক্ষা পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর কোন অংশের কোন জাতি পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদিগকে বহু পশ্চাতে রাখিয়া আপনি একাকী অত্যন্ত দ্রুতগতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না—তাদৃশ দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে গেলেই আবার পতন হয়। সমগ্র পৃথিবীকে সভ্যতার সমভূমিতে আনয়ন করিবার জন্য প্রকৃতি-দেবীর নিয়ত চেষ্টা। গ্রীকেরা যখন সভ্যতার চূড়ান্ত সীমায় উত্থিত হয়—রোমকেরা আসিয়া তাহাদিগের দেশ জয় করে এবং গ্রীকদিগের সংস্রবে রোমকদিগের সভ্যতা বৃদ্ধি হয়; আবার যখন রোমকেরা সভ্যতার চূড়ান্ত সীমায় উত্থিত হয়—গথ্, ভাণ্ডাল প্রভৃতি উত্তরপ্রদেশীয় জাতিগণ তাহাদিগকে জয় করে, এবং বিজিত রোমকদিগের সংস্রবে তাহারা আবার সভ্যতা-পথের পথিক হয়। এইরূপ পৃথিবীর ইতিহাসে এক দিকে পতন, আর এক দিকে অভ্যুদয়, এক দিকে অবনতি, আর এক দিকে উন্নতি নিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন পাত্রে জল রাখিয়া অগ্নিতে জ্বাল

দিলে যেমন পাত্রস্থ নিম্ন জলের জলরাশি কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইলে উপরিভাগে উত্থিত হয়—তাহার স্থান আবার অব্যবহিত উপরিস্থ অপেক্ষাকৃত শীতল জলস্তবক আসিয়া অধিকার করে—এইরূপ প্রক্রিয়ায় যেরূপ ক্রমে-ক্রমে সমস্ত জলরাশির উষ্ণতা সমান হইয়া পড়ে, সেইরূপ সভ্যতাও ক্রমে-ক্রমে পৃথিবীর সর্ব্বাংশে সমানরূপে বিস্তৃত হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।

"বল যার অধিকার তার" এই নীতিসূত্রটির বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। যদিও ইদানীন্তন ইউরোপে এই নিয়মটি পূর্ব্বতন সাংগ্রামিক কালের ন্যায় প্রবল নহে, তথাপি এই নিয়মটির কার্য্য এখনও সেখানে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। এখন শুদ্ধ যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ হয় না, জাতীয় স্বার্থের উদ্দীপনায় যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়। ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন এক বার এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ইউরোপের সকল রাজ্যের নির্দ্দিষ্ট সৈন্য-সংখ্যার লাঘব করা হউক, কিন্তু তাহাতে কেহই সম্মত হয়েন নাই, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই ফরাসিস্ জর্ম্মাণ যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। অতএব দেখা যাইতেছে 'বল যার অধিকার তার' এই নিয়ম এখনও মনুষ্য-সমাজ হইতে তিরোহিত হয় নাই।

কিন্তু লেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের স্থানে স্থানে এই নিয়মটি সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে হঠাৎ এইরূপ প্রতীতি হয় যেন তিনি ঐ নিয়মটির উৎকৃষ্টতা ও চিরস্থায়িতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এক স্থলে বলিয়াছেনঃ— * * * *

In these Nature once more asserts her eternal law, once more gives the Hero who reigns not by the so called right of conventional inheritance but of Might which alone gives you the right !"

* * * * * * * * * * * * * *

"And look how the nation blooms and flourishes once more under the sway of its just rightful king, because chosen by Nature on account of his acknowledged might and therefore his inviolable right to rule."

আমরা এই বলাধিকারের নিয়মকে উৎকৃষ্ট নিয়ম বলিতে পারি না—এই নিয়মানুসারে চলিতে কাহাকে উপদেশ দিতে পারি না। মানব-সমাজের অপূর্ণতা-হেতুই এই নিয়মটির অস্তিত্ব—ইহাকে আমরা কখন সনাতন (Eternal law) নিয়ম বলিতে পারি না। ন্যায়ের নিয়মই সনাতন নিয়ম। বলাধিকার-নিয়মের উৎকৃষ্টতা স্বীকার করিলে—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যুদ্ধ-বিগ্রহের আর অবধি থাকে না, সুতরাং সভ্যতার গতি একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। বলই যদি অধিকারের নিয়ম হয়, তাহা হইলে কোন রাজ্যেরই শাসন-কার্য্য স্থায়ী পত্তন-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; দণ্ডে দণ্ডে রাজ-শাসনের পরিবর্ত্তন হয়। আজ এক রাজা এক রাজাকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত করিল—কল্য আর এক জন প্রবলতর রাজা আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহার স্থান আবার অধিকার করিল; প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করিয়া আছে—যখনই তাহার ক্ষমতা হইবে অমনি সে আর এক জনের বস্তু বলপূর্ব্বক অপহরণ করিবে। এই জন্যই সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য-শাসন-সম্বন্ধে এই সাধারণ নীতিটি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—যে দেশের যে চিরন্তন রীতি, সেই রীতি-অনুসারে সাধারণ প্রজাদিগের ব্যক্ত কিম্বা অব্যক্ত সম্মতি-ক্রমে সেই দেশের রাজা কিম্বা শাসনকর্ত্তা কিম্বা শাসনকর্ত্তৃগণ সেই দেশের শাসন-ভার প্রাপ্ত হয়েন। যতক্ষণ না তাঁহারা ন্যায়ের নিয়ম লঙ্ঘন করেন ততক্ষণ তাঁহারা স্বীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন না—অন্য দেশের লোক প্রজাদিগের বিনা সম্মতিতে যদি সেই দেশ আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহারা সেই দেশের অনধিকারপ্রবেশী শত্রু বলিয়া পরিগণিত হয়;

তাহারা বলপূর্ব্বক ঐ দেশ অধিকার করিলেও ঐ দেশে তাহাদিগের যে ন্যায্য অধিকার, ন্যায্য স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে না। রাজনীতি-সম্বন্ধে এইরূপ একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা নিরূপিত হইয়াছে বলিয়াই পূর্ব্বতন সাংগ্রামিককাল অপেক্ষা ইদানিন্তন সভ্য-সমাজে যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। লেখক মহাশয় এক স্থলে বলিয়াছেন ;—" Abundant blessings flow to the conquered inspite of the bloody resistance they might offer or curses and imprecations they might heap on their hated conquerors"—অনেক সময় পরাজিত জাতি জেতৃজাতির নিকট বহুবিধ উপকার প্রাপ্ত হয় সত্য, তাহা আমরাও স্বীকার করি এবং সে বিষয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখও করিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া "বল যার অধিকার তার" এই নিয়মটিকে কখনই উৎকৃষ্ট নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। এক জন দস্যু এক জন দুর্ব্বলের ধন অপহরণ করিয়া দীনদুঃখীগণকে দান করিতে পারে, তাহা বলিয়া সে যে দস্যুতা-অপরাধে অপরাধী নহে, কিম্বা সে যে সমাজের নিকট দণ্ডনীয় নহে, এ কথা কেহই স্বীকার করিবে না। জগদ্‌বিধাতার কার্য্যপ্রণালীই এইরূপ যে, তিনি অশুভ ঘটনা হইতেও কিঞ্চিৎ শুভ উদ্ধার করেন। তাহা বলিয়া যাহা অন্যায় তাহা কখনই ন্যায় হইতে পারে না। যদি লেখক মহাশয়ের বলিবার অভিপ্রায় এই হয় যে, সমস্ত পৃথিবীতে—এমন কি তাহার সভ্যতম অংশ ইউরোপেও যে নিয়ম এখনও কার্য্যতঃ প্রচলিত রহিয়াছে তাহারই কথা তিনি বলিতেছেন,—কোন্ নিয়মকে মনুষ্য সমাজের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত করা উচিত, সে বিষয় তিনি বলিতেছেন না, তাহা হইলে তাঁহার মতের সহিত আমাদিগের কিছুমাত্র অমিল নাই। ইহা সত্য যে, সমস্ত পৃথিবীতে এখনও 'বল যার অধিকার তার' এই নিয়মটী কার্য্যতঃ প্রচলিত রহিয়াছে। সভ্যতাভিমানী ইউরোপ মুখে এই নিয়মটি স্বীকার

করেন না বটে কিন্তু কার্য্যতঃ এই নিয়মানুসারে অনেক সময়ে চলিয়া থাকেন। তবে অসভ্যদিগের সহিত তাঁহাদিগের এই প্রভেদ যে, অসভ্যেরা পষ্টাপষ্টি এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়, আর তাঁহারা তাহার উপর একটি ন্যায়-ধর্ম্মের আবরণ দিয়া স্বীয় অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন রাখেন। তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া এই যে একটি ন্যায়-ধর্ম্মের আবরণ দিতে হয়, ইহাও অপেক্ষাকৃত উন্নতির লক্ষণ বলিতে হইবে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে বলাধিকারের নিয়ম ক্রমশঃই খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যতই মনুষ্য-সমাজে সভ্যতার বাস্তবিক উন্নতি হইবে ততই 'বল যার অধিকার তার' এই নিয়মটির উপর "যতো-ধর্ম্মস্ততোজয়" এই নিয়মটি জয়লাভ করিবে। ইউরোপীয় সভ্যতার এক্ষণে এতটুকু উন্নতি হইয়াছে যে, ইউরোপীয়েরা এক্ষণে জ্ঞানতঃ বুঝিয়াছেন যে ন্যায়ের নিয়মই শ্রেষ্ঠ নিয়ম, তবে তাহারা অপূর্ণতাহেতু রাজনৈতিক ব্যাপার-সম্বন্ধে স্বার্থ-অন্ধ হইয়া কার্য্যতঃ প্রায়ই এই নিয়মের ব্যভিচার করেন।

এক্ষণে লেখক-মহাশয় ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা-লাভ-পক্ষে যে সকল অবশ্য-পালনীয় নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। তিনি বলেন—বাণিজ্য, শিল্প, রাজনৈতিক স্পৃহা (political spirit) ও বিজ্ঞান—এই গুলিই ভারত-বর্ষীয়দিগের বিশেষ অভাব—রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের এই গুলিই মুখ্য নিয়ম ও সাধন—এই গুলিই আমাদের সকল রোগের মহৌষধি।

কিন্তু প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভারতবর্ষীয়দিগকে একটি সমগ্র জাতি বলা যায় কি না? ভারতবর্ষীয় বলিলে ভারতবর্ষবাসী মুসলমান ও খৃষ্টান তাহার অন্তর্ভুক্ত হয় কি না? যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া শুদ্ধ হিন্দুজাতিকেই ধরা যায়—তাহা হইলেও এক্ষণে হিন্দুগণের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহাদিগকে কি এক জাতি বলিয়া মনে হয়?

যে জাতির মধ্যে একতাসূত্র নিবদ্ধ হইয়াছে—যাহারা সকলে এক ভাবে, এক উৎসাহে উত্তেজিত হয়—যে জাতির মধ্যে একজনের বিপদ উপস্থিত হইলে সাধারণ-বিপদ বলিয়া সকলে মনে করে, সেই জাতির জাতীয়তার প্রকৃত পত্তন-ভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিতে হইবে; যতক্ষণ তাহা না হইবে ততক্ষণ সে জাতি জাতিনামের যোগ্য নহে। সমস্ত হিন্দুজাতির মধ্যে এখন একতা নাই—এখন হিন্দুজাতিকে একটি সমগ্র জাতি বলিয়াই যেন বোধ হয় না। লৌকিক আচার ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ভিন্ন। এক্ষণে পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী, মহারাষ্ট্রী প্রত্যেকেই এক একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ হয়। যত দিন না এই বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে বিজাতীয় বৈষম্যগুলি দূরীকৃত হইয়া একতা-সূত্র নিবদ্ধ হইবে, তত দিন আমরা স্বাধীনতার উপযুক্ত হইব না, স্বাধীনতার অধিকারী হইব না; তত দিন আমাদিগের স্বাধীনতার আশা দুরাশা মাত্র। এই একতার অভাবেই আমরা স্বাধীনতা হারাইয়াছি, এবং পৃথিবীর অনেক জাতিই এই একতার অভাবেই স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। অতএব সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একতার অভাবই প্রধান অভাব। এই একতা-সাধন পক্ষে বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি যে অতীব কার্য্যকারী তাহাতে সন্দেহ নাই—কোন জাতির মধ্যে বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যের রীতিমত উৎকর্ষ সাধন হইলে, সে জাতির মধ্যে শুধু যে একতার সুবিধা হয় তাহা নহে, কিন্তু একত্র হইয়া সাধারণ স্বার্থ রক্ষার্থ কি করিয়া কার্য্য করিতে হয়, কি করিয়া কার্য্যে সফলতা লাভ করা যায়—তাহার যথার্থ উপায় অবলম্বন করিবারও ক্ষমতা জন্মে।

সহস্র বৎসর দাসত্ব-ভারে প্রপীড়িত হইয়া স্বাধীনতার স্বাভাবিক ভাব—স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি—স্বাভাবিক স্পৃহা আমরা হারাইয়াছি। আমরা হৃদয়ের দ্বারা এক্ষণে স্বাধীনতার আস্বাদ পাই না—এক্ষণে জ্ঞান দ্বারা

স্বাধীনতার উপকারিতা ও আবশ্যকতা আমাদিগকে বুঝিতে হইতেছে। হৃদয়ের স্বাভাবিক উত্তেজনায় এক্ষণে আমরা একত্র হইতে পারি না—এক্ষণে জ্ঞানদ্বারা একতার উপকারিতা বুঝিয়া তবে আমাদিগকে ঐক্য-সাধনে চেষ্টা করিতে হয়। অতএব একতা-সাধন পক্ষে এক্ষণে জ্ঞানানুশীলন যে সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মনুষ্য-প্রকৃতিতে বুদ্ধির সহিত হৃদয়ের, জ্ঞানের সহিত ভাবের একটি স্বাভাবিক যোগ আছে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে। আমরা যদি প্রথমে জ্ঞানের কথায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই—আর যদি পুনঃ পুনঃ সেই কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে থাকি—ক্রমে তাহা আমাদিগের ভাবের সহিত মিশ্রিত, হৃদয়ের সহিত জড়িত হইয়া যায়—ইহাই মানব-প্রকৃতির নিয়ম। আমরা যদি এক্ষণে জ্ঞান দ্বারা একতার উপকারিতা বুঝিয়া তাহার সাধনায় প্রবৃত্ত হই—ক্রমে আমরা ভাব দ্বারা চালিত হইয়া একত্র হইতে সমর্থ হইব। আমরা ভাবের সহজ পথ হারাইয়াছি—এক্ষণে আমাদিগকে দুরূহ জ্ঞানের পথ দিয়া ভাবের পথে উপনীত হইতে হইবে। সাধারণ জ্ঞানানুশীলন ও শিক্ষা এই জন্য নিতান্ত আবশ্যক। উচ্চতর বিজ্ঞান-চর্চ্চাও যে একতা-সাধনের বিলক্ষণ সহায়তা করে, বিজ্ঞান-প্রসূত বাষ্পীয় শকট, তাড়িৎ-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি তাহার জাজল্যমান দৃষ্টান্ত। তাহাদিগের সাহায্যে ভারতবর্ষের দূরবর্ত্তী প্রদেশ সকলের মধ্যে পরস্পর যাতায়াত কেমন সহজ হইয়া পড়িয়াছে—বাণিজ্য-ব্যাপারের কেমন সুগমতা হইয়াছে—এইরূপে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশীয় জাতিদিগের মধ্যে দ্রব্যের বিনিময় ও ভাবের বিনিময় দ্বারা একতার পথ কেমন অল্পে অল্পে উন্মুক্ত হইতেছে। তবে এই সকল বাষ্পীয় শকট, তাড়িৎ-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি যদি আবার আমাদিগের স্বজাতীয় বিজ্ঞানচর্চ্চার ফল হইত—যদি স্বজাতীয় ধনে ও স্বজাতীয় চেষ্টায় ঐ সকল ব্যাপার আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে

যদি অধ্যবসায়-সহকারে ব্যায়াম-চর্চ্চা প্রভৃতি উপায়ের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে কেনই বা না বাহ্য প্রকৃতির প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া শারীরিক বল-সঞ্চয়ে সমর্থ হইবেন? কিন্তু এই প্রকার অধ্যবসায়ের পূর্ণফল যাঁহারা অচিরাৎ দেখিতে চাহেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন—কেন না, যে নিয়মে আমরা পূর্ব্ব-পুরুষের দোষ-গুণের উত্তরাধিকারী হই, সেই কৌলিক নিয়মের প্রভাবেই আমরা আমাদিগের অধ্যবসায়-সত্ত্বেও পূর্ব্বপুরুষদিগের দুর্ব্বল শারীরিক গঠন ও প্রাকৃতির উত্তরাধিকার হইতে একেবারেই অব্যাহতি পাইব না, পরন্তু ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে কৌলিক-অধিকারের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে আমরা সমর্থ হইব।

প্রত্যেক ব্যক্তি কিম্বা জাতির উন্নতির মূলে—এমন কি সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে, প্রধানতঃ দুইটি মূল নিয়ম দৃষ্ট হয়। একটি কৌলিক গুণ-প্রবাহের নিয়ম, আর একটি উপযোগিতার নিয়ম; এই দুইটি নিয়মই মনুষ্য-সমাজে একত্র কার্য্য করিতেছে। প্রথমোক্ত নিয়মটির প্রভাবে আমরা পূর্ব্ব-পুরুষদিগের দোষগুণের উত্তরাধিকারী হই, এবং শেষোক্ত নিয়মটির অনুযায়ী আমরা নিজ চেষ্টায় আপনাদিগকে অবস্থা ও ঘটনার উপযোগী করিয়া লইতে সমর্থ হই। যাহা বরাবর হইয়া আসিয়াছে তাহাই রক্ষা করিবার জন্য এবং তাহারই স্থায়িত্ব সম্পাদনের জন্য একটি নিয়ম সতত চেষ্টা করে; অপর নিয়মটি দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে অবস্থা ও ঘটনার উপযোগী করিয়া আমাদিগকে অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তনের দিকে—উন্নতির দিকে লইয়া যায়; এক কথায় একটি রক্ষণশীল—আর একটি পরিবর্ত্তন-শীল বা উন্নতিশীল। এই দুই নিয়মে সমাজের শ্রেণীগত সাদৃশ্য রক্ষিত হয় ও ব্যক্তিগত বিভিন্নতা সম্পাদিত হয়। নূতন নূতন ঘটনা ও অবস্থা-স্রোতে আমরা একেবারে ভাসিয়া না যাই, কৌলিক নিয়ম আসিয়া তাহার প্রতিরোধ-চেষ্টা করে এবং কৌলিক নিয়মানুসারে যে দোষ-

প্রবাহ বংশপরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হইবার কথা, উপযোগিতার নিয়ম আসিয়া তাহার পরিশোধন-চেষ্টা করে; এইরূপে এই দুই নিয়মের ঘাত-প্রতিঘাতে মনুষ্য-সমাজ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

আমরা বাঙ্গালী-জাতি যেমন একদিকে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে দয়া, ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইরূপ আর এক দিকে তাঁহাদিগের ভীরুতা, নির্ব্বীর্য্যতা প্রভৃতি দোষেরও উত্তরাধিকারী হইয়াছি। এইক্ষণে এই দোষগুলি আমাদিগের চরিত্র হইতে অপনীত করিবার জন্য বাহিরের ঘটনাবলী ও অবস্থা কতদূর অনুকূল ও উপযোগী দেখা আবশ্যক। বলিষ্ঠ সাহসী ইংরাজ জাতির সংস্রব ও দৃষ্টান্ত একদিকে যেমন এই উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে উপযোগী, সেইরূপ আর এক দিকে ইংরাজি সভ্যতা তাহার প্রতিকূল কি না—তাহা আমাদিগের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। মিল্ (Mill) তাঁহার সভ্যতা নামক প্রবন্ধে এই মর্ম্মে বলেন যে, ইংরাজি সভ্যতার প্রভাবে ইংরাজদিগের বীর্য্য দিন দিন হ্রাস হইতেছে। তিনি বলেন :—

"There has crept over the refined classes, over the whole class of gentlemen in England, a moral effeminacy, an inaptitude for every kind of struggle. They shrink from all effort, from everything which is troublesome and disagreeable. The same causes which render them sluggish and unenterprising, make them, it is true for the most part, stoical under inevitable evils. But heroism is an active, not a passive quality, and when it is necessary not to bear pain but to seek it, little needs be epected from the men of the present day. They cannot undergo labour, they cannot brook

ridicule, they cannot brave evil tongues. They have not hardihood to say an unpleasant thing to any one whom they are in the habit of seeing, or to face, even with a nation at their back, the coldness of some little coterie which surrounds them"—যদি বলিষ্ঠ ইংরাজজাতিকেও ইংরাজি সভ্যতা দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে চির-দুর্ব্বল বাঙ্গালাজাতি তো উহার দ্বারা আরও দুর্ব্বল হইবার কথা। এখনও ইংরাজদিগের প্রকৃতিতে কুল-পরম্পরাগত এতখানি সার সঞ্চিত আছে, অ্যাঙ্গোস্যাক্‌সন্ রক্তের এত অধিক তেজ আছে যে, তাহারই বলে তাহারা ইংরাজি সভ্যতার দৌর্ব্বল্যজনক প্রভাব কথঞ্চিৎ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীজাতির সে সারও নাই, সে তেজও নাই, অথচ সেই ইংরাজি সভ্যতার সমস্ত ভার তাহাদিগের দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপানো হইয়াছে। বাঙ্গালীজাতির পুরুষ-পরম্পরায় অর্জ্জিত অন্তরের সারবত্তা ও শারীরিক বল নাই বলিয়াই তাহারা কোনও বিদেশীয় জাতির প্রভাব এ পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। যখন মুসলমানদিগের আধিপত্য ছিল, তখন আমরা মুসলমান দিগের সভ্যতায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, এক্ষণে আবার ইংরাজি সভ্যতায় সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। মুসলমানদিগের আমলে তাহাদিগের অনুকরণে চাপকান কাবা পরিয়াছিলাম, এক্ষণে আবার একেবারেই হ্যাট্‌কোট পেণ্ট্‌লুন পরিতে আরম্ভ করিয়াছি।

কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, মুসলমানি সভ্যতা ইংরাজি সভ্যতা অপেক্ষা আরও দৌর্ব্বল্যজনক। মুসলমানদিগের তুলনায় ইংরাজের সংস্রব আমাদের পক্ষে যে অনেক উপকারী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মুসলমান সভ্যতার সহিত আলস্য ও বিলাসের মূর্ত্তিমান্ প্রতিরূপ—আতর গোলাব তাকিয়া গদি প্রভৃতি যেন একেবারে জড়িত, এবং ইংরাজি

সভ্যতা-গত বিলাস সামগ্রীর মধ্যেও অপেক্ষাকৃত কার্য্যতৎপরতা ও উদ্যমের ভাব লক্ষিত হয়। ইহা কে না স্বীকার করিবে যে, ইংরাজদিগের সংসর্গে, শিক্ষায় ও দৃষ্টান্তে আমাদিগের কার্য্য-তৎপরতা ও শ্রমশীলতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা আমাদিগের স্বাভাবিক নহে, সুতরাং ইহার উপর নির্ভর করা যায় না। শারীরিক বল ও স্ফূর্ত্তি হইতে স্বাভাবিক ভাবে যে উদ্যম-তৎপরতা প্রসূত হয়, তাহাই অপেক্ষাকৃত অধিক ফলপ্রদ ও স্থায়ী। ইংরাজি সভ্যতার প্রভাবে আমাদের এত অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে যে, আর অল্পে সন্তুষ্ট হইবার যো নাই। জীবিকার উপায় করিবার জন্য আকুল হইয়া সকলকে ইতস্ততঃ বেড়াইতে হইতেছে। এমন কি, উহার জন্য আমাদিগের যুবকদিগকে সাত সমুদ্র পার হইয়া দূর দেশে যাইতে হইতেছে। এত উদ্বেগ ও এত চিন্তা বাঙ্গালীর দুর্ব্বল শরীরে কি সহ্য হইবে? এক্ষণে ইংরাজদিগের শাসনে আমাদিগের মধ্যে যেরূপ একদিকে কার্য্য-তৎপরতা, উদ্যম ও স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি পাইতেছে—সেইরূপ আর একদিকে আমাদিগের দৈহিক বল সঞ্চয়ের প্রতি লোকের কি সেরূপ যত্ন ও মনোযোগ দেখা যায়? মুসলমানদিগের আমলে তেমন সুশাসন ছিল না—দস্যুদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল, সুতরাং সকলকে দায়ে পড়িয়া শারীরিক বল ও সাহস অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইত। তখন লেখা পড়ারও এত চাপ ছিল না, সুতরাং শরীরের প্রতি অনেকটা লোকের দৃষ্টি থাকিত। বিপদের সহিত সংগ্রাম না করিলে কখনই সাহস ও আত্মনির্ভরের শিক্ষা হয় না। কিন্তু এক্ষণে আমাদের বিপদের লেশমাত্র আশঙ্কা নাই। আমরা শান্তির ক্রোড়ে দিব্য আরামে শুইয়া আছি। রাজপুরুষদিগের উপর সমস্ত নির্ভর, আপনার উপর কিছুই নির্ভর করিতে হয় না। পুলিসের এমনি শাসন, জীবন-সম্পত্তি রক্ষার জন্য আমাদিগের নিজের কোন চেষ্টা পাইতে হয় না। এই জন্য শারীরিক বল ও সাহস অর্জ্জনের নিমিত্ত আমাদিগের

কোন প্রয়োজনই বোধ হয় না। তাতে আবার লেখা পড়ার এত চাপ যে, এতদ্দেশীয় যুবকেরা শরীরের প্রতি মনোযোগ দিতে অবকাশ পান না এবং রাজপুরুষদিগেরও সে দিকে দৃষ্টি নাই। আমরা এ কথা বলি না যে, অরাজকতা হউক, অশান্তি হউক, লেখা-পড়া দেশ হইতে উঠিয়া যাউক, কেবল শারীরিক বল অর্জ্জনে লোকের চেষ্টা হউক। তাহা আমাদিগের বলিবার অভিপ্রায় নহে। আমরা বিলক্ষণ জানি যে, জ্ঞান-বিরহিত শারীরিক বল পশুতেই শোভা পায়—তাহা মনুষ্যের উপযুক্ত নহে, এবং ইহাও বিলক্ষণ জানি যে, যদি কোন জনসমাজে অরাজকতা অশান্তি থাকে, জীবন-সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তই সকলকে আকুল হইতে হয়, তাহা হইলে সে সমাজের অন্তর্ভূত কোন ব্যক্তি শিল্প বাণিজ্য বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না, সুতরাং সভ্যতা ও উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু আমাদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা শারীরিক বল ও সাহস অর্জ্জনের অনুকূল নহে, সেই জন্যই আরও, দেশের লোক ও রাজপুরুষদিগের এই বিষয়ে অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত। আমরা এক্ষণে যে শান্তি উপভোগ করিতেছি তাহা নির্জ্জীবের শান্তি—তাহা মৃতদেহের শান্তি—তাহা বলবান জীবন্তপুরুষের শান্তি নহে। শান্তিকে রক্ষা করিবার জন্যও বলের প্রয়োজন। যদি আমাদিগের নিজের বল না থাকে, তাহা হইলে শান্তিরক্ষার জন্য চিরকালই পরের উপর নির্ভর করিতে হইবে। যে শান্তিরক্ষার জন্য পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, সে শান্তির স্থায়িত্ব কোথায়? আজ যদি ইংলণ্ড আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান, আমাদিগের এতটুকুও কি বল-সঞ্চয় হইয়াছে যে, আমরা নিজ বলে আপনাদিগের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতে পারি? সত্য, ইংলণ্ডের প্রসাদে আমরা তাড়িৎ-বার্ত্তাবহ পাইয়াছি, বাষ্পীয় শকট পাইয়াছি, বাষ্পীয় আলোক লাভ করিয়াছি,

কিন্তু ইংলণ্ড যদি আজ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে উহার অবশিষ্ট আর কি থাকে? তাড়িৎ-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি কি তাড়িতের ন্যায় তিরোহিত হয় না? এবং বাষ্পীয় শকট প্রভৃতি কি বাষ্পের ন্যায় বায়ুতে বিলীন হইয়া যায় না? ইংলণ্ডের কামান বন্দুক বেয়নেট, শত্রুর আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে সত্য—কিন্তু ইংলণ্ড আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে কি আমরা শিশুর ন্যায় একেবারে অসহায় ও নিরুপায় হইয়া পড়ি না?

আমরা ইংলণ্ডের নিকট আর কিছু চাহি না—আমাদিগের বাহ্য সুখ-সমৃদ্ধি হোক্ বা না হোক্ তাহাতে ক্ষতি নাই, তিনি যদি আমাদিগের মৃতবৎ নির্জীব দেহে এতটুকু বল-সঞ্চার করিতে পারেন যে আমরা আপনার উপর নির্ভর করিতে পারি, আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারি, আপনার উন্নতি আপনারাই সাধন করিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা তাঁহার নিকট প্রকৃত উপকার লাভ করিব, এবং তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইব। তিনি যদি আমাদিগের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লন, তিনি যদি উপযুক্ত দেশীয় লোকদিগকে রাজ্যের উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিতে কৃপণতা করেন, তিনি যদি ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে অনৈক্য-বীজ বপন করেন, তিনি যদি দেশীয় বাণিজ্যের প্রতি বিদ্বেষ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন, তিনি যদি দেশীয় সংবাদপত্রের মুখবন্ধ করেন, তিনি যদি দেশীয়দিগকে পদে পদে অবিশ্বাস করেন, তিনি যদি আমাদিগকে চিরকাল শৈশব-দশায় রাখিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমরা কি কখন স্বাধীনতা-লাভের উপযুক্ত হইতে পারি? স্বীকার করি আমাদিগের নিজের চেষ্টা, নিজের অধ্যবসায়ের উপর অনেকটা নিজের উন্নতি নির্ভর করে, কিন্তু আমরা সহস্র বৎসরের অধীনতায় একেবারে চিররোগীর ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি—আমাদের দুর্ব্বল চেষ্টায় কত দূর হইতে পারে? তাহাতে যদি আবার কোন

উচ্চতর প্রভু-শক্তি আসিয়া আমাদিগের উন্নতির পথে সহায়তা করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাতে কণ্টক রোপণ করেন, তাহা হইলে কি আমরা একপদও অগ্রসর হইতে পারি? লেখক মহাশয় একস্থলে বলিয়াছেন :—"Do you think if we *deserve* liberty, that is to say, if we have slowly but surely developed those conditions which alone entitle a nation to that grand golden privilege, England would be willing to withold us from it—England, the land of noble heroic hatriots?"

লেখক-মহাশয়ের ন্যায়, স্বাধীনতার জন্মভূমি ইংলণ্ডও অনেক সময়ে তোমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়া থাকেন যে, অগ্রে উপযুক্ত হও, তবে আমাদিগকে আমি উচ্চ অধিকার প্রদান করিব; কিন্তু উপযুক্ত হইবার অবসর না দিলে কেহ কি কখন উপযুক্ত হইতে পারে? পিতা যদি তাঁর দুর্ব্বল সন্তানকে অষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া রাখিয়া তাহাকে বলেন যে, অগ্রে তুমি উপযুক্ত হও তবে তোমাকে আমি পদচারণা করিতে দিব—সে যেরূপ আশ্বাস-বাক্য ইহাও তদ্রূপ। শিশুকে পদচারণা শিক্ষা দিবার সময় শিশু পদেপদে স্খলিত-পদ হয়, কিন্তু এইরূপ পদস্খলনের ওজর করিয়া যদি তাহাকে বলা হয়—তোমার এখনও উপযুক্ত বল হয় নাই, যখন বল হইবে তখন পদচারণা করিও—এ যেরূপ কথা উহাও সেইরূপ। সমস্ত হিন্দুজাতি জেতৃজাতির ইচ্ছামাত্র ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে—লেখক মহাশয় এইরূপ বিভীষিকা দেখাইয়াছেন, কিন্তু চিরকাল শৈশব দশায় থাকা অপেক্ষা একেবারে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হওয়াই কি প্রার্থনীয় নহে?

ইংলণ্ডের একবার ভাবা উচিত, কি মহান্ ভার বিধাতা তাঁহার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন—বিংশতি কোটি মানবের সুখ-শান্তি-স্বাধীনতা তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি প্রথমে জয় করিবার উদ্দেশে এখানে

আসেন নাই, বাণিজ্যের জন্যই আসিয়াছিলেন; মুসলমানের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহার হস্তে আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি বলিলেও হয়। একবার তিনি স্মরণ করিয়া দেখুন, যে পলাশির যুদ্ধে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার করায়ত্ত হইল, সে যুদ্ধে কাহার সাহায্যে তিনি জয়লাভ করিলেন? আমরা দাসত্ব-অত্যাচারে প্রপীড়িত হইবার জন্য তাঁহাকে ডাকি নাই, দাসত্ব-অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার জন্যই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলাম—এই মহৎ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্যই বিধাতা ভারতবর্ষকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। অতএব ইংলণ্ড আমাদিগের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা ও আশা উদ্দীপিত করিয়া যেন তাহা আবার কঠোর ফুৎকারে নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা না পান; এখন তিনি যেন না বলেন যে, অগ্রে উপযুক্ত হও, পরে তোমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিব। তিনি আমাদিগকে অগ্রে স্বাধীনতার অবসর দিন—স্বাধীনতা-স্ফূর্ত্তির পরিসর দিন—স্বাধীনতার শিক্ষা দিন—তাহার পরে বলুন "অগ্রে স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত হও, পরে তাহার আকাঙ্ক্ষা করিও।"

——c——

জীব-জগতের ক্রমাভিব্যক্তি।

ক্রমাভিব্যক্তির মতবাদটি আমাদের দেশে নূতন নহে। সাংখ্য ও বেদান্তদর্শন এই ক্রমাভিব্যক্তি-মতেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। ঈশ্বর ৬ দিনে সমস্ত সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন—এইরূপ যাঁহাদিগের বিশ্বাস—এইরূপ যাঁহাদিগের অপূর্ণ শ্রম-কাতর ঈশ্বরের কল্পনা—সেই খৃষ্টান সম্প্রদায় এই মতটির প্রচারে যে তটস্থ হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি! যাঁহারা মনে করেন, এই ছয় দিনের সৃষ্টিই ঈশ্বরের পূর্ণ সৃষ্টি—কিম্বা ঈশ্বর মধ্যে-মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে এক একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহারা যে ঈশ্বরের শক্তিকে বস্তুতঃ খর্ব্ব করিয়া কল্পনা করেন তাহা বলা বাহুল্য। ঈশ্বরের সৃষ্টি অপূর্ণ, কিন্তু উত্তরোত্তর পূর্ণতার দিকেই অগ্রসর হইতেছে। "পূর্ণ হওয়া এবং একেবারেই না হওয়া সৃষ্ট-বস্তুর পক্ষে উভয়ই সমান। পূর্ণ যিনি তিনি চিরকালই পূর্ণ আছেন এবং পূর্ণ থাকিবেন—সৃষ্ট-বস্তু অপূর্ণ না হইলে হইতেই পারে না—সৃষ্ট-বস্তুর অস্তিত্বই অপূর্ণতা-নিবন্ধন—এবং তাহা অপূর্ণ বলিয়াই তাহার উন্নতির প্রয়োজন।"—(ভারতী, ফাল্গুন) ঈশ্বরের সৃষ্টি স্বল্প-জ্ঞান মনুষ্য-কার্য্যের ন্যায় হইতে পারে না। আমাদিগের দৃষ্টি-পরিসর অতি পরিমিত। আমরা কোন অতীব দূর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিব বলিয়া মনে করিলে সেই উদ্দেশ্য-সাধন-উপযোগী সমস্ত আয়োজন একেবারে পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিতে পারি না, যেমন-যেমন কার্য্য উপস্থিত হয়, যেমন-যেমন প্রয়োজন বুঝিতে পারি, তদনুসারে উপস্থিত-মতে তাহার বিধান করিয়া থাকি; কিন্তু যদি ঈশ্বরের কার্য্য-প্রণালী আমাদিগের কার্য্য-প্রণালীর ন্যায় মনে করি, তাহা হইলে কি ঈশ্বরের পূর্ণতাকে খর্ব্ব করা হয় না? সৃষ্টির ক্রমোন্নতিই যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তিনি এই উদ্দেশ্য-সাধন জন্য যত কিছু আয়োজনের প্রয়োজন—তৎ-

সমুদায় একেবারেই পূর্ব্ব হইতে সৃষ্টি-বীজ মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিয়া, সেই বিশ্ব-বীজ নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে উন্নতি হইতে উন্নতিতে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত—ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করিতেছেন—ইহাই কি সঙ্গত অনুমান নহে? এবং এই অনুমানটি শুদ্ধ অনুমান মাত্র নহে, ইহার প্রমাণও সৃষ্টি-ব্যাপারের পদে পদে দৃষ্ট হয়।

এই অভিব্যক্তি-মত আমাদের দেশে বহু পুরাকালে প্রচারিত হয়, কিন্তু বলিতে গেলে য়ুরোপে সে দিন মাত্র ইহার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছে। (Wolff) উল্‌ফ্‌ নামক পণ্ডিত ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে এই মতটি উপজনন-বাদ (Theory of Epigonesis) নামে প্রথম প্রচার করেন। অধুনাতন য়ুরোপের অভিব্যক্তিবাদিগণের মধ্যে যদিও উল্‌ফ্‌কে এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া গণ্য করিতে হয়, কিন্তু Robinet, Bonnet, Geoffrey S. Hilaire, Weekel, "সৃষ্টি-চিহ্ন" নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার Lamarck, এবং অধুনাতন জীবন্ত বিখ্যাত গ্রন্থকারদ্বয় Darwin ও Wallace প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মতটিকে দৃঢ় বৈজ্ঞানিক পত্তন-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যে বহুল সাহায্য করিয়াছেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে F. B. Robinet কর্ত্তৃক Amsterdam নগরে De la nature নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি সে সময় এতদুর লোক-প্রিয় হইয়াছিল যে, অনতিকাল-মধ্যে উহার তিন "সংস্কার" উঠিয়া যায়। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের স্থূল মর্ম্ম এই:—জগতের সমস্তই একটি- অখণ্ড জীব-শৃঙ্খল ভিন্ন আর কিছুই নহে—অর্থাৎ জগতের সকল পদার্থেরই জীবন আছে, পৃথিবী প্রস্তর গ্রহ তারা বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী সকলই এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সকলই জীবন-বিশিষ্ট, সকলেরই বোধ-শক্তি আছে, সকলই বর্দ্ধিত হয়, সকলেরই প্রবৃত্তি বাসনা আছে, সকলেই বংশ-বিস্তার করিতে সমর্থ। তিনি

বলেনঃ—অগ্নি অতীব বুভুক্ষু ও সর্ব্বভুক্ (আমাদের ভাষায় অগ্নির আর এক নাম সর্ব্বভুক্)—বায়ুই ইহার খাদ্য—বায়ুর অভাবে অগ্নি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। আবার বায়ুর ভক্ষ্য জল—জলের ভক্ষ্য অন্যান্য পদার্থ; এই জন্য তিনি বলেন,—ধাতু-উৎস-জলে লবণ, লৌহ প্রভৃতি অনেক প্রকার ধাতু পাওয়া যায়। তিনি বলেন,—"আমি প্রস্তর-সকলের এবং প্রস্তর-আধার-সকলের অঙ্কুর দৃষ্টি করিবার জন্য অনেক অন্বেষণ করিয়াছি, আমার অনুসন্ধানও তৎসম্বন্ধে বিফল হয় নাই, এমন কি প্রস্তর ও ধাতু-সকল কি প্রকারে স্বীয় স্বীয় শরীর হইতে অঙ্কুর নিঃসৃত করে, তাহা পর্য্যন্ত আমি দেখিতে পাইয়াছি। আমি তাহাদিগের স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ নির্ণয় করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাহাতে কি ?—অনেক জন্তু ও বৃক্ষেরও তো এ পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ-ভেদ নির্ণয় হয় নাই। অবশেষে আমরা ইহাও দেখিতে পাইয়াছি, প্রস্তর ও ধাতু-গর্ভে আবরণ-বিশিষ্ট অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতুর ভ্রূণ-সকল নিহিত থাকে, তাহারা জন্তুদিগের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত ও পরিপোষিত হয়।

এইরূপ বিশ্বাস-অনুসারে Robinet বলেন যে, সকল পদার্থই শরীর-যন্ত্র-বিশিষ্ট। তাঁহার মতে, প্রত্যেক স্ফটিক-খণ্ড, অসংখ্য আণবিক স্ফটিক-শরীরের সমষ্টি মাত্র এবং সমস্ত স্ফটিক-খণ্ডের যে আকার ও গুণ-সকল দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই সমানরূপে প্রত্যেক স্ফটিক-শরীরে আছে, এবং এই প্রকারে জীব মাত্রেই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণবিক জীবের সমষ্টি,—প্রত্যেক কুকুর আণবিক কুকুরের সমষ্টি, প্রত্যেক মনুষ্য আণবিক মনুষ্যের সমষ্টি!

আবার তিনি আরও বলেন,—যেমন ব্যাঙ্গাচি ক্রমশঃ ভেক-আকারে অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ ভেক পুনরায় অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া আবার মৎস্য-আকার ধারণ করে। কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান এই প্রকার অভিব্যক্তি-বাদের পোষকতা করেন না। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্তি-

বাদের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এককালে য়ুরোপে আর একটি মতের প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহার নাম "বাক্স-বন্দি" কিম্বা "কৌটা-বন্দি"-মতবাদ (The theory of Emboitement')। এই মতের মর্ম্ম এই, কাশীর কৌটাতে, একটা কৌটার মধ্যে যেমন অনেকগুলি কৌটা থাকে, সেইরূপ জীব জন্তুর অন্তর্গত প্রত্যেক জাতির মূলবীজের মধ্যে সেই জাতির ভাবী বংশ-পরম্পরা গূঢ়ভাবে নিহিত থাকে।

এক সময়, এই মতাবলম্বী অনেক লোক ছিল। এমন কি, বিখ্যাত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বেত্তা Cuvier এই মতের পক্ষপাতী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আবার সময়-ক্রমে এই মতটিও ধরাশায়ী হইয়া ইহার স্থানে Wolff-প্রবর্ত্তিত উপজনন-বাদ সমুত্থিত হয়। এই Wolff-প্রবর্ত্তিত অভিব্যক্তি-বাদের সহিত আধুনাতন মতের কতকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়; এই জন্যই Wolff য়ুরোপের আধুনিক অভিব্যক্তি-বাদের প্রথম পথ-প্রদর্শক বলিয়া ন্যায্যরূপে অভিহিত হইতে পারেন।

Wolff এই প্রকার মত প্রকাশ করিলেন যে, কোন শরীর-যন্ত্রের প্রথম উৎপত্তিকালে, একটি শরীর হইতে সম্পূর্ণ আর একটি শরীর একেবারেই উৎপন্ন হয় না, পরন্তু ঐ শরীর-যন্ত্রের প্রত্যেক অঙ্গ একাদি-ক্রমে ক্রমশঃ নিঃসৃত হইয়া একটি সর্ব্বাঙ্গীণ নূতন শরীরে পরিণত হয়। ফলিতার্থে এই মতটি এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, কোন জন্তু কিম্বা বৃক্ষের প্রত্যেক অংশই, পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের ফলস্বরূপ—এবং সেই অংশটি আবার নিজে পরবর্ত্তী আর একটি নূতন অংশের কারণ স্বরূপ। অতএব ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান হয়, যে-অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া-অনুসারে পরম্পরাক্রমে শরীরী জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অভিব্যক্ত হয়, তাহারই নাম উপজনন-প্রক্রিয়া (Epigenesis) এবং প্রত্যেক শরীর-যন্ত্র-বিশিষ্ট জীবের শরীরস্থ সমস্ত অঙ্গই সেই জীব-বিশেষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক শক্তি হইতে নিঃসৃত হয়। এই তো গেল উলফের মত।

ইহার পরে Lamarck ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে আর একটি নূতন মত প্রকাশ করেন।

শরীর-যন্ত্রের কোন অঙ্গ ব্যবহার করিলে পরিপুষ্ট হয়, এবং ব্যবহার না করিলে ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং কি জীবজন্তু, কি বৃক্ষলতা, উহাদের বাহ্য অবস্থার পরিবর্ত্তন-অনুসারে উহাদের প্রত্যেকের শরীরে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়—এই যে সর্ব্বজন-পরীক্ষিত সত্যটি, ইহারই উপর Lamarck স্বকীয় মত স্থাপন করিয়াছিলেন।

কোন প্রাণী যদি স্বজাতির অস্তিত্ব স্থায়ী করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে যে কোন নূতন অভাবের উৎপত্তি হয়, সেই অভাবের কোন প্রকার প্রতিবিধান না করিলে চলে না। এবং এই সকল নূতন অভাব সেই প্রাণীকে নূতন কার্য্যসাধনে এবং নূতন অভ্যাস অবলম্বনে উত্তেজিত করে। এইরূপে যে সকল অঙ্গ পূর্ব্ব-অবস্থায় বড় একটা ব্যবহারে আইসে নাই—সেই সকল অঙ্গের প্রয়োজন বর্দ্ধিত হওয়ায় উহাদিগের সমধিক চালনাও হইয়া থাকে, এবং উহা হইতেই নূতন অঙ্গ-সকল পরিস্ফুটিত বা অভিব্যক্ত হয়। পক্ষান্তরে, যে সকল অঙ্গ অব্যবহৃত থাকে, তাহারা ক্ষীণ এবং খর্ব্ব কিম্বা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কোন প্রাণীর বাহ্য অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাহার কতকগুলি অঙ্গ অন্তর্হিত এবং কতকগুলি নূতন অঙ্গ পরিস্ফুট বা অভিব্যক্ত হইতে পারে, এই কথাটি মানিয়া লইয়া ল্যামার্ক এই প্রকার মত প্রকাশ করিলেন যে, কোন জন্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-বৈলক্ষণ্য-অনুসারে তাহার অভ্যাস-সকল নির্দ্দিষ্ট হয় না, পরন্তু তাহার অভ্যাস-অনুসারেই তাহার শারীরিক আকার গঠিত হয়। শত্রুগণের নিকট হইতে পলায়ন করিবার উদ্দেশে হরিণদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চটুলতা উৎপন্ন হয় নাই, পরন্তু তাহারা হিংস্র জন্তুগণের সম্মুখে পড়িয়া, তাহাদিগের কবল হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত

দ্রুতপদক্ষেপে পলাইতে বাধ্য হওয়াতেই তাহাদের শরীরও ক্রমশঃ তদুপযোগী হইয়াছে। এই অভ্যাস-প্রভাবে তাহাদিগের শরীরে শুদ্ধ যে অপরিসীম চটুলতা জন্মিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু যে সকল লঘু অঙ্গের উপর তাহাদিগের গতি-চাপল্য নির্ভর করে, সেই সকল অঙ্গও এই অভ্যাস-নিবন্ধন গঠিত হয়। এই মতানুসারে, জীব জন্তু বৃক্ষ লতাদি, সামান্য হইতে জটিল, জটিল হইতে জটিলতর অবস্থায় ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে, সামুদ্রিক ও ভৌমিক জীব সকল উদ্ভিদ্‌গণের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং উহাদের শারীরিক আকারও উদ্ভিদের শারীরিক আকার-অপেক্ষা উন্নত।

তাঁহার মতে, সকল পদার্থের মধ্যেই ক্রমোন্নতির নিয়ম অন্তর্নিহিত। এই নিয়মানুসারে অচল জড়-পদার্থ হইতেই প্রাণ উৎপন্ন হইল, এবং তৎপরে প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়-বোধ অভিব্যক্ত হইল; অবশেষে এই প্রক্রিয়া-অনুসারেই বুদ্ধিহীন জীব বুদ্ধি-সমন্বিত হইল।

কিন্তু যখন ল্যামার্ক দেখিলেন যে, নানা শ্রেণীর অসংখ্য জীব এখনও একই অবস্থায় আছে, তাহাদিগের মধ্যে উন্নতি-প্রবণতা কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না, তখন এই আপত্তিটি খণ্ডন করিবার জন্য তিনি আর একটি অনুমানের আশ্রয় লইলেন। সে অনুমানটি এই—প্রকৃতি একটি যন্ত্র বিশেষ; ঈশ্বর প্রকৃতির উপর যে সকল নিয়ম মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, প্রকৃতি বাধ্য হইয়া সেই নিয়মানুসারেই কার্য্য করে, এবং এইরূপে প্রকৃতি-দেবী স্বতঃ-প্রজনন-প্রণালী-অনুসারে (Spontaneous generation) জীব ও উদ্ভিদের অসংখ্য বীজাঙ্কুর ক্রমাগত অবিশ্রামে উৎপাদন করিতেছেন। তাঁহার মতে (Monad) এই সকল প্রাণবীজ অহরহ স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া, যুগযুগান্তরে উন্নত হইতে উন্নততর জীবরূপে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে।

ল্যামার্ক-প্রচারিত মতের এই ত স্থূল মর্ম্ম। সর্ব্বশেষে তিনি এই

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উরাং-উটাং-জাতীয় বানর হইতে মনুষ্য-জাতি অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, মনুষ্যের উৎপত্তি-বিষয়ক এই মতটি সর্ব্বপ্রথমে ল্যামার্কই প্রচার করেন। Infusoria কীট প্রভৃতি অতি নিম্নশ্রেণীর জীব-সকল কেন অদ্যাবধি পৃথিবীতে বর্ত্তমান, তাহারই একটা সঙ্গত কারণ দাঁড় করাইবার জন্য এবং তাঁহার প্রচারিত মতের সহিত এই ঘটনার সমন্বয় করিবার নিমিত্তই তিনি প্রকৃতির এই স্বতঃ-প্রজননী প্রক্রিয়ার কল্পনা করিয়াছিলেন। পুরাকালের Lucretius বলিতেন যে, প্রকৃতি-দেবীর কতকগুলি স্বাভাবিক গর্ভস্থলী ভূতলের সহিত সূত্রদ্বারা আবদ্ধ আছে, সেই গর্ভে জীব জন্তুর অহরহ জন্ম হয়। এই অনুমানটি যেরূপ অপ্রামাণ্য, তদ্রূপ Lamarck-কৃত অনুমানটিরও এ পর্য্যন্ত বিশিষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু স্বত-প্রজননী-প্রক্রিয়া লইয়া অধুনাতন পণ্ডিতগণের মধ্যে এখনও বাদানুবাদ চলিতেছে।

পৃথিবীতে অদ্যাবধি যত প্রকার জীব জন্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, বোধ হয় তাহাদের প্রত্যেকেরই অন্তর্ভূত অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর জীব এখনও পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান। অতএব পরিবর্ত্তন-নিয়মে যেরূপ নূতন নূতন জীব ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে, সেইরূপ স্থায়িত্ব-নিয়মে কতকগুলি জীবজন্তু চিরকালই পৃথিবীতে রহিয়া যাইতেছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই নিয়মটির নাম (persistence of Type) "মূল-আদর্শের নির্ব্বন্ধাতিশয়" রাখিয়াছেন। এই নিয়মানুসারে দেখা যায়, জীব-ইতিবৃত্তের অতি-পূর্ব্বতন যুগ হইতে অদ্যাবধি, কোন জাতীয় জীবের বংশাবলী-মধ্যে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

অভিব্যক্তি-বিষয়ক ল্যামার্কের এই মতটিও কালক্রমে লুপ্ত-প্রতিষ্ঠ হয়, এবং ইহার স্থলে ৫০ বৎসর পরে Darwin-প্রচারিত "প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন"-নামক আর একটি নূতন মত সদর্পে মস্তক উত্তোলন করে।

আজ-কাল এই মতটির রাজত্ব চলিতেছে, কিন্তু ইহারও সিংহাসন যে অটল নহে, এখনই তাহার কিছু কিছু নিদর্শন দেখা যাইতেছে। এই মতটি এই:—ইহা একটি সুসিদ্ধান্ত সত্য যে, জীব জন্তু ও বৃক্ষ লতা প্রায়ই এত অধিক সংখ্যায় সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে যে, তাহারা সকলই সমানরূপে পরিপুষ্ট হইতে না পারিয়া বিনষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে, যে যত নিম্নশ্রেণীস্থ, তাহাদের সন্তান-সন্ততিও তত অধিক পরিমাণে জন্মগ্রহণ করে। সেই সন্তান-সন্ততি মধ্যে যাহারা স্বভাবতঃ অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ, কিম্বা অন্য কোন উৎকৃষ্ট-গুণসম্পন্ন তাহারাই আত্ম-জীবন-রক্ষণে সমর্থ হয়, অবশিষ্টগুলি মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। ইহাও একটি সর্ব্বজন-বিদিত বিষয় যে, পিতা মাতার সহিত সন্তান-সন্ততির যেরূপ এক দিকে কতকটা সাদৃশ্য,—সেইরূপ পক্ষান্তরে কতকটা প্রভেদও থাকে।

অতএব সন্তান-সন্ততির মধ্যে যাহারা "সর্ব্বাংশে উপযুক্ত" (best fitted) তাহারাই পৃথিবীতে টিকিয়া থাকে। এই সন্তান-সন্ততির মধ্যে যাহার যে-কোন উপকারী গঠন-বৈলক্ষণ্য উৎপন্ন হয়, তাহাই কুল-পরম্পরায় প্রবাহিত হইয়া আরও বলবৎ হইয়া উঠে এবং তাহারই আনুষঙ্গিক অন্যান্য গঠন-বৈলক্ষণ্য আপনা হইতেই অভিব্যক্ত হয়। যে পরিবর্ত্তনে বাহ্য অবস্থার সহিত শরীর-যন্ত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে, সেইরূপ পরিবর্ত্তনই জীব-শরীরে সংঘটিত হয় এবং এইরূপে অল্পে অল্পে বংশপরম্পরা-ক্রমে সেই সকল জীবের আকার এতদূর পরিবর্ত্তিত হয় যে অবশেষে তাহাদিগকে আমরা নূতন জাতীয় জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করি।

এই জাতির উৎপত্তি লইয়া য়ুরোপীয় প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তবেত্তা পণ্ডিত-গণের মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া বাদানুবাদ চলিতেছে। এক দলের মত এই যে, জীব জন্তু উদ্ভিদ্‌দিগের মধ্যে যে-সকল বিশেষ-বিশেষ

জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের স্বতন্ত্র সৃষ্টি—পূর্ব্ব-সৃষ্ট জীব ও উদ্ভিদ্‌গণের সহিত তাহাদের কোন যোগ নাই। আর এক দলের মত এই যে, এক জাতি হইতেই আর এক জাতি অভিব্যক্তি-নিয়মে ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়াছে। কোন দুই জাতি সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও উহাদিগের উৎপত্তি-মূল একই। উহারা উভয়ই একটি শৃঙ্খলের অংশ মাত্র। আজ কাল ডারুইন এই শেষোক্ত মতটির অধিনেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক না হউন, কিন্তু তাঁহা-কর্ত্তৃকই যে এই মতটি (Origin of Species) "জাতির উৎপত্তি মূল" নামক গ্রন্থে পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত এবং দৃঢ় পত্তন-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ফরাসিস্ দেশীয় Lamarck, Geoffroy Saint Hilaire প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মতের প্রথম সূত্রপাত করেন। ইঁহারা সকলেই অভি-ব্যক্তি-বাদী। তবে, এই অভিব্যক্তি যে নিয়মে, যে প্রণালীতে সম্পাদিত হয়, সেই নিয়ম—সেই প্রণালী লইয়াই তাঁহাদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ডারুইনই "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন"-মতটির প্রথম প্রবর্ত্তক। এই মতটির আজ কাল এতদূর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, যাতে-তাতে এই নিয়মটি খাটানো হইয়া থাকে। এমন কি ঔষধের মধ্যে যেরূপ হলোয়ের বটিকা, তত্ত্বালোচনার পক্ষেও "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের" মতটি তদ্রূপ দাঁড়াইয়াছে। বস্তুতঃ "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" এই নামটি কি শুভক্ষণেই নির্ব্বাচিত হইয়াছিল!

প্রকৃতিদেবী নির্ব্বাচন করিতেছেন—এইরূপ কবিতার ভাষায় বৈজ্ঞা-নিক তত্ত্ব ব্যক্ত হওয়ায়, যেরূপ একদিকে লোকের চক্ষে ধূলি প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতদিগের একটি উপায় হইয়াছে, সেইরূপ আর এক দিকে আসল কথাটিও দৈব-যোগে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই মতের আশ্রয় লইয়া ডারুইনের কোন কোন শিষ্য

নাস্তিকতা সমর্থন করেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহার সহিত নাস্তিকতার কোন যোগ নাই। "প্রত্যেক জীবের পক্ষে যে-কোন পরিবর্ত্তন মঙ্গল-জনক তাহাই প্রকৃতিদেবী নির্ব্বাচন করেন এবং তাহাই বংশপরম্পরা-ক্রমে প্রবাহিত হয় এবং যাহা অনিষ্টকর তাহা স্থায়ী হইতে পারে না" এই যে তাঁহাদিগের মূল মত, ইহার মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় আস্তিকতাই গূঢ়রূপে বিদ্যমান। নির্ব্বাচন-শক্তি অন্ধ জড়ের হইতে পারে না। অতএব যে শক্তি-দ্বারা এইরূপ নির্ব্বাচন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা অবশ্য জ্ঞানস্বরূপ এবং যাহা উপকারী, যাহা মঙ্গলজনক, একমাত্র তাহাই নির্ব্বাচিত হওয়া কোন অমঙ্গল পুরুষের কার্য্য হইতে পারে না—অতএব যে শক্তি দ্বারা এইরূপ নির্ব্বাচিত হয় তিনি অবশ্য মঙ্গল-স্বরূপ। সৃষ্টি-কার্য্যের অপূর্ণতা দেখাইয়া যাঁহারা ঈশ্বরের অপূর্ণতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন তাঁহারা যদি Darwin-মতাবলম্বী হয়েন এবং ক্রমোন্নতি নিয়মে বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ও-কথা বলিবার আর অধিকার থাকে না। যেহেতু, যদি সমস্ত সৃষ্টি চিরকাল সমান ভাবেই থাকিত, যদি বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার উন্নতির শেষ সীমা হইত, তাহা হইলেই বলা যাইতে পারিত, ঈশ্বরের শক্তি সীমাবদ্ধ। কিন্তু যখন উন্নতি হইতে উন্নতিতে ক্রমাগতই সৃষ্টির গতি দেখা যাইতেছে, তখন কি করিয়া এ কথা বলা যাইতে পারে। তবে, সৃষ্টি একেবারেই পূর্ণ হইতে পারে না—যেহেতু দুইটি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণবস্তু একত্রে থাকা অসম্ভব। আবার, যিনি মঙ্গলস্বরূপ ও পূর্ণস্বরূপ, তাঁহার সৃষ্টি কখন চিরকাল সমানরূপে অপূর্ণ থাকিতে পারে না। ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ এবং মঙ্গলস্বরূপ বলিয়াই সৃষ্টির অপূর্ণতা ক্রমশঃ হ্রাস হইবারই কথা, এবং যে সৃষ্টি ক্রমাগত উন্নতি হইতে উন্নতিতে,—মঙ্গল হইতে মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার কারণ কোন পূর্ণস্বরূপ এবং মঙ্গলস্বরূপ পুরুষ হইবারই কথা। অতএব যে দিক দিয়াই দেখ, সেই একই সিদ্ধান্তে

উপনীত হইতে হয়। যদি আমরা প্রথমে ঈশ্বরের স্বরূপ মানিয়া লইয়া সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই—তাহা হইলেও দেখিতে পাই সৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি-ভিন্ন সৃষ্টির পূর্ণতা কখনই হইতে পারে না; আবার যদি সৃষ্টির প্রকৃতি এবং নিয়মের আলোচনা করিয়া ঈশ্বর-স্বরূপের সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলেও দেখিতে পাই—পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বর মূল-কারণ না হইলে সৃষ্টির ক্রমোন্নতি বা ক্রমাভিব্যক্তি সম্ভবে না। অতএব আরোহ ও অবরোহ উভয় প্রণালী-অনুসারেই সৃষ্টি এবং ঈশ্বরতত্ত্ব-সম্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।

সৌন্দর্য্যের কোন একটি অপরিবর্ত্তনীয় আদর্শ মানব-মনে নিহিত আছে কি না তদ্বিষয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। একটি বস্তুকে আমরা কেনই বা সুন্দর বলি, আর একটিকে কেনই বা কুৎসিত বলি তাহার কি কোন কারণ নাই? সৌন্দর্য্যের কি কোন নির্দ্দিষ্ট মূল নিয়ম নাই? কালিদাস বলিয়াছেন "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"—এ বচনটির সত্যতা বিষয়ে কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু আমাদিগের অন্যান্য তাবৎ মানসিক বৃত্তির ন্যায় এই সৌন্দর্য্য-রুচিও কি উন্নতি-সাপেক্ষ নহে? সমস্ত সৃষ্টি-ব্যাপারই যে, ক্রমোন্নতি ও ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মাধীন, এই সৌন্দর্য্য-রুচিই একমাত্র কি সেই নিয়মের ব্যভিচারস্থল হইবে? সমস্ত সৃষ্টিই কোন একটি পূর্ণ-আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইবার জন্য ক্রমাগত যুঝাযুঝি করিতেছে এবং যতখানি সেই আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইতে সমর্থ হইতেছে ততখানিই তাহার উন্নতি। এই যুঝাযুঝির বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিয়া সহসা মনে হইতে পারে যে উহা নিতান্ত উদ্দেশ্য-বিহীন ও সকল প্রকার নিয়মের বহির্ভূত। কিন্তু সকল যুদ্ধ-ব্যাপারই যে অন্তিম চিরস্থায়ী শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপনের সোপান মাত্র এবং সকল যুদ্ধের মধ্যেই যে শান্তির বীজ নিহিত আছে তাহা আমরা সহসা উপলব্ধি করিতে পারি না। মানব-জাতির সৌন্দর্য্য-রুচি-সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। বিচিত্র মনুষ্য-জাতির মধ্যে রুচিও যে বিচিত্র, এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না, ইহার নিদর্শন সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই রুচি-গত বিচিত্রতার অন্তর্নিহিত কোন প্রকার ধ্রুবত্বের নিয়ম লক্ষিত হয় কি না তাহাই বিবেচ্য।

সৌন্দর্য্য-লালসা সমস্ত মানবজাতির মধ্যেই দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের আদর্শ সকল দেশে সমান দেখা যায় না। অতীব অসভ্য

বন্য জাতিদিগকেও শারীরিক শোভা-বর্দ্ধনের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে দেখা যায়, বেশভূষা অলঙ্কারের প্রতি তাহাদের অত্যন্ত অনুরাগ। কোন একজন ইংরাজ পণ্ডিত এতদূর পর্য্যন্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শোভাবর্দ্ধনের জন্যই কাপড়-পরার রীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, শরীরের তাপ রক্ষার জন্য নহে। Proffessor Waitz বলেন "একজন মানুষ যতই দরিদ্র ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হোক না কেন, আপনার শোভাবর্দ্ধনে তাহার সুখবোধ হয়।" 'রেন-ডিয়ার' নামক হরিণের সমকালবর্ত্তী য়ুরোপীয় অসভ্য লোকেরা কোন উজ্জ্বল বস্তু পাইবামাত্রই তাহা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের গহ্বর-মধ্যে আনিত। বর্ত্তমান কালের বন্য-জাতীয়েরাও সর্ব্বত্রই পালক, কণ্ঠহার, বাজুবন্দ, কাণবালা প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা আপনার শরীর বিভূষিত এবং বিচিত্র রঙ্গে রঞ্জিত করে। Humboldt বলেন "পরিচ্ছদধারী জাতিদিগের ন্যায় যদি রঞ্জিত জাতীয়গণের প্রতি সমধিক মনোযোগ দেওয়া হইত, তাহা হইলে দেখা যাইত—কি রঙ্গের বিচিত্রতা, কি কাপড়ের ঢং—উভয়ই এক ফলবতী কল্পনা ও ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল খেয়াল হইতে প্রসূত।"

আফ্রিকার কোন অংশের অধিবাসিগণ চখের পাতা কালো রং দিয়া এবং কোন অংশের অধিবাসিগণ পীত কিম্বা বেগুনি রং দিয়া নখ রঞ্জিত করে। অনেক স্থানে কেশও নানা প্রকার রঙে রঞ্জিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন-দেশে দাঁতে কালো, লাল, নীল প্রভৃতি নানা প্রকার রং দিবার রীতি আছে, এবং মালাই-দ্বীপপুঞ্জ-নিবাসিগণ কুকুরের ন্যায় দাঁত সম্পূর্ণ সাদা হওয়া অত্যন্ত লজ্জার বিষয় মনে করে। অনেক দেশের অসভ্য জাতীয়েরা যত্নপূর্ব্বক কেশ বিন্যাস করে, আবার কোন কোন দেশের লোক মস্তক একেবারে মুণ্ডন করিয়া ফেলে। এমন কি, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা দেশের লোকেরা ভ্রূ পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলে। উপরিতন নীল-নদী-কূলস্থ প্রদেশ-নিবাসী মনুষ্যগণ সম্মুখের চারিটা

দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে। তাহারা বলে যে, সাম্‌নের দাঁত রাখিয়া তাহারা পশু-তুল্য হইতে ইচ্ছা করে না। আরও দক্ষিণে, লিভিংষ্টোন সাহেব বলেন, বোটোকা নামে এক জাতি আছে, তাহারা সাম্‌নের উপরকার পাটির দুইটা দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে; তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগের নিম্ন চোয়াল বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত কদাকার দেখায়, কিন্তু তাহারা মনে করে যে ঐ স্থানের দাঁত থাকিলেই বরং আরও বিশ্রী দেখিতে হয়। তাহারা কতকগুলি য়ুরোপীয়কে দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল, "দেখ দেখ—বড় বড় দাঁতগুলা দেখ।" আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশের এবং মালাইদ্বীপ-পুঞ্জের লোকেরা সাম্‌নের দাঁত ঘসিয়া করাতের মত ছুঁচাল করে, অথবা ছিদ্রিত করিয়া তাহার মধ্যে গোঁজ পুরিয়া রাখে। উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন জাতি, উপরের কিম্বা নিম্নের ওষ্ঠ ছিদ্রিত করে। বোটোকুডো জাতীয়েরা নিম্ন-ওষ্ঠে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে ৪ ইঞ্চি পরিধি-পরিমাণ কাঠের গোঁজ পুরিয়া রাখে। মধ্য-আফ্রিকার স্ত্রীলোকেরা নিম্ন-ওষ্ঠ ফুঁড়িয়া তাহাতে একটি স্ফটিকখণ্ড পুরিয়া রাখে। লাটুকা প্রদেশের সর্দ্দারের স্ত্রী বেকর-সাহেবকে বলিয়াছিল যে,—"যদি তোমার স্ত্রী সাম্‌নেকার নিম্ন পাটির দাঁতগুলি তুলিয়া তাঁহার ওষ্ঠে সূচ্যগ্রবৎ মসৃণী-কৃত স্ফটিকখণ্ড ধারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অনেকটা শ্রী ফিরিয়া যায়।" আরও দক্ষিণে আল্‌কোলো জাতীয়েরা উপরকার ঠোঁট ফুঁড়িয়া তাহাতে একটি বৃহৎ ধাতুখণ্ড এবং বংশের বলয় পরিধান করে। ইহাকে তাহারা 'পেলে' বলে। বেকর সাহেব বলেন, ইহার দরুণ স্ত্রীলোকের ওষ্ঠ, নাসিকার অগ্রভাগ হইতে দু-ইঞ্চি পরিমাণ ঝুঁকিয়া পড়ে; যখন কোন রমণী মৃদু মধুর হাস্য করে, তখন তাহার মাংসপেশী কুঞ্চিত হওয়ায় ওষ্ঠটি চক্ষু ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়ে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের স্ত্রীলোকে কেন এই সকল বস্তু পরিধান করে?" তাহাদের প্রধান সর্দ্দার চিনস্মর্দি এই প্রশ্নটি নিতান্ত নির্ব্বোধের প্রশ্ন

মনে করিয়া বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল—"কেন, সৌন্দর্য্যের জন্য ;—স্ত্রীলোকদের ঐ যা একমাত্র সৌন্দর্য্য-সাধক বস্তু আছে। পুরুষদের দাড়ি আছে—স্ত্রীলোকদের তো কিছুই নাই। এই 'পেলে' না থাকিলে স্ত্রীলোকদের কি অদ্ভুত দেখ্‌তেই হয় ; দাড়ি নেই অথচ পুরুষের মত মুখ—সে স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকই নয়।" Hearne যিনি আমেরিক ইণ্ডিয়ানদিগের সহিত অনেকবার বাস করিয়াছিলেন তিনি বলেন, "একজন উত্তর প্রদেশস্থ ইণ্ডিয়ানকে জিজ্ঞাসা কর, সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে ? সে উত্তর করিবে—চওড়া-পারা সমতল মুখ, খুদে-খুদে চোখ, উঁচু উঁচু চোয়ালের হাড়, প্রত্যেক গালে তিন চার্‌টে করে' চওড়া-চওড়া কালো রেখা, ছোট কপাল, বৃহৎ চওড়া চিবুক, গ্যাবদা-গ্যাবদা "হুকের" মত নাক, পিঙ্গল-বর্ণের চাম্‌ড়া, এবং আ-কটি লম্বিত স্তন—ইহাকেই বলে সৌন্দর্য্য।" Palles যিনি চীন রাজ্যের উত্তরাংশে গমন করিয়াছিলেন তিনি বলেন "যাহাদের চওড়া মুখ, উচ্চ চোয়াল—খুব চওড়া নাক এবং প্রকাণ্ড কাণ—সেই সকল স্ত্রীলোককেই লোকে পছন্দ করে ; Bogt বলেন যে, চীন ও জাপানবাসীগণের এমনই তো চোখ উপর-দিকে টানা, তারা যখন আবার ছবি আঁকে তখন ছবিতে সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য চোখ আরও উপর-টানা করিয়া আঁকে। পাদ্রি Huc সাহেব পুনঃ পুনঃ অনেক স্থলে বলিয়াছেন যে, আভ্যন্তর প্রদেশের চীনেরা য়ুরোপীয়দিগের সাদা চর্ম্ম এবং উন্নত নাসা থাকা-প্রযুক্ত তাহাদিগকে অতি কদাকার বলিয়া মনে করে। সিংহলবাসীগণের নাক এমনিইতো বসা-বসা, কিন্তু সপ্তম শতাব্দির চীনাগণের, মোগল জাতি-সুলভ সমতল মুখশ্রী দেখাই অভ্যাস থাকায় তাহারা সিংহলবাসীগণের অত্যুন্নত নাসিকা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। Thsang বর্ণনা করেন যে তাহারা "মনুষ্যের ন্যায় শরীর-বিশিষ্ট কিন্তু তাহাতে পাখীর ঠোঁট সংযুক্ত।" প্রসিদ্ধ পর্য্যটক মঙ্গোপার্কের সাদা রং ও উন্নত

নাসিকা দেখিয়া নিগ্রোরা তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিল। আফ্রিকাবাসী মুর-জাতীয়েরাও তাঁহার সাদা রং দেখিয়া "ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিয়াছিল।" পূর্ব্ব-উপকূলে, বর্টন সাহেবকে দেখিয়া নিগ্রো বালকেরা বলিয়া উঠিয়াছিল, "দেখ দেখ একটা সাদা মানুষ—ওকে একটা সাদা বানরের মত ঠিক দেখাচ্ছে না?" রীড্ সাহেব বলেন, নিগ্রোরা কালো রং খুব পছন্দ করে; আবার কাফির জাতীয়েরা কাফ্রি-দিগের ন্যায় অত কালো নয়—কালো ও লাল রঙে মিশ্রিত, তাহারা এই জন্য শ্যামল বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা পছন্দ করে। তাহাদের মধ্যে একজনের রং দুর্ভাগ্যক্রমে ফর্সা হওয়ায় কোন স্ত্রীলোক তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হয় নাই। কোচিন চীনের একজন মনুষ্য একজন ইংরাজ দূতের স্ত্রীর রূপ-সম্বন্ধে এইরূপ ঘৃণাব্যঞ্জক মত প্রকাশ করিয়াছিল—"ওর দাঁত কুকুরের মত সাদা, আর ওর রং আলু ফুলের মত গোলাপি।" ডারুয়িন বলেন—এই একটি বড় আশ্চর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, যে দেশের লোকেরা স্বভাবতঃ শ্মশ্রু-বিহীন তাহারাই মুখ ও শরীরের লোম রাখিতে ভালবাসে না—যদি কোথাও দু-এক গাছা লোম থাকে তো তাহারা যত্নপূর্ব্বক উৎ-পাটিত করিয়া ফেলে। কালমক্ জাতীয়েরা শ্মশ্রুবিহীন, তাহারা শরীরের লোম উন্মূলিত করে। মালাই ও শ্যাম-জাতীয় কিয়দংশ লোকের মধ্যেও এই রীতি প্রচলিত আছে। নব-জিলাণ্ড-নিবাসীরা শ্মশ্রুহীন, তাহারাও মুখের লোম উৎপাটিত করে; তাহাদিগের মধ্যে এই একটি কথা প্রচলিত আছে যে, "লোমশ পুরুষের ভাগ্যে কোন স্ত্রী নাই।"

পক্ষান্তরে শ্মশ্রু-বিশিষ্ট জাতীয়গণ শ্মশ্রুর প্রতি যত্ন ও আদর প্রদর্শন করে। অ্যাংলো-স্যাকসনদিগের আইন-অনুসারে মনুষ্য-শরীরের প্রত্যেক অংশের এক একটা মূল্য নির্দ্দিষ্ট ছিল—"শ্মশ্রুর ক্ষতিপূরণ হিসাবে ১০ টাকা, এবং জানু-অস্থি-ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৬ টাকা মাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল"। প্রাচ্য দেশ-সমূহে শ্মশ্রু স্পর্শ করিয়া শপথ করিবার রীতি দৃষ্ট

হয়। প্রশান্ত সমুদ্রের ফিজি জাতীয়দিগের শ্মশ্রু প্রচুর ও ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া, এবং উহাই তাহাদের একটা অহঙ্কারের বিষয়। আবার এ দিকে তাহাদের পার্শ্বস্থ দ্বীপপুঞ্জনিবাসী টাঙ্গা ও স্যামোয়ো-জাতীয়েরা স্বভাবতঃ শ্মশ্রুহীন, সেই জন্য শ্মশ্রুর প্রতি তাহাদিগের অত্যন্ত বিদ্বেষ।

ডারুয়িন বলেন "এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে Humboldt যে নিয়ম অনেক দিন হইল ব্যক্ত করিয়াছিলেন সেই নিয়মই অনেকটা যথার্থ বলিয়া উপলব্ধি হয়।" তিনি বলিয়াছিলেন—"প্রকৃতি মানুষকে যে সকল বিশেষ লক্ষণ প্রদান করেন, মানুষ সেই সকল বিষয়কেই প্রশংসা ও আদর করে এবং অনেক সময় তাহারই বাড়াবাড়ি করিতে চেষ্টা করে।" শ্মশ্রুহীন জাতীয়দিগের মধ্যে শ্মশ্রুর চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলোপ ও শরীরের সমস্ত লোম উৎপাটন করিবার রীতি এই নিয়মের একটি দৃষ্টান্তস্থল। ডারুয়িন আরও বলেন—"সাধারণতঃ এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, আমাদিগের বোধ-শক্তি বাহ্য-ব্যাপারের সহিত এ প্রকার উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত যে, কতকগুলি বিশেষ আকার, উজ্জ্বল রং, সমবিভক্ত ছন্দোবদ্ধ শব্দ প্রভৃতিতে আমাদিগের সুখবোধ হয়, এবং তাহাদিগকেই আমরা সুন্দর বলিয়া থাকি। আগুনে হাত দিলে শরীরে কেন যন্ত্রণা উপস্থিত হয় কিম্বা সুখস্পর্শ মলয়-সমীরণে কেনই বা আমাদিগের সুখবোধ হয়—ইহার যেরূপ আমরা কারণ বলিতে পারি না, কোন কোন আকার কেনই বা আমাদিগের ভাল লাগে অর্থাৎ সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, এবং কোন কোন আকার কেনই বা আমাদের খারাপ লাগে অর্থাৎ কুৎসিত বলিয়া বোধ হয়, তাহারও আমরা কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারি না।" অতএব, যদি প্রত্যেকের ভাল-লাগার উপরেই সৌন্দর্য্য নির্ভর করে, তাহা হইলে যার যাতে ভাল লাগে, তার নিকটে তাহাই সুন্দর। তবে কি, সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের মূলে কোন প্রকার বিশ্ব-জনীন মূলতত্ত্ব নাই ?

কিন্তু এই একটি বিষয় আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই যে, পৃথিবীতে সাধারণ সভ্যতার যতই উন্নতি হইতেছে, সেই সঙ্গে সৌন্দর্য্যের আদর্শও ক্রমশঃ একতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই জন্যই আমাদের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন হইলেও সেক্‌সপিয়রের সৌন্দর্য্য আমরা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, আবার য়ুরোপীয়গণও শকুন্তলার সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে অনুভব করিতে সমর্থ। আমরা রোমের Saint Peter কিম্বা রুসিয়ার Kremlin দেখিয়া যেরূপ আশ্চর্য্য হই, আমাদের দেশের তাজমহল দেখিয়া য়ুরোপীয়েরাও তেমনি আবার বিমোহিত হয়েন। যদি সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের মূলে কতকগুলি সাধারণ মূলতত্ত্ব না থাকিবে তবে এ প্রকার ঘটনা কেন হয়?

আমরা সুন্দর পদার্থ সকলকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহার মূলে দুইটি মূল-উপকরণ দেখিতে পাই। সমতা ও বিচিত্রতা। এই সমতা ও বিচিত্রতার সামঞ্জস্যের নাম সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য আপেক্ষিক—তুলনা-সাপেক্ষ। যদি সমস্তই একাকার হইত, কোন প্রকার ভিন্নতা না থাকিত, তাহা হইলে সৌন্দর্য্য আমরা আদৌ অনুভব করিতে পারিতাম না। কিন্তু এই বিভিন্নতা—এই বিচিত্রতার মধ্যে যতক্ষণ না আমরা সমতা উপলব্ধি করিতে পারি ততক্ষণ আমাদিগের সৌন্দর্য্য-বোধের উদ্রেক হয় না।

কোন পদার্থের সহিত কোন পদার্থের মিল দেখিতে যেমন আমরা ভালবাসি, সেইরূপ ভিন্নতা দেখিতেও ভালবাসি। বস্তুতঃ, এক বস্তুর সহিত আর এক বস্তুর মিল আছে, এই কথা বলিলে ইহাই বুঝায় যে, কোন-কোন সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে মিল আছে এবং কোন-কোন সম্বন্ধে অমিলও আছে। কেন না, যদি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অর্থাৎ সর্ব্বাংশে ও সর্ব্ব-সম্বন্ধে মিল থাকে, তাহা হইলে আর উভয় শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে না, তাহা হইলে সে একই বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। সৌন্দর্য্য কি? না—সাম্য ও বৈষম্যের সামঞ্জস্য। উহাতে সাম্যও থাকা চাই

এবং বৈষম্যও থাকা চাই এবং এই সাম্য বৈষম্যের মধ্যে আবার সামঞ্জস্য থাকা চাই। এক্ষণে মনে কর, একটি সমচতুষ্কোণ আর একটি সম্পূর্ণ অসমরেখা-বিশিষ্ট আকার তোমার সম্মুখে আছে। এই উভয়ের মধ্যে কোন্ আকারটি তোমার সুন্দর বলিয়া বোধ হয়? সম-চতুষ্কোণ আকারটিই যে অপেক্ষাকৃত সুন্দর তাহা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবে। কেন সুন্দর বোধ হয়? যেহেতু উহাদের মধ্যে পরস্পর সৌসাদৃশ্য আছে;—সাদৃশ্য আছে বলিয়াই বুঝায় যে তাহাদিগের মধ্যে ভিন্নতাও আছে। কোন পদার্থের বা কোন আকারের সম-বিষম অংশগুলি যখন এ প্রকার কৌশলে যোগাযোগ করা হয় যে তাহাদিগের পরস্পর-সামঞ্জস্য সহজেই আমাদিগের চক্ষে প্রতিভাত হয়—তখনই আমরা তাহাকে সুন্দর বলিয়া উপলব্ধি করি। অতএব দেখা যাইতেছে, কেবলমাত্র ভিন্নতা কিম্বা বিচিত্রতাতে আমাদিগের সৌন্দর্য্য-বোধ তৃপ্ত হয় না; বিচিত্রতার মধ্যেও যতক্ষণ না আমরা সমতা দেখিতে পাই, ততক্ষণ আমাদিগের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের উদ্রেক হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে সমতাই সৌন্দর্য্যের মুখ্য উপকরণ এবং বিচিত্রতা গৌণ উপকরণ। কোন নিতান্ত বাঁকা-চোরা রেখা অপেক্ষা একটি সরল রেখা যে সুন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঁকা-চোরা রেখার মধ্যে বিচিত্রতা অনেক আছে; কিন্তু সে বিচিত্রতায় আমাদিগের সৌন্দর্য্য-বোধের উদ্রেক হয় না—কিন্তু সেই একটি বাঁকা-চোরা রেখার সঙ্গে আর একটি ঠিক তদ্রূপ বাঁকা-চোরা রেখা যদি এরূপ কৌশলে সংযোজিত করা যায় যে তাহাদিগের বাঁকা-চোরা-রূপ বিচিত্রতার মধ্যে আবার একটি সমতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, তখন তাহাই আবার সুন্দর হইয়া দাঁড়ায়। অতএব সমতাই সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের অন্ন—এবং বিচিত্রতাই তাহার ব্যঞ্জন-স্বরূপ। সৌন্দর্য্যের পক্ষে উভয়ই প্রয়োজনীয়।

ক্রমাগত একঘেয়ে সাম্যরস আস্বাদন করিয়া-করিয়া আমাদের সৌন্দর্য্য রুচির পাছে অরুচি উপস্থিত হয়, এই জন্যই বিচিত্র সাম্যের প্রয়োজন। ইহার সঙ্গে উহার মিল—এইরূপ মিলের বিচিত্রতা আমরা ভালবাসি।

সৌন্দর্য্য দুই প্রকার;—সাদাসিধা সৌন্দর্য্য ও বিচিত্র সৌন্দর্য্য। সমচতুষ্কোণ, সমত্রিকোণ প্রভৃতি আকার সাদাসিধা সৌন্দর্য্যের দৃষ্টান্ত—সাদাসিধা আকারের মধ্যে চক্র-আকারই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। তাহার কারণ এই যে, চক্র-আকারে—সাম্য ও বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য অতি সুন্দররূপে রক্ষিত হইয়াছে। চক্রাকারের প্রত্যেক অংশ পৃথক্ করিয়া ধরিতে গেলে প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক অংশ হইতে ভিন্ন—অথচ সেই সকল অংশগুলি এরূপ অল্পে অল্পে ক্রমশঃ ভিন্ন হইয়া বেমালুম পরস্পরের সহিত মিলিয়া গিয়াছে যে তাহা হইতে একটি সমগ্র সামঞ্জস্যের ভাব স্ফূর্ত্তি পাইয়া আমাদিগের সৌন্দর্য্য-বৃত্তিকে তৃপ্ত করে।

একটি সমচতুষ্কোণ আকার অপেক্ষাও চক্রাকার এই জন্য অধিক সুন্দর। এই জন্য প্রকৃতিতে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর তাহা সমস্তই প্রায় গোলাকারের দিকে উন্মুখ। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি সুন্দর পদার্থ-সকল এইজন্য ন্যূনাধিক গোলাকার।

ফল অপেক্ষা প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌন্দর্য্য অধিক জম্‌কাল কেন? না—যেহেতু ফল অপেক্ষা পুষ্পের বৈচিত্র্য অধিক।

যে সকল সুন্দর পদার্থ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত তাহাদের সৌন্দর্য্যগত আর একটি উপকরণ—রং। বিচিত্রতা-সম্পাদনই রঙের প্রধান উদ্দেশ্য এবং রঙের সাম্য-বৈষম্যের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানেই রঙের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়।

দর্শনেন্দ্রিয়-গত সৌন্দর্য্যের আর একটি উপকরণ উজ্জ্বলতা। কোন দ্রব্যে উজ্জ্বলতা-ভিন্ন আর কোন সৌন্দর্য্যের উপকরণ না থাকিলেও সেই উজ্জ্বলতার জন্যই আমরা তাহাকে সুন্দর বলি। তবে, আকার-গত

সাম্য-বৈষম্যের সামঞ্জস্যের সঙ্গে যদি আবার কোন পদার্থের উজ্জ্বলতা-গুণ থাকে—তাহা হইলে তাহা যে কেবলমাত্র-উজ্জ্বলতা-বিশিষ্ট পদার্থ-অপেক্ষা সুন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই।

সচরাচর, ফল অপেক্ষা ফুলে রং ফলানো অধিক, আকার-গত বৈচিত্র্যও অধিক; এই জন্য ফল-অপেক্ষা ফুলের সৌন্দর্য্য অধিক মনো-মুগ্ধকর। পূর্ণচন্দ্রকে কেন আমরা এত সুন্দর বলি? গোলাকার ও উজ্জ্বলতা—এই যে দুইটি সৌন্দর্য্যের উপকরণ—ইহা পূর্ণচন্দ্রে আছে বলিয়াই এইরূপ বলি। এ-ছাড়া পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য্যের আর কি কোন উপকরণ নাই? আর একটি আনুষঙ্গিক উপকরণ আছে, তাহা বৈপরীত্য। অনন্ত নীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয় বলিয়াই উহার সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া উঠে।

নীল আকাশে পূর্ণচন্দ্র যখন উদিত হয়, কিম্বা শ্যামল সরোবর-সলিলে যখন পদ্ম বিকশিত হয়, উহাদিগের নিজের সৌন্দর্য্য ছাড়া রঙের বৈপরীত্যে আর একটি অভিনব আনুষঙ্গিক সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। উজ্জ্বলতা সৌন্দর্য্যের একটি সামান্য উপকরণ নহে। অন্যান্য গুণের অভাব অনেক সময়ে উজ্জ্বলতায় ঢাকিয়া যায়। বিকশিত পদ্ম ও সমুদিত পূর্ণচন্দ্রমা এই উভয়ের মধ্যে কে অধিক সুন্দর, নির্ণয় করা সুকঠিন। চন্দ্র অপেক্ষা পদ্মের বৈচিত্র্য অনেক গুণে অধিক; যদি চন্দ্রের উজ্জ্বলতা-গুণ না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারিত চন্দ্র অপেক্ষা পদ্ম সুন্দর। কিন্তু এক উজ্জ্বলতার গুরুত্বে পদ্ম-অপেক্ষা চন্দ্রের সৌন্দর্য্য, তুলাদণ্ডে অধিক হইয়া পড়িয়াছে।

যাহা এতক্ষণ বলিলাম তৎসমস্তই দর্শনেন্দ্রিয়-বিষয়ীভূত সৌন্দর্য্যের দৃষ্টান্ত। আমাদিগের যত ইন্দ্রিয় আছে, তাহার বিষয়ীভূত ততপ্রকার সৌন্দর্য্যও আছে। তন্মধ্যে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত সৌন্দর্য্যই শ্রেষ্ঠ। সঙ্গীতই শেষোক্ত সৌন্দর্য্যের বিষয়।

দর্শনের বিষয়ীভূত সৌন্দর্য্যের মূল-উপকরণ যেরূপ আকার ও রং, শ্রবণের বিষয়ীভূত সৌন্দর্য্যের মূল-উপকরণ সেইরূপ সুর ও তাল। এই সুর-তাল লইয়াই সঙ্গীত। প্রথমতঃ, সঙ্গীতে ধ্বনিরই নানা প্রকার মনোরম বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়—মধুর ধ্বনি, গম্ভীর ধ্বনি, ক্রম-বর্দ্ধমান ও ক্রম-হ্রাসমান এইরূপ নানা প্রকার ধ্বনি, তৎপরে সাদাসিধা গানের সুর ও পরিশেষে নির্দ্দিষ্ট ভাগ-পরিমাণের নিয়মানুসারে বিচিত্র সুরের সামঞ্জস্য।

কোন সমান-ওজনের ধ্বনি অর্থাৎ যে ধ্বনিতে প্রতি সেকেণ্ডে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্পন্দন হয় তাহাকে সাঙ্গীতিক ধ্বনি অর্থাৎ স্বর বলে। এই স্পন্দনের সমতা হইতে আমাদিগের মনে এক প্রকার সুখ উৎপন্ন হয়। শব্দের অনিয়মিত স্পন্দন-অপেক্ষা নিয়মিত স্পন্দন আমাদিগের নিকট অধিক সুখপ্রদ। স্বর-সামঞ্জস্য (Harmony) কি ? না—কোন সরল ভাগ-পরিমাণের নিয়মানুসারে দুই কিম্বা অধিক সম্বাদী স্বরের মধ্যে সাম্য ভাব। তাহার দৃষ্টান্ত, খরজ, গান্ধার, কোমল গান্ধার, এবং পঞ্চম, এই সম্বাদী স্বরগুলি বিভিন্ন হইলেও—ইহাদের মধ্যে পরস্পর একটি মিল আছে, এবং এই প্রত্যেক স্বরের স্পন্দনের সংখ্যা সমান না হইলেও ইহাদের মধ্যে একটি ভাগের নির্দ্দিষ্ট সরল পরিমাণ আছে। যে সকল সুরে এই ভাগের নিয়মটি যত সরল, সেই সকল সুরের মধ্যে সেই পরিমাণে মিল দৃষ্ট হয় এবং আমাদিগের নিকট উহা ততই শ্রুতিসুখকর বলিয়া অনুভূত হয়। * কোন গানে যত

* "If we sound together two notes whose vibration-ratio is exspressed by two terms of the series of natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, &c., we shall have a musical concord more or less perfect or pleasing according to the simplicity of the numerical ratio and more or less displeasing as the ratio is more or less complex—the whole series of such notes is known in music as harmonic sound" by John Cook, M. A.—Sound.

উচ্চ নীচ নানাবিধ স্বরের সামঞ্জস্য থাকে, সেই গান সেই পরিমাণে স্বর-বিষয়ে সুন্দর, এবং কোন গানে যে পরিমাণে সম বিষম নানা তালের সামঞ্জস্য থাকে, সেই গান সেই পরিমাণে তাল-বিষয়ে সুন্দর। সরল রেখার দ্বারা যে সকল আকার নির্ম্মিত হয়, সেই সকল আকারের প্রতিরূপ—য়ুরোপীয় সঙ্গীত; এবং ক্রমবক্র রেখার দ্বারা যে সকল আকার গঠিত হয় তাহার প্রতিরূপ আমাদিগের দেশীয় সঙ্গীত। ক্রমবক্র-রেখা-গঠিত আকারে যেরূপ খোঁচা-খুঁচি থাকে না, পরন্তু এক অংশের সহিত আর এক অংশ আস্তে আস্তে বেমালুম মিশিয়া যায়, আমাদিগের সঙ্গীত অনেকটা তাহারই প্রতিরূপ। ইংরাজদের সঙ্গীত আমাদিগের অপেক্ষা বোধ হয় অধিক খোচা-খুঁচি-বিশিষ্ট—অর্থাৎ একটা সুর হইতে আর একটা সুর ক্রমশঃ না গড়াইয়া একটা সুর হইতে আর একটা সুর অকস্মাৎ উত্থিত হয়। এই জন্য ইংরাজি খোঁচা-খুঁচি সুরে আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া তোলে এবং আমাদের গড়ানে-সুরে ইংরাজদিগের নিদ্রা আকর্ষণ করে। ইংরাজদিগের অপেক্ষা আমাদিগের সঙ্গীতের সাদাসিধা সুরগুলি যে অধিক সুন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজদিগের মূল-সুর হইতে যদি তাহার আনুষঙ্গিক বিচিত্র সুর-সম্মিলন Harmony অপসারিত করা যায়, তাহা হইলে উহা অত্যন্ত সাদাসিধা হইয়া পড়ে; অনেক সময়ে তাহাদিগের মূল-সুরের দারিদ্র্য আনুষঙ্গিক সুর-বৈচিত্র্যে ঢাকিয়া যায়। Captain Willard সাহেব তাঁহার প্রণীত "ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত" নামক গ্রন্থে বলেন:—

"The modern melody has not the merit of the ancient and that harmony is used with the view of compensating for its poorness, and diverting the attention of the audience from perceiving the barrenness of genius"

যদিও আমাদের মূল-সুরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এত অধিক যে

তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য Harmony-রূপ অলঙ্কারের তত প্রয়োজন হয় না, তথাপি আর একটু আনুষঙ্গিক স্বর-বিচিত্রতা প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে বোধ হয় আমাদিগের সঙ্গীতের অপেক্ষাকৃত উন্নতি হয়; কিন্তু মূল-রাগ-রাগিণীর ভাব রক্ষা করিয়া Harmony প্রয়োগ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বিচিত্রতার খাতিরে আমরা রাগ-রাগিণী কিম্বা ভাবের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। Harmonyর দরুণ অনেক সময় যে গানের ভাব নষ্ট হয় তাহা কোন কোন বিচক্ষণ ইংরাজ গ্রন্থকারও স্বীকার করেন। Dr. Burney বলেন :—

"It may indeed happen from the number of performers, and the complication of the harmony, that meaning and sentiment may be lost in the multiplicity of sounds; but this, though it may be harmony, loses the name of music."

সঙ্গীতের আবার দুইটি অংশ আছে, একটি ঐন্দ্রিয়িক, আর একটি মানসিক। গানের যেরূপ সুর ও তাল, সেইরূপ ভাবও একটি প্রধান উপকরণ। কিন্তু এই ভাবকে যদি সুর-তাল হইতে পৃথক্ করিয়া দেখি, তাহা হইলে তাহা কবিতার অধিকারের মধ্যে আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই ভাবকে যখন সুর-তালের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখি, তখনই সঙ্গীত-শাস্ত্রের অধিকারের মধ্যে আসিয়া পড়ে।

সুরের ভাব-সৌন্দর্য্য কাহাকে বলি, না—যখন কোন মানসিক ভাবের সহিত সুর-তালের ঐক্য কিম্বা সামঞ্জস্য হয়। আমাদিগের ভৈরব ও পূরবী প্রভৃতি রাগ ভাব-সৌন্দর্য্যের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তস্থল। এই দুই রাগ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার ভাব মনোমধ্যে যেরূপ উদয় করিয়া দিতে পারে, এরূপ আর কোন রাগ পারে না। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার যেরূপ ঢুলু ঢুলু ঘুমন্ত ভাব—কড়ি কোমল প্রভৃতি অর্দ্ধ সুর প্রয়োগ

করিয়া, সুরের গড়ান-ভাব বিধান করিয়া, প্রাতঃ সন্ধ্যার ভাবটিকে কেমন সুন্দররূপে ফুটাইয়া তোলা হয়। এইরূপ বিশেষ বিশেষ সুরে আমাদের বিশেষ বিশেষ হৃদয়ের ভাব যে উদ্দীপিত হয়, তাহা অনুষঙ্গ-নিয়মেই হইয়া থাকে।

কিন্তু এই বিষয়ে Alison-সাহেবের মতের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ ঐক্য হয় না। তিনি বলেন, ধ্বনি-বিশেষের কোন নিজস্ব মনোহারিতা নাই; ধ্বনির সহিত হৃদয়-ভাবের আনুষঙ্গিকতা না ঘটিলে কেবল মাত্র ধ্বনির সৌন্দর্য্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। তিনি বলেন— উচ্চ নীচ, গম্ভীর তীক্ষ্ণ, দীর্ঘ হ্রস্ব প্রভৃতি বিভিন্ন স্বরের সহিত বিশেষ বিশেষ হৃদয়-ভাবের যোগ আছে, এবং ঐ সকল সুর বিশেষ বিশেষ হৃদয়ভাবকে উদ্রেক করে বলিয়াই ঐ সকল সুরের সৌন্দর্য্য আমরা উপলব্ধি করি। আমরা স্বীকার করি, বিশেষ-বিশেষ সুর বিশেষ-বিশেষ হৃদয়-ভাবের উদ্রেক করিয়া থাকে, কিন্তু ভাবকে ছাড়িয়া শুদ্ধ কি আমরা ধ্বনির সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারি না? কোন কর্কশ ধ্বনি শুনিলে স্বভাবতঃই যেরূপ আমাদের বিরক্তি বোধ হয়, কোন মধুর ধ্বনি শুনিলে, আমরা শুধু সেই ধ্বনি-গত মাধুর্য্যেই বিমোহিত হই; তবে, যতক্ষণ না ঐ ধ্বনি কোন আনুষঙ্গিক মধুর হৃদয়-ভাবকে উদ্রেক করিতে পারে, ততক্ষণ অবশ্য আমাদিগের হৃদয়ে সঙ্গীতের পূর্ণ-সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয় না।

এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে পৃথক্ পৃথক্ সৌন্দর্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। আর একটি উচ্চতর সৌন্দর্য্য-রাজ্য আছে—তাহা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য। সামঞ্জস্য ও বিচিত্রতা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যেরও মূল-উপকরণ। দয়া প্রেম ভক্তি সৌহার্দ্দ বাৎসল্য সরলতা—এ সমস্ত এক একটি বিশেষ বিশেষ আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য। পিতা ভিন্ন ব্যক্তি, পুত্র ভিন্ন ব্যক্তি, কিন্তু স্নেহ-ভক্তির বন্ধনে উভয়ের মধ্যে যে যোগ নিবদ্ধ হয় তাহা হইতেই একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। এইরূপ পিতা পুত্র, ভ্রাতা

ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি বিচিত্র হইয়াও তাহাদিগের মধ্যে কেমন একটি সুন্দর যোগ আছে। যে পরিবারের মধ্যে, এই বিচিত্রতার মধ্য হইতে সাম্য-ভাব স্ফূর্ত্তি পায়, সেই পরিবারের মধ্যেই একটি অনুপম গার্হস্থ্য-সৌন্দর্য্যও বিকসিত হইয়া উঠে। যার প্রতি যেরূপ সম্বন্ধ তাহার প্রতি সেইরূপ উপযুক্ত ব্যবহার করিলে যে সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, তাহাকে আর এক কথায় নৈতিক সৌন্দর্য্য বলা যাইতে পারে। প্রজার সহিত রাজার যে সম্বন্ধ তাহাকে রাজনৈতিক সম্বন্ধ বলা যায়—এই সম্বন্ধের সামঞ্জস্য হইতে যে সৌন্দর্য্য নিঃসৃত হয় তাহাকে রাজনৈতিক সৌন্দর্য্য বলা যাইতেও পারে।

প্রত্যেক প্রকার সৌন্দর্য্যের বিষয়ীভূত এক একটি শিল্প আছে। আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যের শিল্প কি?—না কবিতা; ইহাই অনুষঙ্গ-নিয়মের অব্যবহিত অধীন। বাহ্য সৌন্দর্য্যের সহিত যখন হৃদয়-সৌন্দর্য্যের মিল হয়, তখনই তাহা কবিতার বিষয় হইয়া পড়ে। যখন উষার বাহ্য-সৌন্দর্য্য কবির আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যকে উদ্বোধিত করে, তখনই কবি উষাকে পবিত্র-মূর্ত্তি স্নেহময়ী দেবীরূপে কল্পনা করিয়া এইরূপে বর্ণনা করেন:—

> "ঐ কে অমরবালা—দাঁড়ায়ে উদয়াচলে,
> ঘুমন্ত প্রকৃতি-পানে চেয়ে আছে কুতূহলে!"

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে বিচিত্রতা ও সামঞ্জস্য সর্ব্ব প্রকার সৌন্দর্য্যেরই মূলে অবস্থিত। সৌন্দর্য্যের কোন একটি ধ্রুব আদর্শ না থাকিলেও তাহার মূলে কতকগুলি বিশ্বজনীন মূলতত্ত্ব নিহিত আছে, এবং অন্যান্য মনোবৃত্তির ন্যায় সৌন্দর্য্য-রুচিও উন্নতিসাপেক্ষ। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্য-রুচিও যে উন্নতি-লাভ করে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে কখন কখন যে সম্পূর্ণ বিপরীত সৌন্দর্য্য-রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার কারণ আছে।

সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা এক কথা এবং সৌন্দর্য্য-ভাব বাহিরে প্রকাশ

করা স্বতন্ত্র কথা। কোন শ্রেষ্ঠ কবিকে জিজ্ঞাসা কর—তিনি যতখানি হৃদয়ে অনুভব করেন, তার শতাংশের একাংশও কবিতায় প্রকাশ করিতে পারেন কি না। যাঁর যে পরিমাণে এই প্রকাশ করিবার শক্তি আছে, তিনি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ কবি। কোন ব্যক্তি সঙ্গীতের সমজদার হইতে পারেন, কিন্তু নিজে গান করিতে গেলে হয় তো সকলের সমক্ষে তাঁহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। Darwin যে বলেন :—

"The idea also of beauty in natural scenery has arisen only within modern times."—এ কথা কতদূর সত্য সন্দেহস্থল। এ কথা স্বীকার করি—আমাদিগের অন্যান্য সকল বৃত্তির ন্যায় সৌন্দর্য্য-বৃত্তিও উন্নতি-সাপেক্ষ, কিন্তু অসভ্যেরা যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য একেবারেই অনুভব করিতে পারে না—এ কথা বিশ্বাস হয় না। Darwin নিজেই বলিয়াছেন যে, অতীব অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও নানা প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায়। সেই অলঙ্কারগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় প্রতীতি হইবে, উহা ফুল ও ফলের অসম্পূর্ণ অনুকৃতি মাত্র। কোন ফুলের অবিকল সৌন্দর্য্য অনুকরণ করা উৎকৃষ্ট শিল্পের কার্য্য। অসভ্যেরা ফুলের কিম্বা ফলের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিলেও তাহা শিল্পে প্রকাশ করা তাহাদের পক্ষে সহজ নহে। এই সৌন্দর্য্য-জ্ঞান শিল্পে প্রয়োগ করিবার সময়েই তাহাদিগের নানা প্রকার ভ্রম হইয়া পড়ে। তাহাদিগের অলঙ্কারের আকার যে প্রায়ই গোলাকার হয়, ইহাতেই বুঝা যায় যে, গোলাকারের সৌন্দর্য্য তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং এই আকারটি অপেক্ষাকৃত সাদাসিধা বলিয়া উহা তাহারা শিল্পকার্য্য-দ্বারা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফুল ও ফলের আকার-গত সামান্য সৌন্দর্য্য যে গোল আকৃতি, সেইটুকু পর্য্যন্ত প্রকাশ করাই তাহাদিগের শিল্পের দৌড়; ফুলের পাপড়ি প্রভৃতি বিচিত্র সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করা তাহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। প্রস্ফুটিত

কুসুমের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া প্রথমতঃ হয়তো তাহারা সেই সকল ফুল অঙ্গে ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়; পরে, যখন সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের অপেক্ষাকৃত উন্নতি হইল, তখন বোধ হয় উহারা এই সকল প্রাকৃতিক অলঙ্কার চিরস্থায়ী করিবার জন্য তাহারই অনুকরণে ধাতু-নির্ম্মিত অলঙ্কার-সকল রচনা করিতে প্রথম প্রবৃত্ত হয়। বৃক্ষে রাশি রাশি পুষ্প-ফল লম্বিত দেখিয়া তাহারই অনুকরণে নাক কাণ ঠোঁট ফুঁড়িয়া পুষ্প ও ফলানুকৃত অলঙ্কার-সকল পরিবার রীতি বোধ হয় প্রথম আরম্ভ হয়।

যে অসভ্য মনুষ্য প্রথম এইরূপ অলঙ্কার পরিধান করিয়াছিল, বোধ হয় তাহার মনে এই প্রকার কোন যুক্তি উপস্থিত হইয়া থাকিবে;—ঐ পুষ্পসমূহে যখন বৃক্ষের শোভা বর্দ্ধিত হইতেছে, তখন তাহার অনুকরণে এই সকল কৃত্রিম অলঙ্কার সর্ব্বাঙ্গে পরিধান করিলে অবশ্য শরীরেরও শোভাবৃদ্ধি হইবে। এইরূপ একবার বিশ্বাস ও সংস্কার উৎপন্ন হইলে, ওষ্ঠ ফুঁড়িয়া "পেলে" নামক বলয় পরিধান করা কুরুচির বিষয় মনে হওয়া দূরে থাক্—বরং তাহাই সৌন্দর্য্য-সাধক বলিয়া সেই অসভ্যদিগের মনে হইবে, এবং তাহার দৃষ্টান্ত ও অনুকরণে তাহার স্বজাতীয়দিগের মধ্যে বংশ-পরম্পরাক্রমে এই প্রকার অলঙ্কার পরিধানের প্রথা প্রচলিত হইয়া এই প্রকার রুচিও তাহাদিগের মধ্যে বদ্ধমূল হইবার কথা। সৌন্দর্য্য-জ্ঞান মূলে থাকা সত্ত্বেও তাহার প্রয়োগে এই প্রকার ভ্রম হইয়া সুরুচিকেও ক্রমে কুরুচিতে পরিণত করিতে পারে। এই জন্য সকল দেশেই সৌন্দর্য্য-রুচি যেরূপ শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করে, শিল্পও আবার সৌন্দর্য্য-রুচির উপর সেইরূপ প্রভাব প্রতিফলিত করে। অনুকরণ, অভ্যাস ও দৃষ্টান্তের প্রভাব মানব-প্রকৃতিতে অত্যন্ত বলবৎ; কুৎসিত বস্তুকে যদি আমরা সুন্দর বলিয়া প্রতি দিন দেখি, ক্রমে সেই বাস্তবিক কুৎসিত পদার্থও আমাদের চক্ষে সুন্দর হইয়া দাঁড়ায়। আমা-

দিগের বাজারে শিশুদের জন্য যে সব পুতুল বিক্রয় হয়, তাহা অতি জঘন্য ; এই বিশ্রী শিল্পকার্য্য ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া-দেখিয়া আমাদের শিল্প-রুচি বিকৃত হইবারই সম্ভাবনা। * গুপ্ত ব্রাদার্স-কর্ত্তৃক এখন যে সচিত্র পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে তাহার চিত্রসকল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হওয়ায়, সাক্ষাৎভাবে না হউক, আনুষঙ্গিক ভাবেও সাধারণের সৌন্দর্য্য-রুচির উন্নতির পক্ষে যে সহায়তা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অসভ্যদিগের অনেকগুলি বেশভূষা গোড়ায় সৌন্দর্য্য-স্পৃহা হইতে উৎপন্ন না হইতেও পারে। সে বিষয়ে বিদেশীয় পর্য্যটকদিগের বুঝিবার ভ্রম হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। মালাইদ্বীপপুঞ্জনিবাসী লোকেরা যে, কুকুরের ন্যায় দাঁত সম্পূর্ণ সাদা হওয়া লজ্জার বিষয় মনে করে, কিম্বা উপরিতন নীলনদকূলস্থ প্রদেশনিবাসী মনুষ্যগণ পাছে পশুর মত দেখিতে হয় বলিয়া যে সম্মুখভাগের দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহাতে কি প্রকাশ পায়? তাহারা কি সৌন্দর্য্যের জন্য এইরূপ করে?—না, তাহারা পশুর হীনতা উপলব্ধি করিয়া, যাহাতে কোন প্রকারে পশু-দিগের মত দেখিতে না হয়, এই উদ্দেশেই এই প্রকার আচরণ করে? যে সকল লক্ষণকে পশুর বিশেষ লক্ষণ বলিয়া তাহাদিগের ধারণা, আপনাদিগের শরীরে সেই সকল লক্ষণের কিছুমাত্র আভাস দেখিলেই তাহা সমূলে উৎপাটন করিতে উহারা প্রবৃত্ত হয়।

অনেক সময় কোন পদার্থ আমরা সুন্দর বলিয়া অনুভব করিতে পারি, কিন্তু কেন সুন্দর দেখাইতেছে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারি না। অনেক সময়, সমস্ত অংশের সামঞ্জস্য হইতে যে সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া, তাহার কোন একটি অংশকে সৌন্দর্য্যের কারণ বলিয়া স্থির করি এবং এইরূপে ভ্রমে পতিত

* যে সময়ে এই প্রবন্ধ লিখিত হয় তখন "প্রবাসী" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সচিত্র পত্রিকাদি প্রকাশিত হয় নাই। তখন আমাদিগের চিত্রকলার বড়ই শোচনীয় অবস্থা ছিল।

হই। মনে কর, একজনের মুখশ্রী আমাদিগের নিকট সুন্দর বলিয়া মনে হইল; কেন সুন্দর দেখাইতেছে, আমি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কি বিশেষ লক্ষণ থাকায় অন্য মুখশ্রী-অপেক্ষা তাহার মুখশ্রী সুন্দর হইয়াছে, তাহা বুদ্ধি-দ্বারা নির্ণয় করিতে গিয়া হয়তো ভ্রমে পতিত হইলাম। আমার হয়তো মনে হইল, সুবক্র শুক-চঞ্চু-নাসিকাই তাহার মুখশ্রীর বিশেষ লক্ষণ। ইহা হইতে আমি এই স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম, শুকচঞ্চু-বিনিন্দিত নাসিকাই তবে সৌন্দর্য্যের বিশ্বজনীন আদর্শস্থল। এই সিদ্ধান্ত-অনুসারে যেখানে সেখানে পাত্রাপাত্র ভেদ না করিয়া এই নিয়মের প্রয়োগ করিতে লাগিলাম, কাজেই সৌন্দর্য্য-বিষয়ে আমার পদে পদে ভ্রম হইতে লাগিল। একজনের মুখশ্রীতে চোখ মুখ ঠোঁট প্রভৃতির যেরূপ গঠন, "শুক-চঞ্চু-নাসা" তাহারই মানানসই হওয়াতেই সেই মুখে সুন্দর দেখাইতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া সকল মুখশ্রীতেই যে সেই "শুক-চঞ্চু-নাসা" সুন্দর দেখাইবে তাহার কোন অর্থ নাই। একজনের অন্যান্য অংশের তুলনায় হয়তো তাহার ছোট কপাল মানাইতে পারে—কিন্তু সেই ছোট কপাল তাই বলিয়া সৌন্দর্য্যের বিশ্বজনীন আদর্শ হইতে পারে না। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব ধ্রুব হইলেও সৌন্দর্য্যের আদর্শ ধ্রুব হইতে পারে না। সকল সৌন্দর্য্যই আপেক্ষিক, তুলনা-সাপেক্ষ। প্রত্যেক সুন্দর পদার্থের বিভিন্ন সৌন্দর্য্য, সেই পদার্থ-গত অংশ-সমূহের বিভিন্ন প্রকার সংস্থানের উপর নির্ভর করে; যে কোন সুন্দর পদার্থের যেরূপ অবয়ব-সংস্থান—তদনুসারেই তাহার সামঞ্জস্য বিধান হইয়া থাকে। এই জন্য পাত্রাপাত্র অবস্থা বিবেচনা না করিয়া একজনের কিম্বা এক পদার্থের সৌন্দর্য্য আর একজনে কিম্বা আর এক পদার্থে আরোপ করিলেই ভ্রমে পতিত হইতে হয়। স্থূল কথা—কোন জীব-শরীরের অবয়ব-সংস্থানের নানা প্রকার প্রণালী হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের

প্রত্যেকেরই এক একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে। এই জন্য যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে—ঘোড়া সুন্দর—না, কুকুর সুন্দর?—আর আমি যদি উৎকৃষ্ট-আদর্শের ঘোড়া ও উৎকৃষ্ট-আদর্শের কুকুর উভয়ই দেখিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি কখনই বলিতে পারি না যে, ঘোড়া কুকুর-অপেক্ষা সুন্দর, কিম্বা কুকুর ঘোড়া-অপেক্ষা সুন্দর; তাহাদের প্রত্যেকেরই সৌন্দর্য্য-আদর্শ স্বতন্ত্র। ঘোড়া ঘোড়ার হিসাবে সুন্দর—কুকুর কুকুরের হিসাবে সুন্দর। তাহার অর্থ এই, উহাদের মধ্যে যাহার যেরূপ শরীরের অবয়ব-সংস্থান-প্রণালী তদনুসারেই তাহাদের প্রত্যেকের অবয়ব-সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। যাহার যে পরিমাণে এইরূপ সামঞ্জস্য থাকে, তাহাকে সেই পরিমাণে আমরা সুন্দর বলি।

আরব দেশীয় ঘোড়াকে এই জন্য আমরা ঘোটক-জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া থাকি। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আরব দেশীয় ঘোড়া সুন্দর না গাধা সুন্দর? গাধা অপেক্ষা আরব ঘোড়া যে অসংখ্য-গুণে সুন্দর তাহাতে বোধ হয় কাহারো দ্বিরুক্তি হইবে না। কেন সুন্দর? না—যেহেতু গাধা অপেক্ষা আরব-ঘোড়ার অবয়ব-সংস্থানের অধিক সামঞ্জস্য আছে। পশু-সাধারণের মধ্যে শূকর গাধা প্রভৃতির কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিতান্ত অসামঞ্জস্য থাকা প্রযুক্তই তাহারা জন্তুর মধ্যে কুৎসিত বলিয়া পরিগণিত হয়। যাহা বিবৃত হইল তাহাতে বোধ হয় যথেষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে, সমতা ও সামঞ্জস্যই সৌন্দর্য্যের মূল-উপাদান। কোন পদার্থ কিম্বা বিষয়ের সমতা কিম্বা সামঞ্জস্য দেখিয়া আমাদিগের মনে যে সুখোদয় হয়, তাহারই নাম সৌন্দর্য্য। যেহেতু সৌন্দর্য্য তুলনা-সাপেক্ষ—সেই হেতু তুলনা-বৃত্তি ও সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৌন্দর্য্য-রুচিরও উন্নতি হইয়া থাকে।

নিদ্রা, স্বপ্ন, মস্তিষ্ক ও আত্মা।

নিদ্রার সময় শারীরিক অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় তদ্বিষয়ে নানা পণ্ডিতের নানা প্রকার মত শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বা হৃদয়ে কেহ বা মস্তকে নিদ্রার উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে এই মতটি বলবৎ ছিল যে, হৃৎপিণ্ডের-ক্রিয়া শিথিল হইয়া তথা হইতে রক্তরাশি মস্তিষ্কে গিয়া রক্ত-রোধ উপস্থিত করে এবং এই রক্ত-রোধের চাপে মস্তিষ্ক অসাড় ও অচেতন হইয়া পড়ে। ইহাকেই নিদ্রা বলে।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতটি-অপেক্ষা আধুনিক মতটি উৎকৃষ্ট বলিয়া সহজেই উপলব্ধি হয়। সে মতটি এই,—মস্তিষ্ক হইতে রক্তরাশি আকৃষ্ট হইয়া যখন অন্যস্থানে প্রবাহিত হয় এবং এই রক্ত-শূন্যতা হেতু মস্তিষ্ক-সূত্রগুলি শিথিল হইয়া পড়ে, তখনই নিদ্রা উপস্থিত হয়। অতএব মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য নিদ্রার কারণ না হইয়া রক্তের অভাবই তাহার কারণ বলিয়া আজ কাল অবধারিত হইতেছে।

এই মতটি পরীক্ষার দ্বারাও সপ্রমাণ হইয়াছে। এজন্য জীবন্ত মনুষ্যের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল যে, নিদ্রার সময় তাহার মস্তিষ্কের পাক্‌-গুলি শিথিল হইয়া পড়িত, এবং জাগ্রত হইলেই আবার সে-সকল পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইত; মনের চালনা হইলেই মস্তিষ্কের পাক্‌-গুলি ফুলিয়া উঠিত।

নিদ্রা হইতে যদি কেহ আমাদিগকে হঠাৎ জাগাইয়া দেয়, মস্তিষ্কের মধ্যে বেগে রক্ত প্রবাহিত হওয়া প্রযুক্ত উহাতে কেমন এক প্রকার প্রসারণ উপলব্ধি হয়; রক্তাগমে শিথিল মস্তিষ্ক-সূত্রগুলি দাঁড়াইয়া উঠে, এই জন্যই বোধ হয় ঐ প্রকার ভাব আমাদের মনে অনুভব হয়।

এই মতটির সত্যতা বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

শারীরিক কিম্বা মানসিক কোন প্রকার উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বেগবান্ হইলে, কিছুতেই আমাদের চক্ষে নিদ্রা আইসে না। মস্তিষ্ক যতক্ষণ সক্রিয় থাকে ততক্ষণ নিদ্রাকর্ষণের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া যায়। নিদ্রাকর্ষণ করিবার জন্য আমরা সচরাচর কি উপায় অবলম্বন করি?—যে ঔষধে বা যে উপায়ে মস্তিষ্ক হইতে রক্তরাশি চালিত হইয়া হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আনীত হয়, তাহাই প্রয়োগ করিয়া থাকি। উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলে কি জন্য নিদ্রাকর্ষণ হয়?—মস্তিষ্ক হইতে রক্ত আকৃষ্ট হইয়া পাকাশয়ে প্রবাহিত হওয়া প্রযুক্ত মস্তিষ্কের রক্তাভাবই সেই সময়ে নিদ্রাকর্ষণের একমাত্র কারণ।

নিদ্রা আসিবার সময় আমাদিগের মানসিক অবস্থা কিরূপ হয়?—নানা প্রকার কল্পনা-ছবি আমাদের মনে অনাহূত প্রবেশ করে, বাহ্য বস্তু-সকল নেত্র-সমক্ষে অস্পষ্ট হইয়া যায়, এবং শব্দ সকল অতি মৃদু-ভাবে কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি যে আমাদের ইচ্ছা-শক্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। হয় তো আমরা সেই ইচ্ছাকে পুনর্ব্বার আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করি, হয়তো সেই ইচ্ছা ক্ষণকালের জন্য আমাদের বশে আইসে, যে কর্ম্মে আমরা নিযুক্ত ছিলাম তাহাতে পুনর্ব্বার মনঃসমাধান করিতে হয়তো ক্ষণকালের জন্য সমর্থ হই, কিন্তু পরক্ষণেই আবার চিন্তা সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে—মনশ্চক্ষুর সমক্ষে আবার নানা প্রকার অনাহূত ছবি আসিয়া চলা-ফেরা করিতে থাকে, আমরা বুঝিতে পারি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া আসিতেছে, চক্ষের পত্র নিমীলিত হইয়া আসিতেছে—পরক্ষণেই বাহ্য অস্তিত্ব আমাদের অগোচর হইয়া পড়ে, আমরা নিদ্রিত হই।

আমরা নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থায় যে সকল ব্যাপার দেখিতে পাই, মানসতত্ত্ব কি আত্মতত্ত্ব-ক্ষেত্রে তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার আর কিছুই নাই; কিন্তু নিতান্ত পরিচিত বলিয়াই সেই সকল ব্যাপারে

আমরা বিস্মিত হই না। সেই সকল ব্যাপার প্রতিদিন দেখিতে পাই বলিয়াই তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমাদের কৌতূহল হয় না।

জাগ্রৎ অবস্থা ও নিদ্রাবস্থার মধ্যে যেটুকু ব্যবধান তাহা অতি ক্ষণিক ও সঙ্কীর্ণ, অতি সূক্ষ্ম আত্মদর্শীরাও তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়, কি বিষম মানসিক বিপ্লব উপস্থিত হয়। মনুষ্য যেন আর সে মনুষ্য থাকে না। তাঁকে আর বুদ্ধি-বিবেচনা-সমন্বিত উন্নত জীব বলিয়া বোধ হয় না, বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, তাঁহার নিকট যেন বাহ্য জগতের অস্তিত্বই থাকে না, তাঁহার ইচ্ছা—যাহা চেতনাবান্ আত্মার বাহ্য বিকাশের শক্তি মাত্র,—সে ইচ্ছা-শক্তিও অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া পড়ে, তাঁহার চিন্তা ও ভাবের উপর তাঁহার আর কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না, তাঁহার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-সকল তাঁহার আর বশে থাকে না। কিন্তু তাঁহার প্রাণ-ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ অবিকৃতভাবে ও সুশৃঙ্খল-রূপে সমান চলিতে থাকে, তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না, ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ব কার্য্য হইতে নিরস্ত হয়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে—আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু অতি অস্পষ্টরূপে,—আমরা শব্দের পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারি না। অনেক সময় হয়তো উচ্চ শব্দও আমাদের কর্ণগোচর হয় না, আবার এক এক সময় সামান্য ফুস্‌ফুস্ শব্দেই জাগিয়া উঠি, কিম্বা অতি মৃদু শব্দকেও কখন কখন কামানের উচ্চ আওয়াজ বলিয়া বোধ হয়। দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও যে একেবারে স্থগিত হয় তাহাও ঠিক বলা যায় না; আস্বাদন ও ঘ্রাণশক্তি মন্দীভূত হয় বটে, কিন্তু একেবারে অপনীত হয় না। এই সকল তথ্য আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, ইন্দ্রিয়-সকল যখন আংশিকরূপে অসাড় হইয়া পড়ে, বাহ্য জগতের সহিত আমাদিগের মনের যে অব্যবহিত যোগাযোগ—সেই সকল যোগাযোগের স্থল সে সময় একেবারে অসাড় হয় না, পরন্তু ইন্দ্রিয়

স্নায়ু-সমূহের প্রান্তসীমা এবং মস্তিষ্ক—এই উভয়ের কোন মধ্যদেশে, কিম্বা যেখানে চেতনাবান্ আত্মার সহিত মস্তিষ্কের অব্যবহিত যোগ আছে সেই স্থলেই অসাড়তা উপস্থিত হয়। কি জাগ্রৎ অবস্থা কি নিদ্রাবস্থা সকল অবস্থাতেই স্নায়ুর উপরেই যে বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব সকল প্রকটিত হয় তাহাতে আর সংশয় নাই। এবং এই বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব-সকল মস্তিষ্ক মণ্ডলের তলদেশস্থ স্নায়ু-সঙ্গম-স্থানে (Ganglion) ইন্দ্রিয়-স্নায়ু কর্ত্তৃক যে নীত হয় তাহার কতকটা প্রমাণও পাওয়া যায়। Professor Ferrier সাহেবের পরীক্ষা-সমূহে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়-স্নায়ু-সকল যেখানে গিয়া সম্মিলিত হয়, সেই মস্তিষ্ক-তল-দেশস্থ স্নায়ু-সঙ্গম-স্থানই এই কেন্দ্রস্থল। এই কেন্দ্রস্থলে প্রথমে বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব-সকল প্রবাহিত হয়—পরে, সেখান হইতে মস্তিষ্ক-মণ্ডলে নীত হইলে তখন আত্মা তাহাদিগের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে।

মস্তিষ্ক নিদ্রাবস্থায় শরীরের উপর হুকুম চালাইতে পারে না ; স্নায়ু-সকল তাহার হুকুম মানে না। কোন একটি পদার্থ—যাহা মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু-সমূহের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে এবং যাহা জাগ্রৎ অবস্থায় সক্রিয় থাকে—সেই পদার্থটি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে ; সেই পদার্থটি কি ?—না ইচ্ছা-শক্তি। এই ইচ্ছার কার্য্য স্থগিত হয়, এই জন্যই শরীরের উপর মনের আর কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না। এই প্রণালী-অনুসারেই শরীরের প্রয়োজনীয় বিরাম-কার্য্য সংসাধিত হয়।

এইখানে এই প্রশ্নটি উপস্থিত হইতেছে, এই যে ইচ্ছা-শক্তির কার্য্য স্থগিত হয়—এই পরিবর্ত্তনটি মানসিক যন্ত্রের কোন্ স্থানে সংঘটিত হয় ? নিদ্রা দ্বারা এই মহান্ বিপ্লব কিরূপে সাধিত হয় ? যদি সমুদায় যন্ত্র নিদ্রাবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে তাহা হইলে সহজেই তো এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, "সমস্ত মস্তিষ্ক নিদ্রিত থাকা প্রযুক্তই সমস্ত মানসিক যন্ত্রের কার্য্য স্থগিত থাকে, জাগ্রদবস্থায়

ঐ যন্ত্র যে সকল শক্তি-দ্বারা পরিচালিত হয়, নিদ্রাবস্থায় সেই সকল শক্তি স্বীয় স্বীয় কার্য্য হইতে কিয়ৎকালের জন্য বিরত হয় বলিয়াই সমস্ত যন্ত্র স্থগিত হয়।” কিন্তু তাহা তো প্রকৃত ঘটনা নহে। নিদ্রাবস্থায় সকল শক্তিই তো স্বীয় স্বীয় কার্য্য হইতে বিরত হয় না। জীবনী-শক্তি সে সময় সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করিতে থাকে; মনও একেবারে নিষ্ক্রিয় হয় না, যেহেতু মনে নানা প্রকার স্বপ্নের উদয় হয়; তবে যদি মস্তিষ্কমণ্ডল উপরিভাগে জাগ্রৎ থাকে এবং অবশিষ্ট সমস্ত শরীর নিম্নভাগে নিদ্রিত থাকে, তাহা হইলে নিদ্রার সময় তাহাদিগের যোগটি ঠিক্ কোন্ স্থলে বিনষ্ট হয়?—যে মস্তিষ্কমণ্ডল বুদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ, সেই মস্তিষ্ক-মণ্ডলের কোন নিম্নভাগে অবশ্য সেই যোগের স্থান; অর্থাৎ যে বিন্দুতে মস্তিষ্কের শাখা-প্রশাখা স্নায়ু-মণ্ডলের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই বিন্দু দিয়া আমাদের ইচ্ছা-শক্তি শরীরের উপর অব্যবহিতরূপে কর্ত্তৃত্ব করে।

Professor Ferrier সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে মস্তিষ্ক-মণ্ডল বুদ্ধির ইন্দ্রিয়স্বরূপ, সেই মস্তিষ্ক-মণ্ডলেই ইচ্ছা-শক্তি পরিচালিত হয়। জাগ্রৎ ও অবিকৃত অবস্থায় ইচ্ছা-শক্তিই শরীরের উপর কর্ত্তৃত্ব করে। নিদ্রিত অবস্থায় কিম্বা শরীরের বিকৃত অবস্থায় ইচ্ছার আর সে কর্ত্তৃত্ব-শক্তি থাকে না। মস্তিষ্ক-মণ্ডল এবং শরীর-পরিচালক স্নায়ু সমূহ—এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সম্ভবতঃ এমন কোন একটি স্থল আছে, যেখানে নিদ্রাবস্থায় ইচ্ছা-শক্তির কার্য্য অসাড় হইয়া পড়ে, কিম্বা ইচ্ছা-শক্তি যে সকল আজ্ঞা শরীরের উপর প্রচার করে, সেই আজ্ঞা-সকল সেখান-দিয়া বহন করিতে নিরস্ত হয়। সে অংশটি কি? শারীরবিধান-বিদ্যার সাহায্যে আমরা দুইটি স্নায়ু-সঙ্গমের বিষয় অবগত হই। ইহার মধ্যে একটি ইন্দ্রিয়-স্নায়ু-সমূহের সঙ্গম-কেন্দ্র।

আমরা ইহাও অবগত আছি যে, নিদ্রাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য প্রতি-

বিম্ব সকল বহন করিতে একেবারেই ক্ষান্ত হয়, কিম্বা অতি অস্পষ্টরূপে বহন করে। ইহা হইতে এইরূপ প্রতিপন্ন হয়, এই স্নায়ু-সঙ্গম স্থলটিই নিদ্রার আধারস্থান। এইটি নিদ্রিত হইয়া পড়ে বলিয়াই ইচ্ছার আজ্ঞা সকল মস্তিষ্ক হইতে শরীর পর্যান্ত প্রবাহিত হইতে পারে না এবং ইন্দ্রিয়-প্রেরিত সংবাদ সকলও মস্তিষ্ক মধ্যে নীত হয় না।

সমস্ত মস্তিষ্ক-যন্ত্র, না তাহার কতকগুলি অংশ-মাত্র নিদ্রাবস্থা প্রাপ্ত হয়? আর যদি অংশমাত্রই নিদ্রিত হয় তাহা হইলে সে কোন্ কোন্ অংশ—ইহাই সমস্যা-স্থল। কিন্তু সে যাহাই হউক, উপরে যে সকল তথ্য বিবৃত হইল তাহাতে প্রতীতি হয়, মস্তিষ্কের নিম্নতলস্থ স্নায়ু সঙ্গমই নিদ্রার আধারস্থান। ইহা নিশ্চিত যে, সমস্ত মস্তিষ্ক-মণ্ডল কখনই নিদ্রিত হয় না—তাহা যদি হইত তাহা হইলে স্বপ্ন কখনই হইত না। মস্তিষ্ক-কেন্দ্র এবং শরীর এত উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে স্নায়ু-সঙ্গমটি অবস্থিত—যেখান হইতে স্নায়ু-সমূহ সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়; উহা নিদ্রাভিভূত হয় কি না, আমরা নিশ্চিতরূপে অবগত নহি। নিদ্রিত হয় না বলিয়াই সহজে অনুমান হয়; কারণ, জীবনীশক্তি-গত ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়াকে যে সকল স্নায়ু পোষণ করে, সেই সকল স্নায়ুকে কখনই নিদ্রিত হইতে দেখা যায় না। মস্তিষ্ক-যন্ত্রের অন্যান্য অংশে কেনই বা বিশ্রামের প্রয়োজন হয় আর সেই সকল স্নায়ুর বিশ্রামের কেনই বা প্রয়োজন হয় না, তাহা আমরা অবগত নহি। মস্তিষ্ক-যন্ত্রের যে ভাগটি ইচ্ছা-শক্তির অধীন সেইখানেই বিশ্রামের প্রয়োজন আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মস্তিষ্ক ও শরীর যে সকল বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ, নিদ্রাকালে সেই সকল বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। তাহাদের উপর ইচ্ছা-শক্তির কর্ত্তৃত্ব তিরোহিত হয়। জড়-শরীর বিশ্রাম করে। ইচ্ছা-নিরপেক্ষ যে সকল শারীরিক ক্রিয়া, তৎসমুদায়ের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না, বরং ইচ্ছা-

শক্তির বাধা-বহির্ভূত বলিয়াই উহারা আরও নিয়মিতরূপে ও সুচারুরূপে চলিতে থাকে।

কিন্তু এই যে ইচ্ছা-শক্তি—ইহা কি?

চেতনাবান্ আত্মার বহিঃপ্রকটন-শক্তি ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। এই ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা আত্মা জড়-শরীরের উপর এবং জড়-শরীর-দিয়া বাহ্য জড়-জগতের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে।

কোন নিদ্রিত ব্যক্তিকে দেখিলে মনে হয় বুঝি সে একেবারে মৃতপ্রায়, কিন্তু সেই নিদ্রিত ব্যক্তির সমক্ষে বহির্জগতের অস্তিত্ব যদিও লুপ্ত হয়, তথাপি সেই হতচেতন নিদ্রিত ব্যক্তি, সেই সময়ে আপনার অন্তরের মধ্যে একটি নূতন জগৎ নিম্মাণ করিয়া তাহাতেই বিচরণ করে; শরীর নিদ্রিত হয় বটে, কিন্তু তাহার মন নিদ্রিত হয় না। বরং জাগ্রৎ অবস্থা অপেক্ষা নিদ্রাবস্থাতেই মনকে আরও অধিক ক্রিয়াশীল বলিয়া বোধ হয়। সেই সময় মন কত প্রকার নাটক রচনা করে, কত নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি করে, আত্মসৃষ্ট জগতের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, বৎসরব্যাপী ঘটনা সকল এক ঘণ্টার মধ্যে একত্র করে, কত কি দেখে, কত কি শোনে, কত কি অনুভব করে, জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার শতাংশের একাংশও দেখিতে, শুনিতে বা অনুভব করিতে পারে না। এই সমস্ত ভাবিয়া দেখিলে কি আমাদের বিস্ময় উপস্থিত হয় না? স্বপ্ন যদি আমাদের সকলেরই পরিচিত বিষয় না হইত, তাহা হইলে কি আমরা উহাকে অবিশ্বাস্য অসম্ভব ঘটনা বলিয়া মনে করিতাম না? যদি কেহ আমাদের নিকট আসিয়া বলিত যে আমি নিদ্রাকালে এই প্রকার ব্যাপার-সকল দেখিয়াছি, তাহা হইলে কি আমরা তাহাকে প্রবঞ্চক প্রতারক মিথ্যাবাদী কিম্বা আশু-বিশ্বাসী বাতুল বলিয়া স্থির করিতাম না? স্বপ্নব্যাপারের তত্ত্বানুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে, যে জড়-যন্ত্র তাহার উৎপাদনে সাহায্য করে তাহা প্রথমে বিবৃত করা আবশ্যক।

মেরুগ্রন্থির উপরিতন সীমান্তে প্রসারিত হইয়া যে স্নায়ু সঙ্গমটি মস্তিষ্কের সহিত মিলিত হইয়াছে—সেই স্নায়ু-সঙ্গমকে "লম্বাকৃতি মেদুর" Medulla oblongata বলে।

এই স্থলে আসিয়া মস্তিষ্ক শেষ হয় এবং স্নায়ু-প্রণালীর আরম্ভ হয়। কিন্তু মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-জাল এই উভয়ের কাহার কোথায় আরম্ভ বা শেষ তাহা উপলব্ধি করা সুকঠিন। সমস্ত স্নায়ু-জাল মস্তিষ্কের বিস্তৃতি ও অনুবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে; অঙ্গুলির অগ্রভাগে যদি কোন স্নায়ুর ঈষৎ উত্তেজনা হয়, তাহা হইলে সেই স্নায়ুর সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কও উত্তেজিত হইয়া উঠে। স্নায়ু ঐ বোধ-ক্রিয়াকে মস্তিষ্ক মধ্যে বহন করিয়া লইয়া গেলে মন তাহা অনুভব করে।

মেরুগ্রন্থিতে যে স্নায়ুরাশি জড়ান আছে সেই স্নায়ু-সমূহ এই স্নায়ু-সঙ্গমটির প্রান্ত সীমায় পরস্পরের উপর দিয়া ট্যার্‌চা ভাবে চলিয়া গিয়া মস্তিষ্ক এবং শরীরের পরস্পর-বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। যে সকল স্নায়ু শরীরের বাম ভাগকে চালিত করে তাহারা মস্তিষ্কের দক্ষিণ ভাগে চলিয়া গিয়াছে এবং যে সকল স্নায়ু শরীরের দক্ষিণ ভাগকে চালিত করে তাহারা মস্তিষ্কের বাম ভাগে চলিয়া গিয়াছে। এই প্রকার বৈপরীত্যের ফল এই হইয়াছে যে, মস্তিষ্কের দক্ষিণ ভাগ, শরীরের বাম ভাগের উপর কর্তৃত্ব করে এবং মস্তিষ্কের বাম ভাগ, শরীরের দক্ষিণ ভাগকে চালনা করে।

মস্তিষ্কের তলদেশস্থ এই স্নায়ু-সঙ্গমের উপরে এবং সংলগ্ন আর একটি স্নায়ু-সঙ্গম আছে—শারীর-বিধান-বিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু আপাততঃ সমস্ত এক করিয়া ধরিয়া নিলে বুঝিবার সুবিধা হইবে। এই তলস্থ বৃহৎ স্নায়ু-সঙ্গমটি হইতে ছোট ছোট সাদা সাদা সূত্রসকল মস্তিষ্ক-মণ্ডলে প্রসারিত হইয়াছে।

এই তলদেশস্থ স্নায়ু-সঙ্গমের উপরিভাগে আর একটি বৃহৎ স্নায়ু-সঙ্গম আছে, তাহাকে Ceribellum অর্থাৎ উপমস্তিষ্ক বলে। এই উপ-মস্তস্ক আবার তলস্থ স্নায়ু-সঙ্গমের সহিত একটি বন্ধন-দ্বারা সংযোজিত; এবং পুরো-মস্তিষ্ক-মণ্ডলেরও সহিত দুইটি বন্ধনে আবদ্ধ। কেন্দ্রস্থ স্নায়ু-সঙ্গমেরও সহিত উপমস্তিষ্কটি একটি সূক্ষ্ম চর্ম্ম-দ্বারা সংযুক্ত; এই সূক্ষ্ম চর্ম্মটি অন্যান্য স্নায়ু-সঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এইরূপে ইন্দ্রিয়-কেন্দ্র এবং গতি-কেন্দ্রের সহিত সকল স্নায়ু-সঙ্গমেরই যোগ রক্ষিত হইয়াছে।

এই সকল স্নায়ু-সঙ্গমের উপরে এবং পুরোভাগে Cerebrum অর্থাৎ পুরো-মস্তিষ্ক অবস্থিত। এই পুরো-মস্তিষ্কই বুদ্ধির ইন্দ্রিয়স্বরূপ। এই পুরো-মস্তিষ্ক আবার দুইটি মণ্ডলার্দ্ধে বিভক্ত।

এই দুই বৃহৎ মণ্ডলার্দ্ধের প্রত্যেক মণ্ডলার্দ্ধ স্বতন্ত্র ও স্বসম্পূর্ণ হইয়া গঠিত; অথচ একার্দ্ধ হইতে সূত্র সকল অপরার্দ্ধে সঞ্চারিত হইয়া উভয় অর্দ্ধকে একত্র সংযুক্ত রাখিয়াছে এবং এইরূপে উভয়ের কার্য্যগত একতা সম্পাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে, মস্তিষ্কের যে কেন্দ্রগত স্নায়ু-সঙ্গমের কথা বলা হইয়াছে, সেই স্নায়ু-সঙ্গমটি এই পুরো-মস্তিষ্কের মণ্ডলার্দ্ধযুগলের ঠিক নিম্নদেশে সংলগ্ন। যাবতীয় ইন্দ্রিয়-স্নায়ু এইখানেই আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই স্নায়ু-সঙ্গমের প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট। যেরূপ পুরো-মস্তিষ্কের মণ্ডলার্দ্ধের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার আধার বলিয়া এক্ষণে সপ্রমাণ হইয়াছে অথচ সমস্ত মণ্ডলার্দ্ধ যেরূপ একটি সমগ্র পদার্থ, সেইরূপ এই স্নায়ু-সঙ্গমের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেও উহা একটি সমগ্র পদার্থ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

এই পুরোমস্তিষ্কের মণ্ডলার্দ্ধদ্বয় গোটানো সূতার বাণ্ডিল-সমূহের মত প্রতীয়মান হয়—এবং এই সমস্ত মস্তিষ্ক একপ্রকার অসাধারণ-বোধবাহী

সূক্ষ্ম স্নায়বীয় আবরণ-দ্বারা আচ্ছাদিত। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন, এই সূক্ষ্ম আবরণ থাকা-প্রযুক্তই বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগ স্থাপিত হইয়া সমস্ত মস্তিষ্ক-যন্ত্রের একতা রক্ষিত হইয়াছে।

মস্তিষ্ক-পদার্থ শরীরিক সুখ-দুঃখের আধার বলিয়া অনুমিত হইলেও উহা স্বয়ং অচেতন। এস্থলে শরীর না বলিয়া স্নায়ু বলাই অধিক সঙ্গত, যেহেতু স্নায়ুতেই অনুভব-ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, অস্থি মাংসে কিছুমাত্র অনুভব শক্তি নাই। যে সকল জড়বাদীরা বলেন, চৈতন্য মস্তিষ্ক কিম্বা জড়-পদার্থের অবস্থা মাত্র, তাঁহাদিগের নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—মস্তিষ্কের কোন ক্ষতি হইলে কিম্বা বিনাশ হইলে মস্তিষ্ক যখন তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, তখন মস্তিষ্ক কিরূপে চেতনাবান্ পদার্থ হইতে পারে? কিন্তু এই মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়বীয় আবরণ অতীব স্পর্শ-বোধবাহী—উহাই "মাথা-ধরা"—"মদ্য-বিকার"—মস্তিষ্ক-জ্বর এবং অন্যান্য রোগের আধার-স্বরূপ। ঐ সকল রোগ আমরা মস্তিষ্ক-পদার্থের প্রতি আরোপ করিয়া থাকি।

"আমরা" আরোপ করি—"কে" আরোপ করে?—"কি" আরোপ করে?—মস্তিষ্ক মস্তিষ্কের প্রতি আরোপ করে? কিম্বা মস্তিষ্কের এক অংশ অন্য অংশের প্রতি আরোপ করে? জড়বাদিগণ কি ইহা অনুগ্রহপূর্ব্বক বুঝাইয়া দিবেন?

তাহা সম্ভব যে এই স্নায়বীয় আবরণ-দ্বারা মস্তিষ্কের সকল অংশের মধ্যে পরস্পর যোগ রক্ষিত হইয়া সমস্ত মস্তিষ্কের কার্য্যগত একতা ও সহকারিতা সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু কোন ঘোর অন্ধ-বিশ্বাসী জড়বাদীও কখন একথা স্বীকার করিবেন না যে এই স্নায়বীয় আবরণই সচেতন আত্মা।

Professor Ferrier ভূরি-ভূরি সূক্ষ্ম পরীক্ষা-সমূহের দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক স্নায়ু-সঙ্গমেরই যে এক একটি স্বতন্ত্র কার্য্য

আছে শুদ্ধ তাহা নহে, কিন্তু প্রত্যেক স্নায়ু-সঙ্গমের প্রত্যেক অংশেরও স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব যাঁহারা বলেন, কোন মানসিক ক্রিয়া সমগ্র অখণ্ড মস্তিষ্কের কার্য্য তাঁহাদিগের মত ইহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইতেছে। ইহাতে এই অনুমানটি সিদ্ধ হয় যে, মস্তিষ্ক মনের বাহ্য ইন্দ্রিয় ভিন্ন আর কিছুই নহে; মস্তিষ্কের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশই—স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মানসিক ক্রিয়ার যন্ত্র-স্বরূপ। কিন্তু আমরা যাহাকে "আমি" বলি তাহাকে আমরা কখনই খণ্ডভাবে ভাবিতে পারি না—সে "আমি" একটি অখণ্ড পদার্থ; সেই আমিই আত্মা। অতএব মস্তিষ্ক কখন আত্মা হইতে পারে না।

এই প্রশ্নটির মীমাংসা-পক্ষে Professor Ferrier অনেক সাহায্য করিয়াছেন। মস্তিকের নিম্নতলস্থ যে স্নায়ু-সঙ্গমটি বুদ্ধিবৃত্তির আধার নহে, সেই স্নায়ু-সঙ্গমের কি কি কার্য্য তাহা তাঁহার পরীক্ষা-দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কার্য্য-সম্বন্ধে Professer Ferrier কি বলিয়াছেন শোনা যাউক। তিনি বলেন:—"মস্তিষ্কই মনের ইন্দ্রিয় ও যন্ত্র-স্বরূপ এবং মস্তিষ্ক-দ্বারা এবং মস্তিষ্কের মধ্যেই মানসিক ক্রিয়া-সকল সম্পাদিত হয়। এই যে মতটি ইহা এক্ষণে এতদূর সুপ্রতিষ্ঠ ও সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য হইয়াছে যে, এতৎসম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া এই সুসিদ্ধান্ত সত্যটি হইতেই আমরা সূত্রপাত করিব।" তারপর তিনি বলিতেছেন, "যাহা হউক, মস্তিষ্কের শরীর-তত্ত্ব ঘটিত ক্রিয়া-শীলতা উহার মনস্তত্ত্ব ঘটিত ক্রিয়া-সমূহের সহিত সমব্যাপক নহে। গতি ও ইন্দ্রিয়বোধ-ঘটিত প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের যন্ত্র বলিয়া দেখিতে গেলে, উহাকে দুই-অর্দ্ধ-বিশিষ্ট একটি সমগ্র যন্ত্র বলিয়া উপলব্ধি হয়; এবং মনন-ক্রিয়ার যন্ত্র বলিয়া দেখিতে গেলে, অর্থাৎ পরোক্ষজ্ঞানের যন্ত্র বলিয়া দেখিতে গেলে উহাকে দ্বিগুণাত্মক যন্ত্র বলিয়া উপলব্ধি হয়—

অর্থাৎ উহার প্রত্যেক মণ্ডলার্দ্ধ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ এইরূপ প্রতীতি হয়।

যদি কোন রোগ-বশতঃ মস্তিষ্কের এক মণ্ডলার্দ্ধ অপসারিত বা একেবারে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে একদিককার গতি ও বোধ-ক্রিয়া সেই সঙ্গে বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু অপর মণ্ডলার্দ্ধের সাহায্যে মানসিক ক্রিয়া-সকল সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হইতে পারে। বিপরীত দিকের মস্তিষ্কের (মনে কর দক্ষিণ দিকের) কোন রোগ উৎপন্ন হইয়া যদি কোন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-বোধ এবং গতি-শক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার মনও সেই সঙ্গে অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে না—কারণ সেই ব্যক্তি অপর মণ্ডলার্দ্ধের সাহায্যে অনুভব করিতে পারে, ইচ্ছা করিতে পারে, চিন্তা করিতে পারে, বুঝিতে পারে। এই সকল ক্রিয়া পূর্ব্বেকার ন্যায় ততদূর বলবৎভাবে না চলুক কিন্তু তাহাদিগের সমগ্রতা সম্বন্ধে কোন ক্ষতি লক্ষিত হয় না।”

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কার্য্য-অনুসারে মস্তিষ্ককে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

মস্তিষ্কের তলদেশস্থ স্নায়ু-সঙ্গম শরীরের কার্য্য সকলকে নিয়মিত করে।

মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থ স্নায়ু-সঙ্গম ইন্দ্রিয়-প্রতিভাত বোধ-প্রতিবিম্ব-সকলের আধার-স্বরূপ হইয়া বাহ্য জগতের সহিত আমাদের যোগ নিবদ্ধ করে।

মস্তিষ্কের চূড়াদেশস্থ মণ্ডলার্দ্ধদ্বয় বুদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ। প্রতি মানসিক ক্রিয়ায়, সমস্ত মস্তিষ্ক কার্য্য করে, ইহাই ডাক্তার কার্পেণ্টরের মত। এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট, ইহাই ফ্রেনলজিষ্ট পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের মত। এই দুই মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য তাহাই অবধারিত করিবার জন্য ডাক্তার ফেরিয়র পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

এই সকল পরীক্ষা প্রধানতঃ বানর ও কুকুরের উপর প্রযুক্ত হইয়াছিল। বানরের উপর দিয়া যে পরীক্ষা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষাকৃত

অধিক প্রামাণ্য বলিতে হইবে, যেহেতু মনুষ্য-মস্তিষ্ক-গঠনের সহিত, বানর-মস্তিষ্ক-গঠনের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে।

ঐ সকল জন্তুকে ক্লরফরম্ দ্বারা অচেতন করিয়া মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ মস্তিষ্ক হইতে বাহির করিয়া, কিম্বা দহন-ক্রিয়ায় তাহাকে বিনষ্ট করিয়া এই সকল পরীক্ষা-কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল। ঐ সকল অংশে Electrode নামক তাড়িৎ-যন্ত্র প্রয়োগ করিয়া উহাদিগের ক্রিয়া-ফল অতি সাবধানে পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল।

এই সকল পরীক্ষার তন্ন তন্ন বিবরণের উল্লেখ না করিয়া কেবল তাহাদের কতকগুলি স্থূল সিদ্ধান্ত এখানে উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সমস্ত মস্তিষ্কই বেণীবন্ধন প্রণালী অনুসারে স্নায়ু-সমূহের সহিত সংযুক্ত।

শরীরের বাম ভাগ দ্বারা মস্তিষ্কের দক্ষিণ ভাগের এবং শরীরের দক্ষিণ ভাগ দ্বারা মস্তিষ্কের বাম ভাগের উত্তেজনা-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই প্রকার প্রণালী-অনুসারে বুদ্ধিযন্ত্রগত মস্তিষ্কের ক্রিয়াও নিয়মিত হয় কি না তাহা তিনি অবধারণ করিতে পারেন নাই—যেহেতু, জন্তুদিগের উপর এই সকল পরীক্ষা হওয়ায়, তাহাদিগের মস্তিষ্কের কোন্ অবস্থায় তাহাদের মনে কিরূপ ভাব উত্তেজিত হয় তাহা জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস এই যে, বুদ্ধি-যন্ত্রগত মস্তিষ্ক-মণ্ডলার্দ্ধ-যুগলেও এইরূপ প্রণালী-অনুসারেই কার্য্য হইয়া থাকে।

মস্তিষ্কের তলদেশস্থ বৃহৎ স্নায়ু-সঙ্গম বা উপমস্তিষ্ক তাড়িৎ দ্বারা বিনষ্ট করিয়া, পরীক্ষা-দ্বারা উহার সম্বন্ধেও এই একই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরীক্ষাতে এইরূপ সপ্রমাণ হইয়াছে যে এই স্নায়ু-সঙ্গম দুইটি অসদৃশ ও স্বতন্ত্র অর্দ্ধাংশে বিভক্ত হইলেও পরস্পর সংযুক্ত-ভাবে থাকা-প্রযুক্ত উহাদের কার্য্যগত সমানতা রক্ষিত হয় এবং শরীরের গতি-সমূহকে নিয়মিত করাই এই উপমস্তিষ্কের

বিশেষ কার্য্য। আমাদের শরীর দুই ভাগে বিভক্ত; এই দুই ভাগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেরূপ প্রত্যেকের স্বতন্ত্র গতি-ক্রিয়া আছে, সেইরূপ তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটা যোগের নিয়ম—একটা পরস্পর-সাপেক্ষিতার নিয়ম আছে; তদনুসারেই তাহাদিগের গতি-সকল নিয়মিত হয়; এবং এই উপমস্তিষ্কের প্রত্যেক অর্দ্ধাংশের স্বতন্ত্র ক্রিয়া এবং দুই অংশের সম্মিলিত ক্রিয়া থাকা প্রযুক্তই পূর্ব্বোক্ত প্রকার নিয়মে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি-সকল নিয়মিত হয়। এই তলস্থ স্নায়ু-সঙ্গম-যন্ত্রে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইলে শারীরিক গতি-ক্রিয়ারও ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়; এতদূর ব্যতিক্রম হয় যে, কোন জন্তুর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল যে "সিধা চলিবার" শক্তি তাহার একেবারে অপহৃত হওয়ায় সে চক্রাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মস্তিষ্কের যেটি দ্বিতীয় ভাগ—যাহা সমস্ত মস্তিষ্কের কেন্দ্রদেশে অবস্থিত এবং যাহার উপরিভাগে বুদ্ধি-যন্ত্রগত মস্তিষ্ক-মণ্ডল আধিপত্য করিতেছে,—সেই মস্তিষ্ক-বিভাগের উপর ইন্দ্রিয়-স্নায়ুগুলি আসিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে—ইহাও পরীক্ষাতে দৃষ্ট হইয়াছিল। এই দ্বিতীয় স্নায়ু-সঙ্গমটি বাহ্য জগৎ-প্রেরিত প্রতিবিম্ব-সকলের কেন্দ্রস্থল—ঐখান হইতেই ঐ সকল প্রতিবিম্বের সংবাদ বুদ্ধিযন্ত্রগত মস্তিষ্কে নীত হয়। পরীক্ষা দ্বারা এইরূপ আরও আভাষ পাওয়া যায় যে, এই স্নায়ু-সঙ্গম-স্থিত প্রত্যেক অংশ এক একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-ক্ষেত্র; এই সকল বিভিন্ন অংশের বিনাশে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-নাশ কিম্বা কার্য্য-লাঘব উপস্থিত হয়। এই মস্তিষ্ক-বিভাগ দ্বিগুণাত্মক—যেহেতু এই স্নায়ু-পুঞ্জীভূত উপমস্তিষ্কের দক্ষিণ দিক বিনষ্ট হইলে শরীরের বাম ভাগস্থ ইন্দ্রিয় সকলের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয় এবং এই উপমস্তিষ্কের বাম ভাগ বিনষ্ট হইলে শরীরের দক্ষিণ ভাগস্থ ইন্দ্রিয়-সকল অসাড় হইয়া পড়ে।

এইখানে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। মস্তিষ্কের এই ইন্দ্রিয়-

বোধগ্রাহী অংশটির প্রকৃত কার্য্য কি? যে সকল প্রতিবিম্ব উহার নিকট আনীত হয়, উহা নিজেই কি ঐ সকল প্রতিবিম্বের বোধ-গ্রাহী না উপরিস্থ মস্তিষ্কমণ্ডলে ঐ সকল প্রতিবিম্বের সংবাদ বহন করিবার দূত-মাত্র? সুস্থ অবস্থায় বহির্জগৎ হইতে যে সকল প্রতিবিম্ব উহার নিকট উপস্থিত হয়, উহা যে ঐ সকল প্রতিবিম্বের অবিকল সংবাদ উপরিস্থ মস্তিষ্কমণ্ডলে বহন করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়াতে তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। ইহাও আমরা অবগত আছি যে, মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে নানা প্রকার মিথ্যা সংবাদ বুদ্ধির নিকট আনীত হয়। এই মস্তিষ্ক-অংশটি স্বয়ং কর্ত্তা—না ক্রিয়ার আধার মাত্র, ইহা অবধারিত করিতে পারিলে, নিদ্রা ও স্বপ্নবিষয়ক মানসিক তত্ত্বানুসন্ধান-পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়।

আচার্য্য ফেরিয়রের পরীক্ষা-সমূহ দ্বারা এই প্রশ্নটির এক প্রকার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তিনি একবার একটা বানর ও একটা কুকুরের পুরোমস্তিষ্ক-মণ্ডলার্দ্ধদ্বয় অপসারিত করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহাদের জীবনের কিম্বা স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র ব্যাঘাত বা বৈলক্ষণ্য হয় নাই, কেবল তাহাদের বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছিল মাত্র। তাহাদিগের ইন্দ্রিয়-বোধ লোপ হয় নাই—ইন্দ্রিয়-স্নায়ু-আনীত প্রতিবিম্ব-সকল যে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে তাহা স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। বুদ্ধির যন্ত্র অপসারিত করিবার পূর্ব্বে বাহ্যজগৎ —হং নিমিত্তই, উপলব্ধি করিত, এখনও সেইরূপ করিতে লাগি— নিদ্রাবস্থায় তাহার উপমস্তিষ্ক শরীরের পৈশিক গতিকে নিয়মি—ৎ থাকে—কারণ স্বপ্না-ভিন্ন যখন তাহার মস্তিষ্কের আর কোন—ত পারি; কিন্তু শরীরের তখন ইন্দ্রিয়-বোধের ক্রিয়াও বন্ধ হইয়া—র ইচ্ছার আজ্ঞা শরীর পালন তখনও থাকা প্রযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি

ইন্দ্রিয়-বোধ-ক্রিয়ার আধার-স্বরূপ—র কেন্দ্রস্থ ও তলদেশস্থ বিভাগই হইলে আমরা নিদ্রিত হই না।

উপর যে দুইটি মস্তিষ্ক-মণ্ডলার্দ্ধ অবস্থিত, তাহাই বুদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ। এই দুই মণ্ডলার্দ্ধের প্রত্যেক অর্দ্ধই স্বতন্ত্র ও স্বসম্পূর্ণ। প্রত্যেক অর্দ্ধই অপরার্দ্ধের সাহায্য-ব্যতীত কার্য্য করিতে সমর্থ। উচ্চতর মানসিক ক্রিয়াই এই দুই মণ্ডলার্দ্ধের বিশেষ কার্য্য। উহাদের সাহায্যেই আমরা চিন্তা করি, বিচার করি, এবং অনুভব করি। এই মস্তিষ্ক-মণ্ডলার্দ্ধের কোন অংশ নষ্ট হইলে মনেরও কিয়দংশ অর্থাৎ কোন-কোন মানসিক বৃত্তি নষ্ট হয়—সমস্ত মনের ক্রিয়াশক্তি নষ্ট হয় না।

এই মস্তিষ্কমণ্ডলার্দ্ধদ্বয়ের সমস্তই নষ্ট হইয়া গেলে বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, কিন্তু মৃত্যু হয় না। পাঠকগণের এইটি যেন স্মরণ থাকে যে, সমস্ত মস্তিষ্কের তিনটি প্রধান বিভাগ। বুদ্ধির যন্ত্র-স্বরূপ বিভাগটি চূড়ায় অবস্থিত—ইন্দ্রিয়ের যন্ত্র স্বরূপ বিভাগটি কেন্দ্র-দেশে অবস্থিত—এবং শারীরিক গতিক্রিয়ার যন্ত্রস্বরূপ বিভাগটি তলদেশে অবস্থিত।

১। পুরোমস্তিষ্ক।

২। কেন্দ্রস্থ উপমস্তিষ্ক।

৩। তলস্থ উপমস্তিষ্ক।

এই তিনটি প্রধান বিভাগের আবার অন্যান্য উপবিভাগ আছে—এ প্রসঙ্গে তাদের আলোচনা অনাবশ্যক।

শ.. জাগৎ অবস্থায় কিম্বা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সমস্ত মস্তিষ্কই জাগ্রৎ একটি স্বতন্ত্র হ...ার সকল অংশই একত্র মিলিয়া পরস্পরাপেক্ষী হইয়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কা...র্ত্তি-সকল ইন্দ্রিয়বোধদিগকে সংশোধন করে; মস্তিষ্ক-বিভাগ দ্বিগুণাত্মক বৃত্তিকে সংশোধন করে; হৃদয়-গত ভাবের দক্ষিণ দিক বিনষ্ট হইলে শরী...দয়ের ভাব-সকল ইচ্ছা-শক্তির বলবিধান উপস্থিত হয় এবং এই উপমস্তি...পর কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিয়া বুদ্ধি এবং দক্ষিণ ভাগস্থ ইন্দ্রিয়-সকল অসার্দ্ধাৎ যাহাকে আমরা সচরাচর "মন" বলি এইখানে একটি প্রশ্ন উপস্থি...তর নিকট প্রকটিত করে।

নিদ্রাবস্থায় এই পারস্পারিক সম্বন্ধটি ভাঙ্গিয়া যায়। বুদ্ধিবৃত্তি সকল ইন্দ্রিয়বোধদিগকে আর সংশোধন করে না—ইন্দ্রিয়বোধ-সকল কল্পনা-বৃত্তিকে আর সংশোধন করে না—হৃদয়ের-ভাব-সকল ইচ্ছা-শক্তিকে আর উত্তেজিত করিতে পারে না—শরীর ও মনের উপর ইচ্ছা-শক্তিরও কর্ত্তৃত্ব আর বলবৎ থাকে না। স্বপ্নহীন সুষুপ্তির সময় যাই হোক্ না কেন, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় সমস্ত মস্তিষ্ক-যন্ত্র যে নিদ্রিত হয় না তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উহার কিয়দংশ অবশ্য জাগ্রৎ ও সক্রিয় থাকে—সেই জাগ্রৎ অংশটি কোন্ অংশ ?

ইহা নিশ্চিত যে, স্বপ্নাবস্থায় মস্তিষ্ক-মণ্ডলার্দ্ধদ্বয় সম্পূর্ণরূপে কিংবা আংশিকরূপে জাগ্রৎ থাকে। গভীর নিদ্রাবস্থায়, ইন্দ্রিয়বোধের আধার—কেন্দ্রস্থ স্নায়ু সঙ্গম সম্পূর্ণরূপে নিদ্রিত হয়। নিদ্রার সকল অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রিত থাকে—তবে, কখন কখন ততটা গভীর-রূপে নিদ্রিত হয় না যাহাতে-করিয়া ইন্দ্রিয়-বাহিত প্রতিবিম্ব-সকল চেতনা-বান্ আত্মার একেবারেই অগোচর হইয়া পড়ে। মস্তিষ্কের যে অংশটি শারীরিক গতিক্রিয়াকে নিয়মিত করে সেই তলস্থ উপমস্তিষ্কও নিদ্রার আয়ত্তাধীন। এইরূপেই নিদ্রার প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। শরীরের জড়-যন্ত্রকে বিশ্রাম দিবার নিমিত্ত—তাহার পরিবর্দ্ধন ও নবীকরণার্থ অবসর দিবার নিমিত্তই প্রধানতঃ নিদ্রার প্রয়োজন। এই নিমিত্তই, ইচ্ছা-শক্তি জাগ্রৎ-অবস্থায় শরীরকে চালিত করে, নিদ্রাবস্থায় তাহার কর্ত্তৃত্ব স্থগিত হইয়া যায়। স্বয়ং ইচ্ছা-শক্তি জাগ্রৎ থাকে—কারণ স্বপ্না-বস্থাতেও আমাদিগের ইচ্ছা অনুভব করিতে পারি; কিন্তু শরীরের জড়যন্ত্র নিদ্রিত থাকে বলিয়াই আমাদিগের ইচ্ছার আজ্ঞা শরীর পালন করে না এই মাত্র।

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে—মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থ ও তলদেশস্থ বিভাগই নিদ্রার আধার। তাহারা নিদ্রিত না হইলে আমরা নিদ্রিত হই না।

পুরোমস্তিষ্ক-মণ্ডলদ্বয় সেই সময় সম্পূর্ণরূপে জাগ্রৎ থাকিলেও, উক্ত উপমস্তিষ্কদ্বয় নিদ্রিত হইলেই আমরা নিদ্রিত হই ।

আমাদের মনের প্রকৃতি এই যে, একটি ভাবের সংসর্গ বা সংস্রবে আর একটি ভাব পরম্পরাক্রমে উদ্বোধিত হয়। আমাদের মানসিক ভাব-প্রতিবিম্ব সকল পরস্পর এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আছে যে, উহার একটির উদয় হইলে, আর কতকগুলি ভাব-প্রতিবিম্ব তাহার সঙ্গে সঙ্গে উদয় হয়। অনেক সময় আমাদের মনে এমন অনেক ভাবের উদয় হয়, যাহার সূত্র আমরা ধরিতে পারি না, কি প্রকার অনুষঙ্গ-নিয়মে তাহাদের উদয় হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বিলক্ষণ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে ইন্দ্রিয়োপনীত কোন বাহ্য প্রতিবিম্ব আমাদের মনে অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল ভাব কিংবা চিন্তা-শ্রেণীর প্রথম সূত্রপাত করিয়া দেয়।

আমাদের জাগ্রৎ-অবস্থায় মনোমধ্যে ইন্দ্রিয়োপনীত অসংখ্য বাহ্য প্রতিবিম্ব চারিদিক্ হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়; নিদ্রাবস্থাতেও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্য্য যে একেবারে নিবৃত্ত হয় না, তাহা পাঠক মাত্রেই নিজ নিজ পরীক্ষায় অবগত আছেন। তবে, সে সময় যে-সকল বাহ্য প্রতিবিম্ব ইন্দ্রিয়-দ্বারা মনে উপনীত হয়, তাহার সংখ্যা অতি অল্প। নিদ্রার সময় কখন-কখন কোন সামান্য মৃদু শব্দ কর্ণে পতিত হইলে মনে হয় বুঝি কামানের আওয়াজ হইল।

এইরূপে একবার কোন সূত্রে কোন-একটি মানসিক প্রতিবিম্ব মনোমধ্যে উদ্বোধিত হইলেই তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য নানা প্রকার মানসিক প্রতিবিম্বের উদয় হয়। এবং ঐ সকল প্রতিবিম্বের উদয়ে জাগ্রৎকালে হৃদয়ে যে সকল ভাব অনুভূত হয়—স্বপ্নাবস্থাতেও ঠিক সেই সকল ভাব উত্তেজিত হইয়া থাকে। অতএব ঐ পর্য্যন্ত জানা যাইতেছে যে, নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থায় মন ও হৃদয়ের ভাব-সকল নিদ্রিত হয় না;—

সকল না হউক, কতকগুলি ভাব যে জাগ্রৎকালের ন্যায় সমানরূপে সক্রিয় ও ব্যস্ত থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইচ্ছাও নিদ্রিত হয় না, কেবল ইচ্ছার কর্ত্তৃত্ব-শক্তিই তিরোহিত হয়। স্বপ্নাবস্থায় আমরা যে নানা প্রকার কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে আমাদের ইচ্ছার আদেশ শরীর পালন করে না এইমাত্র। আমরা অনেক সময়ে স্বপ্ন দেখি যেন আমরা কোন বিপদে পতিত হইয়াছি—সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, সেই বিপদের স্থল হইতে পলাইবার নিমিত্ত, আমরা আমাদিগের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকলকে চালিত করিবার জন্য কত চেষ্টা করি এবং আমাদের চেষ্টার বিফলতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া স্বপ্নাবস্থাতেই কত সময় কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। নিদ্রাবস্থায় মস্তিষ্ক-মণ্ডলদ্বয় জাগ্রৎ থাকে, আর কেন্দ্রস্থ ও তলস্থ উপমস্তিষ্কদ্বয় নিদ্রিত হয়,—এই যে মতটি ইহার সহিত স্বপ্ন ব্যাপারের কোন বিরোধ দেখা যায় না, প্রত্যুত স্বপ্ন-ব্যাপার দ্বারাই উহা সপ্রমাণ হয়। তবে এই উপমস্তিষ্ক-মণ্ডলের মধ্যেও কতক অংশ নিদ্রিত ও কতক অংশ জাগ্রৎ থাকে কি না, তাহা আর একটি সমস্যার বিষয়।

আচার্য্য ফেরিয়র পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রত্যেক উপমস্তিষ্কেরই যে স্বতন্ত্র কার্য্য শুদ্ধ তাহা নহে, প্রত্যেক উপমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশেরও আবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি উপমস্তিষ্কগুলির প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র কার্য্য থাকা সত্য হয়, তাহা হইলে মুখ্যমস্তিষ্ক--মণ্ডলদ্বয়ের প্রত্যেক অংশেরও যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। কিন্তু আমরা অবগত আছি যে উহার অংশসকল বেণীবন্ধন-প্রণালীর অনুরূপ পরস্পর সংজড়িতভাবে না থাকুক, পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠভাবে একত্র আবদ্ধ আছে। এই জন্য সহসা অনুভব করিতে পারা যায় না যে, কি করিয়া উহার এক অংশ

নিদ্রিত ও তৎসংলগ্ন অপর অংশটি জাগ্রৎ থাকিবে। বিশেষতঃ আমরা আরও অবগত আছি যে, নিদ্রাবস্থায় রক্ত-রাশি মস্তিষ্কের অংশমাত্র হইতে নহে—পরন্তু সমস্ত মস্তিষ্ক-মণ্ডলার্দ্ধ হইতেই অপসৃত হইয়া যায়।

কিন্তু সে যাহাই হউক, স্বপ্নের প্রকৃতিগত কোন-কোন লক্ষণ দেখিয়া কেহ-কেহ অনুমান করেন যে, স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধি-যন্ত্র-গত কোন কোন অংশের ক্রিয়াও স্থগিত হইয়া যায়। আমরা যাহা স্বপ্ন দেখি তাহা যে অবাস্তব ইহা স্বপ্নাবস্থায় আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। যাহা অসঙ্গত ও অসম্ভব তাহা অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। অনেকদিনকার মৃত ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় যখন আমাদিগের নিকট উপস্থিত হন, তখন আমরা অনেক সময় বিস্মিত হই না। গভীর জলের উপর দিয়া আমরা হাঁটিয়া যাই, শূন্যে উড়িয়া বেড়াই, তাহাতে অনেক সময় আশ্চর্য্য হই না। যতই কেন অসাধ্য, যতই কেন অসম্ভব ব্যাপার হউক না—তাহাতে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে।

মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের সাধারণ মতটি এই যে, নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়-গণের কার্য্য স্থগিত হয় বলিয়া তাহারা অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ার ভ্রম সংশোধন করিতে পারে না।

মন, স্বসৃষ্ট ব্যাপারের সহিত কোন বাহ্য বস্তুর তুলনা করিতে পারে না বলিয়াই সেই সকল ব্যাপারকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করে। জাগ্রৎ অবস্থার ঘটনা-সকল মন যেরূপ অসন্দিগ্ধ ভাবে বিশ্বাস করে—স্বপ্ন-গত ঘটনা-সকলের অস্তিত্বেও তেমনি তাহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে; যেহেতু, সে সময় এই উভয়বিধ ঘটনার মধ্যে কি প্রভেদ তাহা উপলব্ধি করিবার কোন উপায় থাকে না।

কিন্তু Cox নামক কোন পণ্ডিত এইরূপ আপত্তি করেন—"ভাল, মানিলাম, মনের মধ্যে ঐ সকল অসম্ভব ঘটনার অস্তিত্ব উপলব্ধি

করি বলিয়াই উহাদের বাহ্য অস্তিত্বেও আমাদের বিশ্বাস জন্মে; কিন্তু যখন মৃত ব্যক্তিকে সজীব দেখি, দূরকে নিকটে দেখি, অসম্ভব অসাধ্য ব্যাপারকে অনায়াসে সম্পন্ন করি, তখন আমরা বিস্মিত হই না কেন?"

প্রথমতঃ এরূপ স্থলে যে বিস্ময় কখনই উদয় হয় না, তাহা কি সত্য?

স্বপ্নব্যাপার সকলেরই পরীক্ষাধীন। আমি নিজ পরীক্ষার কথা বলিতেছি—আমি কোন অসম্ভব ঘটনার স্বপ্ন দেখিয়া কখন বা বিস্মিত হইয়াছি, কখনও বা বিস্মিত হই নাই। যখন মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে সজীব দেখিয়াছি—কিংবা শূন্যে উড়িতেছি, তখন কখন বা আশ্চর্য্য হইয়াছি, কখন বা হই নাই। অধিকাংশ সময়ে যে আমরা আশ্চর্য্য হই না, তাহার কারণ এই যে, হাজার অসম্ভব ঘটনা হউক না কেন, যখন আমি মনের স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তখন অবশ্য উহা অসম্ভব নহে—উহা তো হইতেই পারে, উহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই—এইরূপ যুক্তি-পরম্পরা দ্রুতগতি মনোমধ্য দিয়া চলিয়া যায়। জাগ্রৎ অবস্থায় যদি কোন অসম্ভব ব্যাপারের কল্পনা আমাদের মনোমধ্যে উদয় হয়—আর যদি সেই কল্পনা এতদূর দৃঢ়রূপে মনকে অধিকার করে যে, আমাদিগের বাহ্যজ্ঞান পর্য্যন্ত কিয়ৎকালের জন্য তিরোহিত হয়, তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণের জন্য সেই কল্পনা-গত ব্যাপারকে জাগ্রৎ অবস্থাতেও বাস্তব বলিয়া বিশ্বাস হয়, কিন্তু যখনি আবার আমাদের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আইসে, তখনি কল্পনাগত বিষয়কে বাহ্যপদার্থের সহিত তুলনা করিয়া সে ভ্রম দূর হইয়া যায়। স্বপ্নাবস্থায় যে আমাদের বিচার-শক্তি, তুলনা-শক্তি একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়—এ কথা সত্য নহে। মনের মধ্যে যে সকল প্রতিবিম্ব বিচারের মূল-উপকরণ স্বরূপ বিদ্যমান থাকে সেই উপকরণগুলি লইয়াই তখন মন বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই মূল-উপকরণগুলিকে পত্তনভূমি করিয়া

যুক্তি-পরম্পরা-অনুসারে যেরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে, মন সেইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়। বিচারের উপস্থিত মূল-উপকরণ ধরিতে গেলে—সে হিসাবে বিচারের সিদ্ধান্ত অনেক সময় যুক্তিসিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আসলে সত্য নাও হইতে পারে। সে সিদ্ধান্ত যে সত্য হয় না, তাহা অনেক স্থলে বিচারের দোষ নহে, পরন্তু উপস্থিত মূল-উপকরণের অসম্পূর্ণতাই তাহার হেতু। মন, মানসিক বিষয়গুলির সহিত বাহ্য বিষয়ের তুলনা করিতে পারে না বলিয়াই অনেক সময়ে স্বপ্নাবস্থার সিদ্ধান্ত সত্য হয় না। কিন্তু যে-সকল স্থলে বাহ্য-বস্তুর সহিত তুলনার আবশ্যক হয় না—সে-সকল স্থলে মন স্বপ্নাবস্থায় অনেক সময়ে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এরূপ তো অনেক শোনা গিয়াছে যে কোন-কোন গণিত-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত যে-সকল সমস্যা জাগ্রদবস্থায় সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, স্বপ্নাবস্থায় তাহার যথার্থ সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অনেক সময় আমরা স্বপ্নে বক্তৃতা করি—প্রবন্ধ লিখি; সেই সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধ অনেক সময় বেশ যুক্তিগর্ভ হয়। যুক্তিগর্ভ হইয়াছে বলিয়া যে শুধু আমরা স্বপ্ন দেখি তাহা নহে—জাগ্রৎ হইয়া যখন সে স্বপ্ন-গত বক্তৃতা কিংবা প্রবন্ধ আমাদের স্মরণে আইসে, তাহাতে বাস্তবিকই কোন প্রকার যুক্তির দোষ দেখিতে পাই না।

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, আমাদের মস্তিষ্কের তলস্থ উপমস্তিষ্ক, যাহা শরীরের গতিক্রিয়াকে নিয়মিত করে, সেই তলস্থ উপমস্তিষ্কের উপরেই নিদ্রার অধিক প্রভাব, তাহার নীচে ইন্দ্রিয়-প্রতিবিম্ব-গ্রাহী উপমস্তিষ্কের উপর—তাহার নীচে বুদ্ধির যন্ত্র-স্বরূপ চূড়ান্ত মস্তিষ্ক-মণ্ডলের উপর। যখন আমাদিগের মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশগুলি নিদ্রিত হয়, কেবল এই বুদ্ধিযন্ত্রগত চূড়ান্ত-মস্তিষ্কটি জাগ্রৎ থাকে—তখনই আমরা স্বপ্ন দেখি, এই স্বপ্ন-ব্যাপার পরীক্ষা করিয়া আমরা মন ও আত্মার প্রকৃতি অনেক পরিমাণে নিরূপণ করিতে পারি। আর একটি সুবিধার

বিষয় এই যে, স্বপ্ন-ব্যাপার পরীক্ষা করা সকলেরই আয়ত্তাধীন। আর, কি জড়বাদী কি প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী-সম্প্রদায়, এ প্রকার পরীক্ষা কাহারই অবজ্ঞার বিষয় নহে। কারণ স্বপ্ন-ব্যাপারের অস্তিত্বকে কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। এই স্বপ্নাবস্থায় মন ও আত্মার কোন্ কোন্ বৃত্তি সক্রিয় আর কোন্ বৃত্তিই বা নিষ্ক্রিয় থাকে তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

সে সময় কি আমাদের অহংবোধ তিরোহিত হয়?—না; স্বপ্নের সময় আমাদের অহংবোধ বিলক্ষণ থাকে। স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি কখন মনে করে না যে সে অন্য ব্যক্তি। সে এরূপ স্বপ্ন দেখিতে পারে, যেন সে রাজা কিংবা ভিখারী কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সে রাজাই হোক্, ভিখারীই হোক্,—বা অন্য যে কেহই হোক্ —তাহার নিজত্ব-বোধ যে লুপ্ত হয় না, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, সে কেবল অন্যের চরিত্র অভিনয় করে এই মাত্র।

আমাদের ইচ্ছা কি সে সময় একেবারে তিরোহিত হয়?—না, তাহাও হয় না। স্বপ্নদর্শী মন, সে সময় উপলব্ধি করিতে পারে যে, সে তার ইচ্ছাকে চালনা করিতেছে, এবং সে বিশ্বাস করে, সে যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে তাহাই সম্পন্ন হইতেছে। তাহার ইচ্ছা-শক্তি সে সময় সম্পূর্ণ থাকে, তবে তাহার ইচ্ছার আজ্ঞা শরীর বাস্তবিকপক্ষে পালন করে না। জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা কথা কহিতে ইচ্ছা করি, দৌড়িতে ইচ্ছা করি, কিংবা অন্য কোন প্রকার কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি, স্বপ্নাবস্থাতেও আমরা ঠিক সেইরূপ করিয়া থাকি। তবে প্রভেদ এই, আমাদের শরীরের স্নায়ুযন্ত্র সে-সকল ইচ্ছাকে সে সময়ে বাস্তবিক কার্য্যে পরিণত করে না।

কল্পনা-শক্তি তো জাগ্রৎ অবস্থা-অপেক্ষা স্বপ্নাবস্থাতেই আরও অধিক বলবৎ ও সক্রিয় হইয়া উঠে। বুদ্ধিবৃত্তি-সকলও সে সময় নিষ্ক্রিয় হয় না— কারণ, স্বপ্নাবস্থায় আমরা বেশ বিচার করিতে পারি। তবে, যে পূর্ব্বপক্ষ-

সমূহকে পত্তনভূমি করিয়া আমরা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই—সেই পূর্ব্ব-পক্ষগুলি ঠিক না হইতে পারে, তৎপ্রযুক্তই আমাদিগের সিদ্ধান্তও অনেক সময় মিথ্যা হইয়া যায়। আমাদের অহংজ্ঞানের সমক্ষে যে কোন প্রতিবিম্ব উপস্থিত হয়, তাহাই আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি এবং সেই সকল প্রতিবিম্ব-রূপ উপকরণ লইয়াই আমরা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই।

হৃদয়ের ভাব-সকলও স্বপ্নাবস্থায় অন্তর্হিত হয় না। স্বপ্ন-কল্পিত ঘটনাগুলি সত্য হইলে জাগ্রৎ অবস্থায় আমাদের হৃদয়ের ভাব যেরূপ উত্তেজিত হইত, স্বপ্নাবস্থাতেও ঠিক সেইরূপ উত্তেজিত হয়। স্বপ্ন-কল্পিত ঘটনাগুলি আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি কেন ?—না যেহেতু তাহাদিগের সত্তা আমরা মনোমধ্যে উপলব্ধি করি।

বাহ্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মন যখন কার্য্য করে—মনের এই বিচ্ছিন্ন অবস্থার ক্রিয়া-সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই সত্যটি আমাদের মনে প্রতিভাত হয় যে, মনোমধ্যে এমন কোন একটি পদার্থ আছে যাহা বাহ্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন—বাহ্য জগতের অনস্তিত্বে তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় না—সে আপনার অভ্যন্তরে আর একটি নূতন জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে থাকিতে পারে।

শুদ্ধ তাহা নহে। যে পদার্থ নিদ্রার সময় বাহ্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাতেই আপনি অবস্থিতি করে, শরীর নিদ্রিত হইলেও যে পদার্থ নিদ্রিত হয় না, যাহার নিজ অস্তিত্ব-জ্ঞান বরাবর সমান থাকে, যাহার স্মরণ-শক্তি আছে, যাহার সুখদুঃখের জ্ঞান আছে, সে যে জড়ীয় মস্তিষ্ক নহে, সে যে মস্তিষ্করূপ জড়-পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ-রূপে ভিন্ন,—এই অনুমান কি নিতান্ত অমূলক? নিদ্রার সময় শরীর মৃতবৎ হইলেও যে পদার্থটি জীবিত থাকিয়া কার্য্য করে—এই নিদ্রারূপ ক্ষণিক বিচ্ছেদের স্থলে যখন মৃত্যু আসিয়া শরীরের সহিত চিরবিচ্ছেদ

ঘটাইয়া দেয়, তখনও কি সেই পদার্থ নূতন জীবনের উপযোগী অন্যান্য নূতন শক্তি লাভ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না ?

স্বপ্ন-কল্পিত বিষয় সকলের অস্তিত্বে আমরা অসন্দিগ্ধচিত্তে বিশ্বাস করি কেন ? বুদ্ধিবৃত্তি-সকলের অন্তর্ধান তাহার হেতু নহে, যেহেতু বুদ্ধি-বৃত্তি-সকল সম্পূর্ণরূপে সে সময় কার্য্য করে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, স্বপ্ন-কল্পিত ছবিগুলিকে ইন্দ্রিয়োপনীত প্রতিবিম্ব বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, এই জন্যই তাহাদিগকে বাস্তবিক বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমরা সমস্ত বাহ্য পদার্থই ইন্দ্রিয়-দ্বারা উপলব্ধি করি, কিম্বা মনের মধ্যে কোন প্রতিবিম্ব উদিত হইলে সেই প্রতিবিম্বকে উপলব্ধি করি। আমাদের সকল প্রকার বোধক্রিয়াই মানসিক। বাহ্য বস্তুকে আমরা অব্যবহিত-রূপে দেখিতে পাই না—বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব মনোমধ্যে দেখিয়া তবে আমরা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। অতএব মানসিক প্রতিবিম্ব-গুলির সহিতই আমাদিগের অব্যবহিত সম্বন্ধ।

কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা এই অন্তর-উৎপন্ন প্রতিবিম্ব এবং ইন্দ্রিয়োপনীত বাহ্য প্রতিবিম্বগুলির মধ্যে কি প্রকারে প্রভেদ নিরূপণ করিতে সমর্থ হই ? বাহ্য প্রতিবিম্বগুলিকে বাস্তব ও অন্তরোৎপন্ন প্রতি-বিম্বগুলিকে অবাস্তব বলিয়া কি প্রকারে চিনিতে পারি ? তাহার দৃষ্টান্ত ;—মনে কর কোন অনুপস্থিত বন্ধুকে তোমার কল্পনা-চক্ষে দেখিতেছ, তাঁহার একটি ছবি তোমার মনোমধ্যে উদয় হইল—এই ছবিটি সম্পূর্ণ-রূপে তোমার বন্ধুর অনুরূপ নাও হইতে পারে, এক আধ-টুকু তফাৎ হইতেও পারে। তার পর মনে কর, সেই বন্ধুকে আবার চর্ম্ম-চক্ষে তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে, তাঁহার মূর্ত্তির ইন্দ্রিয়-বাহিত আর একটি প্রতিবিম্ব, আর একটি ছবি, আবার তোমার মনোদর্পণে পতিত হইল ; এই কাল্পনিক ছবি এবং এই ইন্দ্রিয়-বাহিত ছবি উভয়ই তোমার মনো-মধ্যেই প্রতিবিম্বিত হওয়া প্রযুক্ত উভয়কেই মানসিক প্রতিবিম্ব বলিতে

হইবে। এ উভয়ই মানসিক প্রতিবিম্ব, অথচ তুমি একটিকে কাল্পনিক এবং আর একটিকে বাস্তবিক বলিয়া জানিতেছ—তাহার অর্থ এই, একটির বাহ্য অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না—আর একটি তোমার মনের বাহিরে অবস্থিতি করিতেছে বলিয়া তুমি জানিতে পারিতেছ।

কি প্রণালী-অনুসারে এইরূপ সিদ্ধান্তে তুমি উপনীত হইলে—উহাদের প্রভেদ নিরূপণ করিতে কিরূপে সমর্থ হইলে?

আর কিছুই নহে—তোমার ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াকে তুমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছ বলিয়াই তুমি তাহাদের প্রভেদ নিরূপণ করিতে সমর্থ হইতেছ। তুমি অনুভব করিতে পারিতেছ যে তোমার চক্ষু তোমার বন্ধুর মূর্ত্তি দর্শনে নিযুক্ত হইয়াছে, আর ভূয়োদর্শনেও তোমার এই জ্ঞানটি জন্মিয়াছে যে, ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক বাহ্য বস্তুর সংবাদ আসিলে তবেই তাহা বাস্তব বলিয়া তোমার গ্রাহ্য, নচেৎ নয়। আমাদিগের জাগ্রৎ অবস্থায় এই প্রণালী-অনুসারেই ইন্দ্রিয়গণ মানসিক ক্রিয়াকে সংশোধন করে এবং ইন্দ্রিয়-প্রেরিত সংবাদ অবগত হইয়াই আমরা বাস্তব ও কাল্পনিকের মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ করিতে সমর্থ হই।

অতএব স্বপ্নাবস্থায় কাল্পনিককে কেন আমরা বাস্তবিক বলিয়া গ্রহণ করি, তাহার কারণ এক্ষণে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে। মন জাগ্রদবস্থায় যাহার সাহায্যে অবাস্তব ও বাস্তবের প্রভেদ নিরূপণ করিতে পারে, নিদ্রাবস্থায় সেই ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রযুক্ত তাহা আর পারে না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হয় যে, যত কিছু প্রতিবিম্ব মনে পতিত হয়, সমস্তই এক প্রকার বলিয়া মনের নিকট প্রতীয়মান হয়। অতএব যেহেতু, মনের যত কিছু প্রতিবিম্ব সমস্ত গোড়ায় ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃকই আনীত, সেই জন্য যখন কোন প্রতিবিম্ব মনোমধ্যে আসিয়া উদয় হয়, তখন মন নিরূপণ করিতে পারে না যে, ঐ

প্রতিবিম্বটি সদ্য বাহির হইতে মনোমধ্যে প্রবেশ করিল, না পূর্ব্বে যে প্রতিবিম্ব আসিয়া অবস্থান করিতেছিল তাহাই উদ্বোধিত হইল মাত্র।

এই জন্যই মন স্বপ্নাবস্থায় স্বসৃষ্ট কল্পনাগুলিকে বাস্তব বলিয়া না ভাবিয়া থাকিতে পারে না এবং এই খণ্ড খণ্ড কল্পনাগুলি যখন আবার স্বপ্নে একটি নাটকাকারে সংসূত্রিত হয়, তখন মন ভাবে যে, এই নাটকবৎ স্বপ্ন-গত ঘটনাগুলি বাস্তবিক জগতে বুঝি সত্যই সংঘটিত হইতেছে।

ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমাদের অন্তরে এমন একটি পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহা মস্তিষ্ক-ক্রিয়া সকলের সমালোচক ও সাক্ষী-স্বরূপ,—সুতরাং মস্তিষ্ক হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। সেই পদার্থটিই আত্মা।

সৃষ্টির আণবিক জড়-অংশের সহিত যোগ স্থাপন করিবার উদ্দেশেই ইহলোকে,--আমাদের উন্নতির এই বর্ত্তমান অবস্থায়, আমাদের আত্মা জড়যন্ত্র-দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে মাত্র।

স্বপ্ন-ব্যাপার পরীক্ষা করিয়া আরও এই একটি বিষয় আমরা জানিতে পারি, যে সময় শরীরের সহিত মনের যোগ শিথিল হয় সেই স্বপ্নাবস্থায় আমাদের মানসিক বৃত্তি-সকল নিস্তেজ হওয়া দূরে থাকুক, জাগ্রদবস্থা অপেক্ষা অসংখ্যগুণে স্ফূর্ত্তি লাভ করে। রচনাশক্তি কল্পনাশক্তি সে সময় অত্যন্ত প্রবল হয়। যে ব্যক্তি অত্যন্ত মূর্খ ও নির্ব্বোধ, সেও স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয়—জাগ্রৎ অবস্থায়—যে সময় সকল মানসিক বৃত্তিই সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্ত থাকে—তখন সেরূপ পারে না। প্রত্যেক স্বপ্নই এক একটি গল্প বিশেষ। অনেক স্বপ্ন আবার নাটকের ন্যায়—তাহাতে শুদ্ধ যে একটি গল্প মাত্র থাকে তাহা নহে—বাস্তবিক জীবন-রঙ্গভূমিতে যেরূপ বিভিন্ন প্রকার চরিত্র দৃষ্ট হয়, তাহাতেও সেইরূপ নানা প্রকার চরিত্র অভিনীত হয়।

অতএব স্বপ্নদর্শী মন শুদ্ধ যে একটি গল্পমাত্র রচনা করে তাহা নহে, তন্মধ্যস্থিত পাত্রগণের চরিত্র পর্য্যন্ত রচনা করে। যে পাত্রের মুখে যে কথা শোভা পায়, তাহার মুখে সেই কথাই বসাইয়া দেয়। স্বপ্নে আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এই দেখা যায় যে, মানসিক ক্রিয়ার বেগ সে সময় আশ্চর্য্যরূপ দ্রুত হয়। জড়-শরীরের জড়বৎ গতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বপ্নদর্শী মন জাগ্রদবস্থার কাল-পরিমাণকে অনেকগুণে অতিক্রম করে। যে ঘটনা পরম্পরা বাস্তবিক জীবনে সঙ্ঘটিত হইতে অনেক দিন লাগিবার কথা, স্বপ্নাবস্থায় দুই চারি মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহা সংঘটিত হয়। স্বপ্নাবস্থার কাল-পরিমাণের সহিত জাগ্রদবস্থার কাল-পরিমাণের অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। স্বপ্নাবস্থায় আমাদের মানসিক শক্তি-সকল জাগ্রদবস্থা-অপেক্ষা যে অনেকগুণে সতেজ হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই নিজ নিজ পরীক্ষায় অবগত আছেন। আমরা স্বপ্নে কখন কখন এমন সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারি, প্রবন্ধ কিংবা গান রচনা করিতে পারি, যাহা জাগ্রদবস্থায় বোধ হয় আমাদের সাধ্যাতীত। এরূপ স্বপ্ন-রচনার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোল্‌রিজের কুব্‌লাই খাঁ নামক কাব্যের খণ্ডাংশটি এইরূপ স্বপ্ন-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি স্বপ্নাবস্থায় সমস্ত কাব্যটি রচনা করেন। সেই স্বপ্নটি এত উজ্জ্বলরূপে তাঁর মানস-পটে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র তিনি তাড়াতাড়ি একটা কলম ধরিয়া সেই দীর্ঘ কাব্যটি লিখিতে বসিলেন। এই "কুব্‌লাই খাঁ"-কাব্যের যে সুন্দর অংশটি মাত্র ইংরাজি সাহিত্যে রহিয়া গিয়াছে, তাহা লেখা শেষ করিয়াছেন, এমন সময় তাঁর নিকট সহসা কোন বিষয়কর্ম্ম উপস্থিত হওয়ায় লেখার ব্যাঘাত হইল। বিষয়কর্ম্ম শেষ করিয়া আবার যখন লিখিতে বসিলেন, তখন দেখেন, অবশিষ্ট সমস্তই তাঁর স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

মিস্‌কব্ এইরূপ স্বপ্ন-রচিত আর একটি ফরাসিস্ কবিতার উল্লেখ

করিয়াছেন তাহাও অতি সুন্দর। তাহার অনুবাদ আমরা নিম্নে দিতেছি—

১

পুরাতন দুর্গের প্রাকার উপরে
দাঁড়ায়ে প্রহরী প্রাতে উত্তুঙ্গ চূড়ায়,
হাঁকিতেছে মাঝে-মাঝে উচ্চ কণ্ঠস্বরে—
'কে যায় পথিক নীচে, কে যায় কে যায় ?'

২

শুনি সে উত্তর সব—আশা-ভরপুর,
উপজিল মনে মোর অনির্দ্দেশ্য ভয়,
আশা হ'তে নৈরাশ্য জানি নহে দূর,
দিবা-পিছু রাত্রি যথা আইসে নিশ্চয়।

৩

"কে যায় কে যায় ?"—
সুন্দর যুবক এক অশ্ব আরোহিয়া
ঝকমকি অসি হস্তে—উড়ায়ে পতাকা
যাইতেছে রণক্ষেত্রে আনন্দিত-হিয়া,
গাইতে গাইতে পথে গৌরব-গীতিকা।

"কে যায় কে যায় ?"—
সুন্দরী বালিকা এক, যুবার পিছনে,
সাদা অশ্ব'পরে চড়ি যোদ্ধৃ-দাস-বেশে,
"চোখে চোখে রাখি দিব মোর প্রাণধনে"
বলিয়া মুচকি হাসি চলে অনিমিষে।

৫

"কে যায় কে যায় ?"—
শুভ্রবেশ বৃদ্ধ এক থলি হস্তে যায়,
তার মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা ঝক্‌মক্ করে,
কাঁপিতে কাঁপিতে তাহা যতনে লুকায়,
বলে আর, মহাধনী হইব সত্বরে ।

৬

"কে যায় কে যায় ?"—
সুন্দর যুবক এক, ভগিনীরে লয়ে
ফুল তুলিবার তরে চলে মাঠ দিয়া,
"তোরে মা এ সব দেব মোরা বাড়ী গিয়ে"
এই বলি দুজনায় উঠিল হাসিয়া ।

* * * * *

৭

পুরাণ তুরগ পরে উতরিলা রাত্রি,
আবার প্রহরী সেথা উচ্চে হাঁক দ্যায়,
তুরগের নীচে দিয়া যায় যত যাত্রী,
সবারে ডাকিয়া বলে 'কে যায় কে যায় ?'

৮

রক্ত-মাখা সেই অশ্ব তেজে গ্রীবা-বাঁকা
শূন্য-জীন টানি লয়ে চলে বীরবরে,
মুমূর্ষু সে বীর ধরে সাপটি পতাকা,
প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইবে সত্বরে ।

৯

"কে যায় কে যায় ?"—
সুন্দরী বালিকা সেই অশ্ব-আরোহণে
যোদ্ধৃ-সেবকের বেশ পরিধান করি,
আকুল হইয়া চলে পিছনে পিছনে,
হাহাকার করে ঘোর গগন বিদরি।

১০

"কে যায় কে যায় ?"—
সুবিষণ্ণ বৃদ্ধ সেই অতি শুভ্র কেশ,
শূন্য-থলি লয়ে হাতে আসিতেছে ধীরে,
কাঁপিতে কাঁপিতে বলে "কি বিষম ক্লেশ !
সরবস্ব ধন মোর হরিল তস্করে।"

১১

"কে যায় কে যায় ?"—
সুন্দর বালক সেই—ভগিনীটি কোলে,
ভুজঙ্গে দংশিল তারে মাঠের মাঝার,
নিরশ্রু নয়নে বালা ঘুমায় অকালে,
ফেলিতে হবে না তারে অশ্রু কভু আর !

আর একটি স্বপ্নদৃষ্ট ইংরাজি কবিতার অনুবাদ নিম্নে দিতেছি-

১

ক্লান্ত আত্মা মোর নাথ চাহিছে সতত,
পশিবারে তার সেই বিশ্রামের ঘরে,
সেই দিকে মোর দৃষ্টি রয়েছে নিয়ত
পুণ্য-আত্মা-সবে যেথা আনন্দে বিচরে।

২

এখনো হয়নি শেষ ভবের সংগ্রাম,
বাহিরের অন্তরের ভীম শত্রুগণ
আক্রমিয়া পথমাঝে মোরে অবিরাম
দেখাইতেছে কত শত পাপ-প্রলোভন।

৩

হয়ে এই রণ-মাঝে দুর্ব্বল আহত,
সকাতরে ডাকি তোমা হাত যোড় করি,
রক্ষা কর রক্ষা কর ত্রিভুবন-পিতঃ,
রক্ষা কর মোরে নাথ নতুবা যে মরি।

৪

হেনকালে ধীরে ধীরে মধুর বচন
ভয়-হর শান্তিপ্রদ পশে শ্রুতি-পটে,
অবসন্ন মৃত আত্মা পাইল জীবন—
"ভয় নাই সাধুবর, ঈশ্বর নিকটে।"

৫

সে বাক্য-অমৃত-পানে হয়ে বলীয়ান্
আবার সেই সে পথে হয়ে অগ্রসর,
ঊর্দ্ধদিকে শান্তি-ধামে রাখিয়া নয়ান
চলিলাম তাঁর পরে করিয়া নির্ভর।

৬

লও নাথ, লও মোরে, ডাকি করযোড়ে,
শান্তি-নিকেতন-দ্বার খোল' আমা প্রতি,
লও নাথ সেই তব প্রেমময় ক্রোড়ে,
পাপ তাপ হতে প্রভু দাও গো নিষ্কৃতি।

ডাক্তার কার্পেণ্টরকে অনুসরণ করিয়া মিস্‌কব্ বলেন—"আমাদের কার্য্য-সকল ইচ্ছাশক্তি-সম্বন্ধে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। Involuntary ইচ্ছা-নিরপেক্ষ (যথা হৃৎস্পন্দন—পরিপাক-ক্রিয়া ইত্যাদি)—Voluntary ইচ্ছা-সাপেক্ষ এবং Volitional ইচ্ছা-চালিত। ইচ্ছা-সাপেক্ষ এবং ইচ্ছা-চালিত এই উভয় জাতীয় কার্য্যের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছার অনুমতি অপেক্ষা করে, এবং ইচ্ছা-শক্তিপ্রয়োগে তাহা আবার স্থগিত করা যাইতে পারে, তাহাতে ইচ্ছা-শক্তির অবিরত উদ্যম আবশ্যক হয় না। কিন্তু ইচ্ছা-চালিত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিবার জন্য ইচ্ছার অব্যবহিত ও অবিরত উদ্যম আবশ্যক হয়। এক্ষণে এই তিন শ্রেণীর কার্য্যের মধ্যে দেখা যায়, ইচ্ছা-সাপেক্ষ কার্য্যগুলি চৈতন্য-বহির্ভূত মস্তিষ্কক্রিয়া-দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত যেমন পদচারণা। এই পদচারণা-ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। মনে কর আমরা এখানে কিম্বা ওখানে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি; এবম্বিধ ব্যাপারে "উদ্দেশ্য-বিষয়টিকে ইচ্ছা করা, আর উদ্দেশ্য সাধনের উপায়কে ইচ্ছা করা একই কথা"। আমরা প্রতিপদক্ষেপে তো এরূপ ভাবিয়া কাজ করি না যে "এইবার দক্ষিণ পদটি—এইবার বাম পদটি অমুক স্থলে স্থাপন করিব!" আমাদের মাংসপেশীর যেন কোন অপরিজ্ঞাত নেতা এই সকল খুজরা কাজগুলি সম্পাদন করে। আমরা যখন চলিতে থাকি, তখন আমাদিগের পদদ্বয়কে কোন্ দিকে চালাইতে হইবে—সে বিষয়ে আমরা বেশ নিশ্চিন্ত থাকি। যে পথে আমরা চলিতেছি যদি তাহা আমাদের জানা-শুনা পথ হয়, তাহা হইলে সে পথের প্রত্যেক ঘোর-ফেরে, আমাদের চির-অভ্যাস বশতঃ, ঠিক মোড়টি লই, অথচ সেই সময় সমস্তক্ষণ অন্য কোন বিষয়ের চিন্তাতে হয় তো ব্যাপৃত থাকি। এ-ছাড়া পঠন, সীবন, লিখন, সঙ্গীত-যন্ত্র বাদন

প্রভৃতি কার্য্যেও একবার শিক্ষালাভ করিলে—সে সকল কার্য্যের যান্ত্রিক অংশগুলি, শীঘ্রই আমরা সজ্ঞান উদ্যম-ব্যতীত সম্পাদন করিতে সমর্থ হই।" ডাক্তার কার্পেণ্টর ও মিস্-কব্, জ্ঞান-নিরপেক্ষ মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার এই যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, উহা প্রথমতঃ মস্তিষ্ক-ক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি না, তাহাই সন্দেহস্থল। Professor Ferrier সাহেবের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে, শারীরিক গতি-বিধি, তলস্থ উপমস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে; তাহার উপর চূড়ান্ত-মস্তিষ্কের অব্যবহিত আধিপত্য নাই। চূড়ান্ত-মস্তিষ্ক-যন্ত্র দিয়া ইচ্ছা-শক্তি প্রবাহিত হইয়া, ঐ উপমস্তিষ্ককে চালিত করিলে তবে আমাদিগের শারীরিক গতিক্রিয়া সম্পাদিত হয়। প্রথম-প্রথম, যতদিন না অভ্যাস দ্বারা সহজ হইয়া আসে, ততদিন কোন গতিক্রিয়ার সময়, ইচ্ছাশক্তিকে তাহাতেই সমস্তক্ষণ প্রযুক্ত রাখিতে হয়। কিন্তু অভ্যাস-নিয়মে উপমস্তিষ্ক যখন কার্য্যোন্মুখ ও পুনরাবৃত্তিপ্রবণ হইয়া পড়ে, তখন ইচ্ছা-শক্তি উপমস্তিষ্ককে একবার চালিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহার পর যন্ত্রের ন্যায় আপনা-আপনিই গতিক্রিয়া হইতে থাকে; সেই গতিক্রিয়া বন্ধ করিবার প্রয়োজন হইলে তখন আবার ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে পদচারণা প্রভৃতি অভ্যস্ত গতিক্রিয়া-সকল প্রবর্ত্তিত করিবার সময় ও বন্ধ করিবার সময়, ইচ্ছাশক্তির সজ্ঞান উদ্যম আবশ্যক হয়;

Unconscious cerebration—এই বাক্যটি অতি অস্পষ্ট। যে সকল দৃষ্টান্ত মিস্-কব্ দিয়াছেন তাহাতে ইহার অর্থ কখন-কখন জ্ঞান-নিরপেক্ষ-মস্তিষ্কক্রিয়া বুঝায়। সমস্ত স্বপ্ন-ব্যাপারই যে জ্ঞান-সাপেক্ষ তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে উহার সমস্তই ইচ্ছা-সাপেক্ষ কি না তাহাই বিবেচ্য। Unconscious cerebrationএর অর্থ যদি জ্ঞান-বহির্ভূত না হইয়া ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মস্তিষ্ক-ক্রিয়া হয়—তাহা হইলে জাগ্রদবস্থাতেও

আমাদিগের মনে যত প্রকার ভাবোদয় হয়, তৎসমুদয়ই তো Uncons-cious cerebrationএর মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

কোন-কোন জড়বাদী বলেন যে, অচেতন অবস্থায় আমাদের অজ্ঞাতসারে কোন মানসিক ক্রিয়া হইতেছে,—এরূপ যদি পরিচয় পাই, আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের মস্তিষ্ক, মনন-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ এরূপ যদি সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি ?

আমাদের অজ্ঞাতসারে যে সকল মনন-ক্রিয়া হয় তাহার নাম ডাক্তার কার্পেণ্টর "Unconscious cerebration" অর্থাৎ "জ্ঞান-বহির্ভূত মস্তিষ্কক্রিয়া" রাখিয়াছেন। Miss Cobbe এই জ্ঞান-বহির্ভূত মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-প্রদর্শিত ক্রিয়া-সকল বাস্তবিক জ্ঞান-বহির্ভূত কি না, তাহা প্রথমে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মিস্ কব্ বলেন—"ইহা তো আমাদিগের সকলেরই সচরাচর ঘটিয়া থাকে যে, কোন একটি বিশেষ কথা, কবিতার কোন একটি চরণ, আমরা ভুলিয়া গিয়াছি—কিয়ৎকাল পরে যখন জ্ঞাতসারে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা আর খুঁজিতে চেষ্টা না করি, তখন হঠাৎ এক সময়ে আমাদের স্মরণে আইসে। আমরা প্রথমে হয়তো তাহাদিগকে মনে আনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হই, কিন্তু কিছুতেই মনে আনিতে পারি না; মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিয়াও যখন তাহাতে কৃতকার্য্য হই না, যখন আমরা অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করি, ক্রমে যখন আমাদের সমস্ত মন অন্য কোন বিষয়ে নিমগ্ন হয়, তখন আমরা হঠাৎ বলিয়া উঠি—"মনে পড়েছে—সে কথাটি কিম্বা কবিতার চরণটি এই"। এই প্রকার ঘটনা এত সচরাচর ও সর্ব্বজন-পরিচিত যে আমরা এইরূপ অবস্থায় প্রায় বলিয়া থাকি—"যেতে দাও, যখন ওতে আর মনোযোগ দিব না, তখন আপনা-আপনিই কথাটা মনে আসিবে।"

কিন্তু এই মানসিক ক্রিয়াটি যে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-বহির্ভূত, তাহা এই দৃষ্টান্তে সপ্রমাণ হয় না। প্রথমতঃ একটা কোন কথা স্মরণ হইতেছে না বলিয়া মনে উদ্বেগ উপস্থিত হইলে, তাহা শীঘ্র স্মরণে আইসে না। অনুষঙ্গের নিয়মানুসারেই আমাদিগের স্মরণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়—একটি কোন কথার সূত্র ধরিয়া, আর-একটি কোন কথা আমাদের মনে উদয় হয়। যখন আমরা কোন কথা মনে করিবার জন্য ব্যস্ত হই, তখন আমাদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে বলিয়াই যথার্থ সূত্রটি ধরিতে সমর্থ হই না—সুতরাং সে কথাটি সে সময় কিছুতেই মনে আইসে না। যখন আমরা অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করি, তখন আমাদিগের উদ্বেগ অনেকটা প্রশমিত হয়। কিন্তু অন্য বিষয়ে আমরা যতই মগ্ন হইয়া যাই না কেন, এক-এক বার মুহূর্ত্তের জন্যও পূর্ব্ব-বিষয়ে মন ধাবিত হয়,—এত অল্প কালের জন্য যে, পরে তাহা আমাদিগের আর স্মরণ থাকে না; পূর্ব্ব-বিষয়ে মন যে আবার ক্ষণমাত্রও ধাবিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের আর মনে পড়ে না। আমরা মনে করি, বিনা চেষ্টাতেই বুঝি কথাটা আমাদিগের মনে পড়িল, কিন্তু মনের ব্যস্ত অবস্থায়, দুই ঘণ্টা ধরিয়া চেষ্টা করিয়া, যে বিস্মৃত কথার প্রকৃত সূত্রটি আমরা ধরিতে পারি নাই, মনের অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থায়, এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমরা সেই সূত্রটি ধরিতে পারিলাম এইমাত্র। অতএব এই মানসিক ক্রিয়াটি আমাদিগের অজ্ঞাতসারে হয় কি না, তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই।

কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আমাদিগের মনে যত প্রকার ব্যাপার উপস্থিত হয়, তাহা কতকটা আমাদিগের আয়ত্তের মধ্যে এবং কতকটা আমাদিগের আয়ত্তের বাহিরে। আমাদের অন্তরে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই বর্ত্তমান। আমাদের মানসিক ক্রিয়া-সকল কতকটা অবশ্যম্ভাবী নিয়মানুসারে যন্ত্রবৎ সম্পাদিত হয়—ইহাই প্রকৃতির কার্য্য

এবং কতকটা আমাদিগের ইচ্ছা-দ্বারা নিয়মিত ও চালিত হয়—ইহাই পুরুষের কার্য্য। আমাদিগের মনে যত প্রকার ভাব ও চিন্তার উদয় হয়, তাহার অধিকাংশই একটি বিশেষ নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। তাহার নাম "অনুষঙ্গের নিয়ম।" যাহা হউক, যদিও ইহা সপ্রমাণ হয় যে Unconscious cerebration বলিয়া কোন ব্যাপারের অস্তিত্ব আছে, তাহাতেই বা কি? তাহার সঙ্গে ইহাও তো প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আর একটি জ্ঞান-সাপেক্ষ, ইচ্ছা-সাপেক্ষ মস্তিষ্কক্রিয়ারও অস্তিত্ব আছে। এক দিকে যন্ত্র, আর একদিকে যন্ত্রের নিয়ন্তা—একদিকে প্রকৃতি আর একদিকে পুরুষ—একদিকে মন, আর একদিকে আত্মা।

কেবল "মস্তিষ্ক ক্রিয়া"-দ্বারা আমাদিগের সমস্ত আভ্যন্তরিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। ডাক্তার ফেরিয়ার মস্তিষ্ক-ব্যাপারের তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া যে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। "শারীরতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মস্তিষ্কের এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারেঃ—মস্তিষ্ক কি?—না গতিকেন্দ্র-সমূহ ও বোধকেন্দ্র-সমূহের জটিল যন্ত্র-বিশেষ। মনস্তত্ত্বের বিষয় ও মানসিক ক্রিয়া—এ একই কথা; মানসিক ক্রিয়া-সকলের আলোচনা মনস্তত্ত্বেরই অধিকারের মধ্যে আইসে। মানসিক ক্রিয়ার তত্ত্বানুসন্ধান-প্রণালী, শারীরতত্ত্বের অনুসন্ধান-প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র। কেবলমাত্র শারীরতত্ত্বের অনুসন্ধান-প্রণালী-অনুসারে কোন ক্রমেই অহং-জ্ঞানের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। * * *" মস্তিষ্ক-কোষ-সমূহে যে সকল আণবিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, সেই সকল পরিবর্ত্তনের অনুরূপ পরিবর্ত্তন কি করিয়া মনন-ক্রিয়াতেও আবার উপস্থিত হয়, তাহা বুঝা সুকঠিন। যথা, নেত্রনিপতিত আলোকের কম্পনে, দৃষ্টি-বোধ-রূপ জ্ঞানের পরিবর্ত্তন কিরূপে সংঘটিত হয়, তাহা সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরূহ। কোন ইন্দ্রিয়বোধ মনোমধ্যে অনুভূত হইলে, মস্তিষ্ক-কোষ-মধ্যে যে সকল

আণবিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তাহা হয় তো ঠিক নির্ণয় করা যাইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা সেই অনুভব-ব্যাপারের আসল প্রকৃতি-বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান-বৃদ্ধি হয় না। উহার মধ্যে একটি—বহির্মুখী- (Objective) এবং আর-একটি অন্তর্মুখী (Subjective); বহির্মুখী-ব্যাপার-ঘটিত পরিভাষায়, অন্তর্মুখী-ব্যাপার-সকল ঠিক প্রকাশ করা যাইতে পারে না। আমরা একথা কখন বলিতে পারি না যে, একটি আর একটিতে বেমালুম মিশিয়া যায়। তবে, Laycockএর ভাষায় অন্ততঃ এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, মস্তিষ্ক ও মন উভয়ই উভয়ের অনুবন্ধী (correlated) কিম্বা Bain-এর ভাষায় বলিতে পারি যে, শারীরিক পরিবর্ত্তন ও মানসিক পরিবর্ত্তন-সকল "দ্বিমুখী একতার" (double-faced unity) বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী দিক্ মাত্র।"

স্থূল কথা, আত্মা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয় বলিয়াই যে ইহা একেবারে অপরিজ্ঞেয়—জড়বাদীদিগের এই মতটি আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আত্ম-প্রত্যয়ই আত্মার মুখ্য প্রমাণ। জড়বাদিগণ যদি সে প্রমাণ গ্রাহ্য না করেন, তবে তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য বলা যাইতে পারে, চুম্বকাকর্ষণ এবং উত্তাপ প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থের সত্তা যে প্রকারে সপ্রমাণ হয়, আত্মার অস্তিত্বও কি সেই একই প্রকারে সপ্রমাণ হয় না? চুম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি পদার্থ ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য হইলেও অপরিজ্ঞেয় নহে, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়-জগতের উপর ঐ সকল পদার্থ যে ক্রিয়া প্রকটিত করে, তাহার দ্বারাই ঐ সকল পদার্থের সত্তা ও গুণ আমরা উপলব্ধি করি। প্রমাণের প্রণালী উভয় পক্ষেই সমান। যদি ঐ সকল সূক্ষ্ম পদার্থের পক্ষে এই প্রকার প্রমাণ গ্রাহ্য হয়, তবে অতীন্দ্রিয় আত্মার পক্ষে সেই একই প্রমাণ কেন না গ্রাহ্য হইবে? এই প্রণালী-অনুসারে কতদূর প্রমাণ হইতে পারে তাহা অবশ্য আলোচনার বিষয়; কিন্তু জড়বাদীরা যে বলেন, যেহেতু আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অতএব

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহার অস্তিত্ব আদৌ সপ্রমাণ হইতে পারে না, সুতরাং উহা অপরিজ্ঞেয় ও চিরকাল অপরিজ্ঞেয় থাকিবে, উহাকে বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য—এই যে জড়বাদিগণের অন্ধ মত, ইহা আমরা কখনই গ্রাহ্য করিতে পারি না।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ও কলিকাতার ভূতত্ত্ব।

ব-দ্বীপ কাহাকে বলে ও কিরূপে তাহা সংগঠিত হয় সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিয়া আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে অবতরণ করিব।

সমুদ্র কিম্বা হ্রদে প্রবেশ করিবার সময়, যখন কোন নদীর স্রোত কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত হইয়া মন্দীভূত হয়, তখন তৎপ্রবাহিত বালুকা ও কর্দ্দম-রাশি নদীর তলদেশে নিমগ্ন হয়। ক্রমে-ক্রমে এই তলদেশের কিয়দংশ হইতে নদীর উপরিভাগ-পর্য্যন্ত বালুকা ও কর্দ্দমে ভরাট হইয়া গিয়া মূল-স্রোতস্বিনীর উভয় পার্শ্বে, বিস্তৃত সমতল জলা-ভূমি-সকল গঠিত করে। জলপ্লাবনের সময়, এই সকল ভূমি কর্দ্দমময় জলে প্লাবিত হওয়ায়, মৃত্তিকা কিম্বা বালুকার একটি সূক্ষ্ম আবরণ তাহার উপর সঞ্চিত হয়, এবং এইরূপে ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া, অল্পে অল্পে নদীর সাধারণ সমতলকে ছাড়াইয়া উঠে, এবং ঐ সকল ভূমির মধ্য-দিয়া ঐ নদীর অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়। ক্রমে এই সকল সমতল জলাভূমির উপর নানাবিধ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়; ক্রমে জীবজন্তুরাও সেখানে আহার ও আশ্রয় লাভ করে; এইরূপে, নদীর ক্রিয়াপ্রভাবে একটি নূতন রাজ্য সৃষ্ট হয়। নদী-সংগঠিত এই সমতল-ভূমিকে ইংরাজি ভাষায় Delta বলে। নীল-নদী-সংগঠিত এই প্রকার ভূমির আকার, গ্রীক-ভাষার Delta অক্ষরের ন্যায় প্রাচীন গ্রীকদিগের নিকট প্রতীয়মান হওয়ায়, তাহারাই প্রথম উহার Delta নাম দেয়। এই Delta অক্ষরের সঙ্গে আমাদিগের বাঙ্গালা ব-অক্ষরের সাদৃশ্য থাকায় Deltaর অনুবাদে ব-দ্বীপ আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নদী-মুখে মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া যে সকল ভূমি উৎপন্ন হয়, সাধারণতঃ তাহাদের আকার প্রায় ব-অক্ষরের মত, কারণ এই সমভূমি

ব-দ্বীপগুলি প্রথমে সংকীর্ণভাবে আরম্ভ হয়; পরে সমুদ্রের দিকে যতই অগ্রসর হয় ততই বিস্তৃত আকার ধারণ করে।

সাধারণতঃ ব-দ্বীপ কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা বলা হইল, এক্ষণে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করা যাক্। বঙ্গদেশের অধিকাংশই যে এই প্রকার গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর স্রোতোগতিতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, এবং এই জন্যই বঙ্গদেশ অসাধারণ উর্ব্বরতা লাভ করিয়াছে। ব-দ্বীপের যেখান হইতে প্রথম সূত্রপাত হয়, তাহাকে ব-দ্বীপের সূত্রস্থান কহে। বঙ্গদেশীয় মহা ব-দ্বীপের দুইটি সূত্রস্থান আছে, সমুদ্র হইতে উভয়ই প্রায় সমদুর। প্রথমটি গঙ্গানদী-সমুৎপন্ন;—রাজমহলের ১৫ ক্রোশ নিম্নে তাহার আরম্ভ এবং তাহা সমুদ্র হইতে ১০৮ ক্রোশ দূরে। দ্বিতীয়টি ব্রহ্মপুত্র-সমুদ্ভূত,—চিরাপুঞ্জীর নিম্নদেশ হইতে তাহার আরম্ভ, এবং বঙ্গ-উপসাগর হইতে ১১২ ক্রোশ দূরে। যখন নদীর জল নিম্ন থাকে, তখন সমুদ্রের জোয়ার ব-দ্বীপের সূত্রস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু যখন বর্ষাকালীন বৃষ্টিজলে নদী-সকল ফাঁপিয়া উঠে, তখন তাহাদের জলরাশি ও স্রোতোবেগ সমুদ্রের স্রোতকে বাধা দেয়, এই জন্য সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান-ব্যতীত জোয়ারের স্রোত তখন আর বড় অনুভব করা যায় না। অতএব এই সময়ে ব-দ্বীপে সমুদ্রের গতিক্রিয়া, নদীর গতি-ক্রিয়ার অধীন হইয়া পড়ে, সুতরাং নদীর কার্য্যে অতি অল্পই ব্যাঘাত দিতে সমর্থ হয়। এই বার্ষিক জলপ্লাবনকালেই ব-দ্বীপ উচ্চতা ও বিস্তৃতিতে অত্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করে। বৎসরের অন্য সময়ে আবার সমুদ্র স্বীয় স্রোতোবেগে জল-পথ-সকল খনন করিয়া এবং কখন-কখন উর্ব্বর পলি-গঠিত ক্ষেত্র-সকল গ্রাস করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইয়া থাকে।

Major Colebrooke তাঁহার গঙ্গানদীর স্রোতোগতিবিষয়ক বিবরণে বলেন:—উক্ত নদীর কত শাখাপ্রশাখা ভরাট হইয়া গিয়াছে ও

কত বর্গক্রোশ-পরিমাণ ভূমি অল্পকাল মধ্যে অপসারিত হইয়া নূতন জলপ্রণালী-সকল প্রস্তুত হইয়াছে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি বলেন একস্থানে ৪০ বর্গমাইল মৃত্তিকা কয়েক বৎসরের মধ্যে অপসারিত হয়। একজন মনুষ্যের জীবনকাল অপেক্ষাও কম সময়ে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র-নদীর শাখা-প্রশাখার মধ্যে, কত বড় বড় দ্বীপ সৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, কত রাশি-রাশি মৃত্তিকা উক্ত নদীদ্বয়ে প্রবাহিত হয়। ইহার মধ্যে, নদীর বাঁকের কোণে বালুচর পড়িয়া কতকগুলি ক্রোশ-ব্যাপী দ্বীপ সৃষ্ট হয়; তৎপরে কোন-কোন স্থলে স্রোতের গতি ফিরিয়া যাওয়ায়, সেই চরগুলির চারিদিকে জল জমিয়া উহা দ্বীপাকারে পরিণত হয়। নদীর তলদেশে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক থাকা-প্রযুক্ত আর কতকগুলি দ্বীপ উদ্ভূত হয়। একটা বৃহৎ বৃক্ষ কিম্বা কোন বাত্যাহত নৌকা জলগর্ভে থাকায়, নদীর স্রোত আটকিয়া গিয়া বালুরাশি তলদেশে থিতিয়া পড়ে, এবং এই বালুরাশি জমিয়া নদীর অনেকটা অংশ ভরাট করিয়া দেয়। এই সময় সমস্ত নদীর তলদেশ সমানরূপে পূরণ করিবার জন্য নদীর প্রত্যেক দিকের তট ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, এবং প্রত্যেক বার্ষিক জলপ্লাবনের সময়ে, আবার নূতন মৃত্তিকারাশি সঞ্চিত হইয়া, এই সকল দ্বীপ পরে আরও বর্দ্ধিত হয়।

রেণেল বলেন, লক্ষ্মীপুরের নিম্নে গঙ্গা ও মেঘনা নদীর সঙ্গম-মুখে কতকগুলি দ্বীপ আছে,—যাহা উর্ব্বরতা ও আয়তনে ওয়াইট-দ্বীপের সমকক্ষ। এই নদীর কোন-কোন অংশে নূতন দ্বীপ সকল সংগঠিত হইতেছে, এবং অপরাংশে আবার পুরাতন দ্বীপ সকল ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। এই সকল নূতন দ্বীপ, শীঘ্রই কুশ-কাশ এবং অন্যান্য তৃণগুল্মে আচ্ছাদিত হইয়া দুর্গম অরণ্যে পরিণত হয়, এবং ব্যাঘ্র-গণ্ডার মহিষ-হরিণ এবং অন্যান্য বন্য পশুর আবাসস্থান হইয়া পড়ে। এই জন্য জীব জন্তু ও উদ্ভিজ্জের দেহাবশেষ কখন-কখন নদীর স্রোতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়

ব-দ্বীপ-প্রদেশে যে মৃত্তিকা থিতিয়া পড়ে, তন্মধ্যে সেই সকল দেহাবশেষ সমাবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন এরূপ ঘটিয়া থাকে,—যে সময়ে বার্ষিক জলপ্লাবনের চূড়ান্ত প্রকোপ, সেই সময় প্রবল ঝটিকা উত্থিত হয়, এবং তৎসঙ্গে সমুদ্রের প্রবল স্রোতের প্রাদুর্ভাব হয়; এই উভয় এক যোগে সম্মিলিত হইয়া নদীর নিম্নবহমান স্রোতকে কখন কখন ঠেলিয়া রাখে, এবং এই কারণে ভয়ানক সর্ব্বগ্রাসী জলপ্লাবন-সকল সংঘটিত হয়। সামুদ্রিক ব-দ্বীপ মাত্রেরই অধিবাসীগণ বিশেষরূপে এই প্রকার দুর্ঘটনার আয়ত্তাধীন, এবং ইহা এক প্রকার নিশ্চিত-রূপে বলা যাইতে পারে, যে অবধি মনুষ্যের বসতি হইয়াছে সেই অবধি এই প্রকার শোচনীয় দুর্ঘটনা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে বারম্বার সংঘটিত হইয়াছে।

এই কারণবশতঃ, ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে, লক্ষ্মীপুরে, নদীর জল সচরাচর সমতল হইতে ৬ ফীট ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, পশু মনুষ্য ঘরবাড়ীর সহিত সমস্ত একটি প্রদেশকে একবার ভাসাইয়া লইয়া যায়।

যে মৃত্তিকারাশি, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জলে আটক থাকিতে দেখা যায়, তাহা পরিমাণে পৃথিবীর আর সকল নদীর অপেক্ষা অধিক। তাহার কারণ, প্রথমতঃ তাহাদিগের শাখা-সকল উচ্চতম পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত এবং যেরূপ রাইন-নদী কন্‌স্‌ট্যান্‌স্‌ নামক হ্রদে ও সোন-নদ জেনিবা-হ্রদে পড়িয়া পরিষ্কৃত হয়, ইহাদের সেরূপ পরিষ্কৃত হইবার কোন উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ উক্ত নদীদ্বয় মিসিসিপি প্রভৃতি নদী অপেক্ষা বিষুব-রেখার অধিক নিকটবর্ত্তী। এতদ্ব্যতীত হিমালয়ের যে প্রথম পর্ব্বত-শ্রেণী ভারতবর্ষের সমভূমি-হইতে উত্থিত হইয়াছে তাহার দক্ষিণ ধারে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়।

ব-দ্বীপের প্রান্তদেশ হইতে বঙ্গ-উপসাগরে ৫০ ক্রোশ পর্য্যন্ত যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই অল্পে অল্পে এই উপসাগরের গভীরতা

৪০ হইতে ৬০ বাঁউ বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। কোন কোন স্থলে ৭০ কিম্বা ১০০ বাঁউ পর্য্যন্ত গভীর।

কিন্তু এই সমতল-নিয়মের একটি বিশেষ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ব-দ্বীপের মধ্যদেশের সম্মুখে, উপকূল হইতে ১৫ কিম্বা ২০ ক্রোশ দূরে, একটি সামুদ্রিক খাত আছে—তাহার নাম "অতলস্পর্শ"; তাহার পরিসর ৭॥ ক্রোশ। সেখানে ১৮০ হইতে ৩১০ বাঁউ পর্য্যন্ত তলমান-যন্ত্র ফেলিয়াও তাহার তল পাওয়া যায় নাই। উপকূলস্থ চড়ার ৫ মাইল ব্যবধান হইতে ঐ খাদের ঢালু আরম্ভ হইয়াছে; নদীর কর্দ্দম-ভারাক্রান্ত জল যে শুধু ইহার উপর দিয়া সর্ব্বদাই প্রবাহিত হয় এরূপ নহে, কিন্তু বাণিজ্য-বায়ু-প্রবাহ কালে, কর্দ্দম ও বালুকা-ভার বহন করত সমুদ্র আবার-ব-দ্বীপ-অভিমুখে প্রধাবিত হয়; এইরূপ অবস্থায় এই অতলস্পর্শ খাত-কিরূপে যে উৎপন্ন হইল ইহাই আশ্চর্য্য।

যখন উপসাগরের আর ৪০ ক্রোশ পর্য্যন্ত কর্দ্দম-রাশি বিস্তৃত বলিয়া জানা আছে—তখন এই অতলস্পর্শে যে অত্যন্ত-গাঢ় কর্দ্দম-রাশি সঞ্চিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হয় বঙ্গীয় উপসাগরের এই অংশের আদিম গভীরতা অত্যন্ত অধিক ছিল, নয় ইদানীন্তন কালে, মধ্যে মধ্যে ভূমি বসিয়া গিয়া এইরূপ ঘটনা হইয়াছে। এই শেষোক্ত অনুমানটি অধিকতর সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু ব-দ্বীপের সংগঠনকালে, কলিকাতার নিকটস্থ ব-দ্বীপ যে বসিয়া যাইতেছিল তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অধিকন্তু, পুরাকালে ভূমিকম্প-প্রভাবে বঙ্গদেশের কিয়দংশ এবং চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী উপকূলের অনেকাংশ যে বসিয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

Fergusson-সাহেব অনুমান করেন, ঐ অতলস্পর্শে ১৮০০ ফীট পর্য্যন্ত তলমান-যন্ত্র নিঃক্ষেপ করিয়াও তল পাওয়া যায় নাই; উহা আর

কিছুই নয়—উহা একটি-জল-পথ মাত্র,—সামুদ্রিক স্রোতের প্রবল বেগে প্রস্তুত হইয়াছে, কিম্বা স্রোতোবেগে ঐ স্থানে কোন মৃত্তিকারাশি সঞ্চিত হইতে পারে নাই।

এই প্রকার অনুমান সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি উল্লেখ করেন যে, গঙ্গা নদীর জোয়ারকালে স্রোতের গতি ঘূর্ণায়মান দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভূতত্ত্ববিৎ লায়েল সাহেব বলেন—যদি Fergusson সাহেব ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেন যে, সেই গতির বেগ-পরিমাণ কিরূপ, তাহা হইলে সেই বেগ-প্রভাবে এরূপ অতলস্পর্শ খাত প্রস্তুত হইতে পারে কি না অনুমান করা যাইতে পারিত। লায়েল সাহেব বলেন তাঁহার মতে এই অনুমানটি আরও সহজ যে, পূর্ব্ব হইতেই ২০০০ ফিট কিম্বা ততোধিক গভীর একটি সামুদ্রিক খাত বর্ত্তমান ছিল—সেইটি হয়তো বঙ্গ-উপসাগরের আদিম আধার-স্থানের একটি অংশ মাত্র। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এই দুই বৃহৎ-নদী, বঙ্গীয় উপসাগরের এই গভীর ও মধ্যবর্ত্তী অংশটিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, সামুদ্রিক স্রোতের সহিত মিলিত হওয়ায়, তাহাদিগের স্রোত মন্দীভূত হইয়া যায়, এবং তৎপ্রযুক্তই তাহাদিগের কর্দ্দম সেই স্থানেই থিতিয়া পড়ে; সুতরাং "অতলস্পর্শ খাত" পর্য্যন্ত সেই কর্দ্দম প্রবাহিত হইয়া ঐ স্থানটিকে ভরাট করিতে অবসর পায় নাই।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীগত ব-দ্বীপের কোন অংশে, কিম্বা সমুদ্রের ২০০ ক্রোশ অপেক্ষা কম নিকটে, কর্করের ন্যায় কোন স্থূল পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কলিকাতা-সমীপস্থ ফোর্ট উইলিয়ামে ১৮৩৫।১৮৪০ খৃষ্টাব্দে যে কূপ খনন করা হইয়াছিল, তাহাতে ১২০ ফীট নিম্নে কর্দ্দমের সহিত উপলখণ্ড বাহির হয়। কলিকাতার সমতলভূমির ৪৮১ ফীট-পর্য্যন্ত নীচে খনন হইয়াছিল এবং তৎকালে তত্রস্থ ভূতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যে অবস্থা প্রকাশ পায়, তাহাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায়, কলিকাতার উপরকার মাটির প্রায়

১০ ফীট নীচে, প্রায় ৪০ ফীট পুরু একপ্রকার নীল মৃত্তিকা ছিল; তাহার নীচে বেলেমাটি, এই বেলেমাটির অব্যবহিত নিম্নে জীর্ণ উদ্ভিদ-রাশি, এবং তন্নিম্নে ২ ফীট পুরু কৃষ্ণবর্ণ জীর্ণ উদ্ভিদে একপ্রকার মৃত্তিকা-স্তর অবস্থিত। পোর্টল্যাণ্ডের "জঞ্জাল-স্তরের" (Dirt-bed) ন্যায়, এই জীর্ণ উদ্ভিদের মৃত্তিকারাশি দেখিয়া এইরূপ অনুমান হয়, উহা সুন্দরবনের কোন প্রাচীন ভূখণ্ডের সুস্পষ্ট নিদর্শন। রক্তবর্ণ কাষ্ঠের গুঁড়ি ও শাখা-প্রশাখা-সকল এই মৃত্তিকাস্তরের উপরে এবং অব্যবহিত নীচে, এরূপ অবিকৃতভাবে ছিল যে তদ্দৃষ্টে Dr. Wallich সুঁদরি কাঠ বলিয়া স্পষ্ট চিনিতে পারিয়াছিলেন। Dr. Falconer বলেন, কলিকাতার চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য স্থানেও ৯ কিম্বা ২৫ ফীট নিম্নে এই প্রকার মৃত্তিকা-স্তর আরও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

ইহাতেই প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রদেশে প্রথমে যে ভূমি ছিল, তাহা অন্যূন ৭০ ফীট বসিয়া গিয়াছে; কারণ, সমুদ্রের সমতল হইতে কলিকাতা কতিপয় ফীট মাত্র উচ্চ, এবং এই সকল উদ্ভিদ-জাত মৃত্তিকা-স্তর থাকাতেই বোধ হয় এই ভূমি ক্রমশঃ অল্পে অল্পে বসিয়া গিয়াছে।

এই উদ্ভিদ-স্তরের নিম্নে, ১০ ফীট পুরু ঈষৎ হরিদ্রা-বর্ণের আর একটি মৃত্তিকা-স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে বিস্তর কর্করের স্তবক দৃষ্ট হয়। এই কর্করমধ্যে কিয়দংশ অতি অল্পদিনের বলিয়া বোধ হয়; সাহারণ-পুরের নিকট নদীপ্লাবনে যে কর্কর সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই ইহার উৎপত্তি। তৎপরে ১২০ ফীট নিম্নে প্রবেশ করিয়া কোমল মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তাহাতে অভ্র, শ্লেট, এবং অন্যান্য প্রস্তরের জীর্ণ অংশ সকল দৃষ্ট হয়; সে সকল অংশ গঙ্গার স্রোতে প্রবাহিত হইয়া সে স্থানে আসিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এই সমস্ত স্তরে কোন মৃত সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় নাই—যাহা কিছু দেখা

গিয়াছিল সমস্তই নদী-জাত ও স্থলজাত জীবের দেহাবশেষ। তাহার পর ৩ ফীট নিম্নে আর একটি জীর্ণ উদ্ভিদ-স্তরের উপর কর্দ্দম-স্তর সন্নিবেশিত। ইহাতে এইরূপ বুঝা যায়, আবার কিয়ৎকালের জন্য একটি বিরামকাল উপস্থিত হইয়া, ঐ অরণ্যাচ্ছাদিত ভূমি ৩০০ ফীট বসিয়া গিয়াছিল। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, উপরি-উক্ত অধোগত ভূমিখণ্ডের উপর যখন বৃক্ষাদি ছিল, তখন এখনকার অপেক্ষা বঙ্গভূমির আয়তন সমুদ্রের দিকে অধিক বিস্তৃত ছিল সন্দেহ নাই; এবং ইদানীন্তন কালে গঙ্গার স্রোতঃ-ক্রিয়া-প্রভাবে ব-দ্বীপের আয়তন যাহা কিছু বৃদ্ধি হইতেছে তাহা আসলে বৃদ্ধি নয়—সমুদ্র-অপহৃত ভূমি গঙ্গাদেবী অল্পে অল্পে পুনরুদ্ধার করিতেছেন এই মাত্র। তৎপরে, ৪০০ ফীট নিম্ন স্তর-সন্নিবেশে একটি আকস্মিকপ্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়—এই স্থানের স্তরটী বালুকা ও স্থূল উপলখণ্ডে নির্ম্মিত। তাহার পর, খনন-যন্ত্রে কোন দৈব-ব্যাঘাত উপস্থিত হওয়ায়, খনন-ক্রিয়া এই খানেই স্থগিত হয়।

১২০ এবং ৪০০ ফীট নিম্নে উপলখণ্ড দৃষ্ট হওয়ায় এইরূপ বুঝাইতেছে যে, ঐ সময়ে কলিকাতার নিকটস্থ কিম্বা চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানের ভৌগোলিক অবস্থায় একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল। নদী-প্রপাত কিম্বা পলিময় ভূক্ষেত্রের সাধারণ ঢালু হয় তো পূর্ব্বে অধিক মাত্রায় ছিল, কিম্বা ভূমির সাধারণ অধোগমনের পূর্ব্বে যে সকল ক্ষুদ্র পর্ব্বত, ব-দ্বীপের বর্ত্তমান তল-প্রদেশের নিকটতর স্থানে ছিল, তাহারা হয়তো কয়েক শত ফীট উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, বঙ্গ-উপসাগরে দ্বীপাকারে পরিণত হয়, এবং সেই সকল দ্বীপ হয়তো ক্রমে বসিয়া গিয়া, নদীগত সঞ্চিত কর্দ্দম-মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে, প্রতি বৎসর গড়ে কত পরিমাণ মৃত্তিকা প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, তাহা যদি পরীক্ষা করিয়া কিয়ৎ-পরিমাণে নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ কত দিনে

নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। গঙ্গার স্রোতে কত পরিমাণ মৃত্তিকা আনীত হয়, সে বিষয়ে Rev. Mr. Everest ১৮৩১।২ খৃষ্টাব্দে, সমুদ্র হইতে ২৫০ ক্রোশ দূরে, গাজিপুর নগরে পরীক্ষা-পরম্পরা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে তাহার পরিমাণ—

গড়ে প্রায় ৫০০,০০০ ঘনফীট জলরাশি, বর্ষাকালের ছয় মাস, এবং ৫৫,০০০ ফীট জলরাশি বাকি ৮ মাস, প্রতি সেকেণ্ডে প্রবাহিত হয়। এবং এক বৎসরের মৃত্তিকা-সমষ্টি ৬,৩৬৪,০৭৭,৪৪০ ঘনফীট।

এই মৃত্তিকারাশি, এক বৎসর কাল মধ্যে ১১৪½ বর্গ ক্রোশ পরিমাণ ভূমি উঠাইতে সমর্থ।

এক্ষণে দেখা যায়, ১২½ ঘনফীট গ্র্যানীট-প্রস্তর ওজনে এক টন্; এবং ইহাও গণনায় নিরূপিত হইয়াছে যে, মিশর দেশের বৃহৎ পীরামিড্ যদি নীরেট্ গ্র্যানীট-প্রস্তর হইত, তাহা হইলে তাহা ওজনে ৬,০০০,০০০ টন্ হইত সন্দেহ নাই। অতএব, এই গণনানুসারে প্রতি বৎসরে গঙ্গায় যে কর্দ্দমরাশি প্রবাহিত হয় তাহা ওজনে ও আয়তনে ৪২টা পীরামিড্ অপেক্ষাও অধিক এবং বর্ষাকালে ৪ মাসে যে কর্দ্দমরাশি প্রবাহিত হয় তাহার পরিমাণ ৪০টা পীরামিডের সমান হইবে।

মিশরদেশের বৃহৎ পীরামিডের তলদেশের আয়তন ১১ acres এবং ইহার খাড়াই উচ্চতা প্রায় ৫০০ ফীট। অতএব গঙ্গা নদীতে শান্ত ভাবে ও অলক্ষিতভাবে কি প্রকাণ্ড ব্যাপার চলিতেছে, তাহা এই পীরামিডের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই কল্পনায় কিয়ৎপরিমাণে ধারণা করা যাইতে পারে।

১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে এট্না নামক আগ্নেয়-গিরি হইতে যত ধাতুপিণ্ড নিঃসারিত হয়, তত অধিক পরিমাণে ঐতিহাসিক কাল মধ্যে আর কখনই নিঃসৃত হয় নাই। Ferrara গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে

এট্না হইতে ঐ কালে ১৪০,০০০,০০০ ঘনগজ পরিমাণ ধাতু-নিঃসৃত হইয়াছিল, এই হিসাব অনুসারে গাজিপুর দিয়া, প্রতি বৎসরে গঙ্গা নদীতে যে কর্দ্দমরাশি প্রবাহিত হয়, তাহার পঞ্চম অংশের এক অংশের সমান হয় না; সুতরাং পরিমাণে ইহার সমান হইতে গেলে, এট্না গিরির এইরূপ ৫টা অগ্ন্যুৎপাত বা মহাধাতু-নিঃস্রব আবশ্যক হয়।

পণ্ডিতবর Lyell বলেন, বঙ্গ-উপসাগরে এক বৎসরে যে কর্দ্দমরাশি প্রবাহিত হয় তাহার পরিমাণ ৪০,০০০,০০০ ঘনফীট কিম্বা গাজিপুরের কর্দ্দম-প্রবাহ অপেক্ষা প্রায় ৬'৭ গুণ অধিক। Colonel Strachey গণনা করিয়া বলেন, বঙ্গীয় বদ্বীপের যতখানি অংশ প্রতি বৎসর প্লাবিত হয় তাহা দীর্ঘে ১২৫ ক্রোশ এবং প্রস্থে ৪০ ক্রোশ—সর্ব্বশুদ্ধ আয়তনে ১০,০০০ বর্গ ক্রোশ। ইহার দক্ষিণে, উপসাগর-মধ্যে যতখানি স্থান ব্যাপিয়া কর্দ্দম প্রক্ষিপ্ত হয় তাহার আয়তন ২২,৫০০ বর্গ ক্রোশ—এই দুইটি অঙ্ক যোগ করিলে ৩২,৫০০ বর্গ ক্রোশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব এই ৩২,৫০০ বর্গ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া উক্ত মহা-নদীদ্বয়ের কর্দ্দমরাশি প্রসারিত হয়। মনে কর যদি এই কর্দ্দমরাশির নিরেট অংশ ৪০০,০০০ ঘনফীট হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত ভূমির আয়তন একফুট ঊর্দ্ধে উঠাইবার জন্য—৪৫৺ বৎসর কাল, কিম্বা ৩০০ ফীট ভূমি উঠাইবার জন্য ১৩,৬০০ বৎসর ক্রমাগত মৃত্তিকা-সঞ্চয় করা আবশ্যক। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, কলিকাতায় নদীস্তর যতদূর পর্য্যন্ত বাস্তবিক খনন করা হইয়াছিল তাহার গভীরতা ৩০০ ফীট অপেক্ষা অনেক অধিক।

যাহা হউক, এই বদ্বীপ ভবিষ্যতে কি পরিমাণে অগ্রসর হইবে, তাহা কখনই উপরোক্ত তথ্যগুলি হইতে নিরূপণ করা যায় না—এবং এই সমস্ত ভূমি সমভাবে থাকিবে কিম্বা কালে সমুদ্রের স্থান অধিকার করিবে তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ইদানীন্তন ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের

পর্য্যবেক্ষণে এই আশ্চর্য্য সত্যটি প্রকাশ পাইয়াছে যে, দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল, Scandinavia দেশ এবং প্রশান্ত সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ যেরূপ একদিকে ধীরে ধীরে অলক্ষিতভাবে উন্নত হইতেছে—সেইরূপ পক্ষান্তরে গ্রীন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দেশ ক্রমশঃ অধোগত হইতেছে। গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের ন্যায় যদি আমাদের এই প্রদেশেও অধোগতি-ক্রিয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে ১৩,০০০ বৎসর পরে বঙ্গ-উপসাগর এখনকার অপেক্ষা গভীর হইলেও হইতে পারে। Lyell বলেন, যদি প্রতি শতাব্দীতে বঙ্গীয় বদ্বীপ ২ ফীট ৩ ইঞ্চ করিয়া বসিয়া যায়—(এত অল্প পরিমাণ যে বঙ্গবাসীরা তাহা উপলব্ধি করিতেও পারিবে না)—তাহা হইলে উক্ত মহা-নদীদ্বয় তদীয় বদ্বীপের সীমা-পরিবর্দ্ধনের যতই চেষ্টা করুক না কেন, ঐ পরিমাণ ভূমি বসিয়া গিয়া উহার যথেষ্ট প্রতিবিধান করিবে সন্দেহ নাই। এই বঙ্গীয় ব-দ্বীপে, নদীর মৃত্তিকা-বাহনশক্তি অপেক্ষা, ভূমির অধোগমনরূপ বিরোধী শক্তি যে অধিকতর প্রবল, "অতলস্পর্শের" অস্তিত্বেই তাহার নিদর্শন, এবং কলিকাতার খনন-ক্রিয়াতেও তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। এই জন্যই বঙ্গভূমি উন্নত হইতে সমর্থ হয় না, এবং এই জন্যই বঙ্গউপসাগরের অধিকাংশ স্থান কর্দ্দমরাশিতে পূর্ণ হইতে পারে না। কিন্তু কালে উন্নমন কি অধোগমন—কোন্ শক্তিটি বঙ্গদেশে প্রবল হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

রামিয়াড্

অথবা

ডাক্তার বাল্মীকি এল্ এল্ ডি, এফ্ আর্ সি এস্-কৃত

ঊনবিংশ শতাব্দীয় রামায়ণ।

পুণ্যতীর্থ তমসা নদীর তীরে ডাক্তার বাল্মীকির তপোবন। তার-কণ্ঠী কুক্কুট-কুক্কুটী বিহঙ্গেরা মনের উল্লাসে গান করিতেছে; কোথাও বা আশ্রম-মৃগ কুক্কুরগণ সুখে অস্থি-দূর্ব্বা রোমন্থ করিতেছে। ডাক্তার বাল্মীকি আশ্রম-কুটীরে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ফায়ার-সাইড অগ্নি-কুণ্ডের পার্শ্বে ঈজিচেয়ার-বেদীতে হেলান দিয়া ম্যানিলা-পত্রের ধূমপান করিতেছেন; চুরট-প্রান্ত হইতে ঘন ধূমরাশি কুণ্ডলী পাকাইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে, সেই ধূপধূনার পুণ্য গন্ধে আশ্রম-কুটীর আমোদিত। মধ্যে মধ্যে মুনিবর পার্শ্বস্থিত বোতল-কমণ্ডলু হইতে শ্যাম-পেনের সোম-পান করিতেছেন; এমন সময়ে কুটীর-দ্বারে ঘা পড়িল। মুনি-কুমার মাষ্টার ভরদ্বাজ, ডাক্তার বাল্মীকির নিকট আসিয়া সমাচার দিল—"রেবরেণ্ড মিষ্টর নারদ আসিয়াছেন।" ধ্যানমগ্ন বাল্মীকির চটক্ ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং হাইচার্চ-মিসনরি-সোসাইটির পরিব্রাজক-মিসনরি, সঙ্গীতের অধ্যাপক, সহস্র চুরট-ভস্মকারী, গোখাদকদিগের অগ্রগণ্য, রেবরেণ্ড নারদের সহিত চটুল-ভাবে হস্তালোড়নপূর্ব্বক "কেমন করিতেছ" বলিয়া কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ উত্তর করিলেন, "সম্পূর্ণ ভাল—ধন্যবাদ তোমাকে।" অতঃপর বাল্মীকি নারদকে আহ্বান-পূর্ব্বক কুটীরের মধ্যে লইয়া গিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। মহামুনি, ধুচুনি-উষ্ণীষ মস্তক হইতে অবতারণ পূর্ব্বক চেয়ারে উপবেশন করিলেন, পরে চেয়ারের নিম্নে

উষ্ণীব স্থাপন করিয়া বলিলেন "বাল্মীকি! তোমায় আজ এত ভাবিত দেখিতেছি কেন?" বাল্মীকি উত্তর করিলেন, "প্রিয় খুড়া, সত্য বলিয়াছ, আমি কিছু ভাবিত আছি; অনেক দিন হইতে আমি মনে করিতেছি একটি মহাকাব্য লিখিব—কে নায়ক হইবার উপযুক্ত তাহাই এতক্ষণ আমি এই অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম। বুদ্ধিকে সতেজ করিবার জন্য গ্যালন-গ্যালন "শ্যাম্পেন"-সোমপান করিয়াছি তথাপি তাহার কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। এক্ষণে খুড়া, তুমি কি এত দয়ালু হইবে যে, ইহার একটা সৎপরামর্শ দিয়া আমাকে বাধিত করিবে?" সুবিজ্ঞ নারদ আজানুলম্বিত পাকা দাড়ি বুলাইতে বুলাইতে উত্তর করিলেন—"দেখ বাপু বাল্মীকি! মহাকাব্য, ভাষায় যাহাকে "এপিক্ পোয়েম" বলে, তাহা অতি দুরূহ ব্যাপার, তাহা লেখা তোমার আমার কর্ম্ম নহে। এক-যা লিখিয়াছিলেন মহর্ষি হোমর—তেমন এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আর কেহই লিখিতে পারে নাই—পারিবেও না; তুমি সে দুরাশা পরিত্যাগ কর।" বাল্মীকি বলিলেন "খুড়ো অমন আশীর্ব্বাদ করিও না—মনুষ্য যাহা করিয়াছে মনুষ্য তাহা করিতে পারে। হোমর ইলিয়াড লিখিয়াছেন—আমি কি কিছুই লিখিতে পারি না? হোমর ইলিয়াড লিখিয়াছিলেন, আমি রামিয়াড লিখিব! আমার ইন্‌স্‌পিরেষণ আসিয়াছে, তোমার হার্পটা আমাকে দাও, আমি রামিয়াড গান করি।" এই কথা বলিয়া বাল্মীকি হার্প বাদনপূর্ব্বক গর্দ্দভ-বিনিন্দিত সুমধুর স্বরে উনবিংশ-শতাব্দীয় রামায়ণ গান আরম্ভ করিলেন। বাল্মীকির স্বহস্ত-পালিত আশ্রম-মৃগ কুক্কুরগণ প্রভু-প্রসাদ গো-অস্থি রোমন্থ করিতেছিল—গীত-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নিকটে আগমন পূর্ব্বক ভেউ ভেউ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। উভয় স্বর মিলিয়া একটি মধুর সঙ্গীত-লহরী গগনতলে সমুত্থিত হইল:—

রাম নামে একজন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার দেহ

মধ্যমাকার, হর্কুলিসের ন্যায় দৃঢ়-গঠন, নাসিকা রোমীয় ছাঁদের, ওষ্ঠাধর কিঞ্চিৎ চাপা, ইহাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সূচিত হইতেছে। তাঁহার কুঞ্চিত কুন্তল, আবলুষ্-কাষ্ঠ-বিনিন্দিত মসৃণ ললাটে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বোধ হইতেছে যেন বিশাল ওকগাছে আইভি-লতা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সেই লোকপূজিত রাম গাম্ভীর্য্যে নেষ্টরের ন্যায়, ধৈর্য্যে আল্প-গিরির ন্যায়, সৌন্দর্য্যে ক্যুপিডের ন্যায়, ক্ষমায় যীশু খ্রীষ্টের ন্যায়, ধনে রথচাইল্ডের ন্যায়, শাস্ত্রজ্ঞানে মোক্ষমূলারের ন্যায় অসাধারণ ছিলেন। তিনি রাজা দশরথের প্রিন্স-অফ্-ওয়েল্স্। একদিন রাম মৃগয়ার্থ মিথিলা-সন্নিহিত কোন অরণ্যে খ্যাকশেয়ালী শীকার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ অতি পরিপাটী। নীলাভ উৎকৃষ্ট বনাতের কোট্ ও নব্যতম চপের চোস্ত পেন্‌টলুন পরিধান, মস্তকোপরি সোলার হ্যাট্, পদদ্বয়ে শীকারোপযোগী ওয়েলিংটন-বুট আজানু-সমুত্থিত, এবং উইস্কির বোতল্ ও কাট্‌লেট-সম্বলিত চর্ম্মঝুলি চর্ম্মোপবীতে আলম্বিত রহিয়াছে। শিঙ্গার নিনাদে, কুক্কুরের চীৎকারে, শিকারীগণের হুর্‌রে-রবে, অশ্বের হ্রেষা-ধ্বনিতে কানন-প্রদেশ ধ্বনিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্র বল্লম উদ্যত করিয়া শৃগালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া, একেবারে কাননের প্রান্ত-দেশে উপস্থিত হইলেন। শৃগাল দৃষ্টিবহির্ভূত হইল। রাম নিরাশ হইয়া একটি বৃক্ষে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইলেন এবং পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঘন-ঘন মুখ পুঁছিতে লাগিলেন। সহসা রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত কাতর চীৎকার-ধ্বনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাম একজন গ্যালাণ্ট লোক, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ধ্বনির অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

কিয়দ্দূরে গিয়া দেখিলেন, একটি চত্বারিংশৎবর্ষীয়া-বালিকা মূর্চ্ছিতা। রাম অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, তাঁহার ব্যাগের মধ্যে আঘ্রাণ-লবণ-খুঁজি-লেন কিন্তু পাইলেন না। পরে উইস্কির বোতলে যে মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ ছিল তাহার এক ডোজ বালিকাটির মুখে ঢালিয়া দিলেন—দিবামাত্রই

সমস্ত শরীর নড়িয়া উঠিল—ক্রমে ক্রমে চক্ষু উন্মীলিত হইল, চক্ষু মেলিতেই সম্মুখে রামকে দেখিতে পাইলেন—অমনি "O my !" বলিয়া দুই হাতে পুনর্ব্বার চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন। রাম বলিলেন "ভয় নাই — আমি আপনার রক্ষা হেতু আসিয়াছি। কি জন্য আপনি ভয় পাইয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি ? চত্বারিংশবর্ষীয়া বালিকা উত্তর করিলেন "আমি আরণ্যক দৃশ্যের স্কেচ তুলিতেছিলাম, এমন সময়ে আমার গাউনের আঁচল ঘেঁসিয়া যেন একটা জন্তু—বোধ হয় শৃগাল—দৌড়িয়া চলিয়া গেল, তাহা দেখিয়া অমি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছি।

রাম।—হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া আছেন কেন ?

বালিকা।—আমার ভয় হইতেছে পাছে আবার শৃগালটা আসে—আমাকে যদি কেউ, এই অরণ্য-পথের রক্ষক হইয়া, আমার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন, তবে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই।

রাম।—তার জন্য চিন্তা কি ?

এই বলিয়া বালিকাকে উঠাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি কি আপনাকে বাহুদান করিতে পারি ?" সীতা বলিলেন, "ধন্যবাদ আপনাকে।" রাম হস্ত বাড়াইয়া দিলেন ; বালিকা ঈষৎ ব্লষ্ করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন "আপনি যে আমাকে এই মহা বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন তাহার ঋণ আমি কিরূপে পরিশোধ করিব ?"

রাম।—আমি যে উপকার করিলাম তাহা অতি সামান্য।

বালিকা।—ওকথা বলিবেন না—আপনার ন্যায় বীরপুরুষ উপস্থিত না থাকিলে, নিশ্চয়ই আজ শৃগালের হস্তে প্রাণ হারাইতাম।

রাম।—আমি থাকিতে আপনার কোন ভয় নাই। এক্ষণে পরস্পরের নিকট আর অপরিচিত থাকা কর্ত্তব্য নয়। আমার নাম রাম—আপনার নাম-জিজ্ঞাসার স্পর্দ্ধা কি মার্জ্জনা করিবেন ?

বালিকা।—আমার নাম মিস্ সীতা জনক।

রাম।—ও! আপনি হিজ্-ম্যাজেষ্টী জনকের কন্যা? তিনি খুব একজন এন্‌লাইটেণ্ড লোক। আমার বলিতে সাহস হইতেছে না—প্রথম দৃষ্টিতেই আপনাকে আমি ভালবাসিয়াছি। এ ভক্ত কিঙ্কর কি আপনার পাণি গ্রহণের আশা করিতে পারে?

সীতা।—(সলজ্জ ভাবে) সে পিতা জানেন।

রাম।—তাঁর কাছে কি আমি প্রস্তাব করিতে পারি? তিনি সম্মত হইলে আপনার ত কোন আপত্তি থাকিবেনা? সীতা ব্লষ্‌ করিয়া নিরুত্তর হইলেন।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে জনক রাজার প্রাসাদে পৌঁছিলেন।

রাম, জনক রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক আপনার কুলের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আপনার কন্যার হস্তের নিমিত্ত আমি উমেদার।" জনক রাজা বলিলেন, "অতি উত্তম! কিন্তু আমার একটি বন্দুক-ভঙ্গ পণ আছে, তাহার আমি অন্যথা করিতে৷ পারি না। আমি টাইম্‌স্-সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে, কোন পর্য্যটক আফ্রিকাবাসী গরিল্লা নামক বীর-চূড়ামণিকে বন্দুক মারিতে যাওয়ায় তিনি তাঁহার বন্দুক কাড়িয়া লইয়া এক মোচড়ে দ্বিখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এইরূপ অসাধারণ বীরত্বের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমি আর নীরব থাকিতে পারিলাম না। আমি দেশ বিদেশে প্রচার করিলাম, গরিল্লা-বীরকে আদর্শ মানিয়া, তাঁহার ন্যায় যিনি বন্দুক-ভঙ্গ করিতে পারিবেন তাঁহাকে আমি কন্যা-সম্প্রদান করিব।" রাম বলিলেন, "আচ্ছা, আমি প্রস্তুত আছি।" অমনি একজন তৈয়ার ভৃত্য দ্রুতগতি একটা মার্টিনি-রাইফেল্ আনিয়া রামের সম্মুখে ধরিল। রাম তাহা দুই হস্তে ধরিয়া একটি মোচড়েই কর্ম্ম নিকাশ করিয়া, সদর্পে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলেন। জনক রাজা এবং তাঁহার পারিষদগণের তাক্ লাগিয়া গেল। জনক

রাজা আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিলেন, "তুমি যেরূপ অসামান্য বলবীর্য্য দেখাইলে, কন্যা-সম্প্রদানের আগে, তাহার উপযুক্ত একটি উপাধি তোমাকে আমি প্রদান করিতে অভিলাষ করি। অনেকের অনেক উপাধি আছে, যথা নর-ব্যাঘ্র, নর-পুঙ্গব, নরর্ষভ, কিন্তু সে সমস্তই পুরাতন হইয়া গিয়াছে, আজ হইতে তুমি নর-লোকে নর-গরিল্লা নামে খ্যাত হইবে। এক্ষণে মিস্ জনকের সম্মতির কেবল অপেক্ষা, অতএব যাও তাঁহাকে রাজি কর গিয়া! রাম সদাসদাই কোর্টসিপ্ সুরু করিয়া দিলেন। সীতা যদিও চত্বারিংশবর্ষীয়া বালিকা বই নয়, কিন্তু তিনি সকল গুণেই গুণবতী ছিলেন। জনক রাজা একজন এন্‌লাইটেণ্ড্ লোক।—তিনি বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক অনেক সভায় বক্তৃতা দিতেন। তিনি আপন কন্যাকে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। সীতা তাঁহার যত্নে সর্ব্বগুণে বিভূষিতা হইয়াছিলেন। তিনি কার্পেট-বুনানি কার্য্যে অতিশয় নিপুণা ছিলেন। ফরাশীশ্ ভাষায় নবেল পাঠ করিতেন। পল্কা এবং ওয়াল্‌ট্‌স্ ধরণে নাচিতেন। প্যারিস নগরের নব্যতম ফেসিয়ানের গাউন পরিতেন—সহজে ব্লষ্ করিতে পারিতেন এবং ইচ্ছা করিলেই মূর্চ্ছা যাইতে পরেিতেন। এমন রূপ-গুণে বিভূষিতা চত্বারিংশ-বর্ষীয়া বালিকাকে দেখিয়া রাম যে মুগ্ধ হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি! তিনি শীঘ্রই কোর্ট্‌সিপ্ শেষ করিয়া ফেলিলেন এবং বিবাহের পর এক্ষণে তিনি মনের সুখে মধুচন্দ্র ভোগ করিতেছেন। ইতি সাত ক্যাণ্টো রামিয়াডের মধ্যে হনি-মুন-নামকোহয়ং প্রথমঃ ক্যাণ্টঃ সমাপ্তঃ।

জাপানের বর্ত্তমান উন্নতির মূল-পত্তন।

জাপানের উপর এক্ষণে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। কি করিয়া এত অল্পকালের মধ্যে জাপানীরা স্বীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিল ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যে উন্নতি এক শত বৎসরের কার্য্য তাহা তাহারা দশ বৎসরের মধ্যে সাধন করিয়াছে। ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে "শোগুন"-আধিপত্য অর্থাৎ সেনাপতিবংশের আধিপত্য বলবৎ ছিল। "শোগুনই" দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা ছিলেন। সম্রাট্ কেবল সাক্ষী-গোপাল। সম্রাটের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শোগুন তাঁর নামে সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ১৬০০ শতাব্দীতে শোগুন-আধিপত্য দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। জাপানে বরাবর উপরাজ—সামন্তরাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। 'মিকাডো'র অর্থাৎ সম্রাটের অব্যবহিত অধীনে অনেকগুলি সামন্ত রাজা ছিলেন,—তাঁহাদের নাম "ডেমিও।" ইহাঁরাই দেশের অভিজাত-বর্গ; ইহাঁরা স্বাধীনভাবে আপন আপন অধীনস্থ প্রদেশ শাসন করিতেন। এই ডেমিওদিগের অব্যবহিত অধীনে "সমরাই।" সংগ্রাম উপস্থিত হইলে ডেমিওদিগের হইয়া সমরাইগণ যুদ্ধ করিত, এবং এই সামরিক দাসত্বের বিনিময়ে ইহারা ডেমিওদিগের নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইত। ইহারাই দেশের সামরিক শ্রেণী। ইহারাই দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়। "সমরাইগণ" আবার তাহাদিগের অনুচরদিগের সহিত নিজ নিজ অধিকারস্থ ভূমি পত্তনি-বন্দোবস্ত করিত। "শোগুন" যদিও নামতঃ ডেমিও-সম্প্রদায়ের সম-পদবীস্থ, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি তাহাদিগের অধিপতি। শোগুনের রাজধানী "যেদো"—বর্ত্তমান "টোকিয়ো" নগর; এবং সম্রাটের রাজধানী "কিয়োটো" নগরে ছিল।

শোগুন আপনার অনেকগুলি অনুচরকে ডেমিও-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং স্বীয় অনুগত লোকদিগকে প্রধান প্রধান রাজ-কার্য্যে নিয়োগ করিতেন। তাঁহার যথেচ্ছাচারী প্রভুত্ব ছিল। "ঘোসিউ" সামন্ত-রাজের অধিকারে ১০টা প্রদেশ ছিল, শোগুন তাহার মধ্যে ৮টা প্রদেশ নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। "সাৎসুমা" সামন্তরাজের অধিকারে ৮টা প্রদেশ ছিল, শোগুন তাঁহার নিকট হইতে ৫টা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এই অত্যাচার-নিবন্ধন, এই দুই রাজ-বংশ "শোগুনের" বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। শোগুনের প্রভুত্ব ধ্বংস করিয়া কিরূপে দেশের প্রকৃত সম্রাটের আধিপত্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবেন ইহাই তাঁহাদের একমাত্র ব্রত হইল। এ দিকে আবার বিদ্যা ও সাহিত্যের পুনরাবির্ভাবে, দেশের প্রকৃত অবস্থা-সম্বন্ধে লোকের চোখ ফুটিতে লাগিল। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, "শোগুন"দিগেরই যত্নে জাপানে বিদ্যা ও সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে "মিতো"র রাজকুমার, "দাই নিহনশি" নামক জাপানের একটি বিস্তৃত ইতিহাসে লেখেন; সেই ইতিহাস পাঠ করিয়া সম্রাটের প্রকৃত অবস্থা-সম্বন্ধে সাধারণ লোকের চেতনা হয়। তাহার পর হইতে আরও অন্যান্য বিদ্বজ্জন ও গ্রন্থকার মধ্যে-মধ্যে সমুদিত হইয়া জাপানের প্রাচীন ধর্ম্ম ও ইতিহাস-বিষয়ে লোকের কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিল এবং দেশের প্রকৃত সম্রাট "মিকাডোর" স্বত্ব ও অধিকার-সকল লোকের স্মরণ-পথে জাজ্বল্যরূপে আনয়ন করিয়াছিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে আর একটি জাপানের ইতিহাস প্রকাশিত হয়। যে সকল সেনাপতি-বংশ অবৈধরূপে সম্রাটের ক্ষমতা অধিকার করিয়াছিল, সেই সকল বংশের ইতিবৃত্ত ঐ গ্রন্থে গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সমস্ত গ্রন্থের সার মর্ম্ম এই যে—"মিকাডোই" জাপানের একমাত্র প্রকৃত শাসনকর্ত্তা, তাঁহার নিকটেই প্রত্যেক জাপানীর নতশির

হওয়া উচিত এবং শোগুনেরা সম্রাটের ক্ষমতা অন্যায়রূপে অধিকার করিয়াছে। "যেদোর" কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ও মুদ্রা-যন্ত্র-শাসকগণ এই গ্রন্থ তন্নতন্নরূপে আলোচনা করিয়া এবং উহার আপত্তি-জনক অংশ সকল উঠাইয়া দিয়া তবে গ্রন্থকারকে ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সম্মতি দেন। শোগুনেরা বংশপরম্পরাক্রমে যে সাহিত্যের উৎসাহ দিয়া আসিয়াছিলেন সেই সাহিত্যই অবশেষে তাঁহাদিগের আধিপত্যের মূলোচ্ছেদ করিল।

একদিকে যেরূপ নানা প্রকার আভ্যন্তরিক কারণে শোগুনের আধিপত্য ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছিল, ওদিকে আবার কতকগুলি অপরিহার্য্য বাহ্য ঘটনা উপস্থিত হইয়া সেই ধ্বংস-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিল। মধ্যে মধ্যে বৈদেশিকেরা জাপানের বন্দরে উপস্থিত হইয়া বাণিজ্য-দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য বারংবার প্রার্থনা করায়, শোগুন ইয়েনোরি বিরক্ত হইয়া এই আদেশ ঘোষণা করিয়া দিলেন, জাপানের উপকূলে যে কোন বৈদেশিক জাহাজ অগ্রসর হইবে, তাহার উপর গুলি বর্ষণ করা হইবে। এবং জাপানের উপকূল সংরক্ষণের বিবিধ ব্যবস্থা করিবার জন্য "ডেমিও"গণের প্রতি আদেশ প্রচার করিলেন।

সাৎসুমা ও মিতোর রাজকুমার নিজ ব্যয়ে ইয়ুরোপীয় প্রণালীর জাহাজ প্রস্তুত করিয়া শোগুনকে উপহার দিলেন। ইয়ুরোপীয় সামরিক প্রণালী-অনুসারে সৈন্যদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। অস্ত্রালয় সকল স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইল। এই সময়ে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে কমোডোর পেরি (Commodore Perry) ৪টা জাহাজের নেতা হইয়া জাপান-উপকূলে উপস্থিত হইলেন, এবং বন্ধুত্ব ও বাণিজ্যের সন্ধি স্থাপনা করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। শোগুন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, সমস্ত জাতি-সাধারণের মত না লইয়া তিনি এ বিষয়ে কোন উত্তর দিতে পারেন না। পেরি বলিলেন, "আচ্ছা তবে আমি আর এক বৎসর পরে আসিব"—এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। এক মাস

পরেই এইরূপ সন্ধিস্থাপনের প্রার্থনা করিয়া একটি রুষীয় জাহাজ উপস্থিত হইল। শোগুন দেশের সংরক্ষণ-কার্য্য ও যুদ্ধ-আয়োজন-সকল সমাধা করিতে আরও তৎপর হইলেন। যুদ্ধের জাহাজ, কামান, ও দুর্গ চারিদিকে নির্ম্মিত হইতে লাগিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে পেরি আবার যুদ্ধ-জাহাজ-সমভিব্যাহারে জাপান-উপকূলে উপস্থিত হইলেন এবং আবার সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। তিন মাস বিলম্ব করিয়া শোগুন একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন। সেই সন্ধির মর্ম্ম এই—পোত-ভগ্ন নাবিকদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে হইবে; কাষ্ঠ, জল, খাদ্য ও জাহাজের অন্যান্য আবশ্যকীয় সামগ্রী আহরণ করিবার এবং "শিমোদা" "হাকোদাতের" বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করিবার অনুমতি দিতে হইবে। কিছুকাল পরেই রুষীয় ওলন্দাজদিগকেও এই সকল অধিকার প্রদত্ত হইল। বিদেশীয়দিগের প্রতি জাপানের দ্বার রুদ্ধ রাখা দেশের প্রচলিত প্রথা ছিল, এবং বিদেশীয়গণের প্রবেশ-নিষেধ-বিধি জাপানের সুখ-শান্তি-স্বাধীনতার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক—এইরূপ জাপানের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোকদিগের দৃঢ় মত ছিল। কিন্তু শোগুন বৈদেশিক-দিগের সহিত এইরূপ সন্ধিবন্ধন করায়, একটা মস্ত ঝুঁকি আপনার স্কন্ধে লইলেন। খোসিউ, সাৎসুমা ও মিতোর প্রভৃতি প্রভাবান্বিত সামন্ত রাজগণ—যাঁহারা বরাবর এই প্রকার রাজনীতির দারুণ বিদ্বেষী ছিলেন এবং প্রকৃত সম্রাটের রাজকীয় ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাঁহাদের গূঢ় ব্রত ছিল—তাঁহারা এই উপলক্ষে বিলক্ষণ একটা সুযোগ পাইলেন। আমেরিকান্‌দিগের বরাবর এই ধারণা ছিল, জাপানের প্রকৃত সম্রাটেরই সহিত তাহাদিগের কথাবার্ত্তা চলিতেছে; কিন্তু পরে তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, শোগুন সম্রাট্ নহেন, এবং বৈদেশিকদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। শোগুন যদিও সন্ধিস্থাপন করিলেন, কিন্তু যুদ্ধ-আয়োজনে শিথিল-প্রযত্ন হইলেন না।

এই সময়ে ইংরাজেরা আসিয়া জাপানে আরও গোলমাল বাধাইয়া দিল। * তাহাদিগেরও সহিত একটি সন্ধি হইল, কিন্তু তখন তাহা দৃঢ়ীকৃত হয় নাই। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে Rear Admiral Sterling জাপানে পুনরাগমন করিলেন, এবং পর বৎসরে Mr. Townsend Harris আমেরিকার শাসন-কর্ত্তৃগণের নিকট হইতে, জাপানে বাস করিবার অনুমতি-প্রার্থনায়, জাপান-সম্রাটের নিকট অনুরোধ-পত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন।

এইরূপ বৈদেশিকেরা ক্রমাগত জাপানে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় শোগুন ভারি মুস্কিলে পড়িলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যদিও তিনি বৈদেশিকদিগের কতকগুলি দাবী মঞ্জুর করিয়াছিলেন, কিন্তু জপানে বৈদেশিকদিগের প্রবেশ-নিষেধ বিষয়ক পুরাতন বিধিটি যতদূর পারেন এতদিন বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাহা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, সে রাজনীতি অনুসারে চলিলে বিপুল পরাক্রান্ত বৈদেশিকদিগের সহিত নিশ্চয়ই যুদ্ধ বাধিবে এবং সে যুদ্ধে জাপানেরই পরাভব সম্ভাবনা। নাগাসাকিস্থ ওলন্দাজ বাণিজ্যস্থানের কর্ত্তা, তাঁহার এই মতের পোষকতা করিলেন। তিনি শোগুনকে এইরূপ পত্র লিখিলেন :—"আমি আপনাকে সাবধান হইতে পরামর্শ দিতেছি,

* While troubles internal and external, were thus preparing, the English made their appearance upon the scene, and those who know what sort of men we are abroad, and how we generally bear ourselves in the East (and one may say in the West, North, South too) to people weaker in ships and arms than ourselves, may well imagine that our appearance did not greatly contribute to the tranquility of the Government of Japan. Japan : by Sir Edward Reed. K. C. B. F. R. S. M. P.

Vol. I—p. 259.

বৈদেশিকদিগের সহিত সংস্রব ঘটিলে, ন্যায় অন্যায় দূরে থাকুক, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া প্রায়ই বিবাদ উপস্থিত হয়। ইহা নিশ্চয়, নিজ দুর্ব্বলতা বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকা, স্বদেশকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার উপায় নহে। এই কারণেই দশ বৎসর পূর্ব্বে, অহিফেন-সংক্রান্ত যুদ্ধের পর, চীন-রাজ্যের কিয়দংশ চীন-রাজের হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়, এবং ক্যাণ্টন-প্রদেশ এক্ষণে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।" এই কথা শোগুন-মন্ত্রিগণের হৃদয়ঙ্গম হইল। তাঁহারা স্থির করিলেন, শান্তি-রক্ষার জন্য ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দের বৈদেশিক প্রবেশ-নিষেধ-বিধির কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমেরিকান দূত হারিসের পুনঃপুনঃ অনুরোধে অভিভূত হইয়া শোগুন অবশেষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যেদো নগরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। ইহাতে প্রধান প্রধান সামন্তরাজগণ অত্যন্ত বিরক্ত ও রুষ্ট হইলেন। তাঁহারা ইহার প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু শোগুনের মত ফিরিল না; শোগুন যেদো রাজধানীতে হ্যারিসকে প্রকাশ্যরূপে নিজ দরবারগৃহে অভ্যর্থনা করিলেন, হ্যারিস তাঁহার প্রার্থনাগুলি মন্ত্রীদিগের নিকট বুঝাইয়া বলিলেন। তাঁহার প্রার্থনাগুলি এই :—স্বর্ণ ও শস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের উভয় দেশের মধ্যে বাধা-বিমুক্ত ও রাজকর্ম্মচারিগণের হস্তক্ষেপ-বহির্ভূত বাণিজ্য সংস্থাপন; শিমোদা-বন্দর রুদ্ধ করিয়া, কানাগাবা ও অশক বন্দরের দ্বার উদ্ঘাটন; যেদো নগরে, একজন আমেরিকান মন্ত্রি-দূতের নিয়ত বাস এবং সবিস্তারে-লিখিত একটি সন্ধিপত্রের দৃঢ় অনুমোদন। শোগুন এক্ষণে সম্রাটের উপর বিচার-ভার সমর্পণ করিলেন এবং দেশের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং এই সন্ধি স্থাপন বিষয়ে সম্মতি আনাইবার জন্য তাঁহার মন্ত্রিগণকে "মিকাডোর" দরবারে পাঠাইলেন। কিন্তু দরবারের অনুগত অভিজাতবর্গ ("কুজে") এই বিষয়ে ভয়ানক আপত্তি উত্থাপন করিলেন। হ্যারিস

এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে প্রকৃত সম্রাটের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিতেছে না—শোগুনের উপরেও আর এক জন কর্ত্তা আছে। কার্য্য-সিদ্ধির অনেক বিলম্ব দেখিয়া সম্রাটের দরবারে নিজে গিয়া উপনীত হইবেন—এই বলিয়া শোগুনকে শাসাইলেন। এই সময়ে লী (Li) শোগুনের প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আমেরিকান ও রুষীয় যুদ্ধ-জাহাজ-সকল য়োকোহামা বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা কর্ত্তৃপক্ষগণকে অবগত করিল যে, আর কিছু দিনের মধ্যেই ইংরাজি ও ফরাসি যুদ্ধ-জাহাজ সকলও আসিয়া পৌঁছিবে। এবং তাহারা সকলেই এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যদি সহজে না হয় তবে তলোয়ার, বন্দুক ও কামানের বলে তাঁহারা জাপানের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবেন।

মন্ত্রিবর লী এই শাসন-বাক্যে ভীত হইয়া সম্রাট-দরবারের মত না লইয়াই তাড়াতাড়ি আমেরিকানদিগের সন্ধিপত্রে নিজ মোহর মুদ্রিত করিলেন এবং পরে এই বিষয় সম্রাটকে অবগত করাইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই রুষীয়, ইংরাজ ও ফরাসিগণ জাপানে প্রবেশ করিয়া আমেরিকার সন্ধিপত্রের আদর্শে সন্ধিস্থাপন করিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, জাপানের সহিত ইয়ুরোপ ও আমেরিকা যে সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা বৈধরূপে হয় নাই—তাহা কামানের মুখে হইয়াছিল। বৈদেশিকদিগের সহিত এইরূপ সন্ধি হওয়ায়, সমস্ত জাপানী জাতি, বিশেষতঃ সামরিক-শ্রেণী ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা ইংরাজ, ফরাসি, রুষজাতীয় দৌত্য-সংক্রান্ত কর্ম্মচারীগণকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া নিহত করিতে লাগিল। তাহার প্রতিবিধান করা শোগুনের অসাধ্য হইয়া উঠিল। ক্রমশই অরাজকতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই বিদ্রোহীদিগের দল ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সম্রাট রাজ্যের এইরূপ অবস্থা অবগত হইয়া শোগুনের

প্রতি এই হুকুম প্রচার করিলেন যে, শোগুন সমস্ত ডেমিওগণ-সমভি-ব্যাহারে কিয়োটো রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত জাপানী-জাতির অভিপ্রায় অবধারণ করুন এবং তৎপরে বৈদেশিক বর্ব্বরদিগকে দেশ হইতে দূরীভূত করিয়া সম্রাটের স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের কোপ শান্তি করুন। আরও, রাজকার্য্যে পরামর্শ করিবার জন্য পাঁচজন প্রধান সামন্ত-রাজ লইয়া একটি মন্ত্রিসভা স্থাপন করিবার বিষয় এবং রাজ্য-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়েও উপদেশ দিলেন।

২৩০ বৎসর ধরিয়া সম্রাট সাক্ষীগোপাল এবং শোগুনই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। এত দিনের পর সম্রাটকে স্বীয় অধিকার সমর্থন করিতে দেখিয়া লোকেরা আশ্চর্য্য হইল এবং এই লইয়া জাপানী সমাজে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। শোগুন, সম্রাটের সমস্ত আজ্ঞাপালন করিবেন বলিয়া দৃঢ়-সংকল্প হইলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মিকাডো, শোগুনের প্রতি পুনর্ব্বার আদেশ করিলেন যে তাঁহার দরবারে যে সকল পুরাতন কুপ্রথা আছে সে সমুদয় সংশোধন করিতে হইবে—এবং কিয়োটো রাজধানীতে আসিয়া সমস্ত সামন্ত-দলের প্রতি হুকুম প্রচার করিয়া অবিলম্বে বর্ব্বর-দিগকে দেশ হইতে দূরীভূত করিতে হইবে। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া শোগুন তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ-সমভিব্যাহারে সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং বর্ব্বরদিগকে দূরীভূত করিবার দিন ২৫শে জুন স্থিরীকৃত হইল। এই বিজ্ঞাপন সমস্ত সামন্তদলের নিকট প্রচার করিবার জন্য শোগুনের প্রতি সম্রাট আদেশ করিলেন। শোগুন আজ্ঞাপালনের ভাণ করিয়া ও-বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট থাকিলেন। তাহার পর মিকাডো প্রস্তাব করিলেন যে একটি প্রসিদ্ধ বুদ্ধ-দেবের মন্দিরে গিয়া তিনি বর্ব্বর-বিধ্বংসী তলো-য়ার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন। শোগুন, পীড়ার ছল করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে তথায় উপস্থিত হইলেন না। সামরিকগণ ভয়ানক উত্তেজিত ও

রুষ্ট হইয়া উঠিল, সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করুন এই বলিয়া সকলে চীৎকার করিতে লাগিল, অনেক কৌশলে ও শাসনে মন্ত্রিগণ তাহাদিগকে শান্ত করিলেন। এ দিকে, উত্তেজিত ইতর লোকেরা বৈদেশিকদিগকে মধ্যে মধ্যে হত্যা করায়, ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ বিস্তর টাকা দিতে হইল।

সাধারণের মতপ্রভাবে অভিভূত হইয়া, শোগুন সন্ধির নিয়ম অতিক্রম করিয়া, বৈদেশিকদিগের বিরুদ্ধে কতকগুলি বাণিজ্য-বন্দর রুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই লইয়া খোসিউ সামন্ত-রাজ-দলের যুদ্ধ-জাহাজের সহিত, য়ুরোপ ও আমেরিকার যুদ্ধ-জাহাজের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। গোলাগুলি বর্ষণে উভয় পক্ষেরই ন্যূনাধিক ক্ষতি হইল।

খোসিউ দলের লোকেরা শোগুনের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে বৈদেশিক জাহাজের উপর গুলিবর্ষণ করায়, শোগুন তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন। এই লইয়া শোগুনের সহিত তাহাদিগের মনান্তর উপস্থিত হইল। সাৎসুমা ও খোসিউ দলকে সম্রাটের প্রাসাদ রক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু সাৎসুমা দলকে ঐ কার্য্য হইতে অবসর দেওয়ায়, কার্য্যের সমস্ত ভার খোসিউ দলের উপর পতিত হইল। খোসিউ দলের উত্তেজনায় সম্রাট স্বয়ং বৈদেশিকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু দরবারের অভিজাতবর্গের এ বিষয়ে মত ছিল না। এই কারণে সম্রাটের দরবার ও শোগুন উভয়েই সম্মিলিত হইয়া, খোসিউ দলের বিরুদ্ধে কুচক্র আরম্ভ করিল। রাজদ্রোহ-অপরাধে অপরাধী করিয়া, খোসিউ দলের প্রধান ব্যক্তিদিগকে বধ করা হইল। খোসিউ দলের অনুচরগণ এক্ষণে বাস্তবিকই রাজদ্রোহী হইয়া উঠিল। এবং বৈদেশিকদিগকে দূরীভূত করিতে বিলম্ব দেখিয়া অন্যান্য বিদেশীয়-বিদ্বেষী লোকেরাও তাহাদিগের দলভুক্ত হইল। এই সময়ে সম্রাটের সহিত শোগুনের মিলন হইয়া গেল। যে সম্রাট এতদিন বৈদেশিক বর্ব্বরদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তিনিই

এক্ষণে বৈদেশিক-বিদ্বেষি-প্রধান-দিগকে শাস্তি দিবার জন্য শোগুনকে আদেশ করিলেন। শোগুন ও তাঁহার অনুচরগণ, এই আদেশে অতীব তুষ্ট হইয়া সম্রাটের প্রতি যারপরনাই রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল, সম্রাট পুনর্ব্বার শোগুনের হস্তে রাজ্যের সমস্ত ভার সমর্পণ করিলেন এবং খোসিউ দলের বিদ্রোহি-প্রধানদিগের প্রতি দণ্ড বিধানের আদেশ করিলেন। সাৎসুমা প্রভৃতি দলের সাহায্যে, অনেক যুদ্ধের পর শোগুন, খোসিউদিগকে পরাভূত করিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপ ও আমেরিকা তাহাদিগের সন্ধিপত্রে মিকাডোর নিকট হইতে বল-পূর্ব্বক সম্মতি বাহির করিলেন। ইংরাজি, ফরাসি, ও ওলন্দাজি যুদ্ধ-জাহাজ-সকল মিকাডোর রাজধানীর অনতিদূরে আসিয়া নোঙ্গর করিল। কিছুতেই তাঁহারা বিমুখ হইলেন না—সন্ধির নিয়মে অনুমোদন করিবার জন্য সম্রাটকে পত্র লিখিলেন। সম্মিলিত যুদ্ধ-জাহাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, মন্ত্রীদিগের পরামর্শ-অনুসারে সম্রাট সন্ধি-নিয়মে সাধারণতঃ সম্মতি দিলেন। জাপানীদিগের এক্ষণে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল, বিভক্ত প্রভুত্বই তাহাদিগের সকল দুর্দ্দশার মূল। এই কারণে যাহাতে সম্রাটের একাধিপত্য হয় তজ্জন্য সকলেই লালায়িত হইল। টোসার সামন্ত-রাজ শোগুনকে পত্র লিখিয়া এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন "সম্রাটের হস্তে শাসন-ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করা আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এমন একটি পত্তন-ভূমি স্থাপিত হইবে যাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া জাপান অন্যান্য সমস্ত দেশের সমকক্ষ হইতে পারিবে। এই সময়কার ইহাই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" শোগুন এই বিষয় অনুমোদন করিলেন, এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ-হিতকামী হইয়া শোগুন মিকাডোর নিকট স্বীয় কর্ম্মে ইস্তফা দিলেন। সম্রাট এই ইস্তফা গ্রহণ করিতে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন—পরে এই ঘোষণা প্রচার করিলেন যে শোগুন স্বীয় কর্ম্মে ইস্তফা দিয়াছেন, এবং

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই রাজবিধি প্রচারিত হইল যে এখন হইতে দেশের শাসন-ভার সম্রাটের হস্তে বিন্যস্ত হইবে। যে দিনে শোগুনের পদ রহিত হইয়া গেল, সেই দিনেই সম্রাট শোগুনের অনুগত সৈন্যদলকে বিদায় দিয়া প্রাসাদ-রক্ষণ-ভার "সাৎসুমা"-দলভুক্ত সৈন্যের প্রতি অর্পণ করিলেন। শোগুনের সহিত কোন প্রকার পরামর্শ না করিয়া এই কাজটী করায়, শোগুন অবমানিত বোধ করিয়া তাঁহার অনুগত দলবলকে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। এই সূত্রে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইল; অবশেষে সম্রাট জয়লাভ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিলেন।

——o——

জাপানের বর্ত্তমান উন্নতি।

শোগুনের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইয়া কিরূপে সম্রাটের আধিপত্য জাপানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে সম্রাট একাধিপত্য লাভ করিয়া কিরূপে জাপানের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, কি কি বিষয়ে সংস্কার করিলেন তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

পূর্ব্বে সম্রাটের রাজধানী কিয়োটো নগর এবং শোগুনের রাজধানী যেদো নগর ছিল। এক্ষণে তিনি কিয়োটো নগর পরিত্যাগ করিয়া যেদো নগরেই তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিলেন। এবং যেদোর পরিবর্ত্তে তাহার নাম টোকিয়ো রাখিলেন। টোকিয়োর অর্থ "প্রতীচ্য রাজধানী।" ওকুবো নামে তাঁহার একজন মন্ত্রী, সম্রাটের চির-প্রচলিত অবরোধ-নিবাসের বিরুদ্ধে এবং রাজধানীর পক্ষে কিয়োটো নগরের অযোগ্যতা-সম্বন্ধে সম্রাটের নিকট আবেদন করেন। সেই আবেদন পাঠ করিয়াই সম্রাটের রাজধানী পরিবর্ত্তনের সঙ্কল্প হয়। সেই আবেদনটি এই—"মধ্যযুগ হইতে বরাবর আমাদের সম্রাট যবনিকার অন্তরালে বাস করিয়া আসিয়াছেন। পৃথিবীর মৃত্তিকায় কখন তাঁহার পদক্ষেপ হয় নাই; সেই যবনিকার বাহিরে যাহা কিছু ঘটিত, তাহা তাঁহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিত না; সম্রাটের আবাস সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ থাকিত, সুতরাং বহির্জগতের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত দরবারের লোক ছাড়া কেহই সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হইতে পারিত না। এই প্রথাটি ঈশ্বরের নিয়মের সম্পূর্ণ বিরোধী। উপরিতন ব্যক্তিকে মান্য করা যদিও মনুষ্যের প্রথম কর্ত্তব্য, কিন্তু আবার অতিরিক্ত মান্য করিলে কর্ত্তব্যের অবহেলা হয়, এবং প্রজাগণও স্বীয় অভাব-সকল তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিতে পারে না, সুতরাং রাজা প্রজার মধ্যে একটা বিচ্ছেদ উপস্থিত

হয়। সকল যুগেই এই পাপজনক প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন এই আড়ম্বরপূর্ণ আদব-কায়দা যেন পরিত্যাগ করা হয়, এবং সরল আচার ব্যবহারই যেন আমাদের মুখ্য নিয়ম হয়। কিয়োটো একটা সৃষ্টিছাড়া স্থান, উহা রাজধানীর অযোগ্য।" টোকিয়ো নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া সম্রাট্ নানা প্রকার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। শাসন-সংক্রান্ত রাজাজ্ঞা-সকল সর্ব্বসাধারণের নিকট জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত একটি রাজকীয় সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন, আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের সংকুলান জন্য কাগজ-মুদ্রা প্রস্তুত হইল এবং ইংরাজ-তত্ত্বাবধানে দীপ-মন্দির-সকল (Light house) নির্ম্মিত হইতে লাগিল। জায়গিরদারি-প্রণালী এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। এই প্রণালীর মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য সম্রাট কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সাৎসুমা, খোসিউ, হিজেন, ভোসা প্রভৃতি প্রধান প্রধান সামন্ত-রাজগণ একত্র হইয়া তাহাদের নিজ নিজ রাজ্য ও প্রজাদিগকে সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিবার অনুমতি প্রার্থনায় সম্রাটের নিকট আবেদন করিলেন। ক্রমে অন্যান্য সমস্ত রাজাও তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। সম্রাট এই আবেদন গ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু সামন্ত-রাজগণের সহিত প্রজাদিগের যে অব্যবহিত সম্বন্ধ-সূত্র নিবদ্ধ ছিল সেই সূত্র হঠাৎ একেবারে ছিন্ন করিলে নানা প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, তাহা নিবারণ করিবার জন্য তিনি সেই সকল সামন্ত-গোষ্ঠীর নামগুলি বজায় রাখিলেন এবং সেই সকল সামন্ত-রাজের নাম "চিহাঞ্জি" অর্থাৎ গোষ্ঠীপতি রাখিলেন। ঐ সকল প্রধানেরা প্রত্যেকে তাহাদের নিজ নিজ রাজ্য হইতে পূর্ব্বে যে রাজস্ব লাভ করিতেন তাহারই দশমাংশ পরিমাণ প্রত্যেকের বৃত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। এইরূপে জায়গিরদারি-প্রণালী একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া তাহার স্থানে সম্রাটের একাধিপত্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গেসঙ্গে সৈন্য-প্রণালীর পরিবর্ত্তন

আবশ্যক হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব-প্রণালী অনুসারে সামরিকগণ (samurai) প্রধানদিগের দাসত্বপাশে বদ্ধ ছিল—কিন্তু প্রধানদিগের স্থানিক প্রভুত্ব বিলুপ্ত হওয়ায়, তাহারাও সে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইল। সুতরাং এক্ষণে সম্পূর্ণ একটি নূতন সৈন্যদল প্রস্তুত করা আবশ্যক লইল। স্বেচ্ছা-নিরপেক্ষ সৈন্যসংগ্রহ বিধি-অনুসারে ১৭ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক অবধি প্রত্যেক পুরুষকে সৈন্যদলভুক্ত করা হইল। তাহারা নিত্যকর্ম্মী সৈন্যদলের সহিত ৩ বৎসর, পৃথক্-রক্ষিত (Reserve)) সৈন্য-দলের প্রথম বিভাগের সহিত ২ বৎসর, ও তাহার দ্বিতীয় বিভাগের সহিত ২ বৎসর, এবং অনিয়মিত সাধারণ (militia) সৈন্য-দলের সহিত অবশিষ্ট সময় কার্য্য করিতে বাধ্য। নিয়মিত সৈন্য-শ্রেণীর মধ্যে পদখালি হইলে, উপরোক্ত বহু-সংখ্যক লোক হইতে অভিনব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেই শূন্য পূরণ করা হইয়া থাকে। * শান্তির সময়, নিয়মিত সৈন্য-সংখ্যা ৩৫, ৫৬০ এবং যুদ্ধের সময় ৫০,২৩০। প্রথমে ফরাসি সৈন্য-নেতাদিগের অধীনে এই জাপানী সৈন্য উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করে। কিন্তু এক্ষণে তাহারা ছাত্র-দশা প্রায় অতিক্রম করিয়াছে। সম্রাটের যে রক্ষিবর্গ অতি উৎকৃষ্ট সৈন্যদল বলিয়া পরিগণিত —যাহারা প্রধানতঃ সামুরাই শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত—তাহারাই সৈন্যের শ্রেষ্ঠাংশ। সৈন্যদিগের য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ। কার্য্যকালে যদিও তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক হইয়াছে, কিন্তু মসম্যান বলেন, পূর্ব্বেকার পরিচ্ছদ উহা অপেক্ষা চিত্রবৎ সুশোভন ছিল। জাপানী সৈনিকগণ প্রায়ই খর্ব্বাকৃতি। সেই জন্য কাওয়াজের সময় আঁট-সাঁট কাপড়ে তাহাদিগকে বালকের মত দেখায়—তাহাদিগের জাতীয় লম্বমান পরিচ্ছদেই তাহা-দিগকে আসলে ভাল দেখিতে হয়। কুচ্ করিবার সময় তাহারা কেমন একটু ঘেঁসৃড়িয়া-ঘেঁসৃড়িয়া চলে—পূর্ব্বকার কুশিক্ষা এখনও সম্পূর্ণরূপে

* কিন্তু সামুয়েল মসম্যান বলেন অনিয়মিত সৈন্যদল ব্যতীত জাপানের নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ১৫০০০৩০।

তাহারা অতিক্রম করিতে পারে নাই। কিন্তু যুদ্ধের সময় ওসব-কিছুই লক্ষ্য হয় না—সে সময় তাহারা যেরূপ উৎসাহভরে সবেগে চলে (elan) সেরূপ ভাবে চলিতে য়ুরোপীয় সৈন্যদিগকেও দেখা যায় না।

প্রথমে তাহাদিগের ফরাসিস শিক্ষক ছিল, কিন্তু জাপানী দূত য়ুরোপে গিয়া দেখিতে পাইল যে, সৈন্য-সংগঠন ও শিক্ষা-বিষয়ে প্রুসীয় প্রণালীই জাপানী-সৈন্যের অধিক উপযোগী। সেই জন্য কোন কোন রেজিমেণ্টের মধ্যে ফরাসি পরিচ্ছদ, কোন কোন রেজিমেণ্টের মধ্যে প্রুসীয় পরিচ্ছদ দৃষ্ট হয়। এইরূপ সঙ্কর-পরিচ্ছদ দেখিয়া য়ুরোপীয়গণ একএক বার হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। এই সকল সৈন্যগণ য়ুরোপের নব-উদ্ভাবিত উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। সম্রাট নিজে জরির-কাজকরা য়ুরোপীয় সেনাপতির পরিচ্ছদ সচরাচর পরিধান করিয়া থাকেন। তাঁহার চুল য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় ছোট করিয়া ছাঁটা—এবং তাঁহার গুম্ফ ও নেপোলীয়ান ফ্যাসিয়ানের দাড়িতে তাঁহার চেহারায় সামরিক ভাব প্রকটিত হয়। সম্রাটের খুল্লতাত রাজকুমার "রিতা শিয়াকোভা" প্রুসীয় "ড্রাগন"-সৈন্যদলের কাপ্‌তেন। তিনি বর্লিন নগরে গিয়া সামরিক কৌশল-সকল শিক্ষা করিয়া আইসেন। সম্রাট ইঁহাকেই জাপানী-সৈন্যের সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করেন। ইনিই প্রুসীয় প্রণালী-অনুসারে সৈন্য-গণকে শিক্ষিত ও সজ্জিত করিয়াছেন।

সৈন্য-নিবাস ব্যতীত সামরিক বিদ্যালয়-সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানে, সৈন্যনেতা-পদের উপযুক্ত করিবার জন্য, পতাকাধারী সৈন্যদিগকে (ensign) যুদ্ধশিক্ষা দেওয়া হয়। ভদ্র যুবকদিগকে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পুত্রদিগকে প্রুসীয় সেনাপতিদিগের অধীনে শিক্ষা দেওয়া হয়। ঠিক প্রুসীয়-প্রণালী-অনুসারেই তাহাদিগের মধ্য হইতে কাপ্তেন, লেফটেনেণ্ট এবং অন্যান্য উপনেতৃবর্গ নির্ব্বাচিত হয়। তাহাদিগের সেনাপতি একজন জাপানী মেজর কিম্বা কর্ণেল, তাহারা জর্ম্মান ভাষা কিছু কিছু বুঝিতে

পারে। যুদ্ধ-সংক্রান্ত আদেশ-সকল জর্ম্মান ভাষাতেই প্রদত্ত হয়। সেই মেজর কিম্বা কর্ণেল সামরিক কৌশল, দুর্গ-নির্ম্মাণ, কামানের ফেরাঘোরা-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন—দুর্গস্থ প্রায় সমস্ত উপনায়কবর্গই সেই বক্তৃতায় উপস্থিত থাকেন। একএক সময় প্রায় ৫০০ শ্রোতা একত্রিত হয়।

জল-যুদ্ধ সম্বন্ধেও জাপানীরা উন্নতি সাধন করিয়াছে। য়ুরোপীয় প্রণালী-অনুসারে লৌহ-আবরণ-বিশিষ্ট ক্রুপ-কামান-সুসজ্জিত সমর-পোতের সংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। টোকিয়ো নগরে একটি নাবিক-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সে খানে ২৩ জন ইংরাজ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। গড়ে ৫০০জন ছাত্র ইংরাজি প্রণালী-অনুসারে নাবিকতা, যন্ত্রবিদ্যা ও তাহার শাখা-বিদ্যা-সকল "হাতে কলমে" শিক্ষা করে। শিক্ষাকালে ইংরাজি নাবিকতার পুস্তক সকল ব্যবহৃত হয়। গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান ক্ষেত্রেই এক্ষণে ইংরাজি ভাষার প্রাদুর্ভাব। ইংলণ্ডের নাবিক-বিদ্যালয়ে যেরূপ পাঠপ্রণালী—যেরূপ অনুশাসনপ্রণালী প্রচলিত তাহাই অবিকল অবলম্বিত হইয়াছে। এমন কি, ইংরাজি নাবিকদিগের পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত অনুকৃত হইয়াছে। জাহাজ-নির্ম্মাণের উপযোগী সামগ্রী প্রস্তুত করিবার কারখানা—জাহাজ-নির্ম্মাণ ও সংস্কারের স্থান-সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানে ছোট-ছোট যুদ্ধ-পোত নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কিন্তু বড় বড় লৌহাবৃত জাহাজ ইংলণ্ড হইতে তৈয়ারী হইয়া আসে। তলোয়ার, সঙ্গিন্ ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনের কামান জাপানেই নির্ম্মিত হয়—কিন্তু ১২ হইতে ৩৬ টনের Armstrong-কামান ইংলণ্ড হইতে এবং গুরুভার ক্রুপ-কামান জার্ম্মানি হইতে প্রস্তুত হইয়া আইসে। এক্ষণে বড় বড় জাপানী যুদ্ধ-জাহাজের সংখ্যা প্রায় ৩০ টা—এতদ্ব্যতী আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা প্রকার জাহাজ আছে। এক্ষণে জাপানের যেরূপ পোত-বল, তাহাতে ভীষণ পোত-বল-সম্পন্ন বড় বড় য়ুরোপীয় জাতির সহিত সংগ্রামে জাপান সাহসপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে পারে।

জাপানী নাবিকগণ অন্যান্য সামুদ্রিক জাতির ন্যায় কার্য্যদক্ষ। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ ভারি-ভারি কামান লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়, তাহাতে তাহাদিগের পক্ষে একটু কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। জাপানী নাবিকদিগের মধ্যে অল্প লোকই দৃষ্ট হয় যাহারা শারীরিক বলে ইংরাজ নাবিকদিগের সমকক্ষ। ইংরাজদিগের তুলনায় তাহাদিগের শরীর ক্ষুদ্র কৃশ এবং তাহারা কামান নাড়াচাড়া করিতে গিয়া শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এই জন্য ইংরাজ নাবিকদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের মধ্যে শীঘ্র শীঘ্র হাত-বদলি করিতে হয়। যাহাই হউক, তাহারা সাহস ও সমর-উৎসাহে য়ুরোপীয়গণের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

রাজবিপ্লবের পর হইতে জাপানী আইনেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সুসংস্কৃত ব্যবস্থা-সংহিতা প্রথম প্রচারিত হয়। তাহার নাম "অভিনব মূল-ব্যবস্থার মুখ্য অংশ" এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আর একটি ব্যবস্থা-সংহিতা প্রচারিত হয়। তাহার নাম "মূল-গত ও শাখা-গত পরিশোধিত ব্যবস্থাবলী।" শোগুনদিগের আমলে, চীন-ব্যবস্থারূপ পত্তন ভূমির উপর, জাপানী আইন স্থাপিত ছিল; এবং ভিন্ন ভিন্ন ডেমিওদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে, দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে, এই সকল আইনের প্রয়োগে কিছু ইতর-বিশেষ হইত। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যে সুসংস্কৃত ব্যবস্থার প্রচার হয়, তাহাও প্রধানতঃ চীন-আইনের উপর স্থাপিত। তবে, তাহার মধ্যে কতকগুলি পরিবর্ত্তন, দেশের পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহার পর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যে ব্যবস্থা-সংহিতা প্রচার হয়, তাহাতে য়ুরোপীয় ব্যবস্থাবলীর আদর্শে আরও অনেকগুলি পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। এই সকল নূতন আইনে, অপরাধীদিগকে উৎকট শারীরিক যন্ত্রণা দিবার প্রথা ও অনেক সামান্য অপরাধে মৃত্যুদণ্ড বিধান-প্রথা রহিত করিয়া দেওয়া হয়। এমন কি শারীরিক আঘাতের শাস্তি জাপানী আইন হইতে এক্ষণে প্রায় একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে।

এক্ষণে তত্রস্থ কারাগারে য়ুরোপীয় নিয়মানুসারে কয়েদিদিগকে নানা প্রকার ব্যবসায় এবং চিত্রকর্ম্ম প্রভৃতি সৌখীন শিল্প-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়।

দেশের মুদ্রা-প্রচলন-প্রণালীতেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যখন য়ুরোপীয় ও আমেরিকান বিদেশীয়েরা প্রথম জাপানে প্রবেশ করে, তখন জাপানীরা স্বর্ণ রৌপ্যের বিশেষ কোন তারতম্য করিত না। এক ভরি রৌপ্যের বিনিময়ে এক ভরি স্বর্ণ তাহারা অনায়াসে বিক্রয় করিত। এইরূপে বিদেশীয়েরা রূপার বদলে জাপানের প্রায় সমস্ত সোনা ফাঁকি দিয়া ক্রয় করে। কিন্তু এক্ষণে তাহারা যে মুদ্রা-প্রচলন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছে তাহাতে স্বর্ণই আর সমস্ত ধাতুর মূল্য-পরিমাপকরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং মুদ্রা-নির্ম্মাণ-কারখানায় এক্ষণে স্বর্ণ-মুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা এবং ব্রন্‌জ-ধাতুর মুদ্রা-সকল মুদ্রিত হইয়া থাকে। শোগুনের আমলে কাগজ-মুদ্রা প্রচলনের প্রথা ছিল। প্রত্যেক ডেমিওর পৃথক্ পৃথক্ কাগজ-মুদ্রা ছিল—প্রত্যেকের অধিকারের মধ্যেই তাহার প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান শাসনাধীনে একটি জাতিসাধারণ কাগজ-মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে। তাহাতে কারবার ও বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে।

জাপানের নূতন গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার ডাক-পত্র বিতরণ-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহা দেখিয়া য়ুরোপীয়েরাও অবাক্। পূর্ব্বে জাতি-সাধারণ পত্র-বিতরণ-প্রণালী জাপানে আদৌ ছিল না। পত্র-বিতরণ করা ব্যক্তি বিশেষের ব্যবসায় ছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণ-মেণ্টীয় ডাক-পত্র-বিতরণ-প্রণালী প্রথম আরম্ভ হয়, এক্ষণে তাহার অসাধারণ উন্নতি ও ব্যাপ্তি হইয়াছে। ৬৯১ ডাকঘর, ১২৪ Receiving agencies, ৮৩৬ Stamp agencies এবং ৭০৩ রাজপথস্থ ডাকচিঠির বাক্স স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৩০ লক্ষ পত্র বিতরিত

হয়। এবং এই পত্র-বিতরণের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। বড় বড় নগরে সামান্ত পত্রের ডাক ষ্ট্যাম্পের মূল্য (½d.) এবং অবশিষ্ট সমস্ত রাজ্যের জন্য (1 d.) মূল্য। এবং পোষ্টকার্ডে ইহার অর্দ্ধেক মূল্য ধৃত হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে Money order প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। এবং ডাক-আফিস-সংক্রান্ত Savings Bank-সকল স্থাপিত হয়। এক্ষণে তাড়িত-বার্ত্তাবহের তার চতুর্দ্দিকে প্রসারিত। এবং বাষ্পীয় শকটের লৌহবর্ত্ম আশানুরূপ না হউক ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতেছে।

নূতন শাসনাধীনে, শিক্ষা-বিভাগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি হইয়াছে। শোগুনদিগের আমলে, অভিজাতবর্গ ও তাহাদিগের অনুচর "সামুরাই" দিগের জন্যই সরকারি পাঠশালা ও বিদ্যালয়-সকল উন্মুক্ত ছিল। সওদাগর, কৃষক, দোকানদার, কারিকর ও মজুরদিগের সন্তানেরা ঐ সকল বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পাইত না।

কিন্তু নূতন শাসনাধীনে, শিক্ষাবিষয়ক রুদ্ধ-দ্বারিতা একেবারে তিরোহিত হইল। বিদ্যাশিক্ষা-রূপ মহারত্ন জাতি-সাধারণের পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইল। সর্ব্বপ্রথমেই শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য একটি শিক্ষাবিষয়ক অধ্যক্ষ-সমিতি স্থাপিত হইল (Education board)। এই অধ্যক্ষ-সমিতি কর্ত্তৃক বৈদেশিক ভাষার শিক্ষালয় ও পূর্ব্বতন কংফুচীয় বিদ্যালয় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। চিকিৎসা-বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়-সকল এই সমিতির অব্যবহিত অধীনে আনীত হইল। বিদেশীয় ভাষা হইতে জাপানীদিগের জন্য পাঠ্যপুস্তক-সকল সংগ্রহ ও অনুবাদ করিবার নিমিত্ত একটি অনুবাদ-সমিতি স্থাপিত হইল। প্রাথমিক পাঠশালা, উচ্চ পাঠশালা এবং বিদ্যালয়-সকলের পত্তন ও বন্দোবস্ত-বিষয়ে অনুকূল আইন জারি হইল। বৈদেশিক ভাষার শিক্ষালয়ে, সরকারি ব্যয়ে শিক্ষা দিবার জন্য, ভাল ভাল ছাত্র নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইবার নিমিত্ত, রাজ্যের উপবিভাগীয় *শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণের* প্রতি

আদেশ প্রচারিত হইল। এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিদ্যা শিখাইবার জন্য ছাত্রাদিগকে বিদেশে পাঠান হইতে লাগিল।

মিকাডো, টোকিয়ো নগরে পাঠশালা ও উচ্চ-বিদ্যালয়-সকল স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়া, পূর্ব্বতন ডেমিওগণকে নিজ দরবার-গৃহে একত্র করিয়া, জাতীয় শিক্ষা-সংক্রান্ত সংস্কারের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া, তাহাদিগের নিকট নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ—

'শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল হস্তগত করিবার নিমিত্ত আর কিছুই করিবার আবশ্যক নাই, কেবল জ্ঞানকে পরিস্ফুট ও সদ্‌গুণ-সকলকে পরিমার্জ্জিত করা আবশ্যক। আর কিছুই করিবার আবশ্যক নাই, কেবল সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে, বাস্তবিক প্রয়োজনীয় বিষয়-সকলের অনুশীলন করিতে হইবে, শিক্ষার উদ্দেশে বিদেশে গমন করিতে হইবে, এবং সমস্তই হাতে-কলমে শিখিতে হইবে। বাড়ীতে শিক্ষা করিবার বয়স যাহার অতীত হইয়াছে তাহা-দিগের পক্ষে বিদেশ-ভ্রমণও যথেষ্ট। দেখিয়া-শুনিয়া তাহাদিগের জ্ঞান-চক্র প্রসারিত হইবে এবং তাহাদিগের বুদ্ধি উন্নত হইবে। আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষার কোন পদ্ধতি নাই। সে কারণেও তাহাদের অনেকের মধ্যে বুদ্ধির অভাব লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত, শিশুদিগের শিক্ষার সহিত তাহাদিগের মাতাদিগের শিক্ষার একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এ বিষয়টি নিতান্ত গুরুতর বিষয়। সেই জন্য যাহারা আপন-আপন স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীগণকে সঙ্গে করিয়া বিদেশে গমন করে, তাঁহাদিগের আচরণে তিলমাত্র আপত্তি হইতে পারে না। বিদেশে স্ত্রী-শিক্ষার উৎকৃষ্ট পত্তন-ভূমি কিরূপ এবং শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার প্রকৃত পদ্ধতি কি—এই সমস্ত তাহারা অবগত হইতে পারে। তোমরা সকলেই যদি এই বিষয়ে মনোযোগী হও, তাহা হইলে সভ্যতা-পথে অগ্রসর হওয়া

আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। আমরা সহজেই অর্থ ও বলের মূল পত্তন করিতে সমর্থ হইব এবং অনায়াসেই পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত সমান-ভাবে টক্কর দিতে পারিব। অতএব তোমরা আমাদের এই সকল বাসনাকে হৃদয়মধ্যে ভাল করিয়া স্থান দাও। যাহাতে আমাদের এই মনস্কামনা পূর্ণ হয়, তদ্বিষয়ে সাহায্য করিতে তোমরা প্রত্যেকে যথাসাধ্য চেষ্টা কর।"

এই অভিপ্রায়-অনুসারে জাপানী শিক্ষা-দান-প্রণালীর প্রসর নির্দ্দেশ করিয়া একটি রাজাদেশ প্রচারিত হইল ;—সমস্ত দেশের শিক্ষা-সংক্রান্ত বন্দোবস্ত-ভার একমাত্র শিক্ষা-বিভাগের হস্তে থাকিবে। এবং সমস্ত জাপানদ্বীপকে সাতটি চক্রে বিভক্ত করা হইবে। সেই প্রত্যেক চক্রে একএকটি উচ্চ পাঠশালা স্থাপিত হইবে। এই সকল বিভাগে পরিদর্শক নিযুক্ত হইবে, প্রত্যেক পরিদর্শকের অধীনে ২০ কিম্বা ৩০টি করিয়া পাঠশালা নির্দ্দিষ্ট হইবে। সমস্ত প্রজা—কি অভিজাতবর্গ, কি সম্ভ্রান্তগণ, কি কৃষক, যাহারা পাঠশালায় পাঠ করিবে, এই বিষয় পরিদর্শককে তাহাদিগের জানাইতে হইবে এবং কোন পরিবারের বালকেরা যদি পাঠশালায় গমন না করে, তাহা হইলে পরিদর্শককে যথারীতি তাহার কারণ জানাইতে হইবে। ছয় মাস কাল, দিনের মধ্যে ৫ ঘণ্টা করিয়া পাঠের সময় নির্দ্দিষ্ট এবং শিক্ষা-অধিষ্ঠানগুলি, উচ্চ, মধ্যম, প্রথম এই তিন প্রকার পাঠশালায় বিভক্ত হইবে। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যোগ্য ব্যক্তিগণ ঐ সকল পাঠশালার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইবে। এই প্রকার স্বদেশে শিক্ষা-লাভের উৎকৃষ্ট বিধান ব্যতীত, কতকগুলি ছাত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য সরকারি ব্যয়ে বিদেশেও পাঠাইতে হইবে। এই শিক্ষা-সংক্রান্ত বিধি এত শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল যে উহা প্রচারিত হইবার ১৮ মাস পরে সাধারণ শিক্ষার প্রতিনিধি মন্ত্রী এইরূপ বিবরণ প্রকাশ করেন যে, ১৭৯৯টি অসরকারি ও ৩৬৩০টি

সরকারি পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল পাঠশালায় ৩৩৮,৪৬৩ পুরুষ ছাত্র, ও ১০৯,৬৩৭ ছাত্রী—এবং উচ্চ পাঠশালায় ৩০,০০০ ছাত্র, সর্ব্বশুদ্ধ ৪৮০,০০০ ছাত্র। অর্থাৎ সমস্ত লোক-সংখ্যা ধরিতে গেলে প্রতি ৬৮ ব্যক্তির মধ্যে একজন করিয়া ছাত্র। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে এই ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। সমস্ত ছাত্রের সংখ্যা এক্ষণে প্রায় ৭০০,০০০। ভাষা-বিদ্যালয়ে ইংরাজি, জর্ম্মাণ, ফরাসিস্, রুশীয় এবং চীন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরাজি ভাষা-শিক্ষার কিছু প্রাধান্য দেখা যায়। ৪০০০ ছাত্র, ফরাসিস্ ও জর্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা করে, ৮০০০ ছাত্র, ইংরাজি শিক্ষা করে। ছাত্রেরা প্রায়ই শিষ্টাচারী, শিক্ষানুরক্ত এবং প্রফুল্ল-স্বভাব। আমাদের কালেজের ছাত্রদিগের ন্যায় তাহারাও অনেকে চক্ষুকে অতিরিক্তরূপে খাটাইয়া চস্‌মা পরিতে বাধ্য হইয়াছে—এবং অনেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উৎসাহ ও উদ্বেগে আপনার স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন করিয়া থাকে—এমন কি, কেহ কেহ উন্মাদগ্রস্তও হয়।

বিদ্যালয়ে কোন বিশেষ ধর্ম্মের শিক্ষা দেওয়া হয় না। ধর্ম্ম-শিক্ষার ভার বুদ্ধ ও সিন্ত-ধর্ম্মের পুরোহিতদিগের প্রতি ন্যস্ত। এক্ষণে সিন্ত-ধর্ম্মই জাপানের রাজপালিত ধর্ম্ম। উহাই জাপানের প্রাচীন ধর্ম্ম। যে সকল দেবতা সিন্ত-ধর্ম্ম-পুরাণের অন্তর্গত, তাহাদের মধ্যে সকলের পূজা হয় না। কেবল তেন-সিয়োদাই-জিন-নামক এক দেবী আছেন—তিনি জাপানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাঁহারই পূজা হয়। কিন্তু তিনি এত উচ্চ ও শক্তিমতী যে অব্যবহিতরূপে তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না। কামী নামক যে সকল উপদেবতা ও মানব-দেবতা আছে তাহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি শেষ মনুষ্য-দেবতা, তিনি একজন মানবীকে বিবাহ করেন। তাঁহারা একটি মনুষ্য-পুত্র রাখিয়া যান, তাঁহার নাম "জিম্মু"—ইঁহা হইতেই জাপানের মিকাডো সম্রাটবংশ প্রসূত হইয়াছে। এই জন্যই সম্রাট সিন্তধর্ম্মাবলম্বী। প্রাচীন

অভিজাতবর্গ ও মন্ত্রিবর্গের অনেকেই সিন্তু-বর্ম্মাবলম্বী—অনেকে আবার অভিনব পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে অন্ধ হইয়া, আমাদের দেশের ন্যায় সন্দেহবাদী হইয়া পড়িয়াছে—তাহারা কোন ধর্ম্মই মানে না।

অন্যান্য উন্নতির সঙ্গে, জাপানী ভাষা ও সাহিত্যেরও উন্নতি হইয়াছে। Mossman বলেন পূর্ব্বাঞ্চলে যত ভাষা আছে তন্মধ্যে জাপানী ভাষায় কথোপকথন শুনিতে সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট লাগে। সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথা কহে তাহাই কেবল মিষ্ট, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যে ভাষায় কথা কহে তাহা অনম্য কঠোর, কদর্য্য ও গম্ভীর ধরণের। ইহাই কেতাবী ভাষা। ইহাতে চীনীয় শব্দের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। অভিজাত-বর্গ ও পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাদের ভাষায় অধিক পরিমাণে চীনীয় শব্দ প্রয়োগ করিতে ভালবাসিতেন। অন্যান্য পরিবর্ত্তনের ন্যায়, এই ভাষা-গত রুদ্ধ-দ্বারিতাও ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছে, সাধারণ লোকের কথিত ভাষা সমাজে ক্রমশঃ পদোন্নতি লাভ করিতেছে। এই চলিত ভাষায় বিদেশীয় ভাষার পুস্তক-সকল যেরূপ অনায়াসে অনুবাদিত হইতে পারিতেছে সেরূপ পূর্ব্বে হইতে পারিত না। চীনের ন্যায় জাপানের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা উপভাষা প্রচলিত নাই। উহাও জাতীয় সাহিত্যের পক্ষে কম সুবিধা নয়। এক্ষণে সচরাচর কথাবার্ত্তায় ও পুস্তকে চীনীয় বাক্য সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে অন্যান্য বিদেশীয় শব্দ ও ধরণ (বিশেষতঃ ইংরাজি) প্রচলিত হইতেছে। ইংরাজিরই অধিক প্রাধান্য, কারণ বিদেশীয় দূতদিগের সহিত রাজ-কার্য্য-সংক্রান্ত যে কথোপকথন হয় তাহা ইংরাজি ভাষাতেই হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, প্রথম পাঠ্যপুস্তক-সকল যাহা দেশীয়দিগের জন্য প্রকাশিত হয় তাহাতে জাপানী ও চীনীয় অক্ষরের পরিবর্ত্তে রোম্যান অক্ষর ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু প্রথাটি কতদূর জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি-পক্ষে সহকারী সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

জাপানে সপ্ত শতাব্দীতে কাগজ উদ্ভাবিত হয়। এই কাগজ উদ্ভাবনের পর হইতেই জাপানের লিখিত ভাষার প্রভূত উন্নতি হয়! য়ুরোপে মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবিত হইবার ২৫০০বৎসর পূর্ব্বে, ১২০৬খৃষ্টাব্দে জাপানে চীন-প্রণালী-অনুসারে মুদ্রাঙ্কন-প্রথা প্রচলিত হয়। জাপানী সাহিত্যে অনেক কবিতা ও দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ আছে। এই সকল উচ্চ শ্রেণীর পুস্তক, উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই পাঠ করে। সাধারণের পড়িবার জন্য অনেক গল্পের বই আছে। কিন্তু তাহার নীতি সেরূপ বিশুদ্ধ নহে। নীতিতত্ত্ব-বিদ্যা, ইতিহাস, এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পুস্তক-সকল কাষ্ঠ-খোদিত রঙ্গিন চিত্রদ্বারা বিচিত্রিত। এবং তাহাদিগের অনেক শিক্ষা-সংক্রান্ত গ্রন্থ আছে। জাপানের ইতিহাসও অনেক। জাপানী সাহিত্যে নাটক অধিক নাই—যাহা আছে তাহা প্রায়ই ঐতিহাসিক। অনেকগুলি নাটক কবিতা-পূর্ণ ভাষায় লিখিত এবং একএক জায়গায় বেশ লগ্ন-সাফিক উত্তর-প্রত্যুত্তর। জাপানী সাহিত্যে নাটক অপেক্ষা কবিতার অধিক প্রাচুর্য্য। বড় বড় কবিতা খুব কম। ছোট ছোট কবিতা ও গীতের ভাগই অধিক। একটি খুব দুঃখের গান নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইতেছে ঃ—

বাতাসে অশথপাতা পড়িছে খসিয়া,
বাতাসেতে দেবদারু উঠিছে শ্বসিয়া!
দিবসের পরে বসি রাত্রি মুদে আঁখি,
নীড়েতে বসিয়া যথা পাহাড়ের পাখী।
শ্রান্ত পদে ভ্রমিতেছি নগরে নগরে,
বিজন অরণ্য দিয়া পর্ব্বত সাগরে।
উড়িয়া গিয়াছে সেই পাখীটি আমার,
খুঁজিয়া বেড়াই তারে সমস্ত সংসার॥
দিন রাত্রি চলিয়াছি—শুধু চলিয়াছি,
ভুলে যেতে আমি যে গো ভুলিয়া গিয়াছি।

আমি যত চলিতেছি রৌদ্র বৃষ্টি বায়ে,
হৃদয় আবার তত যেতেছে পিছায়ে ;
হৃদয় রে, ছাড়াছাড়ি হ'ল তোর সাথে,
এক ভাব রহিল না তোমাতে আমাতে।
নীড় বেঁধেছিনু যেথা, যা রে সেইখানে,
একবার ডাক গিয়ে আকুল পরাণে ;
কে জানে, হ'তেও পারে, সে নীড়ের কাছে
হয়তো পাখীটি মোর লুকাইয়া আছে।
কেঁদে কেঁদে বৃষ্টি-জলে আমি ভ্রমিতেছি,
ভুলে যেতে আমি যে গো ভুলিয়া গিয়াছি।

দেশের সবাই জানে কাহিনী আমার,
বলে তারা—"এত প্রেম আছে বা কাহার ?
পাখী সে পলায়ে গেছে কথাটি না ব'লে,
এমন তো সব পাখী উড়ে যায় চ'লে।
চির দিন তারা কভু থাকে না সমান,
এমন তো শত শত রয়েছে প্রমাণ।
ডাকে আর গায় আর উড়ে যায় পরে,
ইহা ছাড়া বল তারা আর কিবা করে !
পাখী গেল যার, তার এক দুঃখ আছে,
ভুলে যেতে তারে সে যে ভুলিয়া গিয়াছে।"

সারাদিন দেখি আমি, উড়িতেছে কাক,
সারারাত শুনি আমি পেচকের ডাক।
চন্দ্র উঠে অস্ত যায় পশ্চিম সাগরে,
পূরবে তপন উঠে, জলদের স্তরে।

পাতা ঝরে, শুভ্র রেণু উড়ে চারিধার,
বসন্ত মুকুল একি, অথবা তুষার ?
হৃদয়, বিদায় লই এবে তোর কাছে,
বিলম্ব হইয়া গেল, সময় কি আছে ?
শান্ত হরে, একদিন সুখী হ'বি তবু,
মরণ সে ভুলে যেতে ভুলে নাক' কভু।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ জাপানী ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করে। তাহার পর হইতে অনেকগুলি সংবাদ পত্রের বৃদ্ধি হইয়াছে। কোনটা ৩ দিন অন্তর, কোনটা ৫ দিন অন্তর, কোনটা ৭ দিন অন্তর প্রকাশিত হয়। একটির নাম "বান্‌কোকু সাংস্নুমা" অর্থাৎ সকল দেশের সংবাদ। "বান্‌কোকু ওমনা" নামে মহিলাদিগের জন্য একটি বিশেষ সংবাদপত্রও আছে। সংবাদপত্র-সকল সতেজ ভাষায় লিখিত হওয়ায় অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়াছিল—ক্রমে উৎসাহ পাইয়া উহারা রাজ-সরকারের নামে স্পষ্ট নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল। সম্রাট, মুদ্রাযন্ত্র-সংক্রান্ত একটি আইন প্রচারিত করিলেন এবং সেই আইন-অনুসারে কোন কোন সম্পাদকের দণ্ড হইল। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোন ফল হইল না। সম্রাট এক্ষণে আর একটি উপায় অবলম্বন করিলেন—উহার মধ্যে একটি সংবাদপত্রকে নিজ আশ্রয়াধীনে আনিয়া তাহাকেই আপনার মুখপাত্র করিয়া তুলিলেন।

দীপ-মন্দির নির্ম্মাণ, রাজপথ ও সেতুর উন্নতি সাধন, জাপানীদিগের বাণিজ্য-সাহস ও ব্যবসায়-উদ্যম উত্তেজিত করিবার জন্য লৌহকারখানা, রেশম ও কাগজের কারখানা-সকল স্থাপন করিয়া, বর্ত্তমান সম্রাট জাপানের অশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। জাপানে অনেকগুলি খনি আছে —সেই সকল খনির কার্য্য, য়ুরোপীয় তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাহ হয়। তাহাতে, দেশের অনেক মজুর প্রতিপালিত হইয়া থাকে। যে সকল দ্রব্য বিদেশে

চালান হয় তাহার মধ্যে চা ও রেশমই প্রধান। প্রতি বৎসর প্রায় ৭ কোটি টাকার বাণিজ্য হয়। জাপানের ভূমি অত্যন্ত ফলবতী, জলবায়ুও স্বাস্থ্যপ্রদ। তবে, ভূমিকম্প জলপ্লাবন প্রভৃতি কতকগুলি প্রাকৃতিক উপদ্রব আছে। জাপানীদিগের প্রধান খাদ্য ভাত ও তাহারা বাঙ্গালীর ন্যায় মৎস্যপ্রিয়। অতএব দেখা যাইতেছে, খাদ্যের প্রকৃতির উপর জাতীয় মহত্ত্ব ততটা নির্ভর করে না। ইহা হইতে, মৎস্যের কাঙ্গালী ভেতো বাঙ্গালীর কতকটা আশার উদ্রেক হইতে পারে। যাহা হউক, এই সকল উন্নতির পরিচয় পাইয়া, আমাদের বাঙ্গালী কবি কি জাপানকে এখনও "অসভ্য জাপান" বলিতে সাহসী হইবেন ?

কি করিয়া এত শীঘ্র জাপানের উন্নতি হইল তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায়, রাজা হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই হৃদয়ে প্রগাঢ় নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা বিদ্যমান। জাপানী ইতিহাসে অনেক সময়ে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমাদের ন্যায় তাহারা বাক্‌সর্ব্বস্ব দেশানুরাগী নহে। কিসে জাপানের উন্নতি হয়, কিসে সমস্ত সভ্য জাতিদিগের সহিত জাপান একাসনে উপবেশন করিতে পারে—ইহাই জাতিসাধারণের ও সম্রাটের জপমালা। এককালে জাপান সমস্ত এসিয়ার মধ্যে যে প্রবলতম জাতি হইবে তাহার আভাস এখন হইতেই দেখা যাইতেছে। চীন হয়তো সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতম জাতি হইতে পারিত। কারণ জাপান অপেক্ষা চীনের উদ্ভাবনী শক্তি অধিক। কিন্তু তাহার অভ্যুদয়ের পক্ষে অনেকগুলি প্রতিবন্ধক আছে, প্রথমতঃ এখনও চীনে রুদ্ধ-দ্বার নীতির প্রাদুর্ভাব। যতই উন্নতিজনক হউক না, বিদেশীয় বিজাতীয় অনুষ্ঠান চীন কোন ক্রমেই স্বদেশে প্রবর্ত্তিত করিবে না ; যাহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে তাহাই রক্ষা করিবে। দ্বিতীয়তঃ, চীন-দেশ এত বৃহৎ ও তাহার বিভিন্ন প্রদেশে এত বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত যে সম্পূর্ণ একতার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। তৃতীয়তঃ, চীনে যে

অহিফেনের বিষ প্রবেশ করিয়াছে তাহাতেও জাতি-সাধারণের বলবীর্য্য ক্রমশই হ্রাস হইবার কথা। জাপানীরা অহিফেন সেবন করে না, এবং অহিফেন-বাণিজ্য জাপানে রাজবিধি-দ্বারা নিষিদ্ধ। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ন্যায় চীনের যদি একবার নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাহা হইলে এসিয়ার কোন জাতিই তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না—এমন কি য়ুরোপকে পর্য্যন্ত সশঙ্ক হইতে হইবে। কিন্তু সে ঘুম শীঘ্র ভাঙ্গিবার নহে। তাহাতে আবার, অহিফেনরূপ ঘুম-পাড়াইবার ঔষধ তাহারা অপর্য্যাপ্ত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতএব, চারিদিককার যেরূপ ভাবগতিক ও সূচনা দেখা যায়, তাহাতে বলা যাইতে পারে যে এক সময়ে, জাপানীরা ইংলণ্ডের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে অধিষ্ঠিত হইয়া, সমস্ত এসিয়ার অদৃষ্ট নিয়মিত করিবে—কে বলিতে পারে হয় তো আমরাই চিরপরাধীন ভারতবাসী এক দিন আবার জাপানের কর-কবলে পতিত হইব ! *

———o———

* এই প্রবন্ধটি ২৩ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হয়।
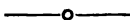
ইংলণ্ডে স্বাধীনতার উন্নতি।

আজকাল আমাদিগের মধ্যে স্বাধীনতার একটা ধূয়া উঠিয়াছে। পুত্র পিতার অবাধ্য হইয়া স্বাধীন হইতে চাহে, শিষ্য গুরুকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন হইতে চাহে, স্ত্রী স্বামীর শাসন কঠোর মনে করিয়া স্বাধীন হইতে চাহে। বাঙ্গালী জাতি "নাকে মুখে গুঁজে দুটো আলু ভাতে ভাত" সভার সমর-অঙ্গনে, কথার তোপে ইংরাজদিগকে উড়াইয়া ভারত-উদ্ধার করেন। তাঁদের যুক্তিপ্রণালী এইরূপ—

ইংরাজ মানুষ

ইংরাজ স্বাধীন

বাঙ্গালী মানুষ

অতএব বাঙ্গালী কেন না স্বাধীন ?—

কিন্তু ইংরাজেরা যে কত যুগযুগান্তর হইতে যুঝাযুঝি করিয়া, কত রক্তপাতের পর অল্পে-অল্পে সোপান-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া তবে স্বাধীনতা-শিখরে আরোহণ করিয়াছেন তাহা আমরা অনুধাবন করিয়া দেখি না—আমরা বালকের ন্যায়, বাতুলের ন্যায় একলম্ফে তদুপরি আরোহণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি, সুতরাং জগতের সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ি। ইংরাজদিগের ন্যায় আমরাও স্বাধীন হইব এই উচ্চ আশা অন্তরে পোষণ করিবার পূর্ব্বে, কি করিয়া তাঁহারা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিলেন তাহা আমাদিগের আলোচনা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

অধুনা ফ্রান্স-দেশের ইতিহাস, ইতর-লোকদিগের অপরিমিত আধিপত্যেরই ইতিহাস ;—উহা স্বাধীনতার ইতিহাস নহে। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডের ইতিহাস প্রকৃতরূপে স্বাধীনতারই ইতিহাস ;—ইতরলোকদিগের যথেচ্ছাচারের ইতিহাস নহে। রাজ্যের প্রাচীনতন্ত্র উচ্ছিন্ন না করিয়া

কিরূপে সাধারণ প্রজাগণ নিজস্ব অধিকার ক্রমশঃ অর্জ্জন, রক্ষণ ও বর্দ্ধন করিয়াছে তাহাই ইংলণ্ডের ইতিহাসে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। ইংলণ্ডের ইতিহাস সংস্কারের ইতিহাস, তাহা বিপ্লবের ইতিহাস নহে। * ইংলণ্ডের ইতিহাস এক-নায়কতন্ত্রের ইতিহাস, কিন্তু এই এক-নায়ক তন্ত্রের অধীনে প্রজাবর্গ সাধারণ-তন্ত্র-সুলভ সমস্ত স্বাধীনতাই অর্জ্জন করিয়াছে। † যে দেশে একরাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও সাধারণ-তন্ত্রের।অপূর্ব্ব সম্মিলন, সেই দেশের ইতিহাসের নামই ইংলণ্ডের ইতিহাস। ‡

স্বয়ং প্রকৃতিই ইংলণ্ডকে বণিক ও নাবিকের আবাসভূমি করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইংলণ্ড-দ্বীপে এই জন্য উহার অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই সমুদ্রের সহিত পরিচিত এবং উহার উপকূলে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপসাগর, খাড়ি ও স্বাভাবিক বন্দর-সকল অবস্থিত, যে উহা নাবিকতার পক্ষে অতীব অনুকূল। ভূগোল-মধ্যে ইংলণ্ডের যেরূপ

* Il en est de meme dans tout le cours de l'histoire d' Angleterre : Jamais aucun element ancient ne fait completement, Jamais ancient element nouveau ne triomphe tout-a-fait, Jamais ancun principe special ne parvient a une domination exclusive. Il y a toujours developpement semultane des defferentes forces, transactions entre leurs pretentions et leurs interets—Guizot, Hist. de la Civ. 335.

† M. Thiers, speaking in the National Assembly, at Merseilles, on June 8 .1871, declared that he found greater liberty existing in London than in Washington.—Times, June 10, 1871. In a recent political satire, the constitutional monarchy has been irreverently described as a democratic republic tempered by snobbism and corruption—Prince Florestan.

‡ M. le Play says, England is patriarchal in the home, demorcratic in the parish, aristocratic in the country, and monarchical in the state—La constitution d' Angleterre. 1876.

স্থান-সন্নিবেশ তাহাতে অনেক জাতির সহিত বিস্তৃত বাণিজ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইবার পক্ষে উহার সুগমতা আছে। ইংলণ্ডের পূর্ব্বদিকে নেদর্‌ল্যাণ্ড ও উত্তরদিকে উত্তর-য়ুরোপ; দক্ষিণদিকে ফ্রান্স ও স্পেন-দেশীয় উপকূল উহার নিকটবর্ত্তী; পশ্চিমদিকে বিশাল আটলাণ্টিক-মহাসাগর। পৃথিবীর বাণিজ্য-পথ ইংলণ্ডের জন্য চারিদিকে উন্মুক্ত।

ইংলণ্ডের বায়ু যদিও ফ্রান্সের ন্যায় তত সুমধুর নয়, কিন্তু উহা নাতি-শীতোষ্ণ, স্বাস্থ্যকর ও বলপ্রদ যদিও ইংলণ্ডের বায়ু পরিবর্ত্তনশীল, আর্দ্র এবং অনেক সময় দারুণ কষ্টপ্রদ, কিন্তু তথাপি অতিরিক্ত শীত, অতিরিক্ত গ্রীষ্ম হইতে একেবারে বিবর্জ্জিত। যে সকল বলবান্ জাতি বিভিন্ন সময়ে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে, তত্তাবতেরই বল শক্তি উদ্যম উহার আবহাওয়া-গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে; এই উত্তরদেশীয় দ্বীপটি আরাম ও বিলাসের আবাস-ভূমিরূপে সঙ্কল্পিত হয় নাই; উহা যুদ্ধ, মৃগয়া, সাহস, কষ্ট, বলবিক্রম, মনুষ্য ও প্রকৃতির সহিত যুঝাযুঝি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অটল বিশ্বাস, ও পুরুষোচিত স্বাধীন ভাবের আবাস-রূপে সৃষ্ট হইয়াছে।

ইংলণ্ডের মৃত্তিকা সাধারণতঃ উর্ব্বরা। ফ্রান্সের ন্যায় ইহার ক্ষেত্র-সকল বিচিত্র প্রাচুর্য্য-সম্পদের আস্পদ না হইলেও, পশুপালনের জন্য—বিশেষতঃ অশ্বকুলের বর্দ্ধন ও উন্নতির জন্য ইহা চির-প্রসিদ্ধ। ইংরাজ-কৃষকের পরিশ্রম ও পটুতায় দিব্য ফসল উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু আমাদের দেশের ন্যায় প্রকৃতির বদান্যতার উপর উহারা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তবে সেখানকার কৃষকেরা কিঞ্চিৎ ফললাভ করিতে পারে। তত্রস্থ পল্লীগ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব বিচিত্র। সুদৃশ্য ক্ষুদ্র পর্ব্বত, উপত্যকা, বনভূমি, ছোট ছোট আঁকা-বাঁকা নদী, বিচিত্র মাঠ-ময়দান, এই সকল সেখানকার বিশেষ লক্ষণ। যে জাতি গ্রাম্য জীবনের আরাম উপভোগে সমর্থ, প্রকৃতিদেবী সেই জাতির উপযুক্ত

আবাসরূপেই যেন ইংলণ্ডকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এক জন ফরাসী, নগরে থাকিয়া যেরূপ সুখী হয়, আর কোথাও থাকিয়া সেরূপ সুখী হইতে পারে না। একজন ইংরাজ রাস্তায় মুমূর্ষু হইয়া পড়ে, কিন্তু পর্ব্বত-পার্শ্বে, নদীতট ও সমুদ্র-উপকূলের মুক্ত বায়ুতে সে যেন নূতন জীবন পায়; এবং ইংরাজদিগের এই স্বাভাবিক চিরন্তন পল্লী-প্রেম, ইংলণ্ডের সমাজ ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

ইংলণ্ডের আর একটি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ তাহার খনিজাত-ঐশ্বর্য্য। মৃদঙ্গার, লৌহ, টিন্, দস্তা, তাঁবা প্রভৃতি ইংলণ্ডে যেরূপ প্রচুর, এরূপ য়ুরোপের আর কোন দেশেই দৃষ্ট হয় না। প্রকৃতিদেবী ইংলণ্ডকে যেমন একদিকে সমুদ্র-বাণিজ্যের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তেমনি আবার তাহাকে সর্ব্বপ্রকার শিল্পের আধার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বিনা পরিশ্রমে, বিনা কষ্টে, নিরাপদে এই খনিজাত-ঐশ্বর্য্য লাভ করিবার উপায় নাই। যেরূপ সমুদ্র-গর্ভে সেইরূপ খনিগর্ভেও নানা প্রকার ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা; কি সমুদ্রে, কি ভূগর্ভে ব্যবসায়ের উদ্দেশে তাহা-দিগকে কতই পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, কতই কষ্ট সহ্য করিতে হয়, এমন কি সময়ে সময়ে স্বাস্থ্য ও প্রাণ পর্য্যন্ত অকাতরে বিসর্জ্জন করিতে হয়। আরও দেখা যায়, স্বাভাবিক শারীরিক বল ও দৃঢ়তা-প্রযুক্তই উহারা য়ুরোপীয় সমস্ত শ্রমজীবীদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই প্রকার শারীরিক ও নৈতিক বল-প্রভাবেই বৃটিস্ জাতি সভ্যতা, সামাজিক উন্নতি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিকে স্থিরভাবে অগ্রসর হইয়াছে।

রোমীয়দিগের রাজত্বকাল হইতে, ইংলণ্ড কি করিয়া ক্রমশঃ স্বাধীনতা-শিখরে আরোহণ করিল তাহা সবিস্তরে বর্ণনা করিতে গেলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়, এই স্বল্পায়তন প্রবন্ধ তাহার উপযোগী নহে। এই ঊনবিংশতি শতাব্দির মধ্যে ইংলণ্ডে কি কি অন্দোলন উপস্থিত

হইয়াছে ও তাহার ফল কি হইয়াছে তাহাই এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। আমাদিগেরও এক্ষণে আন্দোলনের কাল উপস্থিত। নানা বিষয়ের আন্দোলন করিয়া ইংলণ্ডে কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিবার ঠিক এই সময়।

তৃতীয় জর্জের রাজত্বকাল হইতেই ইংলণ্ড দ্রুতগতি উন্নতি-পথে অগ্রসর হইয়াছে। আমেরিকার উপনিবেশ-স্থাপন ও নেদর্ল্যাণ্ডের বাণিজ্য হ্রাস হওয়া-অবধি, নাবিকতা, বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্যে ইংলণ্ড উন্নতি-পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছিল বটে, কিন্তু এই ঊনবিংশতি শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই, এই উন্নতি আরও বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। * (প্রধানতঃ নগর ও উপনগরে); কৃষিবিদ্যা প্রোৎসাহিত হইল এবং কৃষিকার্য্য উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করিল। কিন্তু বাণিজ্য ও শিল্প, কৃষিকার্য্যকেও ছাড়াইয়া উঠিল। † পূর্ব্বে ভূমিই ধনাগমের প্রধান উপায় এবং প্রজা-বর্গের প্রধান উপজীবিকা ছিল, এক্ষণে ভূমির আদর অনেকটা খর্ব্ব হইল। অল্পসময়ের মধ্যেই বিস্তৃত নগর-উপনগর-সকল সমুত্থিত হইতে লাগিল। লণ্ডনের লোকসংখ্যা সমস্ত স্কটল্যণ্ডের সমান হইয়া উঠিল। Liverpool, Manchester, Bermingham, Leeds, Sheffield এবং Glasgow প্রভৃতি নগর, বড় বড় রাজ্যের রাজধানীর ন্যায় প্রাধান্য

* In 1801 the population of Great Britain was 10,942,854, in 1831, it had increased to 16,539,378. Population Return of 18013180I ; Porter, Progress of the nation. Chap I.

† Iu 811,1895, 998 fomilies were employed in agriculture in Great Britain, and 129,049 in trade and manufactures ; in 1831, 967,134 families were employed in the former and 1,434,873 in the latter. In 1841, 1480,785 persons were employed in agriculture and 3,092,787 in trade and manufactures.—Porter, Chap 1.

লাভ করিল। সুতাকাটার কল এবং বাষ্পীয় যন্ত্রের আবির্ভাবে, পশম ও তূলাজাত দ্রব্যের কারখানা-সকল প্রভূত উদ্যম ও উত্তেজনা লাভ করিল এবং সেই সকল দ্রব্য সমস্ত পৃথিবীকে ইংলণ্ড যোগাইতে লাগিল। লৌহ প্রভৃতি ধাতু এবং যন্ত্রের কারখানায় খুব কাজ চলিতে লাগিল। এই সকল প্রসঙ্গ শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খনি-খনন-কার্য্যেরও উন্নতি হইল।

খাল খনন-দ্বারা নাব্য নদীর উন্নতি সাধন ও উৎকৃষ্ট রাজপথ নির্ম্মাণ এবং বাষ্পীয় শকট ও বাষ্পীয় পোতের আবির্ভাবে, আভ্যন্তরিক গতি-বিধি ও বৈদেশিক বাণিজ্যেরও যৎপরোনাস্তি সুবিধা হইল।

Arkwright Watt এবং Stephenson ইংলণ্ড ও পৃথিবীর শিল্পরাজ্যে মহাবিপ্লব আনয়ন করিয়া সমাজকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিলেন। ধনী সদাগর, পোতাধিকারী ও কারখানাওয়ালারা ঐশ্বর্য্যে ও মানমর্য্যাদায় জমিদারদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র ব্যবসাদার, উন্নতিশীল প্রজাগণের বিবিধ অভাব মোচন করিয়া ধনী হইয়া উঠিল এবং কৃষকের সংখ্যা-অপেক্ষা শিল্পীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সামাজিক পরিবর্ত্তনের ইহাই শেষ সীমা নহে। মূলধন ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, একদল স্বাধীন সম্ভ্রান্ত লোক এবং আর একদল নূতন মধ্যম শ্রেণীয় ভদ্রলোকের উৎপত্তি হইল। ইহারা জমিদারও নহে, বণিকও নহে; অথচ রাজনৈতিক ক্ষমতা হইতে ইহাদিগকে বঞ্চিত করাও চলে না। Bath, Cheltenham, Leamington, Brighton, Hastings, এবং লণ্ডনের উপনগর-সকল, ইহাদিগেরই সংখ্যা ও ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দেশের সাধারণ উন্নতিতে জমিদারগণও পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ধনী হইয়া উঠিল এবং তাহাদিগের পদোচিত কর্ত্তব্য সাধন করিয়া স্বকীয় চিরাগত স্থানিক আধিপত্য বজায় রাখিল। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগের আর অবিসম্বাদিত প্রাধান্য

রহিল না। এই সকল সামাজিক পরিবর্ত্তন ৪র্থ জর্জের রাজত্বকালে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়, এবং সেই অবধি এই পরিবর্ত্তনের কার্য্য অবিরাম চলিয়াছে। এই সময়ে, সামাজিক উন্নতি অপেক্ষা রাজনৈতিক উন্নতি আরও সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

যেমন একদিকে বণিকদলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া জমিদারদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইতে লাগিল, তেমনি আবার রাজাশ্রিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আর একাধিপত্য রহিল না। Restoration-এর পর Puritan-সম্প্রদায় একেবারে পদদলিত ও নির্ম্মূলিত হয়, এবং ১৯শ শতাব্দীর প্রাক্‌কালে, Churchmen দিগের ন্যায় Non-conformists রাও নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বকালের ভীষণ ধর্ম্মবিবাদের পর, কিয়ৎকালের জন্য শান্তির আবির্ভাব হয়। পরে আবার Wesley এবং Whitfield একটি নূতন ধর্ম্ম-আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। প্রতিবাদী-সম্প্রদায় (Dissenters) দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। Wales-রাজ্যের রাজাশ্রিত সম্প্রদায় প্রায় একেবারে অধিকার-চ্যুত হইল; কারখানাওয়ালা নগরের অসংখ্য অধিবাসিগণ প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের দলভুক্ত হইতে লাগিল। এইরূপে রাজাশ্রিত-সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-মন্দির-অপেক্ষা প্রতিবাদী-সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-মন্দির সংখ্যায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যদিও রাজাশ্রিত-সম্প্রদায় স্বকীয় চিরাগত বৈধ অধিকার ও নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হয় নাই, তথাপি সাধারণ প্রজাদিগের উপর তাহার আর একাধিপত্য রহিল না। তাহার পর, Presbyterian-সম্প্রদায়-দলভুক্ত Scotland, এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত Ireland-এর যখন সম্মিলন হইল, তখন রাজাশ্রিত-সম্প্রদায়ের পদবী আরও বিচলিত হইয়া উঠিল।

ভূম্যধিকারী ও রাজাশ্রিত ধর্ম্মসম্প্রদায় ইহারা উভয়ই উভয়ের চির-সহায়—এই উভয়েরই আধিপত্যের হ্রাস হইল। বিধর্ম্মীর অধিকারচ্যুতি, সংকীর্ণ নির্ব্বাচন-প্রণালী, ভয়ানক কঠোর ফৌজদারী দণ্ডবিধি, অসমান ও

দুর্ব্বহ করস্থাপন, বাণিজ্য ও সাধারণ প্রজাবর্গের খাদ্যসামগ্রী ও শ্রম-বিষয়ে নানা প্রকার হানিজনক ও বাধাজনক নিয়ম স্থাপন—এই সকল অত্যাচার ও কুনিয়ম, এই উভয় পক্ষেরই পরস্পর-সহায়তায়, বরাবর অবাধে চলিয়া আসিতেছিল। এক্ষণে সমাজের রক্ষণশীল ও পরিবর্ত্তনশীল এই দুই দলের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। পল্লীগ্রাম, নগরের বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিল এবং ক্যাথলিক-সম্প্রদায়ও সর্ব্ব-প্রকার প্রতিবাদী খৃষ্ট-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, রাজাশ্রিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইল। বাহ্য সুখ-সমৃদ্ধি ও সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতিসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষারও উন্নতি হইতে লাগিল। পার্ল্যা-মেণ্ট-সভার বাদানুবাদ, সর্ব্বসাধারণের নিকট মুক্তভাবে প্রকাশ করাই তাহার একটি প্রধান কারণ বলিতে হইবে। জন-সাধারণ, সেই বাদানুবাদের ন্যায়-অন্যায় ধরিয়া বিচার করিবে—এই ভরসায়, যাহারা সংখ্যায় হীন এরূপ সভ্যদলও সাহসপূর্ব্বক মন খুলিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সার্ব্বজনিক মতের একটি স্বতন্ত্র প্রভাব ও আধিপত্য সৃষ্ট হইল। এই সাধারণ-মতের নিকট রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ-দলকেও নতশির হইতে হইল। যদি মুদ্রা-যন্ত্রের দ্বারা সাধারণ-শিক্ষা-সম্বন্ধে আর কোনও উপকার না হইয়া থাকে, অন্ততঃ এই উপকারটি যে হইয়াছে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। প্রজা-সাধারণের ক্ষমতা-বৃদ্ধি-সম্বন্ধে মুদ্রা-যন্ত্রের দ্বারা আরও অনেক উন্নতি সাধিত হই-য়াছে। নানা প্রকার কঠোর নিয়মে মুদ্রাযন্ত্র আবদ্ধ থাকিলেও, উহার প্রভাব ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতে লাগিল। সাধারণ-সমাজ যেমন জ্ঞানানু-শীলনে উন্নত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সাময়িক-সাহিত্যপত্র-ক্ষেত্রেও উচ্চদরের লোক আকৃষ্ট হইতে লাগিল। *

* এই সময় Edinburgh Review, Quaiterly Review এবং Westminster Review প্রকাশিত হয়—ব্রূম, বেন্থাম, মিল প্রভৃতি বড় বড় লোক ইহার লেখক ছিলেন।

চতুর্থ জর্জের রাজত্বকালের আরম্ভ হইতে, মুদ্রাযন্ত্রের উপর সাধারণ লোকের এতদূর বিশ্বাস ও অনুরাগ জন্মিয়াছিল, যে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার প্রতি কঠোর অত্যাচার করিতে আর সাহস পাইলেন না, ক্রমে উহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল। দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৩০।৩১ খৃষ্টাব্দে, কর্ত্তৃপক্ষগণ মুদ্রা-যন্ত্রের লোকদিগের নামে যে সকল অভিযোগ আনয়ন করেন, সেই অভিযোগই শেষ অভিযোগ। তাহার পর হইতেই ইংলণ্ডের রাজসরকার প্রজাদিগকে রাজনৈতিক-বিষয়ে বাদানুবাদ করিবার অসংযত স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্থাপনের পরেই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে, বিজ্ঞাপনের শুল্ক ও সংবাদপত্রের মাশুল, এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, কাগজের শুল্ক রহিত হইল। উপর্য্যুপরি এই কয়েকটি বাধা অপসারিত হওয়ায়, মুদ্রাযন্ত্র আবার স্বীয় স্বাভাবিক উদ্যম লাভ করিল। এইরূপে মতের স্বাধীনতা উন্মুক্ত হওয়ায়, সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই রাজনৈতিক বিষয়-সকল মুক্তভাবে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এই প্রকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং মুদ্রাযন্ত্রের উদ্যম-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সাধারণ শিক্ষারও উন্নতি হইল। কেবল যে রাজনৈতিক বিষয়ের প্রবন্ধ মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশ হইত এরূপ নহে; বিজ্ঞান সাহিত্য ও শিল্পবিদ্যা যাহাতে সধারণ পাঠক-মণ্ডলীর সুপাঠ্য বোধগম্য ও সুলভ হয়, এই প্রকার গ্রন্থ-সকলও প্রচারিত হইতে লাগিল। সাধারণ মানবমণ্ডলী অবাধে বিদ্বান্‌দিগের ঐশ্বর্য্যের অংশভাগী হইল। "প্রয়োজনীয় জ্ঞান-প্রচারিণী" সভার অধ্যক্ষগণ—Lord Brougham Mr. Mathew, Devenport Hill এবং Mr. Charles Knight—এই হিতকর কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর ছিলেন—তাঁহাদিগের পর "খৃষ্টীয় জ্ঞানোন্নতিসাধিনী সভা।" পরে Messrs Chambers এই মহৎ ব্রতে ব্রতী হয়েন। প্রথমে, বিদ্যালয়ের দ্বারাই জ্ঞান ও শিক্ষার পত্তন-ভূমি

স্থাপিত হয় সত্য, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবেই সাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানালোক প্রসার লাভ করে।

মুদ্রাযন্ত্র-ব্যতীত সাধারণ-মত প্রকাশের আর একটি পথ ক্রমশঃ প্রসারিত হইল; রাজনৈতিক সম্মিলনী ও সাধারণ জন-সভার সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তৃতীয় জর্জের রাজত্বের প্রাক্‌কাল হইতেই আন্দোলনের এই সকল ভীষণ যন্ত্র সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সকল সভার আন্দোলন-প্রভাবেই লোকপ্রিয় Wilkesএর পক্ষ সমর্থিত হয়, পার্ল্যামেণ্টের সংস্কার সাধিত হয়, Lord George Gorden এবং তাঁহার সহচরদিগের উন্মত্ত প্রোটেষ্টাণ্ট-ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বালিত হয়, এবং দাস-ব্যবসায় রহিত হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দীর শেষাশেষি যে রাষ্ট্র-বিপ্লবের ঝটিকা উত্থিত হয়, সেই বিপ্লব-ঝটিকাতেই এই সকল সাধারণ লোকের আন্দোলন বন্ধ হইয়া গেল। শান্তির সময় যে সকল সভার অধিবেশনে আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই, তাহা এক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষগণ-কর্ত্তৃক নিরুৎসাহিত ও প্রতিরুদ্ধ হইল। বিপ্লব বিশৃঙ্খলা, রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র নিবারণ করিবার উদ্দেশে কিয়ৎকালের জন্য সাধারণের স্বাধীনতা অপহৃত হইল।

কিন্তু এ অবস্থা চিরস্থায়ী হইবার নহে। সাধারণের মত, আবার শাসন-কর্ত্তৃপক্ষগণের মত অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। মুদ্রাযন্ত্রের শক্তি ও স্বাধীনতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সভার প্রভাবও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সাধারণ-মতের উপর মুদ্রাযন্ত্র যে প্রভাব প্রকটিত করিয়া থাকে, তদপেক্ষা সাধারণ সম্মিলনের প্রভাব অনেকগুণে অধিক সন্দেহ নাই। সভাস্থলে শুদ্ধ মতের বল নয়, শারীরিক শক্তি ও সংখ্যার বলও নেত্র-সমক্ষে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়; শুদ্ধ সংখ্যার বল নহে—অধিক সংখ্যক লোকের সম্মিলিত উৎসাহের বলও প্রকাশ পায়। মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের সংস্পর্শেই উৎসাহ-অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। নিভৃত শান্ত্রা-

লোচনায় নূতন নূতন ভাব ও মতের সৃষ্টি হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণ সম্মিলনের বাদানুবাদ, সংক্রামিত উৎসাহ ও নেতৃগণের জ্বলন্ত বক্তৃতা-ব্যতীত জাতিসাধারণের শিরায় শিরায় ঐ সকল ভাব ও মত প্রবিষ্ট করিয়া দিবার আর অন্য উপায় নাই।

সাধারণ লোকের আন্দোলনের একমাত্র ফল মতপ্রচার নহে। কোন এক বিষয়ের জন্য বহুসংখ্যক লোক একত্র সম্মিলিত হইলে শারীরিক বলের বিরুদ্ধে শারীরিক বল প্রদর্শিত হয়। এইরূপে মারামারি দাঙ্গা উপস্থিত হইবারও আটক নাই। বিশেষতঃ গ্রেট-ব্রিটেনের লোকারণ্য নগরগুলির মধ্যে এই প্রকার বহুসংখ্যক লোকের সম্মিলনে জীবন-সম্পত্তি ও রাজ্য পর্য্যন্ত বিপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে। সাধারণ লোক, যুক্তিবলে সন্তুষ্ট না হইয়া অবশেষে বাহুবলের আশ্রয় লইয়া থাকে। ইতর লোককৃত বিপ্লবের বীজ এই সকল সাধারণ সম্মিলনের মূলে নিহিত, এবং এইরূপেই অন্যান্য দেশে—বিশেষতঃ ফ্রান্সে, এই সকল বীজ হইতেই দারুণ বিপ্লবকাণ্ড উৎপন্ন হয়। প্রজাবর্গের কষ্ট, উগ্রচণ্ড অন্ধ-উৎসাহী নেতৃগণের বক্তৃতা, লোকবিদ্বিষ্ট রাজ-শাসন, এবং কর্ত্তৃপক্ষদিগের দুর্ব্বলতাই যে আকস্মিক রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে রাজ্যে যে পরিমাণে রাজশাসন উৎকৃষ্ট, সেই রাজ্যে সেই পরিমাণে বিপ্লবের আশঙ্কা কম। যে রাজ্যের রাজশাসন ও বিচারকার্য্যে প্রজাবর্গের বিশ্বাস আছে—সেখানে অধিক সংখ্যক লোকে কর্ত্তৃপক্ষদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত; যে রাজ্যের জাতীয় সভায়, বিজ্ঞতা সুবিচার ও মিত-ব্যবহারের আধিপত্য, সে রাজ্যে বিপ্লবের আশঙ্কা সর্ব্বাপেক্ষা কম সন্দেহ নাই। গত পঞ্চাশৎ বৎসরের ইংলণ্ডীয় ইতিহাসে এই সকল সত্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজ-নৈতিক আন্দোলন-দ্বারা কি করিয়া বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, এবং রাজশাসনে বিশ্বাস ও রাজনিয়মে প্রজাদিগের ভক্তি

অবিচল থাকিলে, বৈপ্লবিক শক্তি-সকল কিরূপে দমনে থাকে, তাহা ইংলণ্ডের ইতিহাসে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের কতদূর বল ও তাহাতে কি প্রকার বিপদের সম্ভাবনা তাহা আমরা বলিয়াছি—এক্ষণে তৎসংক্রান্ত ইংলণ্ডের আধুনিক ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিব। যদিও সমস্ত বিজ্ঞ রাজ-নীতিজ্ঞেরাই, ক্যাথলিক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কতকগুলি বিশেষ ফৌজদারি আইন স্থাপন করা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মুখে স্বীকার করিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ অনেকদিন পর্য্যন্ত সেই সকল আইন জারি ছিল। এবং সেই সকল আইন রহিত করিবার জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া পার্ল্যামেণ্টে ও সংবাদপত্রে আন্দোলন চলিতেছিল। কিন্তু পার্ল্যামেণ্টের অধিকাংশ সভ্য চিরাগত সংকীর্ণ নীতির পক্ষাবলম্বী থাকায়, তাহা রহিত হইতে পারে নাই। অবশেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, ক্যাথলিকদিগকে অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য একটি দলবন্ধন হইল—এই দল সমস্ত আয়র্লাণ্ডে ছাইয়া পড়িল।

তাহাদিগের প্ররোচনায়, সমস্ত ক্যাথলিক অধিবাসিগণ সমস্বরে স্বীয় সত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। ডব্লিন নগরে একটি বৃহৎ প্রতিনিধি-সভা স্থাপিত হইল। তাহারা পার্লেমেণ্টের অনুকরণে কার্য্য করিতে লাগিল। পল্লীতে পল্লীতে তাহাদিগের সংকল্প-উদ্দেশে চাঁদা সংগ্রহ হইতে লাগিল, সংবাদপত্র-সকল সাধারণ প্রজাবর্গকে উত্তেজিত করিয়া দিতে লাগিল, ক্যাথলিক ধর্ম্ম-মন্দির-সকল পাদ্রিদিগের জ্বলন্ত বক্তৃতায় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যেমন একদিকে ক্যাথলিকগণ এইরূপে আন্দোলন করিতেছিল, ওদিকে আবার প্রটেষ্টাণ্ট-সম্প্রদায় নানা সভা স্থাপন করিয়া, উৎসাহের সহিত তাহাদিগের প্রতিবন্ধ-কতাচরণে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে একটি ধর্ম্মযুদ্ধ আসন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। পাছে শান্তিভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় পার্ল্যামেণ্ট, কি

প্রটেষ্টাণ্ট কি ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়েরই সভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু এই উপায়ে বিপদ নিবারণ হইল না। আইনকে বঞ্চনা করিয়া, ছলে কৌশলে সভার অধিবেশন হইতে লাগিল এবং তিন বৎসরের মধ্যে ঐ আইন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। এক্ষণে বিপদের চূড়ান্ত সময় উপস্থিত। উত্তেজিত প্রজাবর্গের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সভা-সমিতি আরও উগ্রচণ্ড হইয়া উঠিল—এবং বহুসংখ্যক ক্যাথলিক্‌দিগের একত্র সম্মিলন হইতে লাগিল; তাহাদিগের মধ্যে যুদ্ধ-শাস্ত্রানুযায়ী দলবন্ধন ও ইঙ্গিত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মত প্রকাশ অপেক্ষা বাহুবল প্রদর্শনই এই সকল সভার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। যদি এই উত্তেজিত প্রজাবর্গের পথে কোন প্রতিবন্ধক না দেওয়া হয় তাহা হইলে সাধারণ শান্তির ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা এবং গবর্ণমেণ্ট ও ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়কে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থকিতে হয়; আর যদি তাহাদিগকে সৈন্য-বল দ্বারা দমন করিতে হয়, তাহা হইলেও সৈনিকদিগের সহিত সাধারণ প্রজামণ্ডলীর যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। উভয় দিকেই সঙ্কট। যাহাই হউক, অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষগণ, পাছে শান্তি-ভক্ত প্রজাবর্গের মধ্যে ত্রাস উপস্থিত হয়, এইজন্য ক্যাথলিক্‌দিগের ঐ সভা বন্ধ করিয়া দিলেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত বল-পরীক্ষা করিতে অনিচ্ছু হইয়া এবং অধিকাংশ লোকের মত গবর্ণমেণ্টের অনুকূল বুঝিতে পারিয়া, ঐ ক্যাথলিক সভা শাসন-কর্ত্তৃপক্ষগণের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন।

এইরূপে, কর্ত্তৃপক্ষ-দলের দৃঢ়তা ও ক্যাথলিক্ নেতাদিগের বিজ্ঞতা-নিবন্ধন, রক্তপাত পূর্ব্ব হইতেই নিবারিত হইল। কিন্তু ক্যাথলিক্‌দিগকে অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য, অধিকতর উদ্যম-সহকারে আন্দোলন চলিতে লাগিল।

পার্লেমেণ্টের অধিকাংশ সভ্য ও মন্ত্রিদল প্রটেষ্টাণ্ট-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-ভুক্ত হওয়ায়, ক্যাথলিকদিগের প্রার্থনা-বিরুদ্ধে দৃঢ়রূপে প্রতিবাদ করিতে

তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সাধারণের মধ্যে এরূপ ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল যে তাহার প্রতিরোধ করিতে আর তাঁহারা সাহস পাইলেন না। সাধারণ প্রজাবর্গ রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের উপর জয় লাভ করিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ক্যাথলিকগণ রাজনৈতিক অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ করিল। ন্যায়ের পক্ষ, ধর্ম্মের পক্ষই জয় লাভ করিল। সংকীর্ণ রাজনীতি এবং ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কুসংস্কার অনেক দিন পর্য্যন্ত উহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু পার্লেমেণ্ট ও দেশের প্রাজ্ঞ ও উদার ব্যক্তিগণ ঐ পক্ষের সহায় ছিলেন। এই সকল ঘটনার মধ্যে এইটি দেখা যায় যে, কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সাধারণ-মতের উপর নির্ভর করিয়াই বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিলেন এবং বিনা রক্তপাতে কেবল সাধারণের আন্দোলন দ্বারাই ন্যায়ের পক্ষ জয়লাভ করিল।

ইহার পর, পার্লেমেণ্টের সংস্কার লইয়া আর একটি ঘোরতর জাতীয় আন্দোলন উপস্থিত হয়। ফ্রান্সের অভিনব বিপ্লবকাণ্ডে ইতর সাধারণ প্রজাবর্গের অত্যন্ত উৎসাহ হইয়াছিল, এবং তৎকালীন ইংলণ্ডের অবস্থাও সেই উৎসাহানল প্রজ্বলিত করিবার পক্ষে অনুকূল ছিল। সাধারণ প্রজাবর্গকে রাজনৈতিক অনধিকার হইতে মুক্তি দিবার জন্য তৎকালীন লোক-প্রিয় মন্ত্রিদল একটি আইন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু যে পুরাতন দল, প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের সংকীর্ণ প্রণালী-অনুসারে মুখাপেক্ষী পার্লেমেণ্টের দ্বারাই এতদিন ইংলণ্ডকে শাসন করিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। এই প্রস্তাবিত আইনের সম্বন্ধে একদল লোক এতদূর প্রতিকূলতাচরণ করিতে লাগিলেন যে ঐ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। কিন্তু সাধারণ প্রজাবর্গ অতিমাত্র আগ্রহ ও উৎসাহ-সহকারে তৎসমর্থনার্থ অগ্রসর হইল; সংবাদপত্র-সকল উগ্রভাব ধারণ করিল, রাজনৈতিক সম্মিলনী সংগঠনের উদ্যোগ হইতে লাগিল—

অশ্রুতপূর্ব্ব বিরাট জন-সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল! রাষ্ট্র-বিপ্লব আসন্ন। এই সময়ে হাউস-অব্-লর্ড্সের টোরি দল, দুর্দ্দমনীয় সাধারণ মতের নিকট অবশেষে মস্তক অবনত করিলেন। এইরূপে বিপ্লব নিবারিত হইল। সম্ভ্রান্তদল পরাভূত ও নতশির হইলেন, সাধারণের আন্দোলন আবার প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু এই পরাজয়, প্রকৃতরূপে কর্ত্তৃপক্ষদলের পরাজয় নহে। কেননা রাজ্যের মন্ত্রিদল, হৌস-অফ্-কমন্সের অধিকাংশ সভ্য এবং পার্লেমেণ্টের অভিজাত-বিভাগেরও কিয়দংশ সভ্য, প্রস্তাবিত সংস্কার-আইনের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। এই ব্যবস্থার কল্পনা, বিপ্লব-প্রিয় ইতর লোকদিগের উষ্ণ মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হয় নাই;—দায়িত্ববোধবিশিষ্ট প্রাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞেরা, যাঁহাদিগের উপর সাধারণ প্রজাবর্গের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁহারাই উহার প্রবর্ত্তক। অভিজাতবর্গ ও ভদ্রলোকেরাই এই আন্দোলনের নেতা; এবং মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী লোকেরাও এই আন্দোলনের সহযোগী ছিল। ইহার দ্বারা কোন বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গ প্রতিনিধিত্বের অধিকারী, এই মতটি এতদিন মুখে-মুখেই চলিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে উহা কার্য্যে পরিণত হইল। যদি অভিজাতবর্গ অনেক দিন ধরিয়া অধ্যবসায়-সহকারে উহার প্রতিরোধী না হইতেন, তাহা হইলে সাধারণের মধ্যে এরূপ ঘোরতর আন্দোলন উত্তেজিত হইত না—পার্লেমেণ্টের মধ্যেই তর্কবিতর্ক হইয়া যাহয়-একটা নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। অতএব এবারও দেখা যাইতেছে যে, বৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াই ন্যায়ের পক্ষ জয়লাভ করিল।

যৎকালে ইংলণ্ডে এই সংকটাবহ আন্দোলন চলিতেছিল, সেই একই সময়ে ইংলণ্ড ও আয়র্লাণ্ডের ব্যবস্থা-সম্বন্ধীয় সম্মিলনী (Legislative union) রহিত করিবার জন্য আর একটি ঘোরতর আন্দোলন আয়র্লণ্ডে প্রবর্ত্তিত হয়! ক্যাথলিক্ পক্ষের সহায় ও নেতা Mr. O'Connel

অনতিপূর্ব্বে ক্যাথলিক্‌দিগের অধিকার সমর্থনপূর্ব্বক জয়লাভ করিয়া, এক্ষণে আবার এই সম্মিলনের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু এবার তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিলেন তাহা পূর্ব্বাবলম্বিত পক্ষ হইতে অনেক ভিন্ন। এ পক্ষের কোন প্রাজ্ঞ নেতা ছিল না, কেবল কতকগুলি নির্ব্বোধ ইতর দলপতি মাত্র ছিল—সকল দলের রাজনীতিজ্ঞেরাই এই জন্য প্রস্তাবটিকে অগ্রাহ্য করিলেন এবং সমস্ত রাজ্যের লোক এই প্রস্তাবের দোষ দেখাইতে লাগিল। রহিতকারী দল নানা প্রকার বাহ্য কোলাহল আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পার্লেমেণ্ট ও সমস্ত দেশের সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ অনায়াসে তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন।

কয়েক বৎসর পরে আবার এই বিষয় লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইল। এবার আরও বিস্তৃত ভাবে দল প্রস্তুত হইল, এরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিরাট-সভার অধিবেশন হইতে লাগিল যে সাধারণের শান্তিভঙ্গ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। কিন্তু শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণ পুনর্ব্বার এই আন্দোলনকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন। ন্যায়সঙ্গত নহে বলিয়া উহা সর্ব্বসাধারণের রুচিজনক হয় নাই;—সুতরাং সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইল।

এইরূপে Orang Lodges দিগেরও দলকে অনায়াসেই দমন করা হইল। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিদ্বেষ ও দলাদলীর উগ্রভাব এই দলের পত্তন-ভূমি হওয়ায়, শীঘ্রই সাধারণের শান্তিভঙ্গ ও রাজকার্য্যের ব্যাঘাত হইবার উপক্রম হইল; সাধারণের মতও ঐ দলের পোষক ছিল না—সুতরাং উহাও অচিরাৎ ধরাশায়ী হইল।

যেমন একদিকে কতকগুলি অযোগ্য বিষয়ের আন্দোলন নিষ্ফল হইল—তেমনি আর এক দিকে "দাসত্ব-বিরোধী-সভা" শান্ত-ভাবে স্বদেশীয় লোকদিগের উচ্চভাব জাগরূক করিয়া, কেমন আস্তে আস্তে

স্বীয় সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ করিলেন—সমস্ত ব্রিটিস রাজ্যের দাসদিগকে মুক্তি-দান করিলেন।

যৎকালে আয়র্লণ্ডের সম্মিলন রহিত করিবার আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময়ে ইংলণ্ডে Chartistsদিগের দল ক্রমশঃ জাঁকিয়া উঠিতেছিল। সমস্ত শ্রমজীবীরাই প্রায় এই দলভুক্ত। তাহারা আন্দোলনের পাঁচটি বিষয় মনোনীত করিয়াছিল;—প্রতিনিধিত্বের সার্ব্বজনিক অধিকার (Universal suffrage)—Ballot দ্বারা সম্মতিদান (vote) পার্লেমেণ্টের বাৎসরিক অধিবেশন—সভাদিগের বেতন-নির্দ্দেশ এবং সম্পত্তি-অনুসারে প্রতিনিধির অধিকার-নিরূপণ রহিত করা। সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাঁহারা প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের হাল-বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট ছিলেন, বিশেষতঃ যাঁহারা শ্রমজীবীদিগের নিয়োগকর্ত্তা, তাঁহাদিগের নিকট এই প্রস্তাবটি আদৌ আদরণীয় হইল না। কিন্তু অসন্তুষ্ট শ্রমজীবি-গণ আইনের দ্বারা স্বীয় হীন অবস্থার উন্নতি করিতে উৎসুক হইয়া, এবং অন্যান্য আন্দোলনের সফলতায় উৎসাহিত হইয়া, বড় বড় সভা করা—বড়বড় দরখাস্ত দাখিল করা প্রভৃতি চিরপরিচিত উপায় সকল অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনেক সময় তাহাদিগের উদ্যম উৎসাহ দাঙ্গায় পরিণত হইত, এবং তজ্জন্য তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক শাসিত হইত। তাহাদিগের সংখ্যা কম ছিল না—কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহাদিগের দল অটুটভাবে রক্ষিত হইয়া-ছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে যখন ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লব বাধিয়া উঠে, সেই সময় এই "চার্টিষ্ট" দল তাহাদিগের "চার্টারের" অর্থাৎ স্বরচিত অধিকার-পত্রের অনুকূলে বৈপ্লবিক আন্দোলন পুনরায় উপস্থিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইল। তাহাদিগের আবেদন-সকল অনাদৃত হওয়ায়, তাহারা আর এক দরখাস্ত পাঁচ লক্ষ লোক দ্বারা স্বাক্ষর করাইয়া, দলবল-সমভিব্যাহারে হাউস্-অফ্-কমন্‌সে যাত্রা করিবার জন্য স্থির করিল। এই উদ্দেশে

Kensington Common-এ ১০ই আপ্রিলে একটি বৃহৎ সভা আহূত হইল। সেই স্থান হইতে সকলের একত্র যাত্রা করিবার কথা ছিল।

প্যারিস নগরে এ প্রকার বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইলে, রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হয়। কিন্তু লণ্ডনে, সাধারণ-মত-বিরোধী বৈপ্লবিক আন্দোলন-সকল কি প্রকারে সমাজ ও কর্ত্তৃপক্ষগণের বলবৎ শাসনে নিবারিত হইয়া থাকে তাহার জাজল্যমান প্রমাণ সেই দিনকার ব্যাপারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ আহূত সভা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা-পত্র দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। শান্তিরক্ষার জন্য এই উপলক্ষে নূতন ১৭০,০০০ চৌকিদার নিযুক্ত হইল। Westminister Bridge এবং পার্লেমেণ্ট-বাটীর সন্নিকটবর্ত্তী স্থান-সকলের চতুর্দ্দিকে, কামান ও পদাতিক সৈন্য প্রচ্ছন্নভাবে স্থাপিত হইল এবং এই উপায়ে সভার কার্য্য ব্যর্থ করা হইল;—Westminister Bridge-দিয়া যাত্রা নিষিদ্ধ হইল; সমাগত লোকেরা কোন প্রকার উৎপাত না করিয়া, হতাশ হইয়া আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল।

এই চার্টিষ্ট দলের কার্য্য-প্রণালী অপরিপক্ক ছিল। তাহাদিগের নেতৃগণের তেমন আন্তরিক উৎসাহ ছিল না এবং তাহারা অক্ষম ও ভীরু ছিল। উৎকৃষ্ট নেতা থাকিলেও তাহাদিগের সঙ্কল্প নিষ্ফল হইবার কথা। তাহাদিগের সহিত অন্য শ্রেণীর সহৃদয়তা ছিল না, পার্লেমেণ্টের কোন সভ্যদলই তাহাদিগের সহায় ছিল না; তাহারা সংখ্যায় প্রবল হইলেও সমাজ ও রাজ্যের সমবেত বল তাহাদিগের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল; তাহারা ইচ্ছা করিলে কিয়ৎকালের জন্য শান্তিভঙ্গ করিতে পারিত এই মাত্র, কিন্তু কখনই স্বীয় সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে পারিত না। ইতিমধ্যে আর একটি আন্দোলন উপস্থিত হইয়া পরিণামে জয় লাভ করিল। উহা শস্য-আইন-বিরোধী সম্মিলনের (Anticorn Law League) আন্দোলন। যে প্রস্তাব সমর্থনার্থ এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা স্থায়-

সঙ্গত ও জাতিসাধারণের-মতানুযায়ী—সুতরাং উহাও সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইল। এই বিষয়ে শ্রম নিয়োগী ও শ্রমজীবী উভয় দলেরই সমান স্বার্থ হওয়ায়, উহারা একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল। এই আন্দোলনের নেতা Mr. Cobden ও Mr. Bright উভয়েই সুযোগ্য লোকপ্রিয় বক্তা—ইঁহারা বার্ত্তা-শাস্ত্রের সত্য-সকল পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যা করিতে যেরূপ সক্ষম, লোকদিগের মনকে উত্তেজিত করিতেও তেমনি সমর্থ। এবং অনেক দিন হইতে, দেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ এবং পার্লেমেণ্টের একদল সভা তাঁহাদিগের মত পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে Mr Charles Villiersই প্রধান। কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধ মতের লোকও অসংখ্য ছিল। বিদেশীয় বাণিজ্যে শুল্কস্থাপন করিয়া দেশীয় বাণিজ্য সংরক্ষণ (Protection) অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয় বাণিজ্য-নীতির একটি স্থির মত ছিল। জমিদার ও ধনী কৃষকগণ (Farmers) মনে করিত, বিদেশ হইতে ইংলণ্ডে শস্য আমদানি হইবার পথে প্রতিবন্ধক প্রয়োগ করাই ব্রিটিশ কৃষিকার্য্যের উন্নতিপক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। স্বাধীন বাণিজ্য কত দূর সুফলপ্রদ, তাহা কারখানার অধ্যক্ষেরা প্রথমে তেমন বুঝিতে পারেন নাই। পার্লেমেণ্টের বহুসংখ্যক সভা উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাবের অনুকূলে প্রভূত উদ্যম ও অধ্যবসায়-সহকারে আন্দোলন চলিতে লাগিল। তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাও এই আন্দোলনের অনুকূল ছিল—বিশেষতঃ আয়র্লণ্ডের দুর্ভিক্ষের আলোচনায়, স্বাধীন বাণিজ্যের উপকারিতা লোকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ৮ বৎসরের মধ্যে সাধারণের মত ফিরিয়া গেল। পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিজ্ঞেরা, এমন কি পার্লেমেণ্ট পর্য্যন্ত অবশেষে স্বাধীন বাণিজ্যের মতে দীক্ষিত হইলেন।

এই আন্দোলনে, সাধারণ লোকের বল যেরূপ প্রকাশ পায়, স্বাধীন রাজ্যে বুদ্ধিজ্ঞানের কতদূর প্রভাব তাহাও বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। দেশের

সমস্ত প্রজাবর্গ ও কর্তৃপক্ষগণ বিচার করিয়া যে সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন সেই সত্যটি এস্থলে বাহুবলে নহে, জ্ঞানবলেই জয়লাভ করিল।

ইহার পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রজাসাধারণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। অবশেষে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে, আইন-সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টের সংস্কারের প্রস্তাব পুনরুদ্দীপিত হওয়ায়, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একটা ঘোঁট পড়িয়া গেল। "সংস্কার-সম্মিলন-সভা" (Reform League) ঘোষণা করিয়া দিলেন, ২৩এ জুলাই মাসে Hyde Park নামক স্থানে তাঁহা-দিগের একটি অধিবেশন হইবে। কর্তৃপক্ষগণ তাহা নিষেধ করিয়া দিলেন। কিন্তু নিষেধ-আজ্ঞা বলবৎ রাখিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত ছিল, তাহার প্রতি মনোযোগী না হওয়ায় Hyde Parkএর রেলিং ভগ্ন করিয়া ইতর লোকেরা কিরূপে ঐ প্রখ্যাত উদ্যান অধিকার করিয়াছিল তাহা সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তাহার পর বৎসরে, সভার আর একটি অধিবেশন নিষিদ্ধ হয়, কিন্তু কর্তৃপক্ষগণের নিষেধসত্ত্বেও ঐ সভা বসিয়াছিল। এই দুই বারেই সাধারণ প্রজাবর্গ কর্তৃপক্ষগণের উপর জয়লাভ করে। রাজ-শাসনকে সাধারণ প্রজাবর্গ যে এইরূপে অবজ্ঞা করিতে সমর্থ হইল, তাহার প্রকৃত কারণ কর্তৃপক্ষগণের দুর্ব্বলতা ও দৃঢ়সঙ্কল্পহীনতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই অবধি হাইড্-পার্কে সভার উদ্দেশে লোকসমাগম একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই বটে—কিন্তু তৎসম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম স্থাপিত হইয়াছে.

কিয়ৎ বৎসর পরে, আর একটি ছোট খাটো আন্দোলন উপস্থিত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে, Chancellor of the Exchequer উপস্থিত বৎসরের আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবে, দেশলাইয়ের উপর কর স্থাপন করিবার প্রস্তাব করায়, দেশলাইয়ের প্রধান কারখানাওয়ালারা হঠাৎ তাহাদিগের লোকদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন; এই শ্রমজীবিগণ একত্র সমবেত হইয়া এই ট্যাক্সের প্রতিবাদ করিবার জন্য West Minister

পর্য্যন্ত যাত্রা করিল। এই সামান্য কর, একটি বিশেষ শিল্পের উপর স্থাপিত হওয়ায়, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ও হাউস-অফ্-কমন্সে এই করের প্রস্তাব, আদরের সহিত গৃহীত হইল না—গরিব দেশলাইওয়ালাদিগের প্রতি সাধারণ লোকের মমতা উপস্থিত হইল। এবং এই প্রস্তাব অচিরাৎ পরিত্যক্ত হইল।

ইংলণ্ডের আইন ও ব্যবস্থার উপর সাধারণ লোকের কতদূর প্রভাব তাহা এই সকল আন্দোলন হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ইতর লোক-সমাগমে অনেক সময় শান্তিভঙ্গ হইবার উপক্রম হয়। লোকাকীর্ণ নগরে বহুসংখ্যক ইতর লোকের একত্র সমাগম যে সঙ্কটাবহ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায়, যে সকল বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তাবের আন্দোলন ন্যায়ের উপর স্থাপিত, পার্লেমেণ্টের কোন দল বিশেষ যাহার সহায়, অনেকটা সাধারণ মত যাহার পরিপোষক—এবম্বিধ প্রস্তাব-সকলই পরিণামে জয়যুক্ত হইয়াছে। এইরূপে, সাধারণ লোকের ইচ্ছাক্রমে অনেক সময়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ, হিতকর প্রস্তাব-সকল গ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং যে সকল প্রস্তাব অন্যায়মূলক, তাহার জন্য লোকে যতই চীৎকার করুক—গবর্ণমেণ্ট ও পার্লেমেণ্ট তাহা দৃঢ়তা-সহকারে অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছেন।

জাতি ও বংশের উৎকর্ষ-সাধন।

জীব-জগৎ ও উদ্ভিজ্জ-জগতের পরিবর্ত্তন ও উন্নতি যে অনেক পরিমাণে সভ্যতার উপর নির্ভর করে তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। যে জীবের অভাব যে পরিমাণে পূর্ণ হয়, তাহার স্বাভাবিক শক্তি-সকল যে পরিমাণে যথোচিতরূপে পরিচালিত হয়, এবং তাহার স্বাভাবিক হীনতা ও অপকারী গুণ-সকল যে পরিমাণে অপসারিত হয়, সেই পরিমাণে যে সেই জীব তাহার জাতিগত পূর্ণতা ও উৎকর্ষ লাভ করে তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। উদ্ভিজ্জ-জগতে চাষের দ্বারা যে অনেক উন্নতি হইয়াছে তাহা কে না জানে। কার্পেণ্টর বলেন চাষের দ্বারা অনেক সময়ে কোন ফুলের কেশরগুলিকে পাপড়িতে পরিণত করিয়া, কিম্বা যে পাপড়িগুলি ভাল করিয়া বিকাশ পায় না তাহাদিগকে পরিপুষ্ট করিয়া, সেই পুষ্পটিকে দ্বিগুণাত্মক পুষ্পে পরিণত করা যায়। চাষের দ্বারা অনেক গাছের কাঁটাও অপসারিত করা যায়; এই প্রক্রিয়াকে Linneus "বুনো ফুলকে পোষ মানান" বলেন। "ডালিয়া" ফুলের ন্যায় আপেল ও কপি, চাষের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের বীজ যদি আবার অনুর্ব্বরা মৃত্তিকায় নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ জাতীয় উদ্ভিজ্জ-সকল আবার স্ব স্ব জাতিগত আদিম আদর্শের কাছাকাছি হইয়া আইসে।

কি শেট্‌ল্যাণ্ড টাট্টু, কি আরব ঘোড়া, সকল অশ্বেরই আদি একই; কি নিউফৌণ্ডল্যাণ্ড কুকুর, কি ইটালীয় গ্রেহাউণ্ড, সকল কুকুরই একই জাতি হইতে প্রসূত এবং তাহাদের মধ্যে যে সকল বিশেষত্ব আছে তাহা কেবল বিভিন্ন বাহ্য অবস্থা হইতে উৎপন্ন। কারণ, দেখা গিয়াছে, তাহারা যদি আবার বন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সেই বিশেষত্ব-

গুলিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহার দৃষ্টান্ত, যে সকল কুকুর স্পেনীয়েরা কুবাতে আনিয়াছিল এবং যে সকল বুনো ঘোড়া ও গোমেষাদি এক্ষণে দক্ষিণ-আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের জাতিগত বিশেষত্বগুলি এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়া সমস্ত একাকারে পরিণত হইয়াছে।

অসভ্য জাতি যাহারা শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর অত্যাচারে প্রপীড়িত, যাহাদিগের খাদ্যসামগ্রী দুর্লভ ও অস্বাস্থ্যজনক, তাহারা সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ এবং তাহাদিগের গঠনে অনেকটা পশুর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়; পক্ষান্তরে, যাহারা যে পরিমাণে সভ্যতার প্রসাদ উপভোগ করে, অর্থাৎ যাহারা ভাল খায়, ভাল পরে—যাহারা বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করিয়া মানসিক সুখ সম্ভোগ করে, তাহারা সেই পরিমাণে ককেসীয় জাতির লক্ষণ-সকল প্রাপ্ত হয়। ডাক্তার স্মিথ বলেন, "সভ্যতার তারতম্যে কিরূপ কৌলিক উন্নতির তারতম্য হয় তাহা সেই সকল দেশেই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যেখানে ব্যবস্থার দ্বারা সামাজিক পদমর্য্যাদার চিরস্থায়ী বিভাগ পূর্ণরূপে সাধিত হইয়াছে। স্কটল্যাণ্ডের প্রধানদিগের সহিত স্কটল্যাণ্ডের সাধারণ লোকের কত প্রভেদ! যদি কোন পর্য্যটক তাহা-দিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে পৃথক্‌রূপে দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন সন্দেহ নাই। ফ্রান্স স্পেন জর্ম্মাণি প্রভৃতি দেশের কৃষক ও সম্ভ্রান্ত কুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ প্রভেদ লক্ষিত হয়।"

আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে পূর্ব্বে কত প্রভেদ ছিল, এখনও যে সে প্রভেদ সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না, তবে চাষ করিলে কি না হয়; এখন যেরূপ নির্ব্বিশেষরূপে সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের চাষ চলিতেছে, তাহাতে কালে সে প্রভেদ যে অনেকাংশে বিলুপ্ত হইবে তাহার চিহ্ন এখন হইতেই দেখা যাইতেছে। Buffon

বলেন—"ফ্রান্সে মুখের চেহারা দেখিবামাত্র সুধু যে চাষা ও সম্ভ্রান্ত লোককে চেনা যায় তাহা নহে, উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্তদিগকেও নিম্নশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত হইতে নির্ব্বাচিত করা যায়; উহাদিগের সহিত নাগরিকদিগের প্রভেদ, আবার নাগরিকদিগের সহিত চাষাদিগেরও প্রভেদ বুঝা যায়।" ডাক্তার স্মীথ বলেন—

"আমেরিকার কৃষক-দাসেরা ভাল খাইতে পায় না, ভাল পরিতে পায় না, ভাল বাসায় থাকিতে পায় না, তাহারা ক্ষেত্রমধ্যে ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করে—তাহাদিগের প্রভুর দৃষ্টান্ত ও সংসর্গ হইতে তাহারা বহুদূরে অবস্থিতি করে। স্বতন্ত্র থাকে বলিয়াই তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের অনেকগুলি আচার-ব্যবহার এখনও পর্য্যন্ত বজায় রাখিয়াছে। পক্ষান্তরে, যে সকল দাস তাহাদিগের প্রভুর বাটীতে থাকিয়া কাজ করে এবং তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাহাদিগের প্রতি প্রভুরা অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন। তাহাদিগের কার্য্যভারও লঘু, তাহাদিগের খাওয়া-পরা তাহাদিগের প্রভুদিগেরই ন্যায়, তাহারা প্রভুর আচার ব্যবহার সর্ব্বদা দেখিতে পায়, তাহাদিগেরই অভ্যাস-সকল অবলম্বন করে এবং প্রভুর সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্যজ্ঞান তাহারা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করে। ক্ষেত্র-দাসদিগের উন্নতি তত শীঘ্র হওয়া সম্ভব নহে। গার্হস্থ্য কাজে নিযুক্ত দাসেরা তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অগ্রসর, তাহাদিগের মুখশ্রী অপেক্ষাকৃত প্রীতিজনক, সৌষ্ঠবযুক্ত ও সভ্যসমাজের উপযোগী ভাবব্যঞ্জক। প্রথমোক্ত দাসেরা কদাকার; তাহারা অনেক পরিমাণে আফ্রিকাদেশসুলভ ওষ্ঠ নাসিকা ও কেশ বজায় রাখিয়াছে। তাহাদিগের প্রতিভা অতীব মলিন এবং তাহাদিগের মুখে কেমন এক রকম ঘুমন্তভাব ও বুদ্ধির অভাব লক্ষিত হয়।"

আমাদের দেশেও ইহার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড় দেশে আইসেন তাঁহাদিগের সঙ্গে তাঁহাদের পাঁচ

জন সেবক আসিয়াছিল; এই ব্রাহ্মণ-সেবকদিগেরই বংশ-প্রসূত এখনকার অধিকাংশ বঙ্গীয় কায়স্থ। ভিন্ন বর্ণের হইলেও, ব্রাহ্মণ-সংসর্গ-প্রভাবে তাঁহারা প্রায় ব্রাহ্মণের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। এই জন্য আমাদের দেশে, গণনার সময়, কায়স্থ ব্রাহ্মণকে একত্র ধরা হয়। কারণ, উভয়ের মধ্যে স্বভাব-চরিত্রে অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে।

আমেরিকার পর্য্যটক ডাক্তার হালকক বলেন—"বিজাতিগত বিবাহ না হইয়াও, কয়েক পুরুষব্যাপী কালমধ্যেই কোন জাতির মধ্যে সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। নিগ্রোদিগের মধ্যে দেখা যায়, যাহারা অনেক-দিন হইতে গৌরাঙ্গ প্রভুদিগের ভৃত্য হইয়া তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিয়াছে, তাহাদিগের উত্তর বংশে স্থূল ওষ্ঠ, চ্যাপটা নাসিকা প্রভৃতি কাফ্রিসুলভ মুখশ্রী ততটা সুস্পষ্টরূপে আর লক্ষিত হয় না, ক্রমশঃ তাহাদিগের মুখাবয়ব অনেকটা য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় হইয়া আইসে।"

দক্ষিণ-সমুদ্র দ্বীপবাসিগণ যাহাদের সকলকেই একবংশোদ্ভব বলিয়া মনে হয়, তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের যতটুকু সভ্যতার চাষ হইয়াছে, সেই পরিমাণে তাহাদিগের মধ্যেও প্রভেদ লক্ষিত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত, নিউজিলাণ্ডবাসীরা নিতান্ত অসভ্য ও অধিকাংশ কৃষ্ণবর্ণ, নিউহল্যাণ্ড-বাসীরা অর্দ্ধসভ্য ও কপিশবর্ণ, ফ্রেণ্ডলী দ্বীপবাসীরা অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ও ততটা কালো নহে—তাহাদিগের মধ্যে অনেকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং অনেকেরই য়ুরোপীয় ধরণের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পিতা মাতার কোন বৃত্তি বা শক্তি উৎকর্ষ লাভ করিলে, তাহা যে অনেক সময় তাহার সন্তানে আসিয়া বর্ত্তে তাহাতে সন্দেহ নাই। জন্তুদিগের মধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। Pointer জাতীয় কুকুর যে প্রণালীতে শীকার করে তাহার বাচ্চা কোন শিক্ষা না পাইয়াও স্বভাবতঃ সেই সংস্কারটি প্রাপ্ত হয়। কুকুর ব্যতীত অন্যান্য পশুর মধ্যেও এইরূপ অর্জ্জিত অভ্যাসের কৌলিক অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয়।

ইংলণ্ডের মাঠে তৃণের প্রচুরতা হেতু, সেখানকার মেষগণ একত্র দল বাঁধিয়া চরিয়া বেড়ায়; কিন্তু স্কটলণ্ডের পার্ব্বতীয় প্রদেশে তৃণের বিরলতা হেতু, সেখানকার মেষ-সকল আহারের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে। তথাপি, ইংলণ্ডের মেষদিগকে যদি স্কটলণ্ডে লইয়া যাওয়া যায়, সে দেশের পক্ষে উপযোগী না হইলেও সেখানে তাহারা তাহাদিগের কৌলিক সংস্কার বশতঃ একত্র দল বাঁধিয়া চরিয়া বেড়ায়। এক একটি বিশেষ অর্জ্জিত অভ্যাস কিরূপে জন্তুদিগের মধ্যে কুলপ্রবাহী হয় তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ Night বলেন:—"একটি টেরিয়র কুকুরের বাচ্চা যাহার বাপ-মা গন্ধ-মার্জ্জার শীকার করিত এবং একটি Springing Spaniel কুকুরের বাচ্চা যাহার পূর্ব্বপুরুষেরা বন্য-কুক্কুট শীকার করিত, এই উভয়জাতীয় কুকুর একত্র পালিত হইয়াছিল। টেরিয়র বাচ্চাকে গন্ধ-মার্জ্জার কখন দেখিতে দেওয়া হয় নাই এবং স্পেনিয়েল বাচ্চাকে বন্য-কুক্কুট কখন দেখিতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু সেই টেরিয়র বাচ্চা যখনই প্রথম গন্ধ-মার্জ্জার দেখিতে পাইল, তখনি তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের সংস্কার-অনুসারে ভীষণভাবে তাহাকে আক্রমণ করিল; কিন্তু স্পেনিয়েল শিশু উদাসীনভাবে বসিয়া রহিল। আবার স্পেনিয়েল শিশু সর্ব্বপ্রথমে যখন বন্য-কুক্কুট দেখিতে পাইল, অমনি তাহাকে উৎসাহ ও আনন্দের সহিত আক্রমণ করিল; কিন্তু টেরিয়র উহাতে উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিল না।" মনুষ্যের মধ্যেও এইরূপ বিশেষ বিশেষ অভ্যাসের কৌলিক অনুবৃত্তি কখন কখন দেখিতে পওয়া যায়। Knight বলেন "একজন প্রসিদ্ধ ফরাসিস্ সিভিল ইঞ্জিনিয়র M. Polonceau কয়েক বৎসর হইল আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি একটি ফরাসী যুবককে তাঁহার সঙ্গে আনিয়াছিলেন—এই যুবক অনর্গল ইংরাজের ন্যায় ভাল ইংরাজিতে কথা কহিতে লাগিল। ঐ যুবক দুই বৎসর মাত্র ইংলণ্ডে ছিলেন। তাহার পূর্ব্বে ইংরাজি ভাষা

আদপে জানিতেন না—ইংরাজি কথা কহিতেও কখন শুনেন নাই। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি ইংরাজি নাম Thisslethwaite উচ্চারণ করিতে পার কি না—তিনি তৎক্ষণাৎ স্পষ্টরূপে ও বিশুদ্ধরূপে ঐ নাম উচ্চারণ করিলেন। তার পর দিন, কথায়-কথায় জানা গেল যে তাঁহার কতকগুলি আয়র্লণ্ডীয় আত্মীয় আছে; আরও জানা গেল, তাঁর মাতামহী, যাঁকে তিনি আদপে দেখেন নাই তিনি আয়র্লণ্ডীয় ছিলেন। এই জন্যই বোধহয়, তিনি ঐ কথাটা অত সহজে উচ্চারণ করিতে পারিয়াছিলেন। প্যারিস নগরে, একজন ফরাসী আমার নিকট জাঁক করিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি যে-কোন ইংরাজি কথা বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারেন, আমি Thisslethwaite এই নামটি উচ্চারণ করিতে বলিলাম, তিনি চেষ্টা করা দূরে থাকুক, একেবারে বলিয়া উঠিলেন, "Ah barbare" অর্থাৎ আ বর্ব্বর!—

কোন দেশের জলবায়ু শীতাতপ প্রভৃতি বাহ্য অবস্থার উপর কিয়ৎ পরিমাণে যে সেই দেশের জীবজন্তু মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি নির্ভর করে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। যে দেশে সূর্য্যের প্রখরতা কম সে দেশের লোকের রং অনেকটা ফিঁকে, সমভূমির লোকদিগের অপেক্ষা পার্ব্বত্য প্রদেশের লোকদিগের রং অনেকটা সাফ্; আবার, য়ুরোপ ও এসিয়ার উত্তরাংশের লোকেরা দক্ষিণাংশের লোকদের অপেক্ষা গৌরবর্ণ। উত্তর দেশে জন্তুদিগেরও রং সাদা দেখা যায়—এবং বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী প্রদেশের জীবজন্তুদিগের বর্ণ বিমিশ্র বলিয়া মনে হয়। লোকে বলে, অন্ধকার-স্থানে এক যোড়া শ্যামবর্ণ মূষিককে রাখিলে তাহাদিগের শাবকের রং সাদা হয়। Blumenback বলেন, একটা ঘরে ছোট ছোট পাখীদের রাখিয়া তাহাদিগকে শণের বীজ খাওয়াইলে তাহারা কালো হইয়া যায়।

New South Wales-এর বিবরণ যেরূপ শোনা যায় তাহাতে মনে

হয়, সেখানকার আবহাওয়ার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। অন্যান্য দেশ হইতে আসিয়া, New South Walesএ ভূমি গ্রহণ করিলে, কি উদ্ভিজ্জ কি জীব সকলেরই শারীরিক প্রকৃতিতে আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। অনেক দিন হইতে ইহা লক্ষিত হইয়াছে, যে সকল বেশ্যারা পূর্ব্বে একেবারে বন্ধ্যা ছিল তাহারা ঐ দেশে আসিয়া বহু সন্তান প্রসব করে, এবং যে সকল বিবাহিত স্ত্রীলোকের অধিক বয়সে সন্তান হওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহারাও ঐ প্রদেশে অল্প দিন আসিয়াই সন্তানবতী হয়। সুধু মনুষ্যজাতির কথা নহে, যে সকল জীবজন্তু অন্য প্রদেশ হইতে ঐ প্রদেশে আনীত হয় তাহাদেরও জাতিগত উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং আকারও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

ভারতবর্ষের বিষয় বলিতে গিয়া বিষপ হিবর এক স্থলে বলিয়াছেনঃ— "ইহা স্পষ্ট দেখা যায়, এই সকল শ্রেণীর মনুষ্যেরা (গৌরবর্ণ, পারসীক, গ্রীক, তাতার, তুর্ক, আরব) হিন্দুদিগের সহিত বিবাহ না করিয়াও, কয়েক পুরুষমধ্যেই ভারতবর্ষীয় আব-হাওয়া-সুলভ গাঢ় জলপাই-ফলের বর্ণ প্রাপ্ত হয়—এই বর্ণ নিগ্রোর অপেক্ষা কিছু কম কালো। পোর্টু-গিজেরা ভারতবর্ষে তিন শত বৎসর বাস করিয়াই কাফ্রির মত কালো হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ যে বলেন, কেবল আব-হাওয়ার তারতম্যে নিগ্রো ও য়ুরোপীয়ের মধ্যে প্রভেদ উৎপন্ন হয় না, এই কথাটি উপরোক্ত দৃষ্টান্তে অপ্রমাণিত হইতেছে। ইহা সত্য, নিগ্রোতে অন্যান্য কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে যাহা ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে নাই এবং যাহা ভারতবর্ষ-নিবাসী পোর্টুগীজের মধ্যেও দেখা যায় না; এই সকল বিশেষ লক্ষণ আবহাওয়া ঘটিত নহে বটে, কিন্তু যে একমাত্র বিষয়ে য়ুরোপীয় ও হিন্দুর মধ্যে প্রভেদ সেই শ্যামবর্ণ যে আবহাওয়ার ফল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি উত্তাপে কোন একটি পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা হইলে আবহাওয়ার অন্যান্য বিশেষত্ব হইতে অন্যান্য আরও কতকগুলি

পরিবর্ত্তনও যে ঘটিতে পারে তাহাতে আর বিচিত্র কি। বিশেষতঃ ঐ সকল বিশেষত্ব যখন তিন চারি হাজার বৎসর হইতে স্বীয় প্রভাব প্রকটিত করিয়া আসিতেছে, তখন উহা হইতে যে কত দূর পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে তাহার সীমা নিরূপণ করা সহজ নহে। আমার মনে হয়, আমাদের য়ুরোপীয় গর্ব্বের আতিশয্যে আমরা এই ভ্রমে পতিত হই যে আমাদিগের দেহের রংই বুঝি মনুষ্য জাতির আদিম রং—কিন্তু আমার বরং মনে হয় ভারতবর্ষীয়দিগের যেরূপ রং তাহাই মনুষ্যজাতির আদিম রং—কেননা উহাই দুই অতিরিক্ত সীমার মাঝামাঝি এবং উহাই চক্ষুর তৃপ্তিকর। মনুষ্যজাতির অধিকাংশের মধ্যে ঐরূপ রংই দৃষ্ট হয়। শীত-প্রভাবে ও পরিচ্ছেদের নিত্য ব্যবহারে যেমন একদিকে চর্ম্ম সাদা হইয়া যাইবার কথা, সেইরূপ অন্য পক্ষে জ্বলন্ত সূর্য্যোত্তাপ ও দেহের নগ্নাবস্থা-প্রযুক্ত চর্ম্ম কালো হইয়া যাইবার কথা। এইরূপে উত্তাপ প্রভৃতি নানা প্রকার বাহ্য অবস্থায় পতিত হইয়া, হিন্দু অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া নিগ্রোতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে এবং বিপরীত কারণ বিদ্যমান থাকিলে, ঐ হিন্দুই হয়তো চীন, পারসীক, তুর্ক, রুষ ও ইংরাজের রং প্রাপ্ত হয়।”

Dr Prichard বলেন;—আফ্রিকার পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসিগণ, নিম্নস্থ জলা ভূমির অধিবাসী অপেক্ষা শারীরিক বল ও মানসিক শক্তি-বিষয়ে অনেকগুণে উৎকৃষ্ট।

শারীরিক বলের উপর সভ্যতার কিরূপ প্রভাব তাহা Peron দেখাইয়াছেন। তিনি Regnier-কৃত Dynamometer যন্ত্রের সাহায্যে অবধারণ করিয়াছিলেন যে, Van Diemensland-বাসী বন্য লোকেরা অপেক্ষাকৃত-উন্নত New Holland-বাসীদের অপেক্ষায় শারীরিক বলে নিকৃষ্ট; আবার New Holland-বাসীরা অপেক্ষাকৃত-উন্নত Limor জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট; আবার Timor-বাসীগণ, য়ুরোপীয়দিগের অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট।

জাতির উৎকর্ষ-সাধনই প্রকৃতির উদ্দেশ্য, কিন্তু এই উদ্দেশ্য অতি অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে সাধিত হয়। উৎকৃষ্ট-জাতীয় জীব কিম্বা উদ্ভিজ্জের উন্নতি, নিকৃষ্ট জাতীয় জীব কিম্বা উদ্ভিজ্জের অপেক্ষা বিলম্বে সাধিত হয়। জন্মাইবার পূর্ব্বে, জীব ও উদ্ভিজ্জদিগকে একটি নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাদিগের পূর্ণ শক্তি ও পরিমাণ লাভ করিবার পূর্ব্বেও তাহাদিগকে আবার কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এই জন্য তাহার চরম উৎকর্ষ আরও বিলম্বে সাধিত হয়।

পিতা মাতার উপর, অনুকূল অবস্থা ও ঘটনার প্রভাব প্রকটিত হইলে তাহাদিগের সন্তান সন্ততিরও উন্নতি হইয়া থাকে; এই নিয়মটি থাকায়, মনুষ্যজাতির উৎকর্ষ-সাধনে আমরা একেবারে নিরাশ হই না। কোন জাতির মধ্যে, দুই এক পুরুষের ভিতরে, আমাদিগের আশানুরূপ চরম উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না বলিয়া আমরা ভগ্নোদ্যম হই না। কেননা আমাদিগের উদ্যম চেষ্টায় যদি একজন ব্যক্তিরও অল্পপরিমাণ উন্নতি হয়, তাহা হইলেও সে উদ্যম ও চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হয় না। সচরাচর শিক্ষার দ্বারা কোন ব্যক্তিবিশেষের কিয়ৎপরিমাণে উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু সে উন্নতির একটা সীমা আছে। সেই সীমাটিতে পৌঁছিলেই তাহার আর উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এই ব্যক্তিবিশেষের তিল-পরিমাণ উন্নতিগুলি কৌলিক নিয়মে সন্তান সন্ততির মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে তাল-পরিমাণ হইয়া উঠিতে পারে। যে সকল সমাজ-সংস্কারকেরা তাঁহাদিগের জীবদ্দশায় কোন জাতির উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিতে চান, তাঁহারা নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন,—কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত, তাঁহাদের উদ্যম ও চেষ্টায় যদি সমাজের তিলমাত্র উন্নতি সাধিত হয়, তাহা হইলেই তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইল।

উদ্ভিজ্জ ও পশুদিগের মধ্যে দেখা যায়, বাহ্য অবস্থার অনুকূলতায় যে

কোন উন্নতি সাধিত হয়, সেই অনুকূলতা চলিয়া গেলেই তাহারা আবার যে-কে-সেই পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য ক্রমাগত চাষ ও উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা আবশ্যক। উদ্ভিজ্জ ও পশুদিগের মধ্যে যেরূপ, মনুষ্যের মধ্যেও সেইরূপ একই নিয়ম দৃষ্ট হয়। শারীরিক ও মানসিক উন্নতির উপায়-সকলের প্রতি ঔদাস্য করিলে মনুষ্যের সন্তান সন্ততি ক্রমশঃই হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়; কারণ, বাহ্য অবস্থার প্রভাব যতই প্রবল হউক না, গোড়ার আভ্যন্তরিক প্রভাব আরও বলবৎ। এই জন্য বিবাহার্থী ব্যক্তিদিগের জাতি-কুল-গোত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্রে এক গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিষেধটা অযৌক্তিক নহে। যদি কোন ব্যক্তির শারীরিক প্রকৃতি বা গঠনে কোন প্রকার হীনতা বা বিকৃতি উপস্থিত হইয়া তাঁহার সন্তান সন্ততিতে সংক্রামিত হয়—আর, তাঁহার বংশের মধ্যে যদি স্বজাতি-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে তাঁহার বংশে সেই হীনতা বা বিকৃতি আরও দ্বিগুণ পরিমাণে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি অন্য বংশের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ ঘটে, তাহা হইলে এই হীনতা বা বিকৃতি ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে পারে। এই প্রকার স্বজাতি-বিবাহে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা মস্তিষ্কেরই বেশী হানি দৃষ্ট হয়। স্বজাতি-বিবাহের যে কি বিষময় ফল তাহা য়ুরোপীয় রাজবংশে সপ্রমাণ হয়। য়ুরোপের প্রায় প্রত্যেক রাজবংশে নির্ব্বুদ্ধিতা বা বাতুলতা ন্যূনাধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ডের ইহুদিদিগের মধ্যে খুড়তুতো ভগিনীকে বিবাহ করিবার কুপ্রথা প্রচলিত আছে। এই জন্য তাহাদিগের মধ্যে তোত্‌লামো, টেরা-দৃষ্টি, বাতুলতা ও সকল প্রকার স্নায়বীয় পীড়ার আধিক্য। আসল কথা, বিবাহের গণ্ডী যত বড় হয়, ততই নির্ব্বাচনের সুবিধা। অন্য গোত্রে বিবাহ করিলেই যে ভাল ফল হইবার কথা এরূপ নহে। আমার গোত্রে যে হীনতা আছে, সেই হীনতা যদি অন্য বংশে থাকে এবং

বিবেচনা না করিয়া যদি সেই বংশের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধে নিবদ্ধ হই, তাহা হইলে সেই একই বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। তবে সমগোত্র অপেক্ষা অসমগোত্রে বিবাহে এই প্রকার ঘটনার সম্ভাবনা কম। এমন বংশ বা গোত্র অতি বিরল যাহার মধ্যে কোন না কোন শারীরিক দোষ না আছে এবং সেই গোত্র বা বংশমধ্যে যদি অন্তর্বিবাহ প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে সেই সকল দোষ আরও পরিপুষ্ট ও তীব্রতর হইবার কথা। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, ভিন্ন গোত্র ও ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ যেমন শুভজনক, ভিন্ন জাতির মধ্যেও বিবাহ সেইরূপ শুভজনক। দুই ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ হইয়া যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহা উভয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন নিকৃষ্ট জাতির সহিত উৎকৃষ্ট জাতির সম্মিলন ঘটিলে নিকৃষ্ট জাতি যে উন্নত হয় তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা বলেন, পারসীক জাতি পূর্ব্বে অত্যন্ত কদাকার ছিল, জর্জীয় ও সর্কেসীয় জাতির সংমিশ্রণে এক্ষণে তাহারা সুশ্রী হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে হিন্দু ও য়ুরোপীয়ের সংমিশ্রণে যে ফিরিঙ্গি জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, সে ফিরিঙ্গি জাতিতে উন্নতির কোন লক্ষণ কি দেখা যায়? ফিরিঙ্গিদের মধ্যেতো আমরা কোন উৎকৃষ্ট গুণ দেখিতে পাই না। কি ইংরাজ, কি দেশীয়, তাহারা সকলেরই ঘৃণার পাত্র।' আমার বোধ হয়, নিতান্ত ভিন্ন জাতীয়দিগের মধ্যে বিবাহ হইলে তাহার সন্তান সন্ততি ভাল হয় না। পারসিক ও জর্জীয়দিগের মধ্যে ব্যবধান অধিক নহে। সেই জন্য বেশ মিশ খাইয়াছে। ইংরাজে বাঙ্গালিতে কখনই সেরূপ মিশ খাইতে পারে না। আমাদিগের সহিত বিহারীদিগের হয়তো ভালরূপ সংমিশ্রণ হইতে পারে—কিন্তু পঞ্জাবীদিগের সহিত হইতে পারে কি না তাহাও সন্দেহস্থল।

সে যাহাই হউক যাহাতে সন্তান সন্ততি ভাল হয় ইহার প্রতি লক্ষ্য আমাদিগের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা উচিত। কেবল কটা

পাশ্ করিয়াছে কিম্বা কত টাকা আছে ইহাই যেন পাত্র-নির্ব্বাচনের একমাত্র চরম নিয়ম না হয়। অন্যান্য বিষয়ও অনুসন্ধান করা উচিত।

শস্য উৎপাদন করিবার সময় আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজ দেখিয়া বপন করি—গোরু বা ভেড়ার জাতি ভাল করিতে গেলে আমরা উৎকৃষ্ট জাতীয় গোরু ও ভেড়ার অনুসন্ধান করি। ভাল কুকুরের বাচ্ছা পাইবার জন্য আমরা ভাল ভাল কুকুর বাচিয়া আনি। কিন্তু কেবল মানুষের বেলায় আমাদের কেন এরূপ ঔদাস্য? বিবাহের সময় আমরা ভাল করিয়া পাত্র নির্ব্বাচন করি না বলিয়াই নানাপ্রকার কৌলিক রোগ আমাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হয়। পাত্র যদি সম্পত্তিশালী বা কুলীন বা পাশ-করা হয় তাহা হইলেই আমরা যথেষ্ট মনে করি। তার পরে সে চিররোগী হোক, মাতাল হোক্, কাপুরুষ হোক্ তাহাতে কিছুই আমাদের আসিয়া যায় না। বাঙ্গালি জাতিকে যদি উন্নত করিতে হয়, তাহা হইলে এই সকল বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

———o———

সমাজ-বিজ্ঞান

ও

ম্যাল্‌থসের মত।

(প্রতিবাদ)

সমাজতত্ত্ব লইয়া য়ুরোপে অনেক দিন হইতে আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু এখনও সমাজের রীতিমত বিজ্ঞান হইয়াছে কি না সন্দেহ। অন্যান্য সকল বিজ্ঞান অপেক্ষা সমাজ-বিজ্ঞান দুরূহ ও জটিল; কারণ, সমাজ-বিজ্ঞান সকল বিজ্ঞানের চরম পরিণাম। মানুষ লইয়া সমাজ। মানুষের সমাজকে বুঝিতে গেলে মানুষকে ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। মানুষকে ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে, তাহার শরীর, তাহার মন, তাহার বাহ্য অবস্থা, তাহার বাসস্থান পৃথিবী, অন্যান্য জীবজন্তু, উদ্ভিজ্জ, এমন কি সমস্ত সৃষ্টিকে ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। কাজে কাজেই সকল বিজ্ঞানের চরম উন্নতি না হইলে রীতিমত সমাজ-বিজ্ঞান হইতে পারে না। শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, প্রাকৃতবিজ্ঞান, সকলই এখন শৈশবাবস্থায়—কাজেই সমাজ-বিজ্ঞান এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

এই অবস্থায় যদি কেহ সমাজ-বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া কোন মত জারি করিতে প্রবৃত্ত হন এবং উহা অকাট্য বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কি তাঁহার কথা সন্দেহের সহিত আমরা গ্রহণ করিব না? এ প্রকার সন্দেহ করিবার আমাদের অধিকার আছে।

আমরা ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি, ম্যাল্‌থস প্রমাণ করিয়াছেন, পৃথিবীর খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। অর্থাৎ যে পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, সেরূপ

বাড়িতে গেলে পৃথিবী আমাদিগকে খোরাক যোগাইতে পারিবে না। অতএব লোকসংখ্যা যাহাতে কমে তাহারই চেষ্টা করা উচিত। আমরা যদিও তাঁহার মূল গ্রন্থ পাঠ করি নাই (অতি অল্প লোকেই বোধ হয় পাঠ করিয়াছে) তবু সহজ বুদ্ধিতে এরূপ মনে হয়, তিনি যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার বিশিষ্ট কোন প্রমাণ নাই। সে সকল তথ্য অবলম্বন করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, সেই তথ্যগুলি কতদূর প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। এক খণ্ড ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি ও ফসলের পরিমাণ ঠিক করাই যখন কঠিন এবং একটী নগরের লোকসংখ্যা স্থির করিতে যখন এত ভুল হয়, তখন যে তিনি সমস্ত পৃথিবীর লোকসংখ্যা ও খাদ্যের পরিমাণ অকাট্যরূপে স্থির করিতে পারিবেন ইহা এক প্রকার অসম্ভব। তাঁহার কথা যদি সত্য হইত, সে সময় হইতে গণনা করিলে এতদিনে পৃথিবী উজাড় হইয়া যাইত। তর্কের স্থলে যদি বা তাঁহার কথাই ঠিক বলিয়া মানা যায়—তবু লোকসংখ্যা কমাইবার জন্য কৃত্রিম উপায়ের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। মহামারী, জলপ্লাবন, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী উৎপাত এত আছে যে তাহার উপর যদি ইচ্ছা করিয়া প্রত্যেক মনুষ্য কৃত্রিম উপায়ে প্রজাবৃদ্ধি নিবারণ করে তাহা হইলে তো মনুষ্য-সমাজ একেবারে উচ্ছিন্ন হইবার কথা। কেহ এ কথা বলিতে পারেন, মনুষ্য-সমাজে যতই সভ্যতার বৃদ্ধি হয়, ততই দৈব উৎপাতে জীবননাশের কম সম্ভাবনা থাকে—জীবন-রক্ষার অনেক উপায় উদ্ভাবিত হয়; এ কথা সত্য, কিন্তু এখনও সে অবস্থা আইসে নাই। সভ্য য়ুরোপ এখনও জলপ্লাবন, মারীভয়, যুদ্ধবিগ্রহের হাত হইতে একেবারে অব্যাহতি পান নাই। সভ্যতর য়ুরোপেই যখন লোকসংখ্যা নিবারণের কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিবার সময় আইসে নাই, তখন আমাদের দেশের তো কথাই নাই। এত সামান্য ও অল্প আহারে আমাদের

শরীর রক্ষা হয় যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমাদের কোন ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। বিশেষ কোন দৈব উৎপাত না হইলে, সচরাচর আমাদের দেশে অতি অল্প লোকেই অনাহারে মরে। লোকসংখ্যা নিবারণের চেষ্টা না করিয়া ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা কর না কেন? যদি আমরা কৃষি-বিদ্যার প্রতি মনোযোগী হই—যদি আমরা উৎকৃষ্ট লাঙ্গল ব্যবহার করি ও চাষের উন্নত প্রণালী অবলম্বন করি, তাহা হইলে আমাদের খাদ্যের পরিমাণ হয়তো আরও বৃদ্ধি হইতে পারে। ইহার উপর যদি আমরা মিতব্যয়িতা শ্রমশীলতা অভ্যাস করি তাহা হইলে আমাদের খাদ্যের অভাব কি? Lewis একস্থলে বলিয়াছেন, "অসম্পূর্ণ সভ্যতার অবস্থায় জীবিকার উপায় বৃদ্ধি করা অপেক্ষা অধিক দ্রুতবেগে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার দিকে মানবজাতির স্বাভাবিক গতি। কিন্তু কোন বিশেষ দেশে ও বিশেষ সময়ে সতর্কতা, শ্রমশীলতা, অর্জ্জনস্পৃহা এবং উৎকৃষ্ট রাজনৈতিক ও গার্হস্থ্য বন্দোবস্তের প্রভাবে কার্য্যতঃ এই গতির প্রতিবিধান হইতে পারে।"

লোকসংখ্যার বৃদ্ধি না হইলে সমাজ সংগঠন হয় না—সমাজের উন্নতি হয় না—সভ্যতার বিস্তার হয় না। সমাজ যত দিন অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিবে ততদিন দুঃখ দুর্দ্দশার হাত হইতে কখনই এড়াইতে পারিবে না। প্রকৃত সভ্যতা, প্রকৃত উন্নতির দিকে সমাজ যতই অগ্রসর হইতেছে ততই উহার দুঃখ দুর্গতির হ্রাস হইতেছে সত্য, কিন্তু এই কষ্ট নিবারণের জন্য কষ্টসাধনই একমাত্র উপায়। জল দিয়া যেমন জল বাহির করিতে হয়, তেমনি কষ্টের দ্বারাই কষ্ট দূর হয়। আমাদিগের অপূর্ণপ্রকৃতি, কাজেই কষ্ট আমাদের জীবনের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম; অতএব, পাছে আমার দুটি সন্তানের পর আর দুটি সন্তান হইলে তাহারা কষ্ট পায় এ আশঙ্কা করা কাপুরুষের কথা, স্বার্থপরের কথা। কাজ করিবার জন্যই আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি। সুখ যতটা আসে ভাল;

কিন্তু কষ্টই আমাদের জীবনের নিয়ম; এইরূপ মনে করা উচিত, প্রকৃতির মহান্ উদ্দেশ্য পূর্ণ করাই আমাদের কাজ। সে উদ্দেশ্য কি?—না অধিকতম লোকের অধিকতম সুখ—পূর্ণ সুখ নহে। আমরা পূর্ণ সুখের অধিকারী নহি। আপনার সুখের প্রতি মুখ্য দৃষ্টি থাকিলে সে উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত হয়। প্রজাবৃদ্ধি হইলে যদি সাধারণতঃ জগৎ-সংসারের উপকার হয়, তাহা হইলে ব্যক্তি বিশেষের কষ্টকে গণনার মধ্যে আনা উচিত নহে।

"মনুষ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? যদি জন্মিয়া কষ্টই পাইতে হইল তবে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিবার ফল কি?" এ সকল ধরণের কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা তো প্রকৃতির বিদ্রোহী প্রজা। উদ্দেশ্য যাহাই হউক, তোমার ভাবিয়া কোন ফল নাই। এই পর্য্যন্ত জান, ইহাই প্রকৃতির সঙ্কল্প। যদি প্রকৃতির সুপ্রজা হও, যদি প্রকৃতির ভক্ত হও, তাহা হইলে এই সঙ্কল্পে অবিতর্কচিত্তে তোমাকে যোগ দিতেই হইবে। প্রকৃতির সঙ্কল্পই এই, প্রত্যেক মনুষ্যকে দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, কষ্টের ভাগী হইতে হইবে এবং ভবিষ্য উন্নতসমাজ নির্ম্মাণের জন্য সহায়তা করিতে হইবে—এক কথায়, মজুরের মত খাটিতে হইবে। পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করা যদি মনুষ্যের ইচ্ছাধীন হইত এবং যদি অজাত মনুষ্যগণ বলিত যে, পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ দুর্দ্দশা একেবারে তিরোহিত না হইলে আমরা জন্মগ্রহণ করিব না, তাহা হইলে কি পৃথিবীর উন্নতি হইতে পারিত? সমাজ টেঁকিতে পারিত? একেবারে পূর্ণ সমাজ স্থাপন করা যখন প্রকৃতির উদ্দেশ্য নয়, তখন একেবারে কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার আশা করা বৃথা। যাঁহারা বলেন, এই পরিমাণ কষ্ট সহ্য করা যাইতে পারে, তাহার অধিক নহে—তাহার অধিক কষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিলে সন্তানোৎপত্তি নিবারণ করা উচিত, তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, কষ্ট আপেক্ষিক—এক জনের পক্ষে যাহা কষ্ট, আর এক জনের

পক্ষে তাহা কষ্ট নহে, যে পরিমাণ কষ্ট একজনের সহ্য হয়, সে পরিমাণ কষ্ট আর একজনের পক্ষে অসহ্য। অতএব কষ্টের কোন ধ্রুব পরিমাপক নাই। তা ছাড়া, অনেক সময়ে, যাহা আপাততঃ কষ্ট বলিয়া মনে হয় তাহা ভবিষ্য মঙ্গল—ভবিষ্য সুখের সোপান। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত লোকদিগের মধ্যে খাওয়া পরার কষ্ট হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অত্যন্ত আক্ষেপ করেন। কিন্তু আমার মতে ইহা একটি শুভ লক্ষণ। কষ্টের সঙ্গেসঙ্গে লোকের উদ্যমও বাড়িতেছে। উদ্যমের অবশ্যম্ভাবী ফল উন্নতি। আমাদের সমাজে যতই যুঝাযুঝি চলিবে ততই আমরা বলবীর্য্য অর্জ্জন করিতে পারিব, ধৈর্য্য, দৃঢ়তা, অধ্যবসায় প্রভৃতি পৌরুষিকগুণ—যাহাতে জাতীয় চরিত্র উন্নত হয় সেই সকল গুণ আমরা লাভ করিতে পারিব। ক্রমে আমরা বাঙ্গালি জাতি পৃথিবীর উন্নত জাতির মধ্যে গণ্য হইব। পায়ের উপর পা দিয়া নিশ্চিন্তভাবে আরামে বসিয়া থাকার অবস্থা কোন জাতির পক্ষেও ভাল নয়, কোন বংশের পক্ষেও ভাল নয়, কোন ব্যক্তির পক্ষেও ভাল নয়। Walker তাঁহার 'অন্তর্বিবাহ' নামক গ্রন্থের একস্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি সত্য। তিনি বলেন:—"প্রতিভা, যাহা দুর্দ্দশায় শাণিত হয় তাহা আরামের ক্রোড়ে গিয়া শীঘ্রই ভোঁতা হইয়া পড়ে। এবং মধ্যবিৎ গুণবত্তা, এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া একেবারে নির্ব্বুদ্ধিতায় পরিণত হয়। যে মনুষ্য জন্ম-ঘটনার বলে মান-সম্ভ্রম, সুখ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়, তাহার ঐ সকল বিষয় লাভ করিবার জন্য কোন চেষ্টা করিতে হয় না। চেষ্টা করা আবশ্যক বোধ হয় না। সুতরাং বুদ্ধি-শক্তি ক্রমশঃ অপহৃত হয় এবং সেই মনুষ্য একেবারে অধোগতি প্রাপ্ত হয়।"

যে ভবিষ্য সমাজমন্দির নির্ম্মাণে প্রকৃতি ব্যস্ত, সে মন্দির এত বড় এবং এত কাজ তাহার বাকী যে, মজুরের যোগান কম করিলে কিছুতেই চলে না। মজুরমাত্রেই একটা না একটা কাজে লাগিবে। কিন্তু কি কাজে

লাগিবে তাহা আমরা জানি না, তাহা বিশ্বকর্ম্মাই জানেন। আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্য, যত পারি মজুরের যোগান্ দেওয়া এবং গৌণ কর্ত্তব্য এই যে, সেই মজুর-সকল যাহাতে সবল হয়, চিররোগী না হয়, তাহাদিগের শরীর মনের শক্তি যাহাতে যথাযথরূপে নিয়োগ করিতে পারে অর্থাৎ যাহাতে তাহাদিগকে বসিয়া থাকিতে না হয়—যাহাতে তাহারা পুরা খাটুনি খাটিতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা। কিন্তু গৌণ কর্ত্তব্যের অনুরোধে মুখ্য কর্ত্তব্যকে বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নহে। আমরা গণনা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না। প্রকৃতি কোথায় কোন্ অভাব কাহার দ্বারা পূরণ করিবেন আমরা তাহা কিছুই জানি না।

কেহ কেহ দারিদ্র্যের আশঙ্কায় সন্তান বৃদ্ধি নিবারণের উপদেশ দেন। কিন্তু কত দরিদ্র সন্তান পৃথিবীর কত যে উপকার করিয়াছে তাহা বলা যায় না। দরিদ্রের ঘরে অনেক বড় লোকের জন্ম হইয়াছে। কলম্বস্, হানিমান, জোয়ান অফ আর্ক, স্যামুয়েল জন্সন্, কেপ্লর, হলিনিয়স্, রিখটর, জর্জ্জ ষ্টিফেনসন, আর্কবাইট, ফ্যারাডে প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্ত আছে। প্রখ্যাত উদ্ভিদবেত্তা লিনিয়সের পিতা এত দরিদ্র ছিলেন যে তিনি তাহার পুত্রের শিক্ষাভার বহন করিতে না পারিয়া কোন জুতাওয়ালা মুচির দোকানে তাহাকে শিক্ষানবীশ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পুত্র, কিছুকাল পরে আপনার প্রতিভাবলে নোবল্ম্যান্ শ্রেণীভুক্ত হয়েন। রেলওয়ে আবিষ্কার-কর্ত্তা জর্জ ষ্টিফেনসনের পিতাও তাঁহার পুত্রকে ভালরূপ শিক্ষা দিয়া যাইতে পারেন নাই। শিক্ষার জন্য তাঁহার নিজ সম্বলের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। শালগম্ কুড়াইয়া তিনি প্রতিদিন দুই পেন্স করিয়া পাইতেন। এই কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি নিজ অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি সাধন করেন। সূতাকাটা কলের উদ্ভাবক আর্করাইটের পিতাও অত্যন্ত গরীব ছিলেন। তাঁহার ১৩টি পুত্র,

তন্মধ্যে আর্করাইট সর্ব্বকনিষ্ঠ। তিনিও স্বীয় প্রতিভাবলে নিজ উন্নতি সাধন করেন।

এই সকল বড় লোক যদি না জন্মাইতেন তাহা হইলে কি হইত বল দেখি? তাহা হইলে এই পৃথিবীর সভ্যতা কি যুগযুগান্তর পিছাইয়া পড়িত না? যদি আর্করাইটের দরিদ্র পিতার ১২টি সন্তান জন্মাইবার পর, আর্করাইট্ পৃথিবীতে না আসিতেন তাহা হইলে ইংলণ্ডের কি এতদূর উন্নতি হইতে পারিত? কোন কোন রুগ্ন সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াও পৃথিবীর মহৎ উপকার সাধন করিয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত, প্রখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা কেপলর ও বাষ্পীয়-যন্ত্র উদ্ভাবক ওয়াট্। ওয়াটের জীবনী-লেখক বলে :—"অসাধারণ পরিশ্রম সহকারে স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনে তাঁহার অসুস্থতাই তাঁহাকে প্রবৃত্ত করে।" অতএব কাহার দ্বারা কি কাজ হইতে পারে তাহা পূর্ব্ব হইতে নিরূপণ করা মনুষ্যের অসাধ্য। একেবারে অনাহারে মরিবেই মরিবে, এরূপ নিশ্চিত না জানিতে পারিলে সন্তান উৎপাদনে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে—ইহা ধর্ম্মের বিরোধী, ইহা প্রকৃতির বিরোধী। আমাদের শাস্ত্রে এই জন্য পুত্র না হইলে নরকস্থ হইতে হয়। যাহাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যাহাতে সন্তান সকল অধিক পরিমাণে রক্ষা পায়, এই জন্যই বিবাহের সৃষ্টি হইয়াছে, এই জন্যই স্বগোত্র-বিবাহ ও ব্যভিচার নিষিদ্ধ। এই সকল সুনিয়ম পরীক্ষার ফল।

———o———

ইন্দ্রিয়-বিভ্রম।

সচরাচর লোকে মনে করিয়া থাকে যে, মস্তিষ্করোগাক্রান্ত বাতুল-দিগেরই ইন্দ্রিয়-বিভ্রম উপস্থিত হয়—প্রকৃতিস্থ বুদ্ধিমান লোকের ওরূপ ভ্রম কদাপি হয় না। জ্বর-রোগী যখন বিকারের ঘোরে নানা প্রকার কাল্পনিক মূর্ত্তি দর্শন করে কিম্বা ভয়গ্রস্ত ব্যক্তি একটা বৃক্ষকে ভূত বলিয়া বিশ্বাস করে, তখন তাহা সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি, কিন্তু আমরা যে প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেও আমাদের জীবনের সামান্য কাজ কর্ম্মে, অষ্ট প্রহর, প্রতিমুহূর্ত্ত, এইরূপ ভ্রমে পতিত হইতেছি তাহা আমরা মনে করি না।

ভ্রমই অপূর্ণ মনুষ্যের স্বাভাবিক অবস্থা। যে যতই বুদ্ধিমান হোক না, ভ্রমের হাত হইতে কেহই এড়াইতে পারেন না। স্নায়ু-মণ্ডল ক্ষণ-কালের জন্য ক্লান্ত হইলে, মনোযোগের একটু শৈথিল্য হইলে আমরা ঠিক সত্যটি আর দেখিতে পাই না।

এই প্রস্তাবে আমরা সকল প্রকার ভ্রমের বিষয় আলোচনা করিব না—সাক্ষাৎ যুক্তির ব্যভিচারে যে ভ্রম উৎপন্ন হয় তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। অব্যবহিত স্বতঃসিদ্ধ সহজ জ্ঞানের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া যে ভ্রম আমাদের মনোমধ্যে প্রবেশ করে—তাহাই আমরা আলোচনা করিব। আর কিছু হইতে সিদ্ধান্ত না করিয়া যখন কোন পদার্থকে আমরা তাহার নিজের প্রমাণেই বিশ্বাস করি এবং পরে এই বিশ্বাস যখন ভ্রম বলিয়া সপ্রমাণ হয়—তখন এই যে ভ্রম হয়, তাহাকে বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা বিভ্রম বলিব।

ভ্রম কাহাকে বলে, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে সত্য কাহাকে বলে এই প্রশ্নটি আপনা হইতেই উত্থিত হয়। এ প্রশ্নটি মীমাংসা করা সহজ নহে। সকল কালের ও সকল দেশের

দার্শনিক পণ্ডিতেরা এই প্রশ্ন মীমাংসা করিবার জন্য আবহমান কাল পর্যান্ত মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কোন অকাট্য সিদ্ধান্তে এ পর্যান্ত উপনীত হইতে পারেন নাই। বহির্জগৎ যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়দর্পণে প্রতিভাত হইতেছে তাহা বাস্তবিক সত্য কি না? আমাদের বাহিরে তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে—না, তাহা কেবল আমাদের মনের কল্পনা মাত্র? দর্শনশাস্ত্র একটা না একটা মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের বেদান্তদর্শন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—বাহিরে যাহা কিছু আমরা উপলব্ধি করি—সমস্তই মায়া, সমস্তই স্বপ্ন,—তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। বিজ্ঞানের যে এক মহা গর্ব্ব আছে যে তিনি বিনা প্রমাণে কাহারও কথা গ্রাহ্য করিবেন না, তাঁহারও গর্ব্ব এইখানে খর্ব্ব হইয়াছে। তিনি বাহ্য জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি প্রমাণ পাইয়াছেন? ইন্দ্রিয়ের প্রমাণে আমরা দীর্ঘ প্রস্থ কাঠিন্য প্রভৃতি বস্তুর গুণ মাত্রই উপলব্ধি করি, তাহাতে বস্তুর বাস্তবিক সত্তা সপ্রমাণ হয় না। অথচ বিজ্ঞান তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলেন—বহির্বিষয়ই আমাদের সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বোধের কারণ। বিজ্ঞান কোনরূপেই মূল সত্যের আদর্শ নিরূপণ করিতে পারেন না। মিল্ এই জন্য বাহ্য জগৎকে ইন্দ্রিয়বোধের স্থায়ী সম্ভাব্যতা Permanent possibilities of sensation আখ্যা দিয়াছেন।

কোন বাহ্য বস্তু সত্য কি অসত্য তাহা নিরূপণ করিবার জন্য বিজ্ঞান হয়তো এই মাত্র বলিবেন যে যখন রজ্জুকে আমাদের সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, তখন কেবল নেত্রের প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত—সকল ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেই আসল সত্যটি ধরা পড়িবে। সকল ইন্দ্রিয় একবাক্যে যাহা বলে তাহাই সত্য, তদ্বিপরীত অসত্য। কিন্তু কোন বস্তুকে বস্তু বলিয়া আমাদের যে প্রতীতি হয়, তাহা কোন্ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে? বস্তুজ্ঞান আমাদের

কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই উৎপন্ন হয় না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কেবল গুণরাশির প্রমাণ পাই। আবার হয়তো বিজ্ঞান, সত্যকে এই ভাবে নির্দ্দেশ করিবেন যে, পৃথিবীর অধিকাংশ জ্ঞানবান লোকে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে তাহাই সত্য। তাহাও হইতে পারে না। সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, এক সময়ে য়ুরোপের সাধারণ লোকের ও পণ্ডিতদিগের মত ছিল; গ্যালিলিও তাহার বিপরীত মত প্রচার করিয়া কিরূপ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। James sully সত্য নির্দ্দেশ করিবার আর সকল পথ রুদ্ধ দেখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ;—"যে পরিমাণে মনুষ্যদিগের মন জ্ঞানদীপ্ত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাহারা যাহা অবিচলিত ও চিরস্থায়ীরূপে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে তাহাই সত্য।" কিন্তু ইহাও কোন কাজের কথা নহে। আমাদের জ্ঞানের উন্নতি আপেক্ষিক। গ্যালিলিয়োর সময়ের পণ্ডিতেরা মনে করিত যে তাহারা জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইতে পারে না। আমরাও এই জ্ঞানদীপ্ত ঊনবিংশতি শতাব্দীতে মনে করিতেছি, আমরা যাহা সিদ্ধান্ত করিতেছি তাহা অকাট্য, কিন্তু কে বলিতে পারে এখনকার বিজ্ঞানের কোন সিদ্ধান্ত দূর ভবিষ্যতে উল্টাইয়া যাইবে না? যাহাই হউক, বহির্জগৎ বাস্তবিক থাকুক বা না থাকুক—তাহার অস্তিত্বে আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না—ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। আমি আছি, এই জ্ঞান একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সত্য আছে ইহা আমাদের সহজ জ্ঞানের বিশ্বাস। যখনইআমরা ভ্রম আছে বলিয়া স্বীকার করি, তখনই সত্যেরও একটি ধ্রুব আদর্শ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হই। এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসই আমাদের সত্যের নেতা। ইহা গোড়াতেই মানিয়া লইয়া বিভ্রমের কারণানুসন্ধানে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত হইব। বাস্তবিক সত্য আছে কি না, দর্শন-শাস্ত্রের এই কূট-তর্কের মধ্যে প্রবেশ না

করিয়া সহজ জ্ঞানে যাহা সত্য ও যাহা বিভ্রম বলিয়া মনে হয় তাহারই আলোচনা করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যাহা অব্যবহিত জ্ঞানের ভাণ করিয়া আমাদের মনোমধ্যে প্রবেশ করে তাহাই বিভ্রম। এই সকল বিভ্রমকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইলে তাহারা যে সকল বিভিন্ন জ্ঞানের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আইসে, তাহাদিগকেও শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয়।

আমাদিগের যুক্তি-নিরপেক্ষ জ্ঞানের মধ্যে দুইটি জ্ঞানের নাম কাহারও প্রায় অবিদিত নাই। একটি বহির্জ্ঞান (Perception) আর একটি স্মৃতি। যখন আমরা আমাদের সম্মুখে কোন পদার্থকে দেখিতে পাই, কিম্বা, আমাদের অতীত জীবনের কোন ঘটনাকে মনে আনি, তখন আমাদের যে জ্ঞানক্রিয়া হয়, তাহাকে অব্যবহিত বলা যায়—তাহার মধ্যে আর কোন কিছুরই ব্যবধান নাই।

তথাপি এই দুই প্রকার জ্ঞান-ক্রিয়ার মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রথম স্থলে আমরা যে প্রণালীতে জানি তাহাকে আবির্ভাবের প্রক্রিয়া কহে (Presentative process) তাহাই ঐন্দ্রিয়িক বহির্জ্ঞান (Sense perception)। দ্বিতীয় স্থলে আমরা যে প্রণালীতে জানি তাহা পুনরাবির্ভাবের প্রক্রিয়া (Representative process) অর্থাৎ তাহাই স্মৃতি। একটি স্থলে, আমাদের জ্ঞেয়-বিষয় জ্ঞান বৃত্তির সম্মুখে সাক্ষাৎরূপে আবির্ভূত হয়, আর এক স্থলে আমরা তাহাকে স্মৃতির বলে সেখানে পুনরানীত করি।

যে সকল জ্ঞান অব্যবহিত, প্রত্যক্ষ, কিম্বা সতঃসিদ্ধ বলিয়া আমাদের মনে হয়, তৎসমস্তকে চারিটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা:—অন্তর্দৃষ্টি—বা অনুভব, প্রত্যক্ষ বহির্জ্ঞান, স্মৃতি ও বিশ্বাস। দার্শনিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে যদিও তাহাদের কাহাকেও একেবারে অব্যবহিত বলা যায় না, তথাপি আমাদের সুবিধার জন্য সহজভাবে

এইরূপ শ্রেণীবদ্ধই করা গেল। এই চারি প্রকার জ্ঞানের অনুরূপ চারি প্রকার বিভ্রম আছে। এক্ষণে ঐন্দ্রিয়িক বহির্জ্ঞান-ঘটিত বিভ্রমের বিষয় আলোচনা করা যাউক। ইন্দ্রিয়িক বহির্জ্ঞানের ভ্রম নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে উহার প্রকৃতি কি তাহা আমাদের জানা আবশ্যক।

গ্রীষ্মকালে যখন কোন ব্যক্তি একটি প্রবহমানা স্রোতস্বিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার মধুর স্নিগ্ধতা উপলব্ধি করেন, তখন তিনি বাস্তবিক কি করেন?—তিনি যাহা বাস্তবিক দেখেন তাহার উপর কল্পনার কিছু যোগাযোগ করিয়া আর একটা কিছু গড়িয়া তোলেন। তাঁহার চক্ষে যে ছবি প্রতিভাত হয়—তাহাতে তিনি তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা যোগ করিয়া দেন। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানক্রিয়ায়, মন খানিকটা ইন্দ্রিয়-বোধের উপকরণের উপর কাজ করে। পূর্ব্বে নদীর জল স্পর্শ করিয়া নদীতে অবগাহন করিয়া নদী-সম্বন্ধে যে সকল ভাব তাহার মনে সঞ্চিত ছিল, নদীর দর্শনমাত্রেই তিনি সেই সকল ভাব, ইন্দ্রিয়-আনীত উপকরণের সহিত যোগ করিয়া দিলেন—তিনি নদীর মধুর স্নিগ্ধতা উপলব্ধি করিলেন।

আমাদের মনে যখন কোন ইন্দ্রিয়-বোধ উপস্থিত হয়, তখন তাহার প্রতি আমরা যদি মনোযোগ না দিই, তাহা হইলে সেই বোধ স্পষ্ট জ্ঞানে পরিণত হয় না। কোন ইন্দ্রিয় বোধের উপর যখন মনোযোগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পতিত হয়, তখনই সেই বোধ বলবৎ ও স্পষ্ট হইয়া উঠে। কোন একটি ইন্দ্রিয়বোধের প্রতি মনোযোগ দিয়া আমরা অন্যান্য বর্ত্তমান ও অতীত ইন্দ্রিয়বোধের সহিত তাহার প্রভেদ নিরূপণ করি, এবং পূর্ব্বোপলব্ধ তৎসদৃশ ইন্দ্রিয়বোধ-সমূহের সহিত এক শ্রেণীতে উহাকে শ্রেণীবদ্ধ করি। যথা, যখন আমাদের নেত্রে নারাঙ্গিলেবুর রং প্রতিভাত হয়—তখন সেই রঙের প্রতি মনোযোগ দিয়া আমরা কি করি?—না, লাল পীত প্রভৃতি অন্যান্য পূর্ব্বানুভূত রং হইতে তাহাকে পৃথক করি, এবং

যখন এই রঙ্গের বিশেষত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহাকে নারাঙ্গি আখ্যা প্রদান করি, তখন স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে আমরা পূর্ব্বানুভূত নারাঙ্গি-ঘটিত অনুভাব-সকলের সহিত ইহার যোগ সম্পাদন করি মাত্র। আমরা যখন কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, তখন সেই ইন্দ্রিয়-বোধের সহিত সেই বস্তু-ঘটিত পূর্ব্বোপলব্ধ অতীত ইন্দ্রিয়বোধের ছবিগুলি সংমিশ্রিত করি, আমাদের পূর্ব্বার্জ্জিত অভিজ্ঞতা-সকল তাহাতে যোগ করিয়া দিই। যখন দৃষ্টিমাত্র কোন বস্তুর আকৃতি ও দূরত্ব আমরা উপলব্ধি করি, তখন পূর্ব্বে সেই বস্তুকে নাড়িয়া চাড়িয়া, সেই বস্তু-সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম, সেই অভিজ্ঞতা আমাদের নেত্র-প্রতিভাত ছবিতে যোগ করিয়া দিই মাত্র। পূর্ব্বার্জ্জিত ইন্দ্রিয়-বোধ-সমূহের সংযোগের উপর যদি আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নির্ভর করে, তাহা হইলে যুক্তিপ্রণালী হইতে এই জ্ঞান-ক্রিয়ার এমনই কি প্রভেদ? সেই জন্যই Helmholtz স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, দূরত্বের জ্ঞান কি?—না, উহা আমাদের অ-জ্ঞানকৃত অনুমান কিংবা যন্ত্রবৎ-পরিচালিত বিচারক্রিয়ামাত্র। (an unconscious inference or a mechanically performed act of judgment)

যখন আমরা কোন বস্তুকে দেখিয়া চিনি, তখন এই দৃষ্টি-জ্ঞান-ক্রিয়াটিতে কিরূপ ভ্রম-পরম্পরা দৃষ্ট হয়? প্রথমতঃ, কোন বিশেষ আকার-প্রকার-বিশিষ্ট এবং কিয়দ্দূরে অবস্থিত কোন জড়-পদার্থের গঠন আমরা দেখিতে পাই; অর্থাৎ আকাশ-ঘটিত গুণবিশিষ্ট কোন একটি সামান্য স্পৃশ্য পদার্থকে আমরা উপলব্ধি করি। ইহাই সাদাসিধা দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষ জ্ঞানক্রিয়া। এই ক্রিয়াটি সর্ব্বাপেক্ষা যান্ত্রিক ও চকিতোৎপন্ন; আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বদ্ধমূল।

প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বিতীয় ক্রম কি?—না, যখন কোন পদার্থকে, কোন এক পদার্থ-শ্রেণীর অন্তর্ভূত বলিয়া চিনিতে পারি। কোন একটি লেবুকে

আমরা যখন নারাঙ্গি লেবু বলিয়া চিনি, তখন তাহার আস্বাদ প্রভৃতি আরও কতকগুলি বিশেষ গুণ আমরা উপলব্ধি করি। দূরত্ব আকার প্রভৃতি যত সহজে আমাদের মনে আইসে, এই শ্রেণীগত বিশেষ গুণ আমরা তত সহজে নির্ব্বাচন করিতে পারি না—এই প্রক্রিয়াতে বুদ্ধি বিবেচনার একটু যেন বেশী আবশ্যক বোধ হয়। কোন একটা রং কিম্বা শুদ্ধ একটা আকার চেনা অপেক্ষা এই প্রক্রিয়াটিতে অধিকতর জটিলতা আছে।

তাহার পর, যখন আমরা কোন বস্তুবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষকে চিনিতে যাই, তখন এই প্রক্রিয়াতে সর্ব্বাপেক্ষা কম যান্ত্রিকতা ও অধিক বুদ্ধি-বিবেচনার কার্য্য লক্ষিত হয়। আমরা যখন আমাদের অত্যন্ত পরিচিত বন্ধু রাম কিংবা শ্যামকে চিনি,তখন আমরা তাড়াতাড়ি তাহাদের বিশেষ চিহ্নগুলি আমাদের মনোমধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লই।

এই প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্রিয়া-ভেদ আর একরূপে নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। এই জ্ঞানক্রিয়ার প্রণালীটিকে দুই সোপানে বিভক্ত করা যায়—একটি ভোক্তৃভাবাত্মক (Passive) আর একটি কর্ত্তৃ-ভাবাত্মক (Active); একটি সোপানকে পূর্ব্বপ্রত্যক্ষজ্ঞান এবং অপর সোপানটিকে শুদ্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞান বলা যাইতে পারে। প্রথমটিতে মনের কর্ত্তৃভাব ততটা দৃষ্ট হয় না—অনুষঙ্গের প্রসিদ্ধ নিয়মানুসারে পূর্ব্বোপলব্ধ জ্ঞানের অনুরূপ প্রতিমা-সকল মনোমধ্যে আপনা হইতে জাগিয়া উঠে মাত্র। এইরূপে চিৎ-প্রতিমাগুলি একবার উদ্বোধিত হইলে তাহার উপর মনের কর্ত্তৃ-প্রভাব প্রযুক্ত হয়। এই প্রভাবের বলে ঐ প্রতিমা-গুলি আরও সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়; যাহা পুনরাবির্ভাবিক অবস্থায় ছিল তাহাকে আবার সাক্ষাৎ আবির্ভাবিক অবস্থায় পরিণত করা হয়। আমাদের অনেকগুলি চকিতোৎপন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞানক্রিয়ায় এই দুই সোপানের প্রভেদ বড় একটা লক্ষ্য হয় না। অনেক স্থলে কোন বস্তুর

আকার ও দূরত্ব এত শীঘ্র আমরা উপলব্ধি করি যে, এই দুই সোপানের ক্রম নিরূপণ করা একেবারে অসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু কোন পদার্থকে যখন আমরা শ্রেণীবদ্ধ করি, কিংবা কোন বস্তুবিশেষকে সেই বস্তু বলিয়া নির্দ্ধারণ করি, তখন তদ্বিষয়ক জ্ঞানের প্রথম আভাস ও তৎসম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ জ্ঞান—এই উভয়ের মধ্যে একটা কাল-ব্যবধান দৃষ্ট হয়। প্রথমে উদ্বোধনের (Suggestion) প্রক্রিয়ায় কতকগুলি চিৎ-প্রতিমার আভাস আমাদের মনোমধ্যে উপস্থিত হয়—এবং শেষে সেই আভাস-সকল হঠাৎ যেন বিদ্যুৎপ্রভায় আলোকিত হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে।

প্রত্যক্ষজ্ঞানের ভ্রম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষজ্ঞান কি, তাহাই আমরা আলোচনা করিলাম।

ইন্দ্রিয়-বিভ্রম কাহাকে বলে এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রকৃতি কি, তাহাও ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে, কি কারণে এই সকল ইন্দ্রিয়-বিভ্রম উপস্থিত হয় তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

প্রথমতঃ দেখা যায়, বহির্ব্বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার সময় যদি আমাদের মনোযোগের অভাব হয়, তাহা হইলে সেই বাহ্য বিষয়ের প্রতিবিম্ব আমাদের ইন্দ্রিয়-মুকুরে অতি অস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়—এবং এই অস্পষ্টতা-নিবন্ধন আমরা কখন কখন ইন্দ্রিয়-বিভ্রমে পতিত হই। এই কারণ বশতঃ একজন ভীরু ব্যক্তি, একটা কিছু হঠাৎ দেখিয়া "ভূত" বলিয়া মনে করে, কারণ সে তাহার ভয়-বিহ্বলতা-প্রযুক্ত সেই বাহ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্নিগ্ধ-মস্তিষ্ক ও ধীর-প্রকৃতি সে এরূপ ভ্রমে সহজে পতিত হয় না। অনেক সময়ে, আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রতিবিম্ব-সকলের (Sense impression) যথার্থ শ্রেণী নিরূপণ করিতে পারি না বলিয়াই—তাহাদিগকে ঠিক চিনিতে পারি না বলিয়াই আমরা ভ্রমে পতিত হই। যাহার সহিত

আমরা বিশেষরূপে পরিচিত নই—এরূপ নূতন কোন ইন্দ্রিয়-বোধ আমাদের উপস্থিত হইলে আমরা সেই বোধটিকে কল্পনায় অনেক সময় অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলি। আমাদের পূর্ব্বানুভূত কোন ইন্দ্রিয়-বোধের সহিত এই নবানুভূত ইন্দ্রিয়-বোধটিকে এক শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারি না বলিয়াই আমরা স্বভাবতঃ ইহার তীব্রতা ও পরিমাণকে আমাদের কল্পনায় অতিরঞ্জিত করি। তাহার দৃষ্টান্ত, আমাদের শরীরের এমন কোন অংশে যদি আমরা কোন লঘু বন্ধন পরিধান করি, যে অংশে সচরাচর কোন বাধা বন্ধন থাকে না—তাহা হইলে সে বন্ধন অত্যন্ত লঘু হইলেও, আমাদিগের নিকট অত্যন্ত গুরুভার বলিয়া মনে হয়। আমাদের একটি দাঁত পড়িয়া গেলে মুখমধ্যে যেন একটা বৃহৎ গহ্বর হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে যে একটা অদ্ভুত ভাব অনুভূত হয়, ইহাও তাহার আর এক দৃষ্টান্ত। আমাদের ভাষায় যে একটি চলিত কথা আছে—"অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চচ্চড় করে"—তাহার মূলেও উপরিউক্ত তত্ত্বটি নিহিত। কখন কখন স্বপ্নে যাহা বাস্তবিক তাহা অপেক্ষা বেশী মাত্রায় কেন আমরা অনুভব করি তাহাও কতকটা এই তত্ত্বানুসারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে, যে সকল ইন্দ্রিয়-প্রতিবিম্ব অস্পষ্টরূপে আমাদের মনোমধ্যে প্রতিভাত হয়, তাহাদিগকে প্রায়ই আমরা অযথারূপে শ্রেণীবদ্ধ করি। কোন একটি বিশেষ বর্ণঘটিত কিংবা আকারঘটিত আমাদের কোন ইন্দ্রিয়বোধ যদি অস্পষ্ট হয়, তাহা হইলে অন্য ইন্দ্রিয়বোধের সহিত তাহা অনায়াসে মিশিয়া যায় এবং এইরূপে স্বভাবতই ভ্রমের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এইরূপে দূরস্থিত বস্তু-সকলের যে সকল প্রতিবিম্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর প্রতিভাত হয়, প্রায়ই আমরা তাহাদের অযথা ব্যাখ্যা করিয়া থাকি।

আমাদের চক্ষু কোন একটি পদার্থের প্রতি স্থিরভাবে প্রযুক্ত না

হইলেও যদি তাহাতে সেই পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রতিবিম্ব অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যদি সেই পদার্থটি দৃষ্টিপথের কিঞ্চিৎ অনুপযোগী দূরে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে এই অস্পষ্টতা আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় যদি ঐ অস্পষ্ট প্রতিবিম্বের প্রতি আমরা সহসা মনোযোগ দি, তাহা হইলে আমরা ঐ পদার্থকে ঠিক বুঝিতে পারি না, সহজেই ভ্রমে পতিত হই। Sir David Brewster তাঁহার "Letters on natural magic" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, যখন আমরা জানালার মধ্য দিয়া কোন বাহিরের বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন যদি সেই জানেলার শার্শির উপর কোন মাছি দেখিতে পাই, তখন সেই মাছিকে বাস্তবিক অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া আমাদের মনে হয়—মনে হয় অনেক দূরে যেন একটি পাখী রহিয়াছে। Weber পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কম্পাস নামক পরিমাপ-যন্ত্রের দুইটি শলাকা একটু ফাঁক করিয়া ধরিয়া তাহাদের অগ্র-বিন্দুদ্বয় শরীরের কোন অংশে সংলগ্ন করিলে দুইটি শলাকাই পৃথক্‌রূপে অনুভব করা যায়—আবার শরীরের আর কোন অংশবিশেষে সংলগ্ন করিলে একটি শলাকা বলিয়াই অনুভব হয়। ইহার কারণ কি? এরূপ কি বলা যায় না যে—আমরা তখন দুইটি শলাকারই স্পর্শ আসলে অনুভব করি, কিন্তু ঐ অনুভবদ্বয় এত এক রকমের যে, উহাদের পার্থক্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না,—দুইটি অনুভব পরস্পরের সহিত মিশিয়া যায়, ক্রমাগত মনোযোগ দিতে দিতে আবার দুইটি শলাকার পার্থক্য আমরা অনুভব করি। এক্ষণে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে, আমাদিগের এই যে ইন্দ্রিয়বোধ ইহার কতখানিই বা বিশেষ প্রকারের স্নায়বীয় উত্তেজনার ফল, এবং কতখানিই বা মনোযোগ, বিচার-শক্তি প্রভৃতি উচ্চতর মনোবৃত্তির ক্রিয়া? পূর্ব্বোক্ত কম্পা-সের শলাকাদ্বয়ের পার্থক্য যদি খুব মনোযোগ দিলেও আমরা উপলব্ধি

করিতে না পারি, তাহা হইলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, দুইটি শলাকার স্পর্শ-জনিত দুইটি অনুভব একরকমের বলিয়া যে পরস্পর মিলিয়া যায় এবং সেই জন্যই যে আমাদের ভ্রম হয় এরূপ নহে, প্রত্যুত স্থানীয় স্পর্শ-শক্তির সীমার প্রতি লক্ষ্য না করায়, আমরা ঐ অনুভবের অযথা ব্যাখ্যা করিয়া এই ভ্রমে পতিত হই। স্পর্শ-শক্তির সীমা কি এইখানে তাহার একটু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। শরীরিক কোন অংশের অল্প পরিসরের মধ্যে কোন দুইটি বস্তু একসঙ্গে স্পৃষ্ট হইলে, সেই বস্তুদ্বয় এক বলিয়া আমাদের অনুভব হয়। ত্বকের এক একটি অংশ-বিশেষের নির্দ্দিষ্ট পরিসর আছে, তাহার মধ্যে বহু বস্তু স্পৃষ্ট হইলেও আমরা একটি স্পর্শ মাত্র অনুভব করি। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানের মধ্যে সেই বস্তুদ্বয় আমাদের ত্বকে স্পৃষ্ট হইলে তবে আমরা তাহাদের পার্থক্য অনুভব করি। ইহা আমাদের স্নায়ুর একটি বিশেষ ধর্ম্ম।

ইন্দ্রিয়-প্রতিবিম্ব-সকলের এইরূপ অযথা ব্যাখ্যা করিয়া আমরা যে-সমস্ত ভ্রমে পতিত হই তাহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ কোন একটি বাহ্য বিষয় ইন্দ্রিয়ে প্রতিভাত হইলে, হয় অনুষঙ্গ-নিয়মের সাহায্যে তাহার একটি প্রতিমা আমাদের মনোমধ্যে উদিত হয়—নয় পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ-জ্ঞানের (Preperception) প্রক্রিয়া-অনুসারে একটি প্রতিমা আমরা মনোমধ্যে সৃজন করি। কাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে যদি কখন প্রতিধ্বনি উপস্থিত হয়, তখন হঠাৎ আমাদের এইরূপ মনে হয় যেন আর একজনের কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাইতেছি ; কারণ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর দ্বিতীয় বার শব্দ আহত হওয়ায়, অনুষঙ্গের নিয়মানুসারে কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বরের প্রতিমা আমাদের কল্পনায় আপনা হইতেই উদিত হয়। পক্ষান্তরে, যখন ভূতের গল্প শুনিয়া কোন ব্যক্তির কল্পনা অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া উঠে, তখন হয়তো সে অতি পরিচিত দ্রব্যসামগ্রীকেও ভূত মনে করিয়া ভ্রমে পতিত

হয় ; কারণ সেই সময়ে এই প্রকার কাল্পনিক প্রতিমা স্থজন করিবার দিকে তাহার মনের গতি স্বভাবতঃই প্রবল হইয়া উঠে। প্রথম শ্রেণীর বিভ্রমগুলি যাহা বাহির হইতে উৎপন্ন হয়—ইন্দ্রিয়-প্রতিবিম্বই তাহাদের সূত্রস্থান। এই প্রক্রিয়ায়, সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়বোধই সর্ব্বেসর্ব্বা, পূর্ব্ব-প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ইহার শাসনাধীন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিভ্রমগুলি অন্তর হইতে—কল্পনার অন্তঃ-স্ফূর্ত্ত নিজস্ব উদ্যম হইতে উৎপন্ন হয়। প্রথমোক্ত স্থলে মন অপেক্ষাকৃত ভোক্তৃভাবাপন্ন এবং দ্বিতীয়োক্ত স্থলে মন অপেক্ষাকৃত কর্ত্তৃভাবাপন্ন অবস্থায় থাকে ; এই দ্বিতীয়োক্ত স্থলটিতে ইন্দ্রিয়-প্রতি-বিম্বের উপর মন সাক্ষাৎভাবে কার্য্য করে।

এক্ষণে ভোক্তৃভাবগত বিভ্রমের বিষয় আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ আমাদের স্নায়বীয় গঠনপ্রণালীর বিশেষত্ব-অনুসারে আমাদের ইন্দ্রিয়-চেতনার (sensibility) কিরূপ তারতম্য উপস্থিত হয় ও সেই চেতনা-শক্তির কতদূর সীমা তাহাই এখানে বিবৃত করা যাইতেছে।

ইহা জানা কথা যে, বাহ্য উত্তেজকের যতখানি তীব্রতা ও পরিমাণ ঠিক তাহারই অনুপরূপ উত্তেজিত ইন্দ্রিয়-বোধের তীব্রতা ও পরিমাণ সকল সময়ে দৃষ্ট হয় না। কোন ইন্দ্রিয়বোধ জন্মিবার পূর্ব্বে কতকটা উত্তেজনার আবশ্যক হয়। অনেক সময়ে আমাদের মনোযোগের অভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তেজনাগুলির অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না, এবং ইহা হইতেই এক শ্রেণীর বিভ্রম উৎপন্ন হয়। ট্রেণ ছাড়িবার সময়, কখন্ ট্রেণ ছাড়িবে বলিয়া ঔৎসুক্যের সহিত যখন আমরা নিরীক্ষণ করি, তখন উহা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া কখন কখন আমাদের ভ্রম উপস্থিত হয়। তাহার কারণ এই যে, যে সময়ে আমরা ঔৎসুক্যের সহিত উহার গতিপথ নিরীক্ষণ করিতে থাকি, তখন আমাদের অজ্ঞাতসারে চক্ষের পেশী-সকল ঈষৎ সঞ্চালিত হয়, এবং এইরূপে অজ্ঞাতসারে আমাদের চক্ষু-পেশী-সমূহে গতি উপস্থিত

হওয়ায়, আমাদিগের ঔৎসুক্যজনিত কল্পনা উত্তেজিত হয় এবং আমাদের মনে হয় যেন সত্যই ট্রেণটি চলিতেছে। এই প্রকার বিভ্রম শুধু ইন্দ্রিয়-ঘটিত নহে, ইহাতে কল্পনারও উপাদান আছে। স্পিরিচুয়ালিষ্টগণ যে উপায়ে টেবিল সঞ্চালন করেন, বোধ হয় তাহার মূলে এই তত্ত্বটি নিহিত। টেবিল-সঞ্চালকগণ প্রতিক্ষণ মনে করেন যে এইবার টেবিল চলিবে এবং একটু একটু করিয়া কতকটা পৈশিকশক্তি তাহার উপর অজ্ঞাতসারে প্রয়োগ করেন।

আমাদের দুইটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়বোধ অনেক সময়ে মিশিয়া গিয়া আমাদের নিকট একটি বলিয়া মনে হয়। কম্পাসের দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। অনেকে বোধ হয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, স্নান করিয়া গামছা দিয়া মাথা রগড়াইবার পর চুলে জল না থাকিলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভিজা-ভিজা বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ কি? Helmholtz ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। আমরা যাহাকে আর্দ্র কিম্বা ভিজাভাব বলি তাহা মিশ্রভাব। শীতাতপ-বোধ ও প্রকৃত স্পর্শবোধ এই উভয় বোধই উহার মধ্যে জড়িত। এই দুইটি বোধ, প্রায় একত্রে উপস্থিত হয় বলিয়া আমরা উহাদিগকে মিশাইয়া এক করিয়া ফেলি। আমরা যে, দুই চক্ষু দিয়া এক বস্তু দর্শন করি ইহাও এই সংমিশ্রণের অন্যতর দৃষ্টান্ত। ইন্দ্রিয় উত্তেজনার আর একটি নিয়ম এই যে, কোন উত্তেজকের ক্রিয়া স্থগিত হইলেও তাহার আভাস কিছু কালের জন্য আমাদের অনুভবে থাকিয়া যায়। এইরূপ "পশ্চাৎ-অনুভব"-নিবন্ধন আমাদের কখন কখন বিভ্রম উপস্থিত হয়। আমাদের মনে হয় যেন সেই উত্তেজক পদার্থ এখনও কার্য্য করিতেছে। কোন শিশুর ক্রন্দন থামিলেও আমাদের মনে হয় যেন সে এখনও কাঁদিতেছে। অনেক দিন পর্য্যন্ত আঙ্গুলে আংটি পরিয়া তাহার পর যদি খুলিয়া ফেলা যায় তখনও সেই আঙ্গুলে আংটি আছে বলিয়া অনেক সময়ে আমাদের

ভ্রম হয়। কোন উত্তেজক পদার্থ অপসৃত হইবার পরেও যে আমাদের কোন স্নায়বীয় গঠনে পূর্ব্ব-উত্তেজন-জনিত কম্পন কিছু কালের জন্ম স্থায়ী হয়, এই তথ্যটি হইতে আর একটি বিষয়ের তথ্য জানা যায়। যখন দুইটি বিচ্ছিন্ন উত্তেজনা একটির পর আর একটি ক্রমান্বয়ে দ্রুত উপস্থিত হয়, তখন এই দুইটি উত্তেজনা স্বতন্ত্র হইলেও আমাদের নিকট অবিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই তথ্যটি হইতে অনেক প্রকার দৃষ্টিবিভ্রম উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন রঙের ঘের-দেওয়া একটি লাঠিম যখন খুব ঘুরিতে থাকে, তখন এই কারণেই উহার বিভিন্ন রংগুলি এক বলিয়া মনে হয়; একটি জ্বলন্ত চালা-কাঠ যখন দ্রুত ঘুরানো হয় তখন তাহাকে একটি আলোক-চক্র বলিয়া আমাদের মনে হয়। বাজিকরেরা যে অনেক প্রকার হাতের চালাকি দেখায় তাহার অনেকগুলি, এই তথ্যানুসারে কতকটা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কোন দুইটি কার্য্য কিংবা দুইটি ঘটনা-শ্রেণী,—যাহার প্রতি বাজিকর দর্শকের মনকে বিশেষ রূপে আকৃষ্ট করে,—সেই দুইটি কার্য্য কিম্বা ঘটনা-শ্রেণী যদি একটির পর আর একটি দ্রুত উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে অত্যল্প ব্যবধান থাকা হেতু তাহাদিগকে অবিচ্ছিন্ন বলিয়া দর্শকের ভ্রম হয়—সে কিছুতেই মনে করিতে পারে না যে, ঐ উভয় ক্রিয়ার মধ্যে আর কোন তৃতীয় ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আমাদের ইন্দ্রিয়-চেতনাশক্তির আর একটি সীমা আছে—ইহা উপরোল্লিখিত তথ্যটির সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদিগের স্নায়বীয় উত্তেজনার আর একটি নিয়ম এই যে, কোন স্নায়বীয় গঠন ক্রমাগত উত্তেজিত হইলে, আমাদের মনের উপর তাহার ফল ক্রমেই ক্ষীণতর হইতে থাকে এবং যদি কোন উত্তেজকের ক্রিয়া সর্ব্বদাই চলিতে থাকে, তাহা হইলে কালক্রমে আমরা তাহা আর উপলব্ধি করিতে পারি না। তাহার দৃষ্টান্ত, একটা ঘানি-কলের কাছে যদি আমাদের বসতি হয়, আর

তাহার শব্দ যদি আমরা ক্রমাগত শুনি, তাহা হইলে ঐ শব্দ ক্রমে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়া পড়ে। এই তথ্যটি হইতে আমাদের কোন কোন বিভ্রমের সূত্রপাত হয়। কতকটা শব্দপ্রবাহ-সত্ত্বেও আমরা কখন কখন মনে করি—যেন চতুর্দ্দিকে সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করিতেছে।

আমাদের ইন্দ্রিয়-চেতনাশক্তির আর একটি সীমার বিষয় এখানে বলা আবশ্যক। আমাদিগের স্নায়ু-সমূহের এক একটি বৈশেষিক শক্তি আছে। উত্তেজকের প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন, কোন-একটি বিশেষ স্নায়ু কোন একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সকল সময়ে একইরূপে কার্য্য করে। আমাদের নেত্রস্নায়ু, আলোকদ্বারাই হউক, চাপের দ্বারাই হউক, কি বৈদ্যুতিক প্রবাহের দ্বারাই হউক, যে কোন প্রকারেই উত্তেজিত হউক না—সেই একই ফল উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ আলোক দেখিতেছি বলিয়া আমাদের অনুভব হয়। সাধারণতঃ আমাদের এক একটি স্নায়ুর এক একটি বিশেষ উত্তেজক আছে। সচরাচর আমাদের চক্ষুর স্নায়ু আলোক দ্বারাই উত্তেজিত হয় বলিয়া আমাদের শারীরিক প্রকৃতিতে এমনি একটি অভ্যাস বদ্ধমুল হইয়া গিয়াছে যে, চক্ষুস্নায়ু আর কোনরূপে উত্তেজিত হইলেও আমাদের মনে হয় আলোকের দ্বারাই বুঝি উত্তেজিত হইতেছে। এই হেতু, আমাদের চক্ষুগোলকের পশ্চাদ্ভাগ টিপিয়া ধরিলে আমরা আলোক-চক্র দেখিতে পাই; উহা আমাদের মনের একটা অনুভব মাত্র —বাহ্য আলোক তাহার উৎপাদক নহে।

——o——

নীলের-বাণিজ্য।

নীল বাণিজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের একটি বিশেষ শিক্ষা লাভ হয়। উদ্ভিজ্জ হইতে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে এবং তাহার বাণিজ্য-ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিতে হইলে শুধু যে জল-বায়ুর উপযোগিতা দেখিতে হইবে এরূপ নহে, কৃষক ও কারখানা-ওয়ালাদিগের উদ্যম ও নৈপুণ্যের উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। চাউল, তূলা, চিনি প্রভৃতির ন্যায় নীলও আমাদের দেশের একটি প্রাকৃতিক দ্রব্যজাত—ভারতবর্ষই উহার আদিম উৎপত্তি-স্থান। অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশ হইতে নীল যে অন্য দেশে যাইত তাহার প্রমাণ, Pliny, Arrian প্রভৃতির গ্রন্থে নীলের নাম Indicum বলিয়া উল্লেখ আছে; এই ইণ্ডিকম হইতে ক্রমে ইণ্ডিকো এই কথাটি চলিত হয়—এক্ষণে য়ুরোপীয় বাণিজ্যে ঐ দ্রব্য ইণ্ডিগো নামে খ্যাত। পূর্ব্বে য়ুরোপে Woad নামক একপ্রকার নীলোৎপাদক উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে, য়ুরোপে ভারতবর্ষীয় নীলের এত কাটিং হয় যে তাহাতে য়ুরোপ-জাত "ওয়োডের" বাণিজ্য অনেকটা কমিয়া যায়—এবং এই হেতু ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নীলের বাণিজ্য নিষিদ্ধ করিয়া এক রাজাজ্ঞা প্রচার হয়। তখন নীলকে ভুতুড়ে রং (Devil's dye) বলা হইত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাহাদিগের বাণিজ্যের প্রথম শতাব্দীতে যে সকল দ্রব্য আমাদের দেশ হইতে য়ুরোপে চালান করিতেন, তাহার মধ্যে নীল একটি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য দ্রব্যজাতের ন্যায় নীল বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট হইলেও প্রস্তুত করিবার সময়ে ও বাক্সবন্দি করিবার সময়ে অযত্ন ও অনবধানতা-প্রযুক্ত তাহার মূল্যের হ্রাস হইত। নীলবড়ির বহির্ভাগে বালি ও ময়লা না থাকে তজ্জন্য কোম্পানীর

কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদিগের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে পুনঃপুনঃ সতর্ক করিয়া পাঠাইতেন।

ক্রমে ওয়েষ্ট ইণ্ডিস ও উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ অংশের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকেরা সেই সেই দেশে নীলের চাষ ও কারখানাকার্য্যের প্রতি বিশেষরূপে মনোযোগ দেওয়ায় তত্রত্য নীল ভারতবর্ষীয় নীল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। সুতরাং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে নীল আমদানী বন্ধ করিয়া দিলেন।

পক্ষান্তরে, ফরাসিরা তাহাদিগের নিজ উপনিবেশ সেণ্ট ডোমিঙ্গোতে নীলের চাষ ও কারখানা-কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহার বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল। তৎকালে পোর্টুগীজেরা সেই নীল ব্রেজিলে এবং স্পেনীয়েরা মেক্সিকোতে লইয়া যাইত। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রিটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ার প্রায় সমস্ত নীলকরেরা নীলের চাষ পরিত্যাগ করে। সেই অবধি, গ্রেটব্রিটেন ও অবশিষ্ট সমস্ত য়ুরোপে, স্পেনীয় ও ফরাসিরা নীলের যোগান দিত। উহারা তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নীল প্রস্তুত করিত।

কিন্তু ১৭৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যাহাতে ভারতবর্ষীয় নীল অধিক পরিমাণে জন্মে ও উৎকৃষ্ট হয় তাহার প্রতি আবার বিশেষরূপে মনোযোগ দিলেন। প্রিন্সেপ সাহেব প্রভৃতি চুক্তিদারগণ তাঁহাদিগকে নীল যোগাইবেন বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত একটা চুক্তি করেন। কিন্তু যে সকল নীল ভারতবর্ষ হইতে চালান হইত তাহাতে লাভ না হইয়া গড়ে প্রায় আশি হাজার টাকা ক্ষতি হইল। কিন্তু এই ক্ষতিতেও তাঁহারা নিরুৎসাহ হইলেন না। বরং ইহা হইতে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ লাভের পথ উন্মুক্ত হইল। ওয়েষ্ট-ইণ্ডিয়া-প্রণালী-অভিজ্ঞ য়ুরোপীয়েরা বঙ্গদেশে আসায়, নীল-কারখানা-কার্য্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। এমন কি Boyce সাহেব ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে

যে নীল পাঠাইয়াছিলেন তাহা স্পেনীয় নীলের সমান হয়। কোম্পানী দেখিলেন, ভারতবর্ষে যে উৎকৃষ্ট নীল উৎপন্ন হইতে পারে না এমন নহে। তাঁহারা সঙ্কল্প করিলেন, তিন বৎসরের জন্য তাঁহারা নীল ক্রয় করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন। তাঁহারা মনে করিলেন, ইহার ফল এই হইবে যে, কোম্পানীর প্রতিযোগিতা উঠিয়া গেলে ব্যক্তি-বিশেষদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইবে এবং "ইহার দ্বারা এই দ্রব্য যতদূর সম্ভব পূর্ণতায় আনীত হইবে ;" সেই সঙ্গে, কত কম মূল্যে নীল প্রস্তুত হইতে পারে তাহাও নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে।

উৎকৃষ্ট পদ্ধতি-অনুসারে কিরূপে নীল প্রস্তুত করিতে হয় কোম্পানী তাঁহাদিগের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের প্রতি ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন, এবং অন্য দেশের উৎকৃষ্ট নমুনা এবং ভারতবর্ষ-প্রেরিত নীল-সম্বন্ধে বিলাতী দালালদিগের রিপোর্ট তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত ১৭৮৯ ও ১৭৯০ এই দুই বৎসরের জন্য শুল্ক রহিত করিলেন এবং জাহাজভাড়াও কমাইয়া দিলেন। আরও কোম্পানী কতকগুলি নীল কারখানাওয়ালাদিগকে বেশি বেশি করিয়া টাকা দাদন দিতে লাগিলেন।

এই সকল উপায় অবলম্বন করিবার পরে, অতি অল্প কালের মধ্যেই ভারতবর্ষীয় নীল সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। মার্কিন, ফরাসি ও স্পেনীয় নীল—সমস্তই ভারতবর্ষীয় নীলের নিকট নতমুখ হইল। ক্রমশঃ ভারত-বর্ষীয় নীলের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়া একাধিপত্য লাভ করিল।

নীলের উন্নতি-সাধনে য়ুরোপীয়েরা এখনও পর্য্যন্ত ক্ষান্ত নহেন। সম্প্রতি Mons. P. J. Michea নীল তৈয়ারীর যে একটি নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত করিয়াছেন এবং তাহার পেটেণ্ট লইয়াছেন তাহা যশোহর কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের য়ুরোপীয় কারখানায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই নূতন পদ্ধতিটি আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছে—যে যে কারখানার এই

পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেখানকার মাল কোন কোন স্থলে শতকরা ৩০ কিম্বা ৪০ ভাগ পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়াছে। সেই পদ্ধতিটির স্থূল মর্ম্মগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে :—

১। চারা হইতে রঙ্গীণ পদার্থ বাহির করিবার নিমিত্ত নীল-জল আলোড়ন করিয়া যে গাঁজ বাহির করা হয়, সেই গাঁজ আরও উত্তেজিত ও বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত এক প্রকার গাঁজ-পদার্থ (Yeast) ব্যবহৃত হইয়া থাকে—(এই পদ্ধতি অনুসারে শতকরা ১০ হইতে ১৫ ভাগ অধিক মাল উৎপন্ন হয়।)

২। পচন-হাউজ হইতে গাজ্‌নি-হাউজে নীল-জল প্রবাহিত হইবার পরেও নীলের ছিবড়ায় যে কিছু রস অবশিষ্ট থাকে তাহাও কোন উপায়ে পুনর্ব্বার বাহির করিয়া লওয়া হয়। ইহাতেও প্রায় শতকরা ৫ ভাগ পরিমাণ মালের বৃদ্ধি হয়।

৩। গাজন-হৌজে গাজনের পর যাহাতে নীলের রঙ্গীণ পদার্থ তলায় সহজে থিতিয়া পড়ে তাহার সুবিধার নিমিত্ত Neutral alum salt অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। জল নির্গমনের সঙ্গে যে কতকটা মাল বাহির হইয়া গিয়া নষ্ট হয়—সেই মাল আর বাহির হইতে পারে না—সুতরাং শতকরা ৮ হইতে ১০ ভাগ আন্দাজ মাল বাঁচিয়া যায়।

৪। হাওয়া ঠাণ্ডা হইলে "মুরির" জল ষ্টীম দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া আবশ্যক পরিমাণে তাপ রক্ষা করা যায়। ইহাতে নীলকরদিগের আবহাওয়ার উপর বড় নির্ভর করিতে হয় না; এমন কি, নবেম্বর মাস আসিয়া পড়িলেও নীল তৈয়ারির কার্য্য বন্ধ করিবার আবশ্যক হয় না।

কিন্তু নীলের বাণিজ্য বোধ হয় আর থাকে না। সম্প্রতি একজন জর্ম্মাণ পণ্ডিত রসায়ন-বিদ্যার সাহায্যে এক প্রকার নীল রঙের সৃষ্টি করিয়াছেন। শোনা গিয়াছিল, তাহা প্রস্তুত করিতে যেরূপ অধিক খর্চ্চা পড়ে তাহাতে আমাদের দেশের উদ্ভিজ্জ-নীলের স্থান তাহার দ্বারা

অধিকৃত হইবে এরূপ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আবার ফেব্রুয়ারি মাসের Nature নামক বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রে সেদিন দেখিলাম যে থর্চ্চার প্রতিবন্ধকও দূর হইয়াছে। অতএব নীল-করদিগের এক্ষণে সমূহ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত। *

এই বাণিজ্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, যেইমাত্র য়ুরোপীয়েরা ওয়েষ্ট-ইণ্ডিস ও উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ অংশে নীলের চাষ ও তাহার কারখানাকার্য্যে মনোযোগী হইলেন অমনি ভারতবর্ষীয় নীল হীনপ্রভ হইয়া পড়িল, আবার যখনই য়ুরোপীয়েরা এখানে আসিয়া তাঁহাদিগের উদ্যম ও নৈপুণ্য নিয়োগ করিলেন, অমনি আবার আমাদের নীল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। অতএব দেখা যাইতেছে, য়ুরোপীয় উদ্যম ও নৈপুণ্যের নিকট আমরা অনেক বিষয়ে ঋণী। অনেকে ক্রমাগত এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, ইংরাজেরা আমাদের দেশ হইতে অজস্র ধনরত্ন লুটিয়া লইয়া যাইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে উদ্যোগী পুরুষকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করেন। আমাদের লক্ষ্মী আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যে বিদেশীয়দিগকে আশ্রয় করিতেছেন, তাহার কারণই এই যে আমরা তাঁহার অযোগ্য, আমাদের নিজের দোষেই

* Prof, Baeyer succeeded, some years ago, in preparing indigo artificially, but the process was so expensive that it was not likely to be of much practical importance. He has now, however succeeded in effecting the synthesis in another way, by which he can not only produce the indigo much more cheaply but can produce it within the fibre of the material to be dyed. The artificial production of olizarin has already wrought a great change in the commercial relations of the south of France, and if indigo be produced synthetically at a lower price than it can be grown, similar alterations may result in some parts of our Indian Empire. —Nature.

আমরা তাঁহার প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। তার জন্য আক্ষেপ করা বৃথা। যতই কেন য়ুরোপীয়েরা আমাদের দেশ হইতে ধন লুট করুন না, ইহা কিন্তু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহাদের উদ্যম ও নিপুণতা-গুণে আমাদের দেশে নূতন নূতন কারখানা খোলা হইতেছে; ধনাগমের নূতন নূতন পথ আবিষ্কৃত হইতেছে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেছে।

—o—
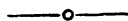
জাতীয়তা ও বিজাতীয়তার উপদ্রব।

আমাদের মধ্যে এক দল আছেন যাঁহারা জাতীয় ভাবের একান্ত পক্ষপাতী ও বিদেশীয় ভাবের দারুণ বিদ্বেষী। তাঁহাদের মত এই, যাহা কিছু আমাদের দেশের তাহাই ভাল, যাহা কিছু বিদেশ হইতে আনীত তাহাই মন্দ। তাঁহারা মনে করেন জাতীয়তা ও দেশহিতৈষিতা একই পদার্থ। বাস্তবিক ধরিতে গেলে, প্রকৃত জাতীয়তা ও দেশ-হিতৈষিতা একই পদার্থ বটে। কিন্তু এক দল যেরূপ অন্ধভাবে ও বিকৃতভাবে জাতীয়তার (Nationality) অর্থ করেন, তাহা অনেক অনর্থের মূল। এই জাতীয়তাটি যে কি পদার্থ তাহা সেই জন্য সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা উচিত। অনেক সময় একটা কথা লইয়া অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়। সেই কথার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিলে তাহার অর্দ্ধেক গোলযোগ নিষ্পত্তি হইয়া যায়। যেমন সভ্যতা একটি কথা। এই কথা লইয়াও নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই কথার দোহাই দিয়া পরস্পর-বিরোধী মত সকল অনায়াসে পার পাইয়া যায়। কেহ হয়তো বলিবেন "যতই সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে, ততই দেশের কুনীতি বাড়িতেছে," আর একজন বলিলেন "যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই দেশে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে,"—ইহার মধ্যে কোন্ মতটি ঠিক, নির্ণয় করিতে হইলে, প্রকৃত সভ্যতা কাহাকে বলে নির্ণয় করা আবশ্যক। এবং তাহা একবার নিরূপিত হইলে ঐ কথা লইয়া আর কখন গোলযোগ হয় না। জাতীয়ভাব, এই কথাটি এক্ষণে অতি সঙ্কীর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়। আহার, পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার লইয়াই জাতীয়তা; কোন জাতির বাহ্য নিদর্শন ও অনুষ্ঠানের বিশেষত্বকেই আমরা এক্ষণে জাতীয়তা বলি। কোন জাতির আন্তরিক বিশেষত্বের প্রতি আমরা

তত লক্ষ্য করি না, কেবল তাহাদিগের বাহ্য বিশেষত্বের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য। আমরা একটি ফলের খোসা দেখিয়াই তাহার ভালমন্দ বিবেচনা করিতে যাই, তাহার অভ্যন্তরস্থ শাঁস দেখি না। এই জন্যই আমাদের জাতীয়তা এক-দেশ-দর্শী অন্ধ জাতীয়তা। বাস্তবিক ধরিতে গেলে, কোন জাতির আভ্যন্তরিক বিশেষ ভাব ও তাহার বাহ্যপ্রকাশ উভয় লইয়াই তাহার জাতীয়তা।

আচার ব্যবহার প্রভৃতি সেই আভ্যন্তরিক ভাবের বাহ্য নিদর্শন মাত্র। এস্থলে আভ্যন্তরিক ভাবই মুখ্য বিষয়, বাহ্য আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান সকল তাহার আনুষঙ্গিক মাত্র।

দেশ, কাল, জল, বায়ু প্রভৃতি বাহ্য ঘটনা ও প্রাকৃতিক অবস্থার বিশেষত্ব অনুসারে কোন জাতির চরিত্র-গত বিশেষত্ব উৎপন্ন হয়। সেই চরিত্রগত আভ্যন্তরিক ভাবের উপযোগী হইয়া সেই জাতির আচার ব্যবহার প্রভৃতি বাহ্য অনুষ্ঠান সকল আপনা আপনিই সমুদ্ভূত হয়। বাহ্য ঘটনা-সকলের পরিবর্ত্তনে কালক্রমে যদি সেই জাতির আভ্যন্তরিক ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে তাহার আচার ব্যবহার সকলও যে আপনা আপনিই পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই প্রকার স্বাভাবিক অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের গতি যাঁহারা অস্বাভাবিক উপায়ে রোধ করিতে যান তাঁহারা বাতুলের ন্যায় কার্য্য করেন। তাঁহাদিগের উদ্যম কখনই সফল হয় না। এই উদ্যম উৎসাহ এই প্রকারে নষ্ট না করিয়া যদি তাঁহারা উপযুক্ত বিষয়ে তাহা নিয়োগ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। যে ঘটনা-স্রোতে কোন জাতির চরিত্র-গত পরিবর্ত্তন প্রথম আরম্ভ হয় সেই প্রারম্ভকালে বাধা দিলে বরং কিয়ৎকালের জন্যও সেই স্রোতের গতিরোধ হইতে পারে কিন্তু একবারে চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইলে, তাহার উপযোগী ও আনুষঙ্গিক যে একটি বাহ্য

অনুষ্ঠানের স্রোত স্বভাবতঃ প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহার গতিরোধ করা একেবারেই অসম্ভব।

মনে কর, আলস্য ও নিরুদ্যম বঙ্গবাসীর একটি জাতীয় ভাব। এই ভাবের উপযোগী করিয়াই আমাদের আহার পরিচ্ছদ কিয়ৎ পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছে। যাহারা পরিশ্রমী তাহারাই গুরুপাক দ্রব্য হজম করিতে পারে, এবং যাহারা কর্ম্মঠ লোক তাহাদেরই আঁট-সাট কাপড় পরা আবশ্যক হয়। লঘুপাক ভাত, আর লম্বা-কোঁচা ধুতি উভয়ই আমাদের জাতীয় অলসতার পরিচয় দেয়। এক্ষণে ইংরাজদিগের সংশ্রবে আমাদের মধ্যে একটা উদ্যমের ভাব আসিয়াছে। এই ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আহার পরিচ্ছদও অল্প অল্প পরিবর্ত্তিত হইতেছে। হয়তো কেহ কেহ শরীরে বল সঞ্চয়ের জন্য অল্প পরিমাণে মাংস আহার করিতে বাধ্য হইতেছেন, হয়তো কেহ কেহ কাজের সুবিধার জন্য আভূমি-লম্বমান চাপকানের পরিবর্ত্তে খাটো চাপকান পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কিন্তু একজন "জাতীয়" পতাকাধারী মহাত্মা আসিয়া হয়তো বলিবেন "কি! তুমি মাংস খাও, তুমি জাতীয় ভাবের বিরুদ্ধাচারী, তোমার সঙ্গে আমাদের কোন সংশ্রব রাখা উচিত নয়—তোমার পিতৃপিতামহ চিরকাল ভাত খাইয়া আসিয়াছেন, আর তুমি কিনা আজ মাংস খাইতেছ।"

সে ব্যক্তি হয়তো উত্তর করিল "মহাশয় আমি সাধ করিয়া ভাত ছাড়ি নাই—আমার যেরূপ ভূতগত পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে একটু মাংস না খাইলে চলে না।" "জাতীয়-ভাব"গ্রস্ত ব্যক্তি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিবেন—"না খাইলে চলে না—তার মানে কি? তোমার পিতৃপিতামহের কিরূপে চলিত?—একবার ভাত খাইয়া তুমি যদি শরীরে বল না পাও, তাহা হইলে একবার ভাত খাও, দুইবার ভাত খাও, তিনবার ভাত খাও। আর, তিনবার ভাত খাইয়াও যদি তুমি শরীরে বল না পাও,

তাহলে তোমার পক্ষে মরাই ভাল।" কিম্বা তিনি হয়তো কাহাকেও খাটো চাপকান পরিতে দেখিয়া মহা ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ বলিবেন, "একি রকম ফেসিয়ান? ছোট চাপকান তো আমাদের জাতীয় পোষাক নয়—তুমি দেখছি জাতীয় ভাব একেবারে বিসর্জ্জন করেছ। যার জাতীয় ভাব নাই সে কিনা করিতে পারে—সে খুনও করিতে পারে।" খাটো চাপকান-ধারী বেচারা তো অবাক—সে দেখে, খাটো চাপকান পরিয়া সে খুনের দায়ে দায়ী হয়। সে আত্মসমর্থনে দুই একটা কথা বলিল। সে বলিল কাজকর্ম্মের সময়ে ছোট চাপকানে অনেক সুবিধা হয়—পা পর্য্যন্ত ঝোলা চাপকানগুলা কেমন জবড়জঙ্গি, কাজের হুড়াহুড়ি দৌড়াদৌড়িতে হোঁচট খাইবার সম্ভাবনা—কাপড় শীঘ্র শীঘ্র ছিঁড়িয়াও যায়। জাতীয়ভাব-গ্রস্তের বিকৃত মস্তিষ্কে এ সকল যুক্তি প্রবেশ করিল না। তিনি বলিলেন, "সুবিধা অসুবিধা আবার কি? যা বরাবর চলিয়া আসিতেছে তাই করিতে হইবে—অসুবিধা হয় বলিয়া তুমি একটা সৃষ্টি-ছাড়া কাজ করিবে না কি? দৌড়িতে গেলেই পড়িতে হয়, তার জন্য কি আবার কাপড় বদ্‌লাইতে হইবে?"

অতি-জাতীয় মহাত্মাদিগের যুক্তির কত দূর দৌড় তাই দেখাইবার জন্যই উল্লিখিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। তাঁহাদিগের যুক্তির নাড়ী এত সূক্ষ্ম যে নাই বলিলেও হয়। মাংস খাওয়া বাস্তবিক এদেশের পক্ষে ভাল, কিম্বা ছোট চাপকান পরা বাস্তবিক সুবিধাজনক কিনা সে বিষয়ে মত প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। ওবিষয়ে অনেক মতামত আছে। কেহ বাঁধা রাস্তার এদিক ওদিক গেলে জাতীয়ভাব-গ্রস্ত মহাত্মাগণ কিরূপ তাহাকে যুক্তিহীন মুখ-থাবড়া দেন তাই দেখাইবার জন্যই উল্লিখিত উত্তর প্রত্যুত্তরের অবতারণা করা হইয়াছে। যদি তিনি বলিতেন, "এ দেশে যেরূপ গরম, তাহাতে মাংসের ন্যায় তাপজনক পদার্থ-সকল আহার করা আমাদের পক্ষে ভাল নয়"—কিম্বা যদি বলিতেন "খাটো

চাপকানগুলা লম্বা চাপকানের ন্যায় সুদৃশ্য সুশোভন নহে” তাহা হইলেও খানিকটা যুক্তির আভাস থাকিত। কিন্তু তাঁহার সমস্ত যুক্তির সার মর্ম্ম এই—সকল কথায় এই একমাত্র ধুয়া যে “বরাবর যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহার ব্যতিক্রম করা উচিত নহে”—যাহা পুরাতন, যাহা ভূতকালের, তাহাই ভাল। তাহা বর্ত্তমান কালের পক্ষেও ভাল, ভবিষ্যৎ কালের পক্ষেও ভাল! যাহারা কেবল ভূতকাল লইয়াই ব্যস্ত তাঁহারা নিশ্চয়ই ভূত-গ্রস্ত মনুষ্য—রোজা ডাকাইয়া অচিরাৎ তাঁহাদিগের চিকিৎসা সুরু করিয়া দেওয়া উচিত।

জাতীয়তা-ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিদের যুক্তিপ্রণালীতে যেরূপ সুসঙ্গতি নাই, তাঁহাদের বাহিরের আচার ব্যবহারেও সেইরূপ কিছুমাত্র সুসঙ্গতি নাই। তাঁহারা জীবনে এমন অনেক কাজ করেন যাহা তাঁহাদিগের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। যদিও তাঁহারা কিছুতেই তাহা স্বীকার করিবেন না। বিজাতীয় দ্রব্য যে তাঁহারা ব্যবহার করেন না এরূপ নহে। তবে হয়তো তাঁহারা স্বয়ং তাহা প্রবর্ত্তন করেন নাই এই মাত্র। যাহা দশজনে করিতেছে তাহাই তাঁহারা করিতেছেন। যে সকল বিজাতীয় আচার তাঁহারা অবলম্বন করিতেছেন, কিম্বা যে সকল বিজাতীয় দ্রব্য তাঁহারা ব্যবহার করিতেছেন, অর্থাৎ বিজাতীয় যাহা কিছু তাঁহাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে —তাঁহাদের সহিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর কোন দোষ নাই। ছোট চাপকান পরিতেই দোষ, কিন্তু লম্বা চাপকান বিজাতীয় হইলেও তাহাতে দোষ নাই, যেহেতু তাঁহারা তাহা ব্যবহার করেন। যাঁহাদিগের মোজা পরা সহিয়া গিয়াছে তাঁহারা হয়তো বুট পরাকে বিজাতীয় প্রথা বলিবেন; যাঁহাদিগের চৌকিতে বসা অভ্যাস হইয়াছে, তাঁহারা হয়তো টেবিল ব্যবহার করাকেই বিজাতীয় বলিবেন। এই জন্যই যাঁহারা ‘জাতীয় ভাব’ ‘জাতীয় ভাব’ করিয়া ক্রমাগত চীৎকার করেন তাঁহারা সুশিক্ষিত লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হয়েন। তাঁহারা আসলে লোক ভাল, তাঁহাদের কোন

কু-মৎলব নাই; তবে তাঁহাদিগের একটু মস্তিষ্কের অভাব আছে। জাতীয়তা যে কি পদার্থ তাহা তাঁহারা কখন তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই; জাতীয়তা সম্বন্ধে অস্ফুট, অনির্দ্দেশ্য, কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন, অপরিপক্ক কতকগুলি ভাব তাঁহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে ইলি-বিলি করিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। এবং তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তিনি সময়ে সময়ে ভূত-গ্রস্তের ন্যায় দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া হাত পা ছুঁড়িতে থাকেন।

কেহ না মনে করেন আমরা জাতীয় ভাবের বিরোধী পক্ষ। আমরা প্রকৃত, গোঁড়ামীশূন্য জাতীয়তার ভক্ত। অন্ধ বিকৃত জাতীয়তার ভক্ত নহি। জাতীয়তা কেবল কি একটি হৃদয়ের অস্ফুট অনির্দ্দেশ্য ভাব মাত্র? —তাহার কি কোন জ্ঞানমূলক সুদৃঢ় পত্তনভূমি নাই? তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

বিচিত্রতার মধ্যে একতা, ইহাই প্রকৃতির মূল নিয়ম, এবং এই নিয়মটি অবলম্বন করিয়া প্রকৃতি উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে। প্রকৃতির সমস্ত পদার্থের মধ্যেই একটি সাধারণ যোগ আছে—সেইটি একতার বন্ধন, এবং তদন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থের আবার কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে—ইহাই বিচিত্রতার মূল। এই বিচিত্রতা যে কেবল সৃষ্টির শোভা সম্পাদনের জন্য তাহা নহে, তাহার কার্য্যকারিতাও আছে। প্রকৃতির প্রত্যেক পদার্থের, প্রত্যেক জীবের যেরূপ বিশেষ বিশেষ গুণ আছে, সেইরূপ তাহাদের বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট কার্য্যও আছে। একের কার্য্য অপরে পূরণ করিতে পারে না। কাহারও এক বিষয়ে অভাব, কাহারও আর এক বিষয়ে অভাব। পরস্পরে মিলিয়া পরস্পরের অভাব পূরণ করিতেছে। প্রকৃতির মধ্যে এইরূপে একটা গূঢ় বাণিজ্য চলিতেছে। এবং এই বাণিজ্যের ফল—উন্নতি। বিশেষত্বকে কেন আমরা ভাল বলি? না—সেই বিশেষত্ব একটি বিশেষ কার্য্য সাধন করিবার জন্য একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিবার জন্যই

সৃষ্ট হইয়াছে। বিশেষত্বকে আমরা বিশেষত্বের জন্য আদর করি না, তাহার বিশেষ কার্য্যোপযোগিতার জন্যই তাহার আদর।

মনুষ্য-সমাজও এই নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল নহে। একতা ও বিচিত্রতার নিয়মানুসারেই ইহার শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে। সমাজের প্রথম উপকরণ—ব্যক্তি, তাহার পর—পরিবার, তাহার পর—গোষ্ঠী, তাহার পর—বংশ, তাহার পর—স্বজাতি, তাহার পর—স্বদেশ, অবশেষে—মনুষ্য-জাতি। ব্যক্তিই এই মানব-সমাজরূপ বৃহৎ চক্রের কেন্দ্র এবং সমস্ত মনুষ্য-জাতি ইহার পরিধি। এই বৃহৎ চক্রের অন্তর্গত আরও অনেকগুলি সম-কেন্দ্রিক ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর চক্র আছে। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত সমস্ত মনুষ্য-জাতির একটা যোগ নিবদ্ধ রহিয়াছে—এবং যে চক্র এই ব্যক্তিরূপ কেন্দ্রের যত নিকটবর্ত্তী, সেই চক্রের সহিত তাহার সেই পরিমাণে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এবং এই সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা অনুসারে আমাদিগের কর্ত্তব্যের মুখ্য গৌণতা নির্দ্ধারিত হয়। সর্ব্ব প্রথমে আপনি। আপনার উন্নতি সাধন সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। 'Charity begins at home' যদিও এই ইংরাজি প্রবচনটি হঠাৎ শুনিতে খারাপ লাগে, কিন্তু বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা সত্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি আপনার উন্নতি সাধনে, প্রকৃত স্বার্থ সাধনে অবহেলা করে, সে স্বীয় পরিবারের উন্নতিসাধন করিতে পারে না;—যে স্বীয় পরিবারের উন্নতিসাধনে অবহেলা করে, তাহা কর্ত্তৃক স্বজাতির উন্নতিসাধন বিড়ম্বনামাত্র; এবং স্বজাতির উন্নতিসাধনে যে ব্যক্তি পরাঙ্মুখ তাহা কর্ত্তৃক সমস্ত মনুষ্য-জাতির উন্নতি-চেষ্টা নিতান্তই হাস্যাস্পদ। বস্তুতঃ, ব্যক্তিগত উন্নতির সমষ্টিই পারিবারিক উন্নতি,—পারিবারিক উন্নতির সমষ্টিই জাতীয় উন্নতি,—জাতীয় উন্নতির সমষ্টিই মানব-সমাজের উন্নতি। মনুষ্য যেরূপ দুর্ব্বল ও পরিমিত-শক্তি-বিশিষ্ট জীব তাহাতে এইরূপ পদ্ধতিই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও ফলপ্রদ। বার্ত্তা-শাস্ত্রে যে শ্রম-বিভাগের এত

গুণ বর্ণনা শুনা যায়, উহা সেই শ্রম-বিভাগেরই একটি দৃষ্টান্ত স্থল। প্রত্যেকে যদি আপন আপন ক্ষুদ্র চক্রের মধ্যেই আপন আপন উদ্যম উৎসাহ মুখ্যরূপে নিয়োগ করেন, তাহাতে সমস্ত মনুষ্য-সমাজের যতখানি উন্নতি হইবার সম্ভাবনা তাহা কদাপি অন্য প্রণালীতে হইতে পারে না। ইহা স্পষ্টই পড়িয়া আছে। এই লইয়া বেশী বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে আমাদের সামাজিক কর্ত্তব্যের মুখ্য গৌণতা যথেচ্ছরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই—উপযোগিতারূপ সুদৃঢ় পত্তন-ভূমিতে উহা সংস্থাপিত।

উল্লিখিত কর্ত্তব্য সকল যাহাতে যথোপযুক্তরূপে সাধিত হইতে পারে তজ্জন্য প্রকৃতি তাহার অনুরূপ প্রবৃত্তি, প্রেম, অনুরাগ, মানব-অন্তঃকরণে নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, প্রেম, অনুরাগ, কর্ত্তব্যের উত্তেজক ও প্রবর্ত্তক। সর্ব্বপ্রথমে আত্মপ্রেম বা আত্মহিতৈষিতা। প্রকৃতির নিয়মানুসারে ইহাই সকল প্রেমের কেন্দ্রস্থল। তাহার পর পারিবারিক প্রেম—তাহার পর স্বজাতি প্রেম—তাহার পর মানবানুরাগ।

এখানে বলা আবশ্যক, প্রেম ও হিতৈষিতায় অনেক প্রভেদ আছে। প্রেম কতকটা অন্ধ, হিতৈষিতা দূরদর্শী। পুত্রের প্রতি মাতার অন্ধ প্রেম, পিতার প্রেম হিতৈষিতায় পরিণত। অন্ধ প্রেম হইতে অনেক অনর্থ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু হিতৈষিতা হইতে ভাল বই মন্দ হইতে পারে না। যতই জ্ঞানের উন্নতি হয়, ততই এই প্রেম হিতৈষিতায় পরিণত হয়। বস্তুতঃ অন্ধ প্রেম অপেক্ষা জ্ঞান-দীপ্ত হিতৈষিতা যে উন্নত তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। আপনার উপর যাহার অন্ধ প্রেম, সে আপনার কিছুই মন্দ দেখিতে পায় না, সুতরাং আপনার উন্নতি পথের আপনিই কণ্টক হইয়া পড়ে। সেইরূপ স্বজাতির উপর যাহার অন্ধ প্রেম, সেও স্বজাতির কিছুই মন্দ দেখিতে পায় না, সুতরাং তাহার দ্বারা স্বজাতির উন্নতি সাধন অসম্ভব।

প্রত্যেক ব্যক্তি যেরূপ বিশেষ বিশেষ দোষ গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিও বিশেষ বিশেষ দোষগুণের আধার। যিনি আত্মহিতৈষী তাঁহার কর্ত্তব্য নিজ চরিত্রের দোষগুলি অপনীত করিয়া গুণের উন্নতি সাধন করা, যিনি স্বজাতি-হিতৈষী তাঁহার কর্ত্তব্য জাতীয় চরিত্রের দোষগুলি দূরীকৃত করিয়া স্বজাতি-সুলভ গুণগুলিকে পরিপোষণ করা। আমরা যখন বলি আমাদের জাতীয় ভাব রক্ষা করা কর্ত্তব্য তখন আমরা কখন এরূপ মনে করিয়া বলি না যে আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের দোষগুলিও রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এক্ষণে জাতীয় ভাব সচরাচর যেরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার সহিত নীতি-মূলক দোষগুণের সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। এক্ষণে জাতীয়ভাব অর্থে কোন জাতির বাহ্য আচার ব্যবহার আহার পরিচ্ছদের বিশেষত্ব বুঝায় মাত্র। জল বায়ু, শীতাতপ, ভূমির উর্ব্বরতা, বৈদেশিক আক্রমণ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থা ও বাহ্য ঘটনা সকল অনেক সময় কোন জাতির আচার ব্যবহার প্রভৃতির উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করে—এমন কি ঐ সকলের প্রভাবে জাতীয় চরিত্র অনেকাংশে সংগঠিত হয়।

জলবায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি-সকল জাতীয় চরিত্রের উপর যে প্রভাব প্রকটিত করে, তাহার ফল যে সকল সময়েই শুভ হয় তাহা নহে। তাহা হইতে অশুভ ফলও উৎপন্ন হইতে পারে। শারীরিক দুর্ব্বলতা, আলস্য, নিরুদ্যম, হীন অসার গর্ব্ব প্রভৃতি আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের যে সকল দোষ, তাহা যে অনেক পরিমাণে জলবায়ু ভূমি প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রভাবের ফল তাহা কে অস্বীকার করিবে? বহুবিবাহ প্রভৃতি আমাদের দেশে যে সকল কুপ্রথা প্রচলিত আছে তাহাও বোধ হয় কিয়ৎপরিমাণে প্রাকৃতিক প্রভাবের ফল। আবার এই প্রাকৃতিক প্রভাবেই দয়া ধৈর্য্য ভক্তি ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণে আমাদের জাতীয় চরিত্র অলঙ্কৃত হইয়াছে। অনেক বাহ্য প্রথা এই

সকল চরিত্রগত দোষগুণের ফল। কতকগুলি এরূপ প্রথাও আছে যাহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে নীতির কোন সংশ্রব নাই—তাহা কেবল মাত্র সুবিধা ও উপযোগিতামূলক। যেমন, ভাত খাওয়া প্রথা কিংবা ধুতি প্রভৃতি ঢিলাঢালা কাপড়-পরা প্রথা এতদ্দেশের জলবায়ুর উপযোগী বলিয়াই প্রচলিত হইয়াছে; তেমনি আবার কতকগুলি এরূপ প্রথাও আছে যাহার সহিত নীতি, দুর্নীতি, সুবিধা, অসুবিধার কোন যোগ নাই। তাহা নিতান্তই যদৃচ্ছাসম্ভূত ও আগন্তু। যেমন আমাদের দেশের প্রণাম, মুসলমানদিগের সেলাম—ইংরাজদিগের সেক্‌হ্যাণ্ড।

অতএব কোন দেশের প্রথাকে এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

১। চরিত্র-মূলক।

২। সুবিধা বা উপযোগিতা-মূলক।

৩। যদৃচ্ছা-সম্ভূত কিম্বা আগন্তু।

চরিত্র-সম্ভূত প্রথা সকলের মধ্যে যাহা সুনীতি-মূলক তাহার পরিপোষণ করিতেই হইবে, যাহা দুর্নীতি-মূলক তাহা পরিবর্জ্জন করিতেই হইবে। তাহা দেশ-কাল-পাত্রের উপর ততটা নির্ভর করে না। নীতি সংশোধন মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

সুবিধা বা উপযোগিতা-মূলক প্রথা-সকল দেশ-কাল-পাত্রের উপর খুবই নির্ভর করে। ইংরাজের আগমনে আমাদিগের যেরূপ উদ্যম বাড়িয়াছে তাহাতে লম্বা-কোঁচা ধুতি এক্ষণে সুবিধাজনক বা উপযোগী নাও হইতে পারে। বাহ্য অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই সকল প্রথার পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। উপযোগিতাই এই সকল প্রথার পত্তনভূমি। অতএব যতক্ষণ উপযোগী ততক্ষণই এই সকল প্রথাকে আমরা আদর করিব। বরাবর চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে রাখিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। তা ছাড়া, বরাবর এ পর্য্যন্ত কিছুই চলিয়া আসে নাই।

যে সকল প্রথা যদৃচ্ছা-সম্ভূত—যাহার সহিত নীতি, দুর্নীতি, সুবিধা, অসুবিধার কোন সংশ্রব নাই তাহার পরিবর্ত্তে বিদেশীয়-প্রথা অবলম্বন করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। যাঁহাদিগের অনুকরণ-স্পৃহা, অসার জাঁকের ভাব অতিমাত্র প্রবল, তাঁহারাই এরূপ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় কোন কোন ইঙ্গ-বঙ্গের এই রোগটি আছে। তাঁহাদিগের অনুকরণের কোন অর্থ নাই—যাহা আমাদিগের অভাব আছে তাহা পূরণ করিবার জন্য কোন বিষয়ে অন্য জাতির অনুকরণ করা যাইতে পারে—কিন্তু কেবল অনুকরণের জন্যই অনুকরণ অতিশয় হেয়, অসার, হাস্যাস্পদ,—তাহা হনুকরণ নামেরই যোগ্য। এই "হনু" শব্দ তাহাদিগের সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে খাটে। "হনুর" অর্থ বর্ত্তমানকাল-ব্যঞ্জক—"হই-লাম।" ভবিষ্যতে কি পরিণাম হইবে তাহার প্রতি তাঁহাদিগের আদৌ লক্ষ্য নাই—উনবিংশতি শতাব্দিরূপ বর্ত্তমান কালের কোন সভ্য জাতির যাহা কিছু প্রথা, তাহা দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়াই তাহা হনুকরণ করিতেই হইবে। তাহাদিগের লক্ষ্য ন ভূত ন ভবিষ্যৎ—তাঁহারা বর্ত্তমানকাল লইয়াই সন্তুষ্ট। একদল যেমন, "আমরা হ্যান ছিনু, আমরা ত্যান ছিনু" করিয়া ভূতগ্রস্ত হইয়াছেন, আর একদল তেমনি, "আমরা হ্যান হনু, আমরা ত্যান হনু" এই বলিয়া সদর্পে চীৎকার করি-তেছেন। এই 'হনু'তে যে মান আছে তাহা তাঁহারা চিরকাল উপভোগ করুন, সে মান হইতে আমরা তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিতে চাহি না। তবে এই এক কথা, "ভূতের" উপদ্রব ও "হনুর" উৎপাত আর আমাদের সহ্য হয় না। কেবল লেখকের এখন এই ভয় হইতেছে, পাছে উভয়ের মাঝে পড়িয়া একের কিল ও অপরের চড় খাইয়া প্রাণ সংশয় হয়।

———০———

জাতীয়তার নিবেদনে অনতিজাতীয়তার বক্তব্য।

"জাতীয়তা ও বিজাতীয়তার উপদ্রব" নামক প্রবন্ধের উপসংহারে আমি এই আশঙ্কা করিয়াছিলাম পাছে "ভূত" ও "হুজুর" মাঝে পড়িয়া একের কিল অপরের চড় খাইয়া প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হয়। এখন দেখিতেছি আমার আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নহে। ইহারই মধ্যে একজন ভূতের উকীল কিল উচাইয়া "সামাল সামাল" রবে ধাবমান হইয়াছেন। যাহা হউক আশ্বাসের মধ্যে এই, কিলটি তেমন জোরালো নহে।

উকীল মহাশয় বলেন :—"জ্ঞান অনেক দূরের বস্তু দেখিতে পায়, অনুরাগের দৃষ্টির বিশেষ গুণ এই যে, সে ছোট ছোট জিনিসকে অতি স্পষ্ট ও বড় করিয়া দেখিতে পায়। অনুরাগ প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করিয়া দেখিতে পায়, জ্ঞান অনেককে একত্র করিয়া দেখে। আমাদের লেখক মহাশয় বঙ্গসমাজের প্রতি জ্ঞানের দূরবীণ কসিয়াছেন, দূর ভবিষ্যতে কিসে কি হইতে পারে তাহারই প্রতি তাঁহার দৃষ্টি, দূর-দেশে কি কি ভাল জিনিস আছে তাহা তাঁহার নজরে পড়ে। একবার অনুরাগের অনুবীক্ষণ কসিয়া যদি দেখেন, তবে কাছাকাছির অনেক জিনিস, এমন কি কাপড়টা ছোপড়টা পর্য্যন্ত বড় করিয়া তাঁহার চোখে পড়িবে। কেবলমাত্র উপযোগিতার চক্ষে ঘরের জিনিস দেখা ঘরের লোকের পক্ষে সকল সময়ে ভাল নহে। সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগের দৃষ্টিও থাকা চাই, নহিলে হৃদয়হীনতা প্রকাশ পায়। একটা চূড়ান্ত সীমার দৃষ্টান্ত দেখানো যাউক। স্ত্রী সংসারের পক্ষে নিতান্ত উপযোগী। কিন্তু যে ব্যক্তি স্ত্রীকে অনুরাগশূন্য উপযোগিতার চক্ষে দেখে, বয়স বশতঃ বা রোগ বশতঃ স্ত্রীর উপযোগিতা দূর হইলে বা কমিলে অনুরাগের

অনুরোধ না শুনিয়া যে ব্যক্তি সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহাকে আমরা বিশেষ প্রশংসা করিব না।”

জ্ঞান যে কেবল দূরের বস্তু দেখিতে পায়, নিকটের বস্তু দেখিতে পায় না, এ কথা সত্য নহে। জ্ঞান, সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ প্রণালী দ্বারা, কি দূরের বস্তু, কি নিকটের বস্তু, কি সাধারণ, কি বিশেষ, সকলই তন্ন-তন্নরূপে, যথার্থরূপে দেখিতে পায়। জ্ঞানের দূরবীক্ষণ যন্ত্রও আছে, অনুবীক্ষণ যন্ত্রও আছে। অনুরাগের যে কেবল দূরদৃষ্টি নাই তাহা নহে, আবার অনুরাগের মুকুরে অনেক সময় ঠিকটি দেখা যায় না। তাহাতে অনেক সময় বাহ্য পদার্থ সকল বিকৃতরূপে প্রতিফলিত হয়। কখন বা ছোট ছোট জিনিস অপরিমিত বড় দেখায়, কখন বা বড় বড় জিনিস অসম্ভব ছোট দেখায়, কখন বা তিলকে তালরূপে, কখন বা তালকে তিলরূপে দেখিতে পাওয়া যায়—কখন বা কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অনুরাগের মুকুর দিয়া দেখি বলিয়াই আমরা অনেক সময় আত্মীয়জনের দোষ দেখিতে পাই না—কিম্বা দোষের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। কথাই আছে:—“আমার ছেলেটি খায় এতটি, বেড়ায় যেন গোপালটি, ওর ছেলেটা খায় এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা।” এই অনুরাগের মুকুরে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই দেস্‌ডেমোনা অমন কদাকার একজন কাফ্রিকে দেবতুল্য সুন্দর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, টিটানিয়া একটা গর্দ্দভ-মুণ্ডে অশেষ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সন্তানের প্রতি মাতার কিরূপ অন্ধ স্নেহ তাহার তো ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এমন কি কোন কোন পিতাও এই দুর্ব্বলতার অধীন হইয়া পড়েন। আমি ও আমার দুইজন বন্ধু একবার কোন পল্লিগ্রামের ভদ্রলোকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। আমরা গিয়া একটা ঘরে বসিয়া আছি, একটি ছোট লম্বোদর ছেলে আসিয়া আমাদের একটি বন্ধুর উপর নানা প্রকার উৎপাত আরম্ভ করিল; তাঁহার চুল টানিয়া,

তাঁহার কাঁধে চড়িয়া, তাঁহার কান মলিয়া, তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। এমন সময়ে তাঁহার পিতা উপস্থিত হইলেন। আমাদের বন্ধু এখন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তাঁহার প্রতি মর্ম্মভেদী কাতর-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; সে দৃষ্টিতে পাষাণও বিগলিত হইতে পারে কিন্তু সেই অব্যক্ত কাতর অনুনয় তাঁহার মনে একটি রেখাও অঙ্কিত করিতে পারিল না। তিনি একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "মশায়, ও আদর ক'রছে।" আমাদের বন্ধু তো চক্ষুস্থির। তিনি ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলিতে পারিলেন না, কিন্তু মনে মনে ঐ ছেলেটির চতুর্দ্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন। যাহোক পিতা কোন কার্য্যোপলক্ষে যেই ঘর হইতে বাহির হইয়াছেন অমনি আমার বন্ধু অবসর বুঝিয়া আইন নিজহস্তে লইলেন এবং ছেলেটার উপর একটি নিগূঢ় মর্ম্মান্তিক চিমটি প্রয়োগ করিলেন; সে ভ্যাঁ করিয়া উঠিল, আমার বন্ধুও এতক্ষণে নিষ্কৃতি পাইলেন। অনুরাগের দৃষ্টির যে কি মহিমা তাহা আমার বন্ধু বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পরিহাস ছাড়িয়া এক্ষণে প্রকৃত বিষয় আলোচনা করা যাউক। লেখক মহাশয় বলিয়াছেন "কেবল মাত্র উপযোগিতার চক্ষে ঘরের জিনিস দেখা ঘরের লোকের পক্ষে সকল সময়ে ভাল নহে, সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগের দৃষ্টিও চাই। নহিলে অত্যন্ত হৃদয়-হীনতা প্রকাশ পায়।" আমি বলি, কেবল মাত্র অনুরাগের চক্ষেও ঘরের জিনিস দেখা ঘরের লোকের পক্ষে সকল সময়ে ভাল নহে, সঙ্গে সঙ্গে উপযোগিতার প্রতিও দৃষ্টি চাই, নহিলে অত্যন্ত মস্তিষ্ক-হীনতা প্রকাশ পায়। আমি এই উপযোগিতা শব্দ বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। মনুষ্যের পক্ষে যাহা কিছু উন্নতিসাধক, যাহা কিছু মঙ্গলজনক তৎসমস্তই উপযোগিতার অন্তর্ভূত। আমাদের মনোবৃত্তি, আমাদের হৃদয়ের প্রবৃত্তি, সমস্তই মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। কিন্তু আমাদের প্রবৃত্তিদিগকে জ্ঞানের শাসনে রাখা চাই; জ্ঞানের শাসন অতিক্রম করিলেই তাহা হইতে

অশুভ ফল উৎপন্ন হয়, তখন আর তাহাদিগকে আমাদিগের উন্নতির উপযোগী বলা যাইতে পারে না। যে অনুরাগ হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হয় তাহাই আমাদিগের উপযোগী, এবং যে অনুরাগ হইতে অশুভ ফল উৎপন্ন হয় তাহাই অনুপযোগী, তাহাই দূষ্য। লেখক মহাশয় স্ত্রীর উপযোগিতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে বয়স বশতঃ বা রোগ বশতঃ স্ত্রীর বিশেষ উপযোগিতা একেবারে যে দূর হয় তাহা আমি স্বীকার করি না, স্ত্রীর বিশেষ উপযোগিতা দূর হইলেও স্ত্রী পরিত্যাগ করা সাধারণ মঙ্গলের উপযোগী নহে। আমার মতে, যে ব্যক্তি স্ত্রীকে অনুরাগশূন্য উপযোগিতার চক্ষে দেখে না—যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ অনুরাগপূর্ণ উপযোগিতার চক্ষে দেখে, সেই প্রকৃত উপযোগিতার চক্ষে দেখে। কারণ বিশুদ্ধ অনুরাগ উপযোগিতারই অন্তর্ভূত।

সকল অনুরাগই যে শুভ তাহা নহে। একজন মদ্যপায়ীর মদের উপর অনুরাগ জন্মিতে পারে, নীরো কিম্বা সিরাজুদ্দৌলার ন্যায় পিশাচ-তুল্য মনুষ্যগণ অন্যের কষ্ট অন্যের যন্ত্রণা দেখিয়া সুখী হয়, তাহাতেই তাহাদিগের অনুরাগ, অতএব অনুরাগ মাত্রই যে প্রশংসনীয় তাহা নহে। শুভ ও অশুভ ফল দেখিয়াই অনুরাগের ভাল মন্দ নির্ণীত হয়।

"জাতীয়তা-গ্রস্তেরা বাহ্য অনুষ্ঠান, বাহ্য পরিবর্ত্তন লইয়াই আন্দোলন করেন, আভ্যন্তরিক ভাবের প্রতি তাহাদের লক্ষ্য নাই—" এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল কারণ হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহা তাঁহারা সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া দেখেন না, তাহা তাঁহাদিগের আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি হয় না—তাঁহারা কোন বিষয়ের মূল পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখেন না—এক কথায়, তাঁহারা যুক্তির ত্রিসীমা দিয়াও যাইতে চাহেন না। এ প্রথাটি ভাল, কেন ভাল? না, যেহেতু উহা আমাদের দেশের, আর এক কথায়, তাহার কোন যুক্তি নাই। একটি প্রথা কেন প্রবর্ত্তিত হইল, সমস্ত জাতির আভ্যন্তরিক ভাবের সহিত

তাহার সম্বন্ধ কি, সে প্রথাটির উপযোগিতা কি, এ সমস্ত তাঁহারা কিছুই ভাবেন না। জাতীয়তাগ্রস্তদিগের অযৌক্তিক মনের গঠন প্রদর্শন করাই আমার পূর্ব্ব-প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

লেখক মহাশয় বলেন ঃ—"কথাটি সত্য যে, জাতীয়তাগ্রস্ত লোকেরা পরিবর্ত্তনের বাহ্য খুঁটিনাটি লইয়াই অধিক হাঙ্গামা করিয়া থাকেন, কিন্তু কেন যে তাহা করেন তাহা কি কেহ দেখিবে না? ছেলেবেলা হইতে তাঁহারা যাঁহাদের ভালবাসিয়া আসিয়াছেন, যাঁহাদের ভাষা তাঁহারা বুঝিতে পারেন ও যাঁহারা তাঁহাদের ভাষা বুঝে, যাঁহারা তাঁহাদের কোন কাজ কোন কথা কখন ভুল বুঝেন না, যাঁহাদের প্রতি কাজ প্রতি কথার ঠিক মর্ম্মটি তাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের সকলেই এক প্রকার বিশেষ কাপড় পরিতে ও বিশেষ বিশেষ আচার অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়াছেন, সেই সকল কাপড় ও আচার ব্যবহার প্রিয়জনদের ভাবের সহিত তাঁহাদের মনে এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, উভয়ই একত্রে তাঁহাদের হৃদয়ে বাস করে। প্রিয়জন মনে পড়িলেই সেই সকল বস্ত্র ও আচার ব্যবহার তাঁহাদের মনে পড়ে। সেই সকল আচার ব্যবহার ও পরিচ্ছদ-সমূহ কেবল মাত্র তাঁহাদের উপযোগী নহে, তাহা তাঁহাদের অনুরাগের সামগ্রী! তাঁহাদের আপনার লোকেরা সেই সকল কাপড় পরে ও সেই সকল আচার অনুষ্ঠান করে। সেই সকল আচার ব্যবহার ও বস্ত্র যদি কেহ পরিবর্ত্তন করে, তবে সে যে-কোন যুক্তি দেখাক না কেন, আমরা, অর্থাৎ জাতীয় লোকেরা, তাহাকে বলি, "তুমি ইহা যদি করিতে পার, তবে কি না করিতে পার, তবে খুনও করিতে পার! অর্থাৎ তোমার সহৃদয়তা এতই অল্প।" অনুরাগ সকল সময়ে যুক্তি খুঁজিয়া পায় না। তাহার মনের মধ্যে যাহা থাকে তাহা এমন জাগরূক থাকে যে, সে ভাবিয়া পায় না, ইহার আবার প্রমাণ কি দেখাইতে হইবে! এই জন্য অনুরাগের কথাগুলা অনেক

সময় অযৌক্তিক শুনায় কিন্তু তাই বলিয়া যে, সকল সময় ভুল হয় তাহা নহে।"

কোন জাতীয় প্রথা প্রিয়জনের স্মৃতির সহিত জড়িত আছে বলিয়াই যে তাহা ভাল হইবে এরূপ বলা যাইতে পারে না। যাঁহাদিগকে ছেলেবেলা হইতে ভালবাসিয়া আসিয়াছি, তাঁহাদিগের অবলম্বিত আচার ব্যবহারে যে আমরা ভালবাসিব তাহা খুব স্বাভাবিক, তাই বলিয়া সেই সকল আচার ব্যবহার যে সকল সময়েই ভাল হইবে এরূপ বলা যাইতে পারে না। যদি কোন প্রথা অশুভ হয়, তাহা প্রিয়জনের বলিয়াই যে তাহা আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। যখন আমাদের দেশে সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, সেই সময়ে কেহ যদি তাহা নিবারণ করিতে যাইতেন, তাহা হইলে আমাদিগের লেখক মহাশয়ের ন্যায় তৎকালের জাতীয়তাগ্রস্ত লোক হয়তো তাঁহাকে ঠিক এই কথাই বলিতেন—"প্রিয়জনের সহিত এই প্রথাটি জড়িত, প্রিয়জন মনে পড়িলেই এই প্রথাটি আমাদের মনে পড়ে, ইহা আমাদের অনুরাগের সামগ্রী, তুমি যে কোন যুক্তিই দেখাও না, তুমি যদি এই প্রথা অমান্য করিতে পার—তাহা হইলে তুমি কি না করিতে পার, তুমি তাহা হইলে খুনও করিতে পার।" যাহা হউক অন্যে খুন করুক বা না করুক, জাতীয়তাগ্রস্তেরা যুক্তিকে যে নির্দ্দয়রূপে খুন করেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমাদের পূর্ব্ব-প্রবন্ধে, প্রসঙ্গক্রমে ধুতি ও চাপকানের সুবিধা অসুবিধা বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। ধুতি পরা উচিত কি চাপকান পরা উচিত—সে বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করা আমার অভিপ্রায় ছিল না। জাতীয়তাগ্রস্তদিগের যুক্তি-প্রণালী কিরূপ তাহাই দেখাইবার জন্য ঐ কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমার বক্তব্য এই, যদি ধুতি বাস্তবিক অনুপযোগী হয়, তাহা হইলে, তাহা বহুদিন হইতে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও,

প্রিয়জনদিগের পরিধেয় হইলেও তাহা পরিবর্ত্তন করা উচিত। তবে, এরূপ প্রণালীতে পরিবর্ত্তন করা উচিত, যাহাতে প্রিয়জনদিগের মনে, দেশের লোকের মনে অকারণ কষ্ট দেওয়া না হয়। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, এরূপ ছোট ছোট বিষয়ে একটু অসুবিধা হইলেও অনর্থক গোলযোগ করা উচিত নহে। কিন্তু বাস্তবিক ধরিতে গেলে, আমাদের জীবনের কোন কার্য্যকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবহেলা করা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের সমষ্টিই আমাদের জীবন। জাতীয় জীবনের যদি সংস্কার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অসুবিধা সত্ত্বেও, যাহা আছে তাহাতেই যদি সন্তুষ্ট থাকা বিধেয় হয়, তাহা হইলে সভ্যতার পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়—কোন কালে কোন উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আর, সমস্ত পৃথিবীর লোকে ঐ মতানুসারে বাস্তবিক যদি এতদিন চলিয়া আসিত, তাহা হইলে মানবজাতির যে কি দুর্দ্দশা, কি শোচনীয় অবস্থা হইত তাহা সকলেই কল্পনা করিতে পারেন। যদি ধুতি পরিয়াই কাজ চলে, যদি মালকোচা মারিলেই আমাদের পরিধেয় বস্ত্রের অসুবিধা দূর হয়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে। তাহাতে উপযোগিতা ও জাতীয় অনুরাগ উভয়ই রক্ষা হয়। আমাদিগের মহিলাদিগের মধ্যে শান্তিপুরের ফিন্‌ফিনে কাপড় পরিধান প্রথা এখনও কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত আছে—আমাদের প্রিয়জনেরা তাহা ব্যবহার করেন বলিয়াই কি তাহা পরিবর্ত্তন করিতে নিরস্ত থাকিব? দেশের প্রতি যাহার বাস্তবিক অনুরাগ আছে, তিনিই দেশের অভাব মোচন করিতে অগ্রসর হয়েন। অতএব অসুবিধা নিবারণার্থে কোন পরিবর্ত্তন করা বাস্তবিক দেশানুরাগের বিরোধী নহে। অন্ধ অনুরাগই তাহার বিরোধী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশুদ্ধ অনুরাগের সহিত উপযোগিতার কোন বিবাদ নাই।

লেখক মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবের উপসংহারে আমার নিজের ফাঁদেই আমাকে জড়াইয়া ফেলিবেন মনে করিয়া ইংরাজি কাপড় পরিধানের নানা প্রকার সুবিধা ও উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন, যাঁহারা ইংরাজি পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে উপযোগিতার ব্রহ্মাস্ত্র কোন কাজে দেখিবে না। আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমি বলিয়াছিলাম, "যে সকল প্রথা যদৃচ্ছা সম্ভূত—যাহার সহিত নীতি, দুর্নীতি, সুবিধা, অসুবিধার কোন সংস্রব নাই তাহার পরিবর্ত্তে সেই জাতীয় বিদেশীয় প্রথা অবলম্বন করিবার কোনই অর্থ নাই। যাঁহাদিগের অনুকরণ-স্পৃহা, অসার জাঁকের ভাব অতিমাত্র প্রবল তাঁহারাই এইরূপ করিয়া থাকেন।" আমি ইহাতে পরিচ্ছদের কোন উল্লেখ করি নাই। কারণ পরিচ্ছদের সহিত সুবিধা অসুবিধার বিলক্ষণই সংস্রব আছে। কিন্তু লেখক ঐ স্থলের সমালোচনা করিতে গিয়া পরিচ্ছদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন ঃ—"মনে করুন, ইংরাজি কাপড় পরা। শুদ্ধ মাত্র ইংরাজ সাজিয়া জাঁক করা যে তাহার উদ্দেশ্য, তাহা নাও হইতে পারে। ইংরাজি বস্ত্র তাঁহাদের জীবিকার সহায়তা করে। একজন ব্যারিষ্টারের কেবল মাত্র আদালতেই বিলাতী বস্ত্র পরা যে আবশ্যক তাহা নহে! বাড়ীতেও পরিয়া থাকা অনেক কারণে প্রয়োজনীয়, বাঙ্গালী মক্কেলগণ তাঁহার ইংরাজি কাপড়ের চটক না দেখিলে বিশ্বাস করিতেই পারেন না যে, একজন ধুতিচাদর-পরা ভেতো ব্যারিষ্টর ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে দাঁড়াইয়া খুব দুই চারিটা ইংরাজি বোল শুনাইয়া দিতে পারিবে। তাহা ব্যতীত আমাদের দেশে ইংরাজি বস্ত্র পরা অনেক বিষয়ে সুবিধাজনক। সাধারণতঃ লোকে ভয় ও মান্য করে; স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে, রেলওয়েতেই হউক বা অন্য কোথাও হউক, কেহ তাঁহার সঙ্গীনীকে অমান্য বা অপমান করিতে সাহস করে না, কেহ তাঁহার সঙ্গিনীর প্রতি নিতান্ত

অবাক হইয়া হাঁ করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে না। রেলওয়ের কর্ম্ম-চারীরা তৃষ্ণা পাইলে জল দিতে দেরী করে না, অন্ধকার হইলে আলো দিতে অবহেলা করে না, বিজনতা-প্রিয় নেটিব-বিদ্বেষী ইউরোপীয়ের অনুরোধে তাঁহাকে একগাড়ী হইতে আর এক গাড়ীতে পাঠায় না। এক কথায়, আমাদের দেশের Struggle for existence-এর পক্ষে ইংরাজি বস্ত্র দেশীয় বস্ত্র অপেক্ষা অনেক উপযোগী।"

আমার পূর্ব্ব-প্রবন্ধে ইংরাজি পরিচ্ছদ পরিধানের উল্লেখ না থাকিলেও, যখন এ কথাটি উঠিয়াছে তখন একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মক্কেলেরা ইংরাজি কাপড়ের চটকে যে ভুলিয়া যায় এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না। তাহা হইলে অনেক বাঙ্গালী ব্যারিষ্টরকে কার্য্যের জন্য এরূপ হাহাকার করিতে হইত না। খ্যাতনামা ব্যারিষ্টর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি পসারে অনেক কোট পেণ্টুলনধারী ইংরাজি ব্যারিষ্টরকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন, হ্যাট-কোট পরিধানই কি তাঁহার সফলতার মূলমন্ত্র? তাঁহার অসাধারণ নিপুণতা, বাকপটুতা, সারবত্তা ও অধ্যবসায় গুণেই কি তিনি তাঁহা-দিগকে ছাড়াইয়া উঠেন নাই? যদি কেহ বলেন যে কেবল পরিচ্ছদের গুণেই তিনি এতদূর খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অন্যায়াচরণ করা হয়, এমন কি তাঁহার অবমাননা করা হয়। আমার বিশ্বাস, যদি তিনি তাঁহার পরিচ্ছদে কতকটা দেশীয় আকার বজায় রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পশারের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না— বরং আরও অধিক পরিমাণে দেশীয় লোকের মন আকর্ষণ করিতে পারিতেন। লেখক মহাশয় পূর্ব্বে এক স্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি যথার্থ। তিনি বলেন :—"কাপড়-চোপড় ও ছোটখাট আচার ব্যবহারের অনুভবমূলক একটি উপযোগিতাও আছে, ইহাতে শ্রেণী-বিশেষের লোকদের অনুরাগের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখে। আমি একজন

বাঙ্গালী দূরদেশে বাস করি। আমি যদি পথে কোন বাঙ্গালী-পরিচ্ছদ-ধারী ও বাঙ্গালী-ভাষীকে দেখি, তবে তৎক্ষণাৎ চুম্বকের ন্যায় তাহার প্রতি ধাবিত হই। আমি তাহার মনো ভাব ও দেখিতে পাই না, আমি কেবল তাহার বাহিরের কতকগুলি আনুষঙ্গিক চিহ্ন দেখিতে পাই। আমাদের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে স্বজাতিস্থ লোকের নিকট সমবেদনা পাইবার অভিলাষ। যদি তুমি বাঙ্গালীর বাহ্য বিশেষত্বের পরিবর্ত্তন কর, তবে সেই সমবেদনা পাইবার ব্যাঘাত ঘটে। দেশের লোকের সমবেদনা চাই না, এমন একটা ভাব যদি কাহারও মনে থাকে, তবে তাঁহার মনের সে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।" এখানে লেখক আমার মতেরই পোষকতা করিয়াছেন।

আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছিলাম যে "প্রত্যেকে যদি আপন আপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রের মধ্যেই আপন আপন উদ্যম উৎসাহ মুখ্যরূপে নিয়োগ করেন, তাহাতে সমস্ত মনুষ্য-সমাজের যতখানি উন্নতি হইবার সম্ভাবনা তাহা কদাপি অন্য প্রণালীতে হইতে পারে না।" আমাদের ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধুগণ যদি অকারণ সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া দেশের লোকের অপ্রীতিভাজন হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের উন্নতিসাধন আশানুরূপ কখনই হইতে পারে না। ইংরাজদিগের হাজার বাহ্য-অনুকরণ করুন, কখনই তাহাদিগের সহিত একীভূত হইতে পারেন না। বাঙ্গালী-আত্মা ইংরাজি আবরণে আবৃত হইয়া একূল ওকূল দুকূলই হারাইয়া বসেন—তাঁহাদের দ্বারা কোন সমাজেরই উন্নতি হয় না—সুতরাং তাঁহারা অকাল-কুষ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইয়া স্বকপোল-কল্পিত মহিমাতেই বিরাজ করেন! রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ তৃষ্ণা পেলে জল দিতে দেরী করে না, অন্ধকার হইলে আলো দিতে অবহেলা করে না, ইত্যাদি অসুবিধার জন্য ইংরাজের সং সাজিয়া লোকদিগকে প্রতারণা করা অপেক্ষা জঘন্য নীচ ঘৃণিত আচরণ আর কি হইতে পারে? ইহাতে যেরূপ

নৈতিক অবনতি হয়, যেরূপ জাতীয় দুর্গতি উপস্থিত হয় তাহার তুলনায় সহস্র অসুবিধাও প্রার্থনীয়। ঐ সকল হীন সুবিধা প্রকৃত উপযোগিতার নামে পরিচিত হইতে পারে না। যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে শিক্ষিত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা কোথায় ইংরাজদিগের স্বাধীনতা বলবিক্রম অকুতোভয়তা শিক্ষা করিয়া আমাদের দৃষ্টান্তস্থল হইবেন, না তাঁহারাও কিনা ঐ প্রকার অসুবিধার ভয়ে ইংরাজি পোষাকের ঝোপে প্রবেশ করিয়া খর্গোসের ন্যায় চক্ষু মুদিত করিয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করিবেন? আমি তাঁহাদিগকে খর্গোসের সহিত এই জন্য তুলনা করিলাম যে তাঁহারা ইংরাজি হ্যাটের মধ্যে হাজার মুখ লুকাইতে চেষ্টা করুন, তাঁহাদের বাঙ্গালীর কোমল মুখশ্রী ও কালো রং সম্পূর্ণরূপে ঢাকিতে কিছুতেই তাঁহারা সক্ষম হয়েন না। তাহার প্রমাণ, ইংরাজি পরিচ্ছদধারী ইঙ্গ-বঙ্গীয় যুবক ও মহিলাদিগকে কতবার রেলওয়েতে অপমানিত হইতে শুনা গিয়াছে। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ সে অত্যাচার হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাঁহারা অন্য উপায়ে এই সকল অত্যাচারের প্রতিবিধান করুন—যাহাতে বাস্তবিক শরীরে ও মনে বল সঞ্চয় হয় তাহার চেষ্টা করুন, নতুবা আপনার দুর্ব্বলতা লুকাইয়া বলের ভাণ করিলে কোন ফল হইবে না—তাহাতে কেবল সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইবেন মাত্র।

ইংরাজি পরিচ্ছদ আমাদের স্বাস্থ্যের ও উপযোগী নহে। সে দিন সংবাদ-পত্রে পড়িতেছিলাম, একজন সেনাপতি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ইংরাজি সৈনিকেরা গরম ইংরাজি পরিচ্ছদ পরিয়া বাহিরে বেড়াইতে যায়, বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের পরিচ্ছদ এতদূর অসহ্য হয় যে তাহারা সমস্ত কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া বারণ্ডায় বসিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল বাতাস গায়ে লাগায়—সহসা এইরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হওয়ায় তাহারা সদ্য পীড়িত হইয়া পড়ে। ইংরাজি পরিচ্ছদ

সকলই যে দেখিতে ভাল তাহাও নহে। Mrs Oliphant পরিচ্ছদ নামক গ্রন্থে ইংরাজি পুরুষের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলেন :—

"The frockcoat, though the nearest and closest resemblance of the ancient tunic, is not a graceful garment, and when crowned by the unimaginable hideous cover, the tall chimney-pot hat, and adorned with two stiff folds of coloured Silk in the form of a neck tie, fastened by a horse-shoe for example in the shade of a pin, it would be difficult to put together a costume less attractive Upon these two articles of apparel imagination is at a stand still. What will improve them we know not. They are as we have said, all but perfect utter formality and ungracefulness and save by improving them off the face of the earth, there is nothing to be done for them, so far as we are aware." আর এক স্থলে বলেন,—"It is true that in our own days nothing very serious can be said against male apparel. In itself it is ugly ; there is no abstract grace in the garment all men wear * * * * * * An evening coat is an insane object to look at ; it is a garb which art disowns and which fancy cannot deign to touch, or allow to be capable of improvement."

অবশেষে আমার এই বক্তব্য যে আমাদের পুরাতন প্রথা-সকল ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত ; পুরাতন প্রথা-সকলের বিরুদ্ধে যে সকল সমালোচনা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ না করিয়া সাবধানে পুনরায় আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সকল প্রাচীন প্রথার মধ্যেই যুক্তির ভিত্তি, সুবিধা ও উপযোগিতার পুরাতন নিদর্শন

থাকিতে পারে। উহা বর্ত্তমান অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী না হইলেও কতকটা তাহার মধ্যে ভাল থাকিতে পারে। যেমন পুরাতন প্রথা-সকল আলোচনা করিয়া দেখা উচিত, সেইরূপ নূতন পরিবর্ত্তন-সকলও ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এই সকল নূতন পরিবর্ত্তনের মধ্যে ক্ষয় ও ধ্বংসের বীজ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কালে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে। নূতনের প্রতি মানব-প্রকৃতির কেমন-একটা স্বাভাবিক স্পৃহা আছে, কিন্তু খানিকটা পুরাতনের উপর ভর না দিলে, নূতন সুস্থভাবে গজাইতে পারে না। বিপ্লব ব্যতীত সংস্কার, গোঁড়ামী ব্যতীত যুক্তিমূলক সংরক্ষণ, নূতনের প্রতি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ, পুরাতনের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি, কি নূতন কি পুরাতন যাহাতে যাহা কিছু ভাল আছে তাহা উপলব্ধি করিবার শক্তি—এই সকল প্রকৃত সমাজ-সংস্কারকের থাকা চাই।

দেশানুরাগ সম্বন্ধে Herbert Spencer যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি বলেন :—"প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ আত্মপরতা, প্রত্যেক জাতির পক্ষে সেইরূপ স্বদেশ-পরতা। বস্তুতঃ উভয়েরই মূল এক; উহার শুভ ফলও আছে, অশুভ ফলও আছে। স্বকীয় সমাজের প্রতি মর্য্যাদা আত্ম-মর্য্যাদারই প্রতিচ্ছায়া মাত্র; স্বকীয় সমাজের অধিকার সমর্থন, প্রকারান্তরে আত্ম-অধিকার সমর্থন মাত্র। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি সেই সমাজেরই অংশ। কোন জাতীয় মহাব্যাপার সংসাধিত হইলে তজ্জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি যে গর্ব্ব অনুভব করে, তাহার কারণ এই, সেই ব্যাপার সাধনক্ষম জাতি তাহার নিজের জাতি! সেই জাতীয় ব্যক্তি বলিলে, ভিতরে ভিতরে এইরূপ বুঝায়, সেই জাতির প্রকৃতিগত উৎকৃষ্টতা সেই ব্যক্তিতেও আছে। স্বদেশের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে তাঁহার মনে যে ক্রোধ উদ্দীপিত হয় তাহার কারণ এই—স্বদেশের কোন অনিষ্ট হইলে তাঁহার মনে হয় যেন তাঁহার নিজেরই অনিষ্ট হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি,

সুব্যবস্থিত আত্ম-পরতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়; এখন আমরা দেখিব সুব্যবস্থিত স্বদেশপরতাও সেইরূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতিরিক্ত আত্মানুরাগে দুই শ্রেণীর অমঙ্গল উৎপন্ন হয়:—প্রথমতঃ, উহাতে আত্ম-অধিকার-সমর্থন অতিরিক্তরূপে উত্তেজিত হওয়ায়, অত্যাচার ও শত্রুতা আহ্বান করিয়া আনা হয়; দ্বিতীয়তঃ, উহাতে আত্ম শক্তিতে অতিরিক্ত বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়ায়, নিষ্ফল চেষ্টা সকল উত্তেজিত হয়—সেই-সকল চেষ্টা পরিশেষে মহা বিপদে পরিণত হয়। আত্মানুরাগের ন্যূনতায় আবার দুই শ্রেণীর অনিষ্ট উৎপন্ন হয়; প্রথমতঃ, আত্ম অধিকার সমর্থন না করায়, অন্যের অত্যাচার ডাকিয়া আনা হয়, এইরূপে অন্যের স্বার্থপরতা পোষণ করা হয়; দ্বিতীয়তঃ যথাযথরূপে আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস না থাকায়, অনায়াসলভ্য ইষ্ট সকলও লাভ করা যায় না। দেশানুরাগের সম্বন্ধেও এইরূপ। অতিরিক্ত হইলে, অন্য জাতির প্রতি অত্যাচার এবং অসার জাতীয় অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। আবার তাহার ন্যূনতা হইলে, জাতীয় অধিকার-সকল সেরূপ উপযুক্তরূপে সমর্থিত হয় না, সুতরাং অন্য জাতির অনধিকার-প্রবেশের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, এবং জাতীয় শক্তি ও জাতীয় অনুষ্ঠানের প্রতি অতিরিক্ত অমর্য্যাদা করিলে উন্নতি উদ্যম নিরুৎসাহিত হয়।”

——o——

রুষীয় ভাষা ও সাহিত্য।

রুষীয় ভাষা স্লেবনিক ভাষার একটি শাখা মাত্র। আমাদের সংস্কৃতের ন্যায় প্রাচীন স্লেবনিক, রুষীয়ার পৌরোহিতিক ভাষা। গির্জ্জায় ঈশ্বরোপাসনাদি এই প্রাচীন ভাষায় সম্পাদিত হয়। ইহা কথিত ভাষা নহে।

প্রচলিত রুষীয় ভাষা তিনটি উপভাষায় বিভক্ত—মহা, ক্ষুদ্র ও শুভ্র রুষীয়। মহা-রুষীয় ভাষা রাজকার্য্যে ব্যবহৃত হয় ও রুষীয়ার উৎকৃষ্ট সাহিত্য এই ভাষায় লিখিত। ইহাতে তিনটি লিঙ্গ ও সাতটি কারক আছে। এবং সমস্ত বিশেষ্য ও বিশেষণ বিভক্তিযুক্ত। ইহার অক্ষর সিলিরিয়ান। নবম শতাব্দিতে সেণ্ট সিরিল এই অক্ষর সৃষ্টি করেন বলিয়া ইহার নাম সিরীলিয়ান হইয়াছে। রুষীয় বর্ণমালায় যেরূপ অনেক প্রকার শব্দ আছে, এই সকল শব্দ প্রকাশের উপযোগী করিয়াই এই অক্ষর-প্রণালী রচিত হইয়াছে। লাটিন অক্ষরে সে-সকল শব্দ প্রকাশ করিতে গেলে কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া পড়ে।

রুষীয়-সাহিত্য-ইতিহাস দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

১। প্রাচীনতম কাল হইতে মহানুভব পিটরের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত।

২। পিটরের রাজত্ব কাল হইতে ইদানিন্তন কাল পর্য্যন্ত।

সকল স্লেবনিক জাতির ন্যায়, রুষীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার জাতীয় গীতিরত্নে পরিপূর্ণ। অনেক প্রাচীন কাল হইতে এই সকল গান চলিয়া আসিতেছে। যখন রুষীয়দিগের উপর ফরাসী সাহিত্যের অপরিসীম আধিপত্য ছিল, তখন এই সকল জাতীয় গীতি অনাদরে পড়িয়া ছিল। ২০।২২ বৎসর হইতে এই সকল জাতীয় গান, রুষীয় পুরারত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যত্নের সহিত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এই সকল গাথার নাম বিলিনি (Bilini) ইহাতে রুষীয় বীরপুরুষদিগের বলবিক্রম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে একজন প্রখ্যাত কৃষক-বীর—মিকুলা সেলিয়া'ননবিচ। ইনি রুষীয় দেশের ভীম। ইঁহার শারীরিক বল অপরিসীম। দেবতারাও এই বীরের লাঙ্গল উত্তোলন করিতে পারেন না। কেবল তিনিই একটি কর-স্পর্শে পৃথিবী হইতে তাহা উত্তোলন করিয়া সুদূর আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিতে পারেন। আর এক বীর যাঁহার গৌরব-কীর্ত্তনে গাথা-সকল পরিপূর্ণ, তাঁহার নাম ইলিয়া মুরোমেটস্। একদা স্বিয়াটগর নামক আর এক বীরপুরুষের পিতার সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। স্বিয়াটগরের পিতা অন্ধ। ইলিয়ার বাহুতে প্রকৃত বীর পুরুষের বল আছে কি না পরীক্ষা করিবার মানসে তিনি ইলিয়ার হস্ত স্পর্শ করিতে চাহিলেন। ইলিয়া এক খণ্ড লৌহ বিলক্ষণ তপ্ত করিয়া বৃদ্ধ অন্ধ বীরকে দিল। বৃদ্ধ সেই লৌহ-খণ্ডকে এরূপ সবলে টিপিয়া ধরিলেন যে তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া চারি দিকে ছুটিতে লাগিল এবং তিনি বলিয়া উঠিলেন "তোর হাত শক্ত ও তোর রক্ত গরম বটে, তুই বাস্তবিক একজন বীরপুরুষ।" এইখানে, ভীম ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গন আমাদের মনে পড়ে!

এই সকল জাতীয় গীতির রচনা অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এখনও তাহার শেষ হয় নাই। একটি গাথাতে নেপোলিয়ানের নিষ্ফল রুষীয় যুদ্ধযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এই সকল কবির সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে।

মহানুভব পিটরের সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে রুষীয় সাহিত্য-ইতিহাসে একেবারে একটি নূতন যুগ উপস্থিত হয়। সেই অবধি রুষীয় সাহিত্য পাশ্চাত্য-প্রভাবের অধীন হইল। লমনসব নামক একজন দরিদ্র মৎস্যজীবীর পুত্র, এই নূতন যুগের নেতা। রুষীয়ার অনেকগুলি কৃষক-গ্রন্থকার উদয় হইয়াছেন। রুষীয় সাহিত্যে এই একটি বড় চমৎকার

ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। লমনসব যে সামান্য গ্রামে বাস করিতেন, সেখানকার সমস্ত সাহিত্য-পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া তিনি রাজধানী মস্কৌ অভিমুখে যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি একটি মৎস্য-বোঝাই করা গাড়ীতে উঠিয়া মস্কৌ নগরে উপনীত হইলেন, এবং সেখানকার একটি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। পরে তাঁহার অধ্যয়ন শেষ করিবার জন্য রাজ-সরকারের ব্যয়ে তিনি জার্ম্মানি দেশে গমন করেন। মারবুর্গ নগরে কিছুকাল থাকিয়া তিনি ঋণগ্রস্ত হইলেন, পরে রুষীয়ায় ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। পথিমধ্যে একটি অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইল। রুষীয়া দেশের সৈন্যসংগ্রহকারী একজন কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি রুষীয় ছাত্রের প্রকাণ্ড বলবান শরীর দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। তিনি লমনসবকে তাঁহার সহিত একত্র মদ্যপান করিতে অনুরোধ করিলেন, ভবিষ্য কবি প্রচুর মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। পরে যখন চেতনা হইল তখন দেখিলেন যে তিনি প্রুসীয় সৈনিকের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আছেন। তাহার পর রুষীয় রাজদূতের মধ্যবর্ত্তিতায় তিনি এই বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইলেন। লমনসব একজন অক্লান্ত সাহিত্য-ব্যবসায়ী। তিনি বিবিধ বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন;—প্রবন্ধ, নাটক, মহাকাব্য, গীতিকাব্য এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ও লিখিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন। কোন দেশের সাহিত্য যখন শৈশবাবস্থায় থাকে, তখন এইরূপ লোক প্রায়ই আবির্ভূত হয়। তিনি পিটারের পথানুগামী হইয়া, স্বদেশীয়দিগের মধ্যে পাশ্চাত্য য়ুরোপের বিদ্যানুশীলন প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তিনি রুষীয় ভাষার বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন—তিনি একটি ব্যাকরণ রচনা করিয়া রুষীয় ভাষাকে নিয়ম-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশীয়েরা তাঁহাকে যে পরিমাণে প্রশংসা করে, সে পরিমাণে কিন্তু তাঁহার রচনা পাঠ করে না।

দ্বিতীয় কাথেরিণের রাজত্বকালে একদল রাজসভা-কবির প্রাদুর্ভাব হয়। রাজ্ঞী ও তাঁহার পার্শ্বচরদের উদ্দেশেই তাহাদের রচনাবলী, প্রায় লিখিত হইত। তখন রুষিয়াতে সাধারণ পাঠকশ্রেণী আদৌ ছিল না। কেবল কৃষকদিগের কুটীরে সুদীর্ঘ শীতকালের রাত্রে পর্য্যটক ভাটেরা তাহাদিগের চিরাগত গাথা-সকল গান করিত। তৎকালের ফরাসী-ভূত রাজ সভাসদেরা, এই সব গীতিরচনাকে অসভ্যদিগের প্রলাপ বলিয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতেন। এত দিনের পর এক্ষণে এই-সকল গীতি-উচ্ছ্বাসের উপর লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে, এখন যত্নের সহিত ঐ সকল গান সংগৃহীত হইতেছে।

Derzhavin কাথেরিণ যুগের প্রধান রাজসভা-কবি ছিলেন। তাঁহার উপর রুষীয়দিগের খুব ভক্তি। কোন যুদ্ধে জয়লাভ হইলেই তিনি সেই বিষয়ে একটি কবিতা লিখিতেন। তাঁরার রচনার খুব তেজ ও ওজস্বিতা আছে; এবং গ্রীক ভাষার ন্যায় রুষীয় ভাষার যে একটি স্বাভাবিক বল ও নমনীয়তা আছে, তিনি তাহা আরও পরিপুষ্ট করিয়া তুলেন। তিনি তাঁহার রাজ্ঞীর Filiza এই নাম দিয়া তাঁহার যেরূপ অশেষ গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ক্লান্ত হইতে হয়। ইহা কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে, স্ত্রীলোক কাথেরিণের যতই দোষ থাকুক না কেন—রাজ্ঞী কাথেরিণ রুষীয়া দেশের জন্য অনেক করিয়াছেন।

ফরাসিস্ বিপ্লবের পর হইতে, যেমন য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশে, তেমনি রুষীয়াতেও একটি নূতন যুগ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে রাজ্য-শাসনের প্রাচীন প্রণালী-সকল যেরূপ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, সেই সঙ্গে লোকের পুরাতন চিন্তা-প্রণালীতেও ভাঙন ধরিল। সাহিত্যের যে একটা বাঁধাবাঁধি পুরাতন ভাব ছিল—যাহাকে ইংরাজিতে classicism বলে, তাহা অনেকটা চলিয়া গেল—য়ুরোপীয় সাহিত্য নব-জীবন লাভ করিল। এই নব-সাহিত্যের নেতা ইংলণ্ড ও জর্ম্মাণি; কিছুকাল পরে

ফ্রান্সও যোগ দিলেন। এই নূতন প্রভাব রুষীয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। প্রথম-আলেক্জাণ্ডারের রাজত্বকালে রুষীয়ার নূতন সাহিত্য-যুগের আরম্ভ হয়। Zhukovski এই যুগের প্রধান কবি। যদিও কবি অপেক্ষা তাঁহাকে উত্তম অনুবাদক বলা যাইতে পারে। তিনি শিলর, গত্তে—মুর ও বায়রণ প্রভৃতি কবির রচনা-সমূহের উৎকৃষ্ট অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বকপোল-কল্পিত রচনা অপেক্ষা এইরূপ অনুবাদ করিয়া তিনি মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। তাঁহার নিজেরও কিছু গীতি-উচ্ছ্বাস ছিল। রুষীয় যোদ্ধৃ-শিবিরে "কবি" নামক তিনি যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে জাতীয় হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল—এবং সেই সূত্রে রাজবাটীতে তাঁহার একটি ভাল কর্ম্মের যোগাড় হয়। জুকোবসকির পদ্য রচনায় কেমন-একটা বেশ সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্য আছে। এইখানে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, রুষীয় ভাষার অনুবাদ-শক্তি বিলক্ষণ আছে। এইরূপ অনুবাদের সাহায্যে অনেক দিন হইতে য়ুরোপের প্রখ্যাত লোকদিগের রচনাবলী রুষীয়দিগের নিকট পরিচিত হইয়াআছে। সেক্সপিয়র, বায়রণ—বকল, মিল, মেকলে প্রভৃতি ইংরাজি লেখকদিগের উৎকৃষ্ট অনুবাদ রুষীয় ভাষায় আছে। গগল, টুরঘেনিয়ের. পিসেম্স্কি, গংখারব প্রভৃতি আজকালের রুষীয় নবন্যাস-লেখকেরা বালজাক্ ও আলেক্জাণ্ডার ডুমার আদর্শ গ্রহণ না করিয়া; ডিক্‌ন্‌স্, থাকারে এবং জর্জ্জ এলিয়টের আদর্শে নবন্যাস রচনা করিয়াছেন।

Zhukovski যেরূপ রুষীয়ার অনুবাদকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, Alexander Pushkin সেইরূপ রুষীয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবি। তাঁহার প্রথম রচনা "রুমলান ও লিউড্‌মিলা"; ইহা একটি প্রাচীনকালের গল্প, ইহাতে বায়রণের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়, কিন্তু তিনি বায়রণের "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" অনুকারক নহেন। তাঁহার "ককেসসের বন্দী"

নামক কবিতাতে তিনি সে প্রদেশের রমণীয় আরণ্য দৃশ্যের জলন্ত বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহার "জিপ্সি" নামক কবিতাটি জলন্ত প্রেম ও প্রতি-শোধের গল্প। রুষীয়দিগের মধ্যে অনেকে, তাঁহার Evgenii Omegin নামক কবিতাটিকে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা বলিয়া মনে করে। ইহা একটি প্রেমের গল্প খুব জোর-কলমে লেখা, এ কালের লোকের চরিত্র-চিত্রে পরিপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে শ্লেষ ও করুণ রস আছে। "বরিস গডুনব" কর্ত্তৃক রচিত একটি নাটক সেক্সপিয়রের আদর্শে লিখিত। তাঁহার পূর্ব্বে রুষীয় ভাষায় যত নাটক লেখা হইত, সমস্তই ফরাসি আদর্শে। এই নাটকখানিতে বিলক্ষণ নিপুণতা ও নাট্য-রচনা-শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। পুস্কিনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকেরা ইংরাজি আদর্শে এইরূপ অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে রুষীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে নিজস্ব জাতীয় নাটক অনেকগুলি সঞ্চিত হইয়াছে।

রুষীয়াতে একদল নৈতিক গল্প-লেখক কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ইবানক্রীলব। তাঁহার রচনান্তর্ভূত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বচন রুষীয়দিগের মধ্যে চলিত কথা হইয়া পড়িয়াছে। যেমন ফরাসিদের মধ্যে লাফন্টেন্ ও ইংরাজদের মধ্যে বট্লরের হুডিব্রাস—তেমনি রুষীয়দিগের মধ্যে তাহার রচনাবলী। তাঁহার লিখিত চরিত্র-চিত্র সম্পূর্ণরূপে জাতীয়। আর একজন উৎকৃষ্ট কবির নাম কল্টজব। জাতি সাধারণের কণ্ঠস্বর পূর্ব্বে কেবল ভাটদিগের গাথাতেই শোনা যাইত, এক্ষণে তাঁহার কণ্ঠেও শুনা গেল। ইনি একজন উৎকৃষ্ট কবি। তাঁহার অধিকাংশ রচনা অমিত্রাক্ষর পদ্যে লিখিত। যেমন জার্ম্মাণ ভাষায় কথার ঝোঁকগুলি এত তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট যে পদ্যে মিল না থাকিলেও সুশ্রাব্য হয় সেইরূপ তাঁহার রচনা সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। দেশীয় চলিত গীত-সমূহ হইতেই তাঁহার কবিত্ব রুচি ফুটিয়া উঠে। Burns যেমন স্কট্দিগের

মধ্যে, তিনিও তেমনি রুষীয়দিগের মধ্যে প্রকৃত জাতীয় কবি। আর এক জন প্রসিদ্ধ রুষীয় কবির নাম নেক্রাসব। তিনি রুষীয় কৃষকগণের দুরবস্থা সম্বন্ধে ছয়খানি কবিতা-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলি অনেকটা বস্তুগত—ইংরাজি কবি ক্র্যাবের ভাব তাহাতে দৃষ্ট হয়।

রুষীয়দিগের মধ্যে অনেকগুলি প্রখ্যাত উপন্যাসলেখক আছেন, তন্মধ্যে ইবান তুর্ঘেনিব সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। সমস্ত য়ুরোপময় তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত। রুষীয়দিগের মধ্যে, বাস্তব-জীবনের অনুকরণে লিখিত ইংরাজি নবেলই উপন্যাস-রচনার প্রচলিত আদর্শ। এই সাহিত্য-বিভাগে ফরাসি প্রভাব অদৌ লক্ষিত হয় না। Zogoskin এবং Lashechinikov এই দুইজন ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখক। তাঁহাদের রচনায় সর্ ওয়াল্‌টার স্কটের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইদানিন্তন Count Tolstoi-এর রচনাবলী ছাড়িয়া দিলে, রুষীয়ায় এই প্রকার ঐতিহাসিক উপন্যাসের চাষ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও হয়! ইংলণ্ডেও আজকাল উপন্যাস-রচনার এই দশা হইয়াছে। গার্হস্থ্য-জীবনের উপন্যাসই এক্ষণে সকল উপন্যাসকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। রুষীয়েরাও এই প্রকার উপন্যাসের প্রতিই এক্ষণে সমধিক অনুরাগী।

——০——

মেঘনাদবধ কাব্য।

আমাদের সমালোচকগণ প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত "মেঘনাদ বধ" একটি এপিক্ অর্থাৎ মহাকাব্য।

এক্ষণে দেখা যাউক, য়ুরোপীয় এপিক্ ও আমাদের মহাকাব্যের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কিনা, উহাদের মুখ্য তাৎপর্য্য একই কি না এবং "এপিক্ কাব্যের" স্থলে আমরা "মহাকাব্য" প্রয়োগ করিতে পারি কি না।

প্রসিদ্ধ ইংরাজি আলঙ্কারিক Hugh Blair বলেন :—"এপিক্ কবিতার প্রকৃতি সহজভাবে এইরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে যে কবিতার আকারে কোন প্রসিদ্ধ মহদনুষ্ঠানের আবৃত্তি করা।" তিনি আরও বলেন :—

"মনুষ্যের পূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদের কল্পনার পরিসর বৃদ্ধিকরা, কিম্বা আর এক কথায়, আমাদিগের বিস্ময় ও ভক্তিরসের উদ্রেক করাই এপিক্ কবিতার উদ্দেশ্য। বীরোচিত ক্রিয়াকলাপ এবং উন্নত চরিত্রের বর্ণনা ভিন্ন এই উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হইতে পারে না। কারণ, মনুষ্য-মাত্রই উন্নত চরিত্রের ভক্ত ও পক্ষপাতী। এই সকল রচনায় বীরত্ব, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়, বিশ্বস্ততা, বন্ধুত্ব, ধর্ম্ম, ঈশ্বরভক্তি, উদারতা প্রভৃতি উন্নত ভাব-সকল অতি উজ্জ্বল বর্ণে বর্ণিত হইয়া আমাদিগের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আনীত হয় এবং এইরূপে সাধু লোকদিগের প্রতি আমাদিগের প্রীতি আকৃষ্ট হয়, তাঁহাদিগের সঙ্কল্পে ও তাহাদিগের দুঃখ-দুর্দ্দশায় আমাদিগের ঔৎসুক্য ও মমতা জন্মে, আমাদিগের হৃদয়ে উদার জন-হিতকর ভাব-সকল জাগরিত হয়, ইন্দ্রিয়কলুষিত হীন কার্য্যের চিন্তা-সকল অপসারিত হইয়া আমাদিগের মন নির্ম্মল হয় এবং উন্নত ও

বীরোচিত মহৎ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমাদিগের হৃদয় অভ্যস্ত হয়।" বিশেষরূপে আলোচনা করিতে গেলে এপিক্ কাব্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখা যাইতে পারে—প্রথমতঃ, কাব্যগত বিষয় কিম্বা কার্য্য-সম্বন্ধে—দ্বিতীয়তঃ, কর্ত্তা কিম্বা পাত্রদিগের সম্বন্ধে, তৃতীয়তঃ, কবির আখ্যান ও বর্ণনা সম্বন্ধে।

এপিক্ কবিতাগত কার্য্যের তিনটি লক্ষণ থাকা আবশুক। কার্য্যটি এক হইবে, মহান্ হইবে এবং উপাদেয় হইবে।" এইত গেল য়ুরোপীয় এপিকের সার মর্ম্ম। এক্ষণে আমাদিগের আলঙ্কারিকগণ মহাকাব্যের কিরূপ লক্ষণ দিয়াছেন, দেখা যাউক।]

সাহিত্য-দর্পণে আছে ঃ—কাণ্ডবিভক্ত কাব্যশাস্ত্র বিশেষকে মহাকাব্য বলে। উহার একটি নায়ক, হয় দেবতা হইবে, নয় ধীরোদাত্তগুণান্বিত কোন সদ্বংশ জাত ক্ষত্রিয় হইবে। সৎকুলোদ্ভব একবংশজাত কতকগুলি রাজাও উহার নায়ক হইতে পারে। শৃঙ্গার, বীর ও শান্তি এই কয়টি রসের মধ্যে একটি রস উহার অঙ্গী এবং অন্য রসগুলি উহার অঙ্গ হইবে। উহাতে সমস্ত নাটকীয় সন্ধিগুলি থাকিবে। বৃত্তান্তটি ইতিহাসোদ্ভব বা সজ্জনাশ্রয় হইবে। উহাতে সমস্ত চতুর্বর্গফল কিম্বা কোন একটি ফল থাকিবে। উহার আদিতে নমস্কার আশীর্ব্বাদ কিম্বা বস্তু নির্দ্দেশ থাকিবে। কখন কখন খলাদির নিন্দাবাদ ও সাধুদিগের গুণকীর্ত্তনে উহার আরম্ভ হয়। সমস্ত পদ্যে একটি ছন্দ থাকিবে, কেবল অবসানে অন্য ছন্দ হইবে। কখন কখন উহাতে নানা ছন্দোময় সর্গ দৃষ্ট হয়। উহা নাতিস্বল্প ও নাতিদীর্ঘ হইবে। উহাতে অষ্টাধিক সর্গ থাকিবে। সর্গান্তে ভাবি সর্গের কথাসূচনা থাকিবে। সন্ধ্যা, সূর্য্য, চন্দ্র, রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, ঋতু, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, শৈল, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিচ্ছেদ, মুনি, স্বর্গ নগর, যজ্ঞ, রণপ্রয়াণ, বিবাহ, মন্ত্র, পুত্রজন্ম ইত্যাদি বিষয় যথাযোগেও সাঙ্গোপাঙ্গ-

রূপে উহাতে বর্ণিত হইবে। কবির নামে, কিম্বা বৃত্তান্তের নামে, কিম্বা নায়কের নামে কাব্যের নাম হইবে। সর্গের মধ্যে যে কথা সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়, তাহারই নামে সর্গের নাম হইবে। মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত যথা, রঘুবংশ, শিশুপালবধ, নৈষধ ইত্যাদি। আর্ষ্য মহাকাব্যকে আখ্যান বলে। যথা মহাভারত।”

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে মহাকাব্যের প্রকৃত লক্ষণ কি, তাহার মর্ম্মগত তাৎপর্য্য কি, তাহার প্রাণগত ভাব কি—সে বিষয়ের কোন কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় না—উহাতে কেবল বাহ্য আকার ও বাহ্য উপকরণের কথাই আছে।

এপিক্ কাব্যের যে সকল লক্ষণ ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, এপিক্ কাব্যগত বিষয়টি এক হইবে, মহান্ হইবে এবং উপাদেয় হইবে। যদিও সাহিত্যদর্পণকার ঠিক এইরূপ কথায় মহাকাব্যের লক্ষণ দেন নাই, তথাপি তাঁহার বিবৃত লক্ষণগুলি হইতে য়ুরোপীয় এপিকের সার মর্ম্মটি কোন প্রকারে উদ্ধার করা যাইতে পারে। তিনি নায়ক ও বৃত্তান্ত বিষয়ের যেরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে মহৎ অনুষ্ঠান ও মহৎ চরিত্রের বিকাশ আপনা হইতেই সূচিত হইতেছে। তিনি যে বলিয়াছেন, মহাকাব্যে নাটকীয় সন্ধিগুলি থাকা চাই, উহাতে য়ুরোপীয় এপিক্ কাব্যের কার্য্যগত একত্বও সূচিত হইতেছে। তাহার পর, সাহিত্য-দর্পণে যে আছে ঃ—সন্ধ্যা, চন্দ্র, সূর্য্য, রণ-প্রয়াণ প্রভৃতি বিষয় মহাকাব্যে বর্ণনীয়—তাহার তাৎপর্য্য এই, একটি মহৎ ব্যাপারের বর্ণনা করিতে গেলে এবং সেই বর্ণনা উপাদেয় করিতে হইলে কাব্য মধ্যে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করা আবশ্যক। উক্ত লক্ষণগুলি এপিক্ কাব্যের লক্ষণের সহিত সাধারণতঃ একরূপ মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সাহিত্যদর্পণ যে বলিয়াছেন, শৃঙ্গাররসও মহাকাব্যের অঙ্গী হইতে পারে—এই কথাটিতে একটু গোল বাধে।

কারণ, শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য থাকিলে এপিক্ কাব্যের মহান্ গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইতে পারে কি না এবং উহাতে মহৎ ও উচ্চ ভাবের তেমন স্ফূর্ত্তি পায় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। সে যাহাই হউক—এপিক্ কাব্য ও মহাকাব্যের মধ্যে ঐক্য থাকুক বা নাই থাকুক—ইহা নিঃসংশয়-রূপে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত য়ুরোপীয় এপিকের আদর্শেই তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করিয়াছেন। অতএব য়ুরোপীয় এপিকের লক্ষণ অনুসারেই আমরা তাঁহার কাব্যের সমালোচনা করিব।

প্রথমতঃ দেখা যাউক মেঘনাদবধ কাব্যের কার্য্যটি এক কি না। অ্যারিষ্টটল বলেন, কার্য্যের একত্ব এপিক্ কবিতার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, ইহা নিশ্চিত, যে উপন্যাস এক ও অখণ্ড, যাহাতে ঘটনাগুলি পরস্পরের উপর পরস্পর লম্বমান, এবং একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল ঘটনাই উন্মুখ—তাহাতে পাঠকের যতদূর মনোরঞ্জন হইতে পারে, তাঁহার হৃদয় যতদূর আকৃষ্ট হইতে পারে, এরূপ, ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ও পরস্পর নিরপেক্ষ ঘটনার বর্ণনায় কখনই হইতে পারে না। অ্যারিষ্টটল আরও বলিয়াছেন, এই একত্ব একজন মনুষ্যের কার্য্যকলাপে বদ্ধ থাকিলেই হইবে না, কিম্বা কোন নির্দ্দিষ্ট কালের ঘটনা বর্ণনা করিলেই যথেষ্ট হইবে না, কিন্তু রচনার বিষয়টির মধ্যেই একত্ব থাকা আবশ্যক। বড় বড় এপিক্ কাব্য মাত্রেই কার্য্যের একত্ব উপলব্ধি হয়। ইটালি দেশে ঈনিয়সের বাস সংস্থাপন—এই বিষয়টি বর্জ্জিলের কাব্যগত বিষয়। ঐ কাব্যের আদ্যোপান্তে ঐ উদ্দেশ্যটি জাজ্বল্যমান। অডিসির একত্ব এই একই প্রকৃতির। অর্থাৎ স্বদেশে য়ুলিসিসের প্রত্যাগমন ও পুনর্ব্বসতিই উহার উদ্দেশ্য। এলিথিসের ক্রোধ ও তদ্ভূত ফলাফল ইলিয়ড্ কাব্যের বিষয়। অখৃষ্টানদিগের নিকট হইতে জেরুসালেম উদ্ধার করা ট্যাসোর এবং স্বর্গ হইতে অদমের বহিষ্করণ মিল্টনের রচনাগত বিষয়।

ঐ সকল কাব্যেই উপন্যাসের একত্ব অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের বধ-সাধন কিম্বা শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পুনর্জ্জীবন লাভ—উহার কোন্‌টি কাব্যগত বিষয় তাহা বুঝা নাও যাইতে পারে। কারণ কবি, মেঘনাদের বধসাধন করিয়াই কাব্যের উপসংহার করেন নাই, তাহার পরেও লক্ষ্মণের শক্তিশেলের ঘটনা আনিয়া এবং রামকে নরক পরিভ্রমণ করাইয়া অনেকটা নিরর্থক বাড়াইয়াছেন। অ্যারিষ্টটলের নিয়মানুসারে ইহাতে কাব্যগত একত্বের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইয়াছে বলিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যাউক, মেঘনাদবধ কাব্যের বর্ণিত কার্য্যটি বৃহৎ ও মহৎ কি না। কার্য্যটি বৃহৎ ও মহৎ হইলে সেই সঙ্গে সেই কার্য্যের কর্ত্তাকে অর্থাৎ নায়ককেও মহাশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া অনুমান করা যায়। যদিও সমস্ত রামায়ণের মধ্যে সীতা উদ্ধারই সর্ব্বাপেক্ষা মুখ্য ও বৃহৎ অনুষ্ঠান, তথাপি মেঘনাদের বধসাধনরূপ কার্য্যকে কবিবর মধুসূদন তাঁহার নিজ কাব্যে প্রাধান্য দেওয়ায় বিশেষ যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। যেহেতু সীতা উদ্ধারের পক্ষে মেঘনাদবধ একটি প্রকৃষ্ট ও প্রধান উপায়; যে মেঘনাদের প্রতাপে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু সর্ব্বদাই সশঙ্ক, তাহাকে বধ না করিতে পারিলে সীতা উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব হইত। কিন্তু কবি, লক্ষ্মণ কিম্বা রামকে নায়ক না করিয়া রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে নায়ক রূপে নির্ব্বাচন করায় তাঁহার কাব্যগত মহত্ত্ব ও গৌরবের বিশেষ হানি হইয়াছে সন্দেহ নাই। রাবণ কিম্বা ইন্দ্রজিৎ পাশব বীরত্বেরই আদর্শস্থল কিন্তু যে বীরত্বের সহিত ক্ষমা দয়া ন্যায় বাৎসল্য ভক্তি মিশ্রিত, সেই বীরত্বগুণে ভূষিত উন্নত চরিত্র মহাপুরুষই মহাকাব্যের উপযুক্ত নায়ক হইতে পারেন। মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক যে কে তাহা আমরা কাব্যের নাম মাত্র পাঠেই অবগত হইতে পারি না। কারণ কাব্যখানির নাম মেঘনাদবধ, উহাতে

মেঘনাদকেই নায়ক বুঝাইতে পারে এবং মেঘনাদ-বধের কর্ত্তা লক্ষ্মণকেও নায়ক বলিয়া মনে হইতে পারে। তবে, আসল নায়ক ধরা পড়ে কোথায় ?—না, যেখানে কবি লক্ষ্মণ ও মেঘনাদকে একত্র আনিয়াছেন।] লক্ষ্মণকে তস্কর ও সর্পের ন্যায় অলক্ষিত ভাবে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করাইয়া কাপুরুষের ন্যায় অন্যায় যুদ্ধে নিরস্ত্র অথচ বীরদর্পে দর্পিত মেঘনাদকে বধ করাইয়া লক্ষ্মণের চরিত্র যারপর নাই হীন বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন এবং মেঘনাদকে উদারতা ও বীরত্ব গুণে ভূষিত করিয়া নায়ক স্থানীয় করিয়া তুলিয়াছেন। মেঘনাদের পরাজয়েও জয় হইয়াছে এবং লক্ষ্মণের জয়েও বাস্তবিক পরাজয় হইয়াছে। কেহ বলিতে পারেন, এ বিষয়ে কবির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত—তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার কাব্যের নায়ক করিতে পারেন, এবং তাঁহার পাত্রদিগকে যেরূপ করিয়া ইচ্ছা আঁকিতে পারেন। এ বিষয়ে Blair যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি যথার্থ কথা। তিনি বলেন, সকল পাত্রকেই যে সৎ চরিত্র করিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই—স্থল বিশেষে অসম্পূর্ণ চরিত্র—এমন কি পাপিষ্ঠ, চরিত্রেরও অবতারণা করা যাইতে পারে কিন্তু কাব্যের যাহারা কেন্দ্রস্থল, সেই নায়কদিগের চরিত্র পাঠ করিয়া যাহাতে পাঠকের মনে ঘৃণা ও অবজ্ঞার উদ্রেক না হইয়া প্রত্যুত বিস্ময় প্রীতি ও ভক্তি-রসের উদয় হয়, এরূপ ভাবে রচনা করা কবির নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ মাইকেল মধুস্থদনের পক্ষে এ দোষটি নিতান্ত অমার্জ্জনীয়। আপনার ছাগকে কেহ মুণ্ডের দিক দিয়াই কাটুক কিম্বা লেজের দিক দিয়াই কাটুক, সে বিষয়ে কাহারও আপত্তি না হইলেও হইতে পারে কিন্তু যাহা কবির একমাত্র নিজের ধন নহে, যাহা সমস্ত ভারতবর্ষের সম্পত্তি, তাহা লইয়া এরূপ লণ্ডভণ্ড করিলে চলিবে কেন ? মূলগ্রন্থে যে সকল চরিত্র উন্নত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কবি আরও উন্নত করিয়া চিত্রিত করুন তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু

সেই মূল গ্রন্থের বর্ণিত উন্নত-চরিত্রদিগকে হীন করিয়া আঁকিবার তাঁহার কি অধিকার আছে? বিশেষতঃ যাঁহারা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ের সামগ্রী—চির আরাধ্য দেবতা—সেই রাম লক্ষ্মণকে এরূপ হীনবর্ণে চিত্রিত করা কি সহৃদয় জাতীয় কবির উচিত? রাম লক্ষ্মণ থাকিতে মেঘনাদকে কিছুতেই নায়ক করা যাইতে পারে না—মহাকাব্যের উপযুক্ত অত বড় মহান্ চরিত্র রামায়ণে কেন, মহাভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোন কাব্যে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তাঁহাদিগকে ছাঁটিয়া রাবণ কিম্বা মেঘনাদকে নায়ক করিবার-ত কোন অর্থই পাওয়া যায় না।]

সাধারণতঃ, চরিত্রচিত্রে কবিবর মধুস্থদনের ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক মেঘনাদকে আমরা অতি অল্পই দেখিতে পাই, যাহা কিছু তাঁহার চরিত্র স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে সে সেই যজ্ঞাগারের দৃশ্যে। তাঁহার পাত্রদিগের চরিত্রে সূক্ষ্ম প্রভেদ সকল উপলব্ধি হয় না। রাবণও বীর—মেঘনাদও বীর—রাবণও বিলাসী মেঘনাদও বিলাসী। প্রভেদের মধ্যে একজন পিতা আর একজন পুত্র। যেমন একজাতীয় হইলেও প্রত্যেক লোকের মুখশ্রী বিভিন্ন—সেইরূপ সাধারণতঃ এক প্রকৃতির হইলেও প্রত্যেক লোকের চরিত্রে সূক্ষ্ম তারতম্য ও বৈষম্য লক্ষিত হয়। এই বৈষম্যগুণ পরিস্ফুটরূপে চিত্র করিতে পারিলে কবির বিশেষ প্রতিভা প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে ব্যাস অদ্বিতীয়। য়ুরোপীয় কবিদিগের মধ্যে এই অংশে হোমর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার নীচে ট্যাসো। মেঘনাদ-বধ কাব্যে যতগুলি পুরুষ-চরিত্র আছে, তন্মধ্যে রাবণের চরিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রস্ফুটিত ও আত্মসঙ্গত হইয়াছে। কিন্তু মূল রামায়ণে যেরূপ রাবণের দুর্দ্ধর্ষ প্রচণ্ড ভাব উপলব্ধি হয়, মেঘনাদ-বধ কাব্যে সেরূপ কিছুই পাওয়া যায় না। মূল রামায়ণেও তাঁহার বিলাপ আছে বটে কিন্তু তাঁহার শোক ও রোষের ভাব এমন নিপুণরূপে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাতে তাঁহার চরিত্রগত ভীষণ গাম্ভীর্য্যের

কিছুমাত্র হানি হয় নাই। মূল রামায়ণে রাবণের বিলাপ বর্ণনা করিতে করিতে একস্থলে আছে যে, রাবণের নেত্র হইতে কিরূপ অশ্রু পতিত হইতেছিল ?—না, যেমন জ্বলন্ত দীপশিখা হইতে তপ্ত তৈল বিন্দু বিন্দু স্খলিত হয়। এই একটি উপমা-দ্বারা রাবণের রোষ দীপ্ত শোক কেমন জ্বলন্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহার চরিত্র কেমন সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে।

সমস্ত বাধা বিঘ্ন বিপদকে তুচ্ছ করিয়া দানব-বালা প্রমীলা যে সময়ে পতি দর্শনে যাত্রা করিতেছেন সে দৃশ্যটী অতি চমৎকার—তাহা পাঠকের মনকে বীরভাবে উত্তেজিত করিয়া তোলে। সমস্ত মেঘনাদ-বধ কাব্যে প্রমীলার চরিত্র বেশ নিপুণরূপে চিত্রিত হইয়াছে। দেব-দেবীগণের চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া মেঘনাদ-বধ কাব্যে অনেক সময় দেবোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হয় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, মেঘনাদ-বধ কাব্যের কার্য্যটি মহান্ হইলেও, তৎসম্পর্কীয় পাত্রদিগের চরিত্রের মহত্ত্ব তেমন সুন্দররূপে বিকশিত হয় নাই। ঐ বৃহৎ কার্যটি সাধন করিবার জন্য যে সকল সরঞ্জামের আবশ্যক, তাহা খুব জমকালো হইয়াছে সন্দেহ নাই। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল হইতে তাহার বিস্তৃত আয়োজন অত্যন্ত ঘটা করিয়া আহরণ করা হইয়াছে। বলিতে কি, মেঘনাদ-বধ কাব্যে সরঞ্জাম ও কৌশলের অভাব নাই। কিন্তু আসল কথা, চরিত্রের মহত্ত্ব বিকাশ—যাহা মহাকাব্যের প্রাণ তাহা মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায় ?

অবশেষে দেখা যাক্—মেঘনাদবধ কাব্য আখ্যান ও বর্ণনা-অংশে উপাদেয় হইয়াছে কি না। কাব্যগত কার্য্যটি বৃহৎ ও মহৎ হইলেই যে উপাদেয় হইবে এরূপ কোন কথা নাই ; কারণ, কেবল মাত্র সাহসের কার্য্যগুলি, যতই কেন বীরোচিত হউক না—নীরস ও বিরক্তিজনক হইতে পারে। কিন্তু কবিবর মাইকেল মধুসূদন তাঁহার কাব্য মধ্যে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করিয়া, দেবদেবী প্রভৃতি অলৌকিক সরঞ্জাম

আনয়ন করিয়া, দুই একটি সুন্দর প্রকরী (Episode) প্রবর্ত্তিত করিয়া এবং যাহাকে এপিক্ কবিতার পাকচক্র বলে (Intrigue) সেই নায়কদিগের বাধা বিঘ্ন সকল যথোপযুক্তরূপে কাব্য-মধ্যে বিন্যাস করিয়া তাঁহার কাব্যটিকে একরূপ বেশ উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছেন।

এপিক্ কাব্যগত আখ্যান-বিন্যাসের দুই প্রকার পদ্ধতি আছে। কবি আপনার মুখেই সমস্ত উপন্যাসটি বর্ণনা করুন কিম্বা তাঁহার কাব্য-গত বিষয়ের পূর্ব্ব ঘটনাগুলি তাঁহার পাত্রদিগের মুখেই বর্ণনা করুন তাহাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কবিবর হোমর তাঁহার ইলিযাডে প্রথমোক্ত প্রথাটি ও তাঁহার অডিসিতে দ্বিতীয়োক্ত প্রথাটি অবলম্বন করিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদনও তাঁহার কাব্যগত মূল বিষয়ের পূর্ব্ব-বর্ত্তী আনুসঙ্গিক ঘটনাগুলি সীতা ও সরমার কথোপকথনে ব্যক্ত করিয়া সুকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। যদিও মাইকেল মধুসূদন চরিত্র-চিত্রে বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন নাই, কিন্তু বাহ্যদৃশ্যগুলি এক-রূপ মন্দ চিত্রিত করেন নাই; তাঁহার অনেকগুলি ছবি বেশ সজীব ও জলন্ত। আমার বোধ হয় প্রাকৃতিক দৃশ্য অপেক্ষা তিনি লৌকিক দৃশ্যগুলি চিত্রিত করিতে অধিক সফল হইয়াছেন। তাঁহার চিত্র-কর্ম্মের প্রণালী এই যে তিনি প্রত্যেক খুঁটি নাটি ধরিয়া চিত্র করেন—দুই একটি পোঁচ দিয়া চিত্রটিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন না; তাঁহার রাবণের সভা বর্ণনা, যুদ্ধক্ষেত্র বর্ণনা, লঙ্কাপুরী বর্ণনা, রণ-প্রয়াণের বর্ণনা পাঠ করি-লেই ইহা উপলব্ধি হইবে। তাঁহার ভাষায় এপিক্-কবিতা-সুলভ তেজ-স্বিতা ও বেগবত্তা আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার পাত্রদিগের কথা-বার্ত্তায় হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস নাই—অকৃত্রিম আবেগ নাই—কেমন সকলেই অভিনয় করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। উত্তর প্রত্যুত্তরগুলি বেশ কাটাকাটা, সাজানো-গোছানো, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের অভাব উপলব্ধি হয়। উহাতে প্রেমের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের স্থলে নাগরিক

রসিকতা, প্রকৃত শোকের স্থলে আড়ম্বরময় বিলাপ, এবং প্রকৃত বীরত্বের স্থলে বীরত্বের আস্ফালনই অধিক প্রকাশ পায়। প্রকৃতির বর্ণনায় আমাদের কবি অধিকাংশ স্থলে পুরাতন কবিদিগেরই অনুসরণ করিয়াছেন—নূতনভাব অতি অল্পই আছে। সেই কোকিল সেই ভ্রমর, সেই পদ্মিনী চকোর। তাঁহার উপমাগুলি অনেক সময় কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়; অনেক সময়ে মনে হয় উপমা দিবার জন্যই উপমা দেওয়া হইয়াছে। অনেক সময়ে তিনি অযথাস্থলে "যথা" প্রয়োগ করিয়া রস ভঙ্গ করেন। সাধারণতঃ বলিতে গেলে, অলঙ্কারের আড়ম্বরে তাঁহার কবিতায় সরল সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি পায় না। যে সর্গে সরমার নিকট সীতা, তাঁহার পূর্ব্বকাহিনী বলিতেছেন—সেই সর্গটি অতি চমৎকার; উহার অনেক অংশে স্বাভাবিক কবিত্বের স্ফূর্ত্তি আছে। স্থানে স্থানে তাঁহার রচনায় কুরুচি প্রকাশ পায়। তাঁহার নরক-বর্ণনা অত্যন্ত বিভৎসজনক। যদিও ইলিয়ড ও মিল্টনেও কোন কোন স্থলে ঐরূপ বিভৎসজনক বর্ণনা আছে, তাই বলিয়া উহা অনুকরণীয় নহে। কোন ইংরাজ সমালোচক বলেন, ইলিয়ডের তৃতীয় সর্গান্তর্গত হার্পিদিগের উপন্যাস এবং প্যারাডাইসলষ্টের দ্বিতীয় "বুকের" অন্তর্ভূত পাপ ও মৃত্যুর রূপকটি উক্ত দুইটি প্রসিদ্ধ কাব্য হইতে পরিত্যক্ত হইলেই ভাল হইত।

কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের যতই দোষ থাকুক না কেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে উহা সুখ-পাঠ্য। বিচিত্র ঘটনা ও ভাবের সমাবেশ এবং অমৃতাক্ষর ছন্দের গুণে, অত বড় গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদিগের ক্লেশ বা ক্লান্তি বোধ হয় না, প্রত্যুত আমোদ পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমরা উহা হইতে যে আমোদ পাই—সাধারণ মানবপ্রকৃতিসুলভ আড়ম্বর-প্রিয়তাই তাহার কারণ। রাজপথে ঘোর ঘটা করিয়া, বাদ্য বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, লোকের কোলাহলে আকাশ পূর্ণ করিয়া, যখন চাকচিক্যময় গিল্টির সাজে সুসজ্জিত কোন প্রতি-

মাকে বাহির করা হয়—তখন যেরূপ সেই দৃশ্য সাধারণ লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে ও তাহাতে তাহারা আমোদ পায়—মেঘনাদ-বধ কাব্য পড়িয়া অনেক সময়ে আমরা যে আমোদ পাই, সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ঐ প্রকারের আমোদ বলিয়া উপলব্ধি হইবে। উহাতে সহজ কবিত্বের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস অতি বিরল, কৃত্রিম আড়ম্বরপূর্ণ অলঙ্কারে উহা পরিপূর্ণ। কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমোদ পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সে আমোদ উচুদরের নহে, উহা চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে বটে, কিন্তু হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না।

কিন্তু একটি কথা শেষে বলা আবশ্যক। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বাঙ্গালা পদ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তিত করিয়া আমাদের সাহিত্য-রাজ্যে একটি শুভ বিপ্লব সংসাধন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার রচনার স্থানে স্থানে বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হাস্যাস্পদ প্রয়োগ থাকিলেও শিথিল বঙ্গীয় পদ্যের সংশ্লিষ্টতা সাধন করিয়া সাধারণতঃ তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের পরম উপকার করিয়া গিয়াছেন বলিতে হইবে। অতএব আর যদি কিছুরই জন্য না হয় অন্ততঃ এই জন্য তাঁহার নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

—— ——

মনোবৃত্তির সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ।

শারীর-তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে মস্তিষ্কের এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, মস্তিষ্ক কি ?—না—গতি-কেন্দ্র সমূহ ও বোধ-কেন্দ্র সমূহের জটিল যন্ত্র বিশেষ। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, মস্তিষ্কের কার্য্য ও মানসিক ক্রিয়া উভয়ই এক কথা বুঝায়, এবং মানসিক ক্রিয়া-সকলের আলোচনা মনস্তত্ত্বের অধিকারের মধ্যে আইসে। কিন্তু উহার তত্ত্বানুসন্ধান-প্রণালী শারীর-তত্ত্বের অনুসন্ধান-প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র। কেবলমাত্র শারীরতত্ত্বের অনুসন্ধান-প্রণালী অনুসারে কোন ক্রমেই সংজ্ঞাব্যাপারের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। তবে, মস্তিষ্কের উপর পরীক্ষা করিতে গিয়া মনের সহিত মস্তিষ্কের যে যে স্থলে যোগ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

মস্তিষ্কই যে মনের যন্ত্রস্বরূপ, এবং মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ও মস্তিষ্কের দ্বারাই যে মানসিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হয়—তাহা এক্ষণে এতদূর সুপ্রতিপন্ন ও সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে যে তৎসম্বন্ধে আর কোন আপত্তি উত্থাপন না করিয়া ঐ চূড়ান্ত-সিদ্ধান্ত সত্যটি হইতেই আমরা এই প্রস্তাবের সূত্রপাত করিব।

কিন্তু মস্তিষ্ককোষ-সমূহে যে সকল আণবিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, সেই সকল পরিবর্ত্তনের অনুরূপ পরিবর্ত্তন কি করিয়া সংজ্ঞাতেও আবার উপস্থিত হয়—তাহা বুঝা সুকঠিন। যথা, নেত্রনিপতিত আলোকের কম্পনে দৃষ্টি-বোধরূপ সংজ্ঞার পরিবর্ত্তন কিরূপে সংঘটিত হয় তাহার সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরূহ। কোন ইন্দ্রিয়-বোধ মনোমধ্যে অনুভূত হইলে মস্তিষ্ককোষ মধ্যে যে সকল আণবিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় তাহা হয়-ত ঠিক নির্ণয় করা যাইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা সেই অনুভব-ব্যাপারের যথার্থ প্রকৃতি বিষয়ে আমাদিগের বিন্দুমাত্রও জ্ঞান বৃদ্ধি হয় না। উহার

মধ্যে একটি হইতেছে বিষয়-সম্বন্ধীয়—বাহ্য, আর একটি হইতেছে বিষয়ী-সম্বন্ধীয়—আন্তরিক। অতএব বাহ্য-ব্যাপার-ঘটিত পরিভাষায় আন্তরিক ব্যাপার-সকল ঠিক প্রকাশ করা কখনই যাইতে পারে না; কিম্বা আন্তরিক ব্যাপারের পরিভাষায় বাহ্য ব্যাপার-সকল প্রকাশ করা যাইতে পারে না। আমরা এ কথা কখনই বলিতে পারি না যে, শরীর ও মন উভয়ই এক পদার্থ, কিম্বা এমনও বলিতে পারি না—যে একটা আর একটাতে বেমালুম মিশিয়া যাইতে পারে। তবে, Laycock-এর ভাষায় হদ্দ এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, মস্তিষ্ক ও মন উভয়ই উভয়ের অন্যোন্য-সম্বন্ধী (Correlated) কিম্বা Bain-এর ভাষায় বলিতে পারি যে, শারীরিক পরিবর্ত্তন ও মানসিক পরিবর্ত্তন-সকল "দ্বিমুখী একতার" (double-faced unity) আন্তরিক ও বাহ্য এই দুইটি বিভিন্ন দিকমাত্র।

"আমাদের প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার অনুসঙ্গী যে কতকগুলি ভৌতিক পরিবর্ত্তন-পরম্পরা উপস্থিত হয় তাহা আমাদিগের বিশ্বাস করিবার সর্ব্বপ্রকার হেতু আছে। কোন অন্তর্ম্মুখী ইন্দ্রিয়-বোধ হইতে সেই ইন্দ্রিয়-বোধের প্রত্যুত্তর-সূচক বহির্ম্মুখী প্রতিক্রিয়া পর্য্যন্ত যত প্রকার মানসিক পরিবর্ত্তন-পরম্পরা সঙ্ঘটিত হয়, তৎসমুদায় তাহার আনুসঙ্গিক শারীরিক পরিবর্ত্তন-পরম্পরা হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন হয় না; মনে কর, কোন নূতন দৃশ্য দৃষ্টিপথে পতিত হইল, অমনি সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয়-বোধ, হৃদয় ভাব ও চিন্তার সমষ্টিগত মানসিক পরিণাম উপস্থিত হইয়া, ভাষা ও ভাবভঙ্গী দ্বারা তাহা বাহিরে প্রকাশ হইল। এই মানসিক ব্যাপার-পরম্পরার সমান্তরাল শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগত আন্দোলনরূপ আর একটি শারীরিক ব্যাপার-পরম্পরার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। আমরা যৎকালে, ইন্দ্রিয়-বোধ, হৃদয় ভাব ও চিন্তারূপ একটি মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করি—সেই সময় শারীরিক ক্রিয়ারও আর একটি অখণ্ড মণ্ডল সৃষ্ট হয়।

এই শারীরিক ব্যাপারের শৃঙ্খল হঠাৎ শেষ হইয়া গিয়া, সেই শূন্যস্থান কোন অজড় পদার্থ দ্বারা অধিকৃত হয়; এবং এই অজড় পদার্থ একাকী কার্য্য করিয়া স্বীয় কার্য্যফল-সকল, ঐ শারীরিক ব্যাপার-সমূহের ভগ্ন শৃঙ্খলার অপরান্তে সংযোজন পূর্ব্বক প্রত্যুত্তরসূচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। অর্থাৎ, দুই জড়রূপ উপকূলের মধ্যবর্ত্তী একটি অজড়ের সমুদ্র বিদ্যমান আছে—এই যে অনুমানটি ইহা আমাদের পরীক্ষিত জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। বস্তুতঃ স্নায়বীয় অনুবৃত্তিতে আদৌ ভঙ্গ উপস্থিত হয় না। তবে এই একটি মাত্র সম্ভবপর অনুমান হইতে পারে যে, শারীরিক ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়া-সকল উভয়েই অবিভক্ত যমক-যুগলের ন্যায় একত্র কার্য্য করে। অতএব কোন মানসিক কারণের কথা উল্লেখ করিলে, দুই পক্ষ-বিশিষ্ট কোন কারণ বুঝায়। উহা হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহাকে কেবল মাত্র মনের কার্য্য বলা যাইতে পারে না—পরন্তু তাহা শরীর ও মনের সমবেত কার্য্য।" (Bain—mind-and body 1873P131)

এই অনুমান-অনুসারে পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মানসিক ক্রিয়া-সকল ইন্দ্রিয়-বোধগত ও গতি-ক্রিয়াগত বাহ্য আধারের আন্তরিক (subjective) পক্ষ মাত্র।

সে যাহাই হউক, মস্তিষ্কের শারীরতত্ত্ব-ঘটিত ক্রিয়া-শীলতা, উহার মনস্তত্ত্ব-ঘটিত কার্য্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে সমব্যাপক নহে। গতিক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়-বোধের যন্ত্র বলিয়া মস্তিষ্ককে দেখিতে গেলে অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় সংজ্ঞার যন্ত্র বলিয়া দেখিতে গেলে উহা দুই অর্দ্ধবিশিষ্ট একটি সমগ্র যন্ত্ররূপে দৃষ্ট হয়। এবং মনন ও সংকল্পনের (ideation) যন্ত্র বলিয়া দেখিতে গেলে অর্থাৎ পরোক্ষ-সম্বন্ধীয় সংজ্ঞার (representative consciousness) যন্ত্র বলিয়া দেখিতে গেলে—উহাকে দ্বিগুণাত্মক (dual) যন্ত্র বলিয়া উপলব্ধি হয়—অর্থাৎ উহার প্রত্যেক মণ্ডলার্দ্ধ

আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। যদি কোন রোগ বশতঃ একটি মণ্ডলার্দ্ধ স্থানান্তরিত কিম্বা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে, শরীরের একদিককার গতি-ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়-বোধ রহিত হইয়া গেলেও অবশিষ্ট মণ্ডলার্দ্ধের সাহায্যে মানসিক ক্রিয়া-সকল সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

মস্তিষ্কের একার্দ্ধে কোন রোগ উপস্থিত হইয়া যদি কোন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-বোধ ও গতি-শক্তি অসাড় হইয়া পড়ে তাহা হইলে সেই সঙ্গে তাহার মানসিক ক্রিয়াতেও অসাড়তা উপস্থিত হয় না; কারণ সে তখনও অপর মণ্ডলার্দ্ধের সাহায্যেই অনুভব করিতে পারে, ইচ্ছা করিতে পারে, চিন্তা করিতে পারে, বুঝিতে পারে। সেই সকল বুদ্ধিবৃত্তি পূর্ব্বের ন্যায় তত বলবৎরূপে চালিত না হউক, তাহাদিগের সম্পূর্ণতা বিষয়ে কোন ক্ষতি দৃষ্ট হয় না।

বাহ্য প্রতিবিম্বের দ্বারা কোন ইন্দ্রিয়ের বোধ-ব্যাপার উত্তেজন করিতে হইলে সেই সেই ইন্দ্রিয়-নির্দ্দিষ্ট মস্তিষ্ক-কেন্দ্রের কোষ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তন্মধ্যস্থ আণবিক পরিবর্ত্তন সকল প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক হয়।

যদি কৌণিক Gyrusনামক মস্তিষ্কাংশ বিনষ্ট কিম্বা নিষ্ক্রিয় হয়, তাহা হইলে নেত্র-মুকুর-নিপতিত প্রতিবিম্ব-সকল পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মমত শারীরিক পরিবর্ত্তন সকল প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলেও সংজ্ঞাকে উদ্বোধিত করিতে পারে না;—যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহার মধ্যে কোন আন্তরিক পক্ষ (Subjective side) থাকে না।

কৌণিক Gyrus-বিহীন দৃষ্টি-যন্ত্র কিরূপ?—না, আলোক-চিত্র-যন্ত্রের প্রতিবিম্ব-ধারক কাচ-ফলক-বিহীন আঁধারে-কাম্‌রা যেরূপ। আলোক-রশ্মি-সকল পূর্ব্বেকার ন্যায় রীতিমত কেন্দ্রীভূত হইলেও কোন রাসায়নিক ক্রিয়া উহাতে উৎপাদিত হইতে পারে না; চিত্র-বিষয়ীভূত পদার্থটি অপসারিত করিয়া লইলে কিম্বা আলোক-পথ রুদ্ধ করিলে সেই পদার্থের প্রতিবিম্ব আর উহাতে স্থায়ী হয় না। অতএব Angular Gyrus,

প্রতিবিম্ব-ধারী কাচ-ফলকের ন্যায়। মস্তিষ্ককোষ-সমূহে কতকগুলি আণবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া সেই সকল পরিবর্ত্তনের অনুযায়ী, দৃষ্টি-বোধরূপ কতকগুলি মানসিক পরিবর্ত্তনও উপস্থিত হয়। আঁধারে-কামরার অন্তর্গত প্রতিবিম্বধারী কাচফলকে যেরূপ এক প্রকার রাসায়নিক লিপি-ক্রিয়া দ্বারা চিত্রবিষয়ীভূত পদার্থের আকারগত প্রতিবিম্ব লিপিবদ্ধ হয়, সেইরূপ মস্তিষ্ক-কোষ-মধ্যস্থ আণবিক পরিবর্ত্তনরূপ লিপি-প্রণালী দ্বারা দৃষ্ট পদার্থের দর্শনীয় লক্ষণ সকল Angular Gyrus-এ লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে।

এই উভয়ের মধ্যে আরও কোন কোন বিষয়ে উপমা প্রদর্শিত হইতে পারে। আলোক-চিত্র-ব্যাপারে আলোক-রশ্মিদ্বারা যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন উৎপাদিত হয়, তাহা যেরূপ স্থায়ী করা যাইতে পারে এবং তদ্দ্বারা দর্শনীয় বস্তুর স্থায়ী প্রতিরূপ রক্ষিত হইতে পারে, সেইরূপ মস্তিষ্ককোষ-মধ্যে নেত্রপতিত প্রতিবিম্ব-ঘটিত যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় তাহাও স্থায়ী হয়। এই দৃষ্টি-গত স্থায়ী প্রতিবিম্বকে আকার-ঘটিত মানসিক স্মৃতির শারীরিক প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে। ঐ মস্তিষ্ক-কোষস্থ স্থায়ী পরিবর্ত্তন-সকল পুনর্ব্বার উত্তেজিত হইলে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্ব পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয়—অর্থাৎ সেই প্রতিবিম্ব কল্পনায় পুনর্ব্বার উদিত হয়। এই উপমা প্রদর্শন করায় কেহ যেন এরূপ না বোঝেন যে, কাচফলকে পদার্থ-সকলের আলোক-চিত্র যেরূপ ভাবে প্রতিফলিত হয়—ঠিক সেইরূপই Augular Gyrus-এ দৃষ্ট পদার্থের প্রতিবিম্ব চিত্রিত হয়। উপমা দ্বারা এই মাত্র ব্যক্ত হইতেছে যে, নেত্র-প্রতিবিম্বিত কোন বস্তুর যেরূপ দৃষ্টি-বিষয়ীভূত লক্ষণ, তাহারই প্রতি-নিধি-স্বরূপ কতকগুলি স্থায়ী পরিবর্ত্তন মস্তিষ্ক-কোষ মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়। কোন পদার্থের দৃষ্টি-বিষয়ীভূত লক্ষণ কি? না—আলোকের বিকম্পন মাত্র। কিন্তু কেবল মাত্র এই লক্ষণ দ্বারা অতি অল্প পদার্থ

আমাদিগের জ্ঞানগোচর হয়। প্রত্যেক পদার্থ আমাদিগের জ্ঞানগোচর হইবার পক্ষে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যও আবশ্যক করে। কোন পদার্থের সমগ্র কল্পনা যখন মনোমধ্যে উদিত হইয়া যখন সেই পদার্থ জ্ঞান-গোচর হয়, তখন প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রে পূর্ব্ব-সংঘটিত পরিবর্ত্তন-গুলি পুনর্ব্বার জাগিয়া উঠে। Angular Gyrus নামক দৃষ্টি-কেন্দ্রের ন্যায় সকল ইন্দ্রিয়-কেন্দ্র-সম্বন্ধেই এই নিয়ম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-বোধের বিশেষ বিশেষ মস্তিষ্ক-কেন্দ্রগুলি স্বীয় স্বীয় বিষয়ীভূত বাহ্য প্রতিবিম্ব-সমূহের শারীরিক ভিত্তিভূমি-স্বরূপ—এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রই, ঐ সকল প্রতিবিম্ব-স্মৃতির আধার-স্বরূপে, মস্তিষ্কের কৌষিক রূপান্তরের আকারে অবস্থিতি করে। কোন পদার্থের বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-ঘটিত যে সকল বিশেষ বিশেষ লক্ষণ থাকে, ঐ সকল বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অধীনস্থ কৌষিক পরিবর্ত্তন সকলের উত্তেজনায়, সেই পদার্থের সেই সেই বিশেষ ইন্দ্রিয়-ঘটিত বিশেষ লক্ষণ-সকল কল্পনাতে পুনর্জীবিত হয়। এই সকল উপকরণগুলির মধ্যে পরস্পর একটা শারীরিক যোগ থাকা প্রযুক্তই, কোন একটি শৃঙ্খলের অংশ জাগিয়া উঠিলেই সমস্ত শৃঙ্খলটি অনুসঙ্গ-নিয়মে জাগিয়া উঠে।

অতএব ইন্দ্রিয়-বোধ-কেন্দ্রগুলি যে শুদ্ধ অব্যবহিতবর্ত্তমান বোধ-ক্রিয়ারই যন্ত্র তাহা নহে, পরন্তু বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ বোধ-ক্রিয়া সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবারও প্রতিলিপি পুস্তক-স্বরূপ। বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়বোধ-সকলের প্রতিলিপি ঐ সকল ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রে কৌষিক পরিবর্ত্তনরূপ অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া, উহাদিগকে মেধারূপ মানসিক শক্তির শারীরিক আধার বলা যাইতে পারে; এবং ঐ সকল স্থায়ী কৌষিক পরিবর্ত্তন-সকল যখন পুনরুত্তেজিত হয় তখনই ঐ সকল ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রকে স্মৃতি ও কল্পনারূপ মানসিক শক্তির শারীরিক আধার বলা যাইতে পারে। Bain অন্য প্রকার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া এই

যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "মূল-বোধক্রিয়া-সমূহ মস্তকের যে যে অংশ যে প্রকারে অধিকার করিয়া থাকে—তাহাদের প্রতিলিপি-স্বরূপ পুনরাবির্ভূত বোধ-ক্রিয়াগুলিও সেই সেই অংশ সেই প্রকারে অধিকার করিয়া থাকে।" এক্ষণে এই সিদ্ধান্তটির শারীরিক পত্তনভূমি কি তাহা আলোচনা করা যাউক। Spencer বলেন যে, কোন পদার্থের কোন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-বোধের সময় যে সকল প্রক্রিয়া বলবৎ রূপে উত্তেজিত হয়—সেই ইন্দ্রিয়-বোধের পুনরাবির্ভাব-কালে সেই সকল প্রক্রিয়াই অপেক্ষাকৃত ক্ষীণভাবে উত্তেজিত হয় এই মাত্র। বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ-ইন্দ্রিয়-বোধের সময় যেরূপ স্নায়ুমণ্ডলবর্ত্তী কোন ইন্দ্রিয় হইতে এক প্রকার আণবিক স্পন্দন আরম্ভ হইয়া মস্তিষ্ককোষ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়—কল্পনা গত কিম্বা স্মৃতিগত ইন্দ্রিয়-বোধের সময়, মস্তিষ্ককোষ-মধ্যে সেই আণবিক স্পন্দনের পুনরাবির্ভাব এত বলৎরূপে সংঘটিত হয় না যে তাহা শরীরের সমগ্র স্নায়ুমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে। কোন কোন স্থলে, মস্তিষ্ককোষে ইন্দ্রিয়-বোধের পুনরাবির্ভাব এত প্রবলরূপে সংঘটিত হয় যে, তন্নিবন্ধন স্নায়বীয় প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-বোধও কখন কখন উপলব্ধি হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের বিকৃত অবস্থায়, কোন কোন উন্মাদ-রোগে, এই প্রকার ঘটনা উপস্থিত হয়।

প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-বোধগত স্মৃতির যে শারীরিক পত্তনভূমি, সাধারণ জ্ঞানেরও সেই একই শারীরিক পত্তনভূমি. যদি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-বোধ-সকল নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী হইত, কিম্বা ইন্দ্রিয়-বিষয়ীভূত পদার্থটি যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণই স্থায়ী হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান পর্য্যন্তই সর্ব্ব-প্রকার বুদ্ধিমূলক জ্ঞানক্রিয়ার পরিসর হইত। এবং তাহা হইলে কোন পদার্থ-সম্বন্ধেই বাস্তবিক জ্ঞান আমরা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতাম না। সাদৃশ্য কিম্বা প্রভেদ চিনিতে পারার নামই জ্ঞান। "এ বিষয় আমি জানি"—একথার অর্থ এই যে, সে বিষয়-সম্বন্ধে অতীত ও বর্ত্তমানে যত

কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে, হয় সাদৃশ্য নয় প্রভেদ আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। কোন রং যখন সবুজ বলিয়া চিনিতে পারি তখন আমাদিগের বুদ্ধিতে কিরূপ প্রক্রিয়া উপস্থিত হয়?—না—সেই সবুজ রঙের বর্ত্তমান অনুভূতি ও কোন অতীত অনুভূতি এই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কিম্বা প্রভেদ আমরা উপলব্ধি করি। যদি মস্তিষ্ক-মধ্যে পুনরুত্তেজনশীল অতীত স্মৃতির কোন আধার না থাকিত—তাহা হইলে, কি সাদৃশ্য কি প্রভেদ—কিছুই আমরা চিনিতে পারিতাম না। মধ্যে মধ্যে, ক্ষণে ক্ষণে, আমরা সজ্ঞান হইতাম, কিন্তু কালের অনুবৃত্তি না থাকা প্রযুক্ত, কোন বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান উপর্জ্জন করা আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইত। অতীত ইন্দ্রিয়-বোধের সময় যে সকল আণবিক প্রক্রিয়া উপস্থিত হয়, বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়-বোধানুভবের সময় সেই একই আণবিক প্রক্রিয়া পুনরুত্তেজিত হওয়াই আমাদিগের সাদৃশ্য-জ্ঞানের দৈহিক পত্তন-ভূমি; এবং এক প্রকার আণবিক প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হইতে আর এক প্রকার আণবিক প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তনই আমাদের প্রভেদ-জ্ঞানের দৈহিক পত্তন-ভূমি। অতএব, ইন্দ্রিয়-বোধের কেন্দ্র-সমূহ কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়-বোধের অর্থাৎ কেবল মাত্র তাৎক্ষণিক ইন্দ্রিয়-বোধের যন্ত্র নহে, পরন্তু—তদনুসঙ্গিক মস্তিষ্ক-পরিবর্ত্তন-সমূহের স্থায়িত্ব ও পুনরুত্তেজনশীলতাশক্তি-প্রযুক্ত,—ইন্দ্রিয়-ঘটিত নানা প্রকার সামান্য ও জটিল জ্ঞানক্রিয়ার যন্ত্র-স্বরূপ।

—— c ——

কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন।

বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ও বঙ্গহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রই বোধ হয় শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে "কলিকাতা সারস্বতসম্মিলন" নামক বঙ্গসাহিত্য-বিজ্ঞানদর্শনসঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়িণী একটি সমালোচনী সভা কলিকাতায় স্থাপিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে। তাহার অনুষ্ঠান-পত্র ও নিয়মাবলী হইতে কিয়দংশ এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—ইহা হইতে সকল্পিত ভাষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি পাঠকগণ অবগত হইতে পারিবেন।

"বিদ্বজ্জনগণের একত্র সম্মিলনের অনেকগুলি শুভফল আছে:—

১। সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর দেখাশুনা হয় ও সৌহার্দ্দ জন্মে।

২। পরস্পরের মধ্যে ভাবের ও মতের আদান-প্রদান হওয়ায়, এক-দেশদর্শিতা ঘুচিয়া যায় ও উদারতার বৃদ্ধি হয়।

৩। এই বিদ্বজ্জনসম্মিলনের উপলক্ষে আমাদের বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে বহুবিধ শুভকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যথা—

(ক) বঙ্গভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শনাদির অনুশীলন করিতে হইলে যে সকল নূতন কথা সৃষ্টির আবশ্যক হয়, তাহা আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হইতে পারে ও তৎসঙ্গে বঙ্গভাষার সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ একটি অভিধান সঙ্কলিত হইতে পারে।

(খ) বিদেশীয় ভাষার শব্দসমূহ বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশ করিতে হইলে নূতন যে সকল অক্ষরের আবশ্যক হয় তাহা সৃষ্টি করিয়া প্রচলিত করা যাইতে পারে।

(গ) বাঙ্গালা গ্রন্থের নিরপেক্ষ ও যথাযোগ্য সমালোচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি সাধন হইতে পারে।

(ঘ) সুলেখকদিগকে সভা হইতে যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া যাইতে পারে।

(২) প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করিয়া, অথবা সংবাদপত্র বা সন্দর্ভ-পত্রের সম্পাদকতা করিয়া যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাঙ্গালাভাষার অনুশীলনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

(৩) বাঙ্গালায় গ্রন্থাদি না লিখিলেও যাঁহাকে সভ্যগণ স্বারস্বত-সভার যোগ্য বিবেচনা করিবেন, অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা সভার উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য হইতে পারিবে, তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারিবে।

(৬) সভায় বাঙ্গালাগ্রন্থ-সমূহ বঙ্গভাষায় সমালোচিত হইবে, অথবা ভারতবর্ষসংক্রান্ত কোন বিষয়ক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ অন্য ভাষায় রচিত হইলে, সভায় তাহারও সমালোচনা হইতে পারিবে।

(৯) যে সকল সমালোচ্য গ্রন্থ সভায় উপস্থিত হইবে, সম্পাদক তাহা সভা-সমক্ষে উপস্থিত করিলে, সভাপতি তাহার সমালোচক স্থির করিয়া দিবেন।

(১২) যে অধিবেশনে পুস্তকের সমালোচনা পাঠ হইবে—তাহার পরের অধিবেশনে, লিখিত সমালোচনা, তর্ক-বিতর্কের সারাংশ ও সমালোচ্য গ্রন্থখানি-সম্বন্ধে সভাপতি তাঁহার নিজ মত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবেন।

(১৩) সভার অন্যান্য কার্য্য-বিবরণের সহিত লিখিত সমালোচনের সংক্ষিপ্তসার ও তর্কবিতর্কের সারাংশ এবং তৎসম্বন্ধে সভাপতির অভিপ্রায় সাধারণের অবগতির জন্য কোন প্রসিদ্ধ সন্দর্ভ-পত্রে প্রকাশিত হইবে। সভার যে কোন মত ব্যক্ত হইবে তাহা সভার মত বলিয়া গৃহীত না হইয়া ব্যক্তিগত মতস্বরূপে গৃহীত হইবে।

(১০) সমালোচনা প্রভৃতি কার্য্য না থাকিলে, অথবা কার্য্য শেষ

হইয়াও যথেষ্ট অবসর থাকিলে, সভ্যদিগের মধ্যে কেহ সভার নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়সম্বন্ধে পাঠ অথবা মৌখিক বক্তৃতা বা পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারিবেন ও তাহা লইয়া বাদানুবাদ চলিতে পারিবে। সমালোচনা, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাদির কাজ না থাকিলে সঙ্গীতাদি হইতে পারিবে।"

এতদ্ব্যতীত সভার গঠন-সম্বন্ধে অনেকগুলি আনুষঙ্গিক নিয়ম আছে, তাহা এখানে উল্লেখ করিবার আবশ্যক বোধ হইতেছে না। উল্লিখিত অনুষ্ঠানপত্রের উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া দেখা যায় সভার মুখ্য উদ্দেশ্য তিনটি। প্রথম বঙ্গভাষার অভাবমোচন। দ্বিতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি-সাধন ও উৎসাহ-বর্দ্ধন। তৃতীয়, বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন।

যাঁহারা কিছুমাত্রও বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন যে, বঙ্গভাষা এখনও এতদূর পরিপুষ্ট হয় নাই যে আমাদের সকল ভাব ঐ ভাষায় স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে। বঙ্গভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া আমরা যে পদে পদে অভাব অনুভব করিয়া থাকি, ইহা কে অস্বীকার করিবেন? পাশ্চাত্য-জ্ঞানের সহিত দিন দিন আমাদের যতই পরিচয় বাড়িতেছে, ততই আমরা আমাদের ভাষার দারিদ্র্য অনুভব করিতেছি। নূতন সাহিত্য, নূতন বিজ্ঞান, নূতন রাজশাসন আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, নূতন ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দিন দিন নূতন কথা সৃষ্টির আবশ্যক হইতেছে। এবং এই সৃষ্টি-ক্রিয়া অনেক দিন হইতে আমাদের ভাষায় আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই ইচ্ছামত নূতন কথা সৃষ্টি করিতেছেন, কিন্তু কোন্ কথাটি ঠিক্ তাহার মীমাংসা করে কে? তাহার দৃষ্টান্ত—self-Government-এর অনুবাদে কেহ লিখিতেছেন "আত্ম-শাসন" কেহ লিখিতেছেন "স্বায়ত্ত-শাসন।" (আমাদের মতে "স্বায়ত্ত-শাসন" এই কথায় ঠিক্ ভাবটি প্রকাশ পায়। কেন না, "আত্মশাসন" অর্থে self-

discipline হইতেও পারে।) যাহা হউক, সারস্বত সভার ন্যায় কোন সভা থাকিলে এই সকল বিরোধী মতের একটা মীমাংসা হইতে পারে। আমাদের শব্দ ভাণ্ডার নিতান্ত অপ্রতুল। প্রতি সূক্ষ্মভাব প্রকাশের নিমিত্ত আমাদের ভাষায় তদনুরূপ পৃথক্ পৃথক্ শব্দ নাই; অনেক সময়ে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিতে হয়; যথাঃ—"মত" এই কথাটি আমরা "Opinion" ও "Theory" উভয় অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকি—Personal ও Individual এই দুই শব্দের অনুরূপ পৃথক্ ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, আমাদের দুইটি স্বতন্ত্র কথা নাই। "ব্যক্তিগত" এই এক শব্দই আমরা উভয় অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকি। আমাদের "ভাব" কথাটিতে Feeling, Sentiment, Thought সকলই বুঝায়। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এইভাব প্রকাশের অভাব পূরণ করিবার জন্য শুদ্ধ যে নূতন কথা সৃষ্টি করিবার আবশ্যক এরূপ নহে—ভাবের তারতম্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার জন্য, ও ভাষার অস্পষ্টতা নিবারণের জন্য, কতকগুলি নূতন সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও অক্ষর আমাদের ভাষায় সৃষ্টি করা এক্ষণে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যথা, কোন বাক্যের প্রতি পাঠকের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে, কিম্বা কোন কথায় বিশেষ ঝোঁক দিতে হইলে, ইংরাজি ভাষা-ব্যবহৃত ইটালিক্‌-সের ন্যায় কোন প্রকার বিশেষ ভঙ্গীর অক্ষর ব্যবহার করা এবং দেশ নগর প্রভৃতির আদ্যক্ষর বড় করিয়া লেখা যেরূপ ইংরাজিতে নিয়ম আছে, সেইরূপ কোন প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক বোধ হয়। ইংরাজি অক্ষর V ও Z বাঙ্গালায় প্রকাশ করা যায় না, এই জন্য অনেক সময়ে অসুবিধা হয়। অনেকে, ইংরাজি V অক্ষরের স্থলে অন্তাস্থ ব ব্যবহার না করিয়া অন্তারূপে ভ ব্যবহার করেন। বর্গীয় বএর সহিত প্রভেদ রাখিবার জন্য এই অন্তাস্থ 'ব'-এ কোন প্রকার প্রভেদসূচক চিহ্ন দেওয়া কর্ত্তব্য।

ব্যাকরণঘটিত কতকগুলি বিবেচ্য বিষয় আছে, তাহারও মীমাংসা করা

আবশ্যক। যথা, কেহ লিখেন "তাহারদিগের," কেহ বা লিখেন "তাহা-দিগের;" প্রতি স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষ্যের পূর্ব্বে কেহ বা স্ত্রীলিঙ্গবাচক কেহ বা পুংলিঙ্গবাচক বিশেষণ ব্যবহার করেন। এইরূপ নানা প্রকার বিভিন্ন প্রয়োগ প্রচলিত আছে। এক্ষণে এই সকল বিভিন্ন প্রয়োগের মধ্যে কোন্‌গুলি সুরুচিসঙ্গত ও আমাদের ভাষা-প্রকৃতির ঠিক্ অনুযায়ী তাহা স্থির করা আবশ্যক।

ভাষার এই সকল অভাব মোচন করা সঙ্কল্পিত সারস্বতসম্মিলনের একটি প্রধান কার্য্য। কেহ বলিতে পারেন—এই সকল অভাব কাল-ক্রমে আপনা-আপনিই মোচন হইবে, ইহার জন্য সভার আবশ্যকতা কি?—তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, যে কারণে অন্যান্য বিষয়ে সভা-সমিতির আবশ্যকতা, সেই একই কারণে ভাষার উন্নতিসাধন-পক্ষেও সভা-সমিতির আবশ্যকতা আছে। যে কোন উদ্দেশ্যই হউক না কেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনে যাঁহাদের একরূপ স্বার্থ অনুরাগ ও যোগ্যতা আছে, তাঁহারা যদি একত্র হইয়া সেই সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় যে সেই উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের বলিবার অভিপ্রায় ইহা নহে যে, ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় কোন ফল নাই—বরং আমাদের অভিপ্রায় এই যে, প্রথমে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা না হইলে সাধারণের সমবেত চেষ্টা হইতেই পারে না। সকল কার্য্যেই ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা যেমন আবশ্যক, সমবেত চেষ্টাও তেমনই আবশ্যক। উভয়ই উভয়ের পোষক ও পরিবর্দ্ধক।

এক্ষণে বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধনপক্ষে ব্যক্তিবিশেষের উদ্যম চতুর্দ্দিক হইতে লক্ষিত হইতেছে। এই জন্যই বলিতেছি, সমবেত উদ্যমেরও এক্ষণে সময় আসিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে দেখিতে হইবে, প্রস্তাবিত সভার শাসনে ব্যক্তিগত উদ্যমের লাঘব হইতে পারে কি না।

সে বিষয়েও আমাদের আশঙ্কা নাই ; কারণ, যাহাতে ব্যক্তিবিশেষের মত প্রকাশে বাধা না হয়, বরং যাহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীন মতের আরও স্ফূর্ত্তি হয় তদ্বিষয়ে প্রস্তাবিত সভার বিশেষ লক্ষ্য আছে। সভা এরূপ বলিতেছেন না, সভা হইতে যে মত প্রকাশ হইবে তাহা অকাট্য অভ্রান্ত,—নতশির হইয়া জনসাধারণকে সেই মতের অনুবর্ত্তী হইতেই হইবে। বরং সভার (১৩) সংখ্যক নিয়ম পাঠ করিয়া এইরূপ প্রতীতি হয় যে, কোন সভ্যের কিম্বা সভাপতির মত সভার মত বলিয়া গৃহীত হইবে না। কোন আলোচ্য বিষয়ে সভ্যগণের ও সভাপতির ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র মতগুলিই কেবল সাধারণের অবগতির জন্য কোন বিশেষ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইবে। সেই সকল যোগ্য ব্যক্তিগণের মতামত পাঠ করিয়া জনসাধারণ একটা নিজের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন। ফল কথা, জনসাধারণের উপরেই শেষ বিচারের ভার। কোন এক আলোচ্য বিষয়ের সকল দিক্ গুলি ভাল করিয়া দেখাইয়া দেওয়া মাত্রই সভার কার্য্য, সভার খ্যাতি-প্রতিপত্তির গুরুভারে জনসাধারণের বুদ্ধিকে অভিভূত করা তাহার উদ্দেশ্য নহে।

কেহ কেহ বলেন, সমালোচনায় কি ফল ?—সমালোচনার দ্বারা সাহিত্যের কোন উপকার হয় না। আমরা তাহার উত্তরে ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি, এই উনবিংশ শতাব্দী যে উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিয়াছে, তাহা কেবল সমালোচনার প্রভাবে। লুথরের আবির্ভাব হইতে আধুনিক য়ুরোপে প্রকৃত সমালোচনার যুগ আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে খৃষ্টীয়ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর কাহারও কথা কহিবার অধিকার ছিল না ; পূর্ব্বতন ধর্ম্মাচার্য্যদিগের কথা অকাট্য ও অভ্রান্ত বলিয়া সাধারণ লোকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করিত ; কিন্তু লুথর সাহসপূর্ব্বক তাঁহাদের মতামত সমালোচনা করিয়া য়ুরোপে স্বাধীন জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিলেন। সেই অবধি কি ধর্ম্ম, কি রাজনীতি, কি সাহিত্যবিজ্ঞান

সকল বিষয়েই সাধারণ লোকে নিজ স্বাধীন বুদ্ধি চালনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ব্যক্তিবিশেষের নাম-মাহাত্ম্যের প্রভাব এবং অপরিবর্ত্তনীয় প্রথার শাসন উঠিয়া গিয়া সেই স্থানে স্বাধীন বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইল। বেকন্, ডেকার্ট, গ্যালিলিয়ো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানরাজ্যে স্বাধীনতা স্থাপন করিলেন; রুসো, বল্টেয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতি সমালোচনা করিয়া ফরাসি বিপ্লবের সূত্রপাত করিলেন, এবং সেই ফরাসি বিপ্লবে য়ুরোপের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিস্তৃত ও বদ্ধমুল হইল;—এই সমস্ত কি সমালোচনার ফল নহে? যদি মনুষ্যের সকল কাজেই সমালোচনার শুভ ফল লক্ষিত হয়, তাহা হইলে একমাত্র সাহিত্যই কি তাহার ব্যতিক্রম-স্থল হইবে? সমালোচনার প্রভাব নাকি অতি গূঢ়রূপে, নিস্তব্ধভাবে, ভিতরে ভিতরে কাজ করে, সেই জন্য অমন করিয়া স্পষ্টরূপে সকল সময়ে দেখান যায় না যে অমুক গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে; তাই বলিয়া যে তাহার প্রভাব জনসমাজে পৌঁছে না এরূপ বলা যাইতে পারে না। শিলর, শ্লেগেল, গত্তে প্রভৃতি জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ যদি সেক্সপিয়রের সমালোচনা না করিতেন. তাহা হইলে বোধ হয় ইংরাজদের মধ্যেও অতি অল্প লোকে সেক্সপিয়রের মর্য্যাদা ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিত।

সমালোচনার আবশ্যকতা নানা কারণে দিন দিন বাড়িতেছে। ঘটনাক্রমে য়ুরোপের সমস্ত সাহিত্যভাণ্ডার আমাদের নিকট এক্ষণে উন্মুক্ত: সে সাহিত্যের আদি নাই, অন্ত নাই। যে সকল নূতন নূতন গ্রন্থ প্রতিদিন বাহির হইতেছে, তৎসমস্ত পাঠ করা একজন লোকের পক্ষে অসাধ্য; কাজেই সমালোচকের শরণাপন্ন না হইলে এখন আর উপায় নাই; তিনি যে গ্রন্থকে ভাল বলেন তাহাই আমরা পাঠ করি, যাহাকে মন্দ বলেন তাহা আমরা পাঠ করি না—এইরূপে আমাদের অনেকটা সময় বাঁচিয়া যায়। এক্ষণে আবার য়ুরোপীয় সাহিত্যের

সংসর্গ লাভ করিয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্য নবোদ্যম ও নবজীবন লাভ করিয়াছে, আমাদের সাহিত্যক্ষেত্র হঠাৎ উর্ব্বর হইয়া উঠিয়াছে, গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। য়ুরোপীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিয়া আবার যদি বঙ্গীয় সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়, তাহা হইলে পঞ্চাশৎবর্ষ ব্যাপী বাঙ্গালী-জীবন তাহাতে কুলায় কি না সন্দেহ, সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রেও এক্ষণে সমালোচকের আবশ্যক হইয়াছে।

প্রস্তাবিত সভার একটি নিয়ম পাঠ করিয়া দেখা যায় যে, কেবল উৎকৃষ্ট গ্রন্থকারগণই যে এই সভার সভ্য হইতে পারেন এরূপ নহে, বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই, অধিকাংশের মতে সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। কেহ বলিতে পারেন, যাঁহারা নিজে কোন বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া সুরুচি ও ক্ষমতার পরিচয় দেন নাই, তাঁহারা কি করিয়া সেই বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচক হইতে পারেন? কিন্তু তাহার উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উৎকৃষ্ট গ্রন্থকার না হইলেও উৎকৃষ্ট সমালোচক হওয়া যাইতে পারে। আমি গায়ক না হইতে পারি কিন্তু গানের সমজদার হইতে পারি। আমি কবি না হইতেও পারি, কিন্তু আমি কবিত্বের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি। বরং অনেক সময়ে গ্রন্থকার অপেক্ষা গ্রন্থ-সমলোচক, কোন গ্রন্থের দোষগুণ শীঘ্র ধরিতে পারেন। কারণ, গ্রন্থকার তাঁহার নিজের একঝোঁকা ভাবে এতদূর নীয়মান হন যে চারিদিক দেখিবার তাঁহার ক্ষমতা থাকে না, অবসরও থাকে না। দাবা খেলার সময় যাহারা খেলায় যোগ না দিয়া কেবল নিরপেক্ষ ভাবে দর্শন করে, তাহারা যেরূপ অনেক সময়ে 'উপর-চাল' দেখিতে পায়, খেলোয়াড়েরা সেরূপ পারে না।

কিন্তু সমালোচনার কাজ বড় সহজ নহে। সমালোচকের কতখানি দায়িত্ব তাহা অনেক সময় সমালোচক বুঝেন না। সাধারণ লোকে অনেক সময়ে খ্যাতনামা সমালোচকদের কথার উপর নির্ভর

করিয়াই কোন নূতন গ্রন্থের ভাল মন্দ স্থির করেন। অতএব এরূপ স্থলে, সমালোচক যদি দলাদলী কিম্বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কোন গ্রন্থের অযথা নিন্দাবাদ করেন, তাহা হইলে তিনি সাহিত্য-সংসারের যে কতদুর অনিষ্ট করেন তাহা বলা যায় না। কতকগুলি সমালোচক গুণের প্রতি বড় মনোযোগ দিতে ভালবাসেন না—তাঁহারা ছিদ্রানুসন্ধানেই বিশেষ আমোদ পান। তাঁহাদের সম্বন্ধে এই সংস্কৃত শ্লোকটি বেশ খাটে,—"মক্ষিকাঃ ব্রণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ষট্পদাঃ।" আমাদের বলিবার অভিপ্রায় ইহা নহে যে, কোন গ্রন্থে দোষ থাকিলে তাহা দেখাইয়া দিবে না—কেন না দোষগুণ উভয়ই না দেখাইয়া দিলে প্রকৃত সমালোচনাই হয় না; তবে, অধিকাংশ সমালোচকের নিন্দা করিবার দিকে যে অসাধারণ প্রবণতা ও ইচ্ছা প্রকাশ পায়, সেইটিই দূষণীয়। আমাদের কোন বন্ধুকে অমরা তাঁহার দোষ গুণের কথা যেরূপ ভাবে বলিয়া থাকি, সেরূপ বন্ধুভাবে কোন গ্রন্থের সমালোচনা করিলে সাহিত্যের যতখানি উপকার হয়, নির্দ্দয় কঠোরভাবে সমালোচনা করিলে সেরূপ উপকার না হইয়া প্রত্যুত সমূহ অপকারই হয়। দোষ থাকিলে ভাল কথা বলিয়া দোষ সংশোধন করিবার চেষ্টা কর, তীব্র বিদ্রূপ ও কঠোর উপহাসের বাণ বর্ষণ করিয়া গ্রন্থকারের হৃদয়ে অনর্থক কষ্ট দেওয়া কেন? এইরূপ কঠোর সমালোচনাই আজ কালের ধরণ হইয়াছে। কঠোর সমালোচনার আবশ্যকতা যে একেবার নাই আমরা তাহা বলি না। যখন কোন গ্রন্থকার অশ্লীল ভাবা প্রয়োগ করিয়া কিম্বা কোন প্রকার দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া কোন গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে প্রখর তীব্র লেখনী ধারণ করা অতীব কর্ত্তব্য। গ্রন্থকারের ক্ষমতার অভাবে গ্রন্থে যে সকল দোষ লক্ষিত হয়, তৎসম্বন্ধে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়া গ্রন্থকারের সূক্ষ্মশরীরে আঘাত দেওয়া নিষ্ঠুরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সহৃদয় সমালোচকের এরূপ করা কখনই উচিত নহে।

সাহিত্যের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, কঠোর সমালোচনায় কত গ্রন্থ-কারের মুকুলিত আশা-উদ্যম মুকুলেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এমন কি, কেহ কেহ লেখনীর তীব্র বিষাক্ত আঘাতে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। অনেকে বলেন, Keats কবির যে অকাল-মৃত্যু হয়, তীব্র সমালোচনাই তাহার কারণ। কবিবর Tasso কঠোর সমালোচনায় ব্যথিত হইয়া উন্মাদগ্রস্ত হয়েন। Montesquieu কঠোর সমালোচনার আঘাতে শীঘ্র মৃত্যু-মুখে পতিত হন। নিন্দুক সমালোচকদের হৃদয়-ভেদী সমালোচনায় কবিবর Shelly দেশত্যাগী হয়েন। তাহার পর হইতে সমস্ত জীবন তিনি অসুখে কালযাপন করেন। তিনি তাঁহার বন্ধু Leigh Hunt কে যে পত্র লেখেন তাহা পাঠ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তিনি লিখিয়াছিলেন "আমার বুদ্ধিবৃত্তি-সকল চূর্ণ বিচূর্ণ ও জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি আর কিছুই লিখিতে পারি না। যাহা লেখা যায় তাহাতে অন্যের নিকট সহানুভূতি পাইব এইরূপ প্রবল উত্তেজনা না থাকিলে কাহারও পক্ষে লেখা অসম্ভব।"

সমালোচনা যে কত দূর গুরুতর কার্য্য—অনেক সময়ে সমালোচক তাহা বোঝেন না; তিনি মনে করেন, দুই এক কলম যা-তা একটা লিখিয়া দিলেই হইল। "প্রাঞ্জলতা" "ওজস্বিতা" "সরলতা" "চিন্তাশীলতা" "গবেষণা" "স্থানেস্থানেভাল"—"মন্দ নহে"—ভবিষ্যতে ভাল হইতে পারে।" "এরূপ গ্রন্থ যত বাহির হয় ততই ভাল" ইত্যাদি কতকগুলি বাঁধি বোল্ তাঁহাদের একমাত্র পুঁজি। সমালোচনার হাঁড়ি চড়াইয়া দিয়া এইরূপ দুই চারিটি বাঁধি-বোলের ফোড়ন তাহাতে ছাড়িয়া দিয়া চট্পট্ করিয়া যে-সে লোক একটা অপূর্ব্ব অপক্ক খিচুড়ি অনায়াসে প্রস্তুত করিতে পারে সন্দেহ নাই। আজকাল আমাদের সন্দর্ভ-পত্রে ও সংবাদপত্রে, গ্রন্থের সমালোচনা-কার্য্য যেরূপভাবে সম্পাদিত হয় তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেই এই বিষয়ের যথার্থতা উপলব্ধি হইবে। সমালোচনার্থ সম্পাদকের

নিকট কোন গ্রন্থ আসিলে তিনি তাঁহার কোন বন্ধুকে সমালোচনার ভার দেন; সে গ্রন্থটি সমালোচনা করিবার যোগ্যতা তাঁহার আছে কি না, সে বিষয়ে তিনি বড় একটা দৃষ্টি করেন না। তাঁর বন্ধু গ্রন্থখানি ভাল করিয়া পাঠ না করিয়াই হয়ত যা-তা একটা লিখিয়া দিলেন—তাহাতে তাঁহার নাম রহিল না; বাহিরের লোক মনে করিল—সম্পাদকই তাহা লিখিয়াছেন। এই প্রণালী-অনুসারে অতি কদর্য্য লেখাও সম্পাদকের নাম-মাহাত্ম্যে বিকাইয়া যায়। এইরূপ বেনামী লেখার অনেক দোষ।

মৃত লর্ড লিটন বেনামী সমালোচনার দোষগুণ বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন;—"কেবল দুই শ্রেণীর লোকের নিকট বেনামী সমালোচনা প্রার্থনীয় হইতে পারে; যে ব্যক্তি বন্ধুদিগের অন্যায় নিন্দা করিয়া ভয় করে পাছে বন্ধুরা তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে ত্যাগ করে, এবং যে মিথ্যাবাদী পামর ভয় করে পাছে তাহার নিন্দার পাত্র তাহাকে চাব্‌কাইয়া দেয়।" এই সমালোচনার অভাব পুরণ করা প্রস্তাবিত সভার অন্যতর উদ্দেশ্য। এইসভা হইতে কোন বেনামী সমালোচনা প্রকাশ হইবে না; সভাপতি ও সভ্যগণের ব্যক্তিগত মতামত নাম দিয়া প্রকাশিত হইবে। অতএব, বেনামী সমালোচনার দোষ ইহাতে বর্ত্তিবে না।

সভার স্থায়িত্বের প্রতি এখন কেবল একটি মাত্র সংশয় আছে। আমাদের সাহিত্য-সংসারে অনেকগুলি দলপতি। প্রায় সকল দলপতিই এক স্থানে সমবেত হইয়াছেন; এক্ষণে যদি তাঁহারা ক্ষুদ্র দলাদলির ভাব ত্যাগ করিয়া, নিজের ক্ষুদ্র অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া, উৎসাহের সহিত এক হৃদয়ে সরস্বতীর সেবায় নিযুক্ত হন তবেই সারস্বত সম্মিলনের পক্ষে মঙ্গল, নচেৎ যে আয়োজন করা হইতেছে,—সে কেবল বাঙ্গালীর আর একটি কলঙ্ক-ধ্বজা স্থাপনের নিমিত্ত!

---o---

মারাঠী ও বাঙ্গলা।

আজ কাল ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের ভাষা শিক্ষা ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন—ইহা একটী শুভ-চিহ্ন বলিতে হইবে। ভারতবাসীদিগের মধ্যে একতা স্থাপিত হইবার পক্ষে যতগুলি বাধা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ভাষার বাধাও বড় একটী কম নহে। সচরাচর, ভারতবর্ষকে একটী দেশ বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাকে একটী মহাদেশ অথবা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। য়ুরোপ-খণ্ডের মধ্যে যেরূপ ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মণ প্রভৃতি ভাষা,—ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সেইরূপ বাঙ্গলা, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি বিবিধ ভাষা প্রচলিত। আজ কাল, রেল-পথের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দূরত্বের বাধা ক্রমশই অপসারিত হইতেছে এবং আমাদিগের রাষ্ট্রীয়-সভার অধিবেশন-উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসী পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে ভাষার বন্ধন ও একতা না থাকা প্রযুক্ত তেমন আশানুরূপ ফল লাভ হইতেছে না। ইংরাজী ভাষায় একরূপ কাজ চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু এই নিতান্ত পরকীয় ভাষার অবলম্বনে আমরা পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারি না। ভাষা-সম্বন্ধে আমাদের নিকট একজন ইংরাজও যেরূপ, একজন মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুও সেইরূপ। উভয়েরই সহিত ইংরাজী ভাষায় আমাদিগের কথাবার্ত্তা চালাইতে হয়। ইহা কম অসুবিধার কথা নহে। এই ভাষার বাধা একেবারে অপসারিত হইবারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। গণনা করিয়া দেখিলে, আমাদিগের প্রাদেশিক ভাষার সংখ্যা, বোধ করি, দ্বাদশেরও অধিক হইবে। এক বোম্বাই অঞ্চলের মধ্যেই তো কতকগুলি ভাষা। এই সকল ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে আমাদের প্রত্যেকের এক একটী

"সার উইলিয়ম জোন্স্" না হইলে চলে না। তবে, এই পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে—যাহার যতটুকু সাধ্য, আপনার ভাষা ছাড়া, আরও দুই একটী প্রাদেশিক ভাষা লিখিবার চেষ্টা করা;—তাহা হইলেও কতকটা কাজ হয়। বিশেষতঃ, যে উপভাষাগুলির মধ্যে নৈকট্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান—প্রাকৃত হইতে যাহাদিগের উৎপত্তি—সেই সকল ভাষার অনুশীলনে, আর কিছু না হউক, অন্ততঃ নিজ নিজ ভাষার ব্যুৎপত্তি বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভ হইতে পারে। মারাঠী ও বাঙ্গলার মধ্যে এইরূপ নিকট-সম্বন্ধ বর্ত্তমান—উভয়ই এক জননী হইতে প্রসূত। সুতরাং মারাঠী ভাষার আলোচনায়, বাঙ্গলা ভাষারও কতকটা উপকার হইতে পারে। গত পৌষ মাসের "সাধনা"য় "মহারাষ্ট্রীয় ভাষা" এই নামে যে একটী সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে লেখক মহাশয় মারাঠী ভাষার উৎপত্তি এবং বাঙ্গলা ও মারাঠী শব্দের ঐক্যানৈক্য সম্বন্ধে বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। তাহারই অনুবৃত্তি স্বরূপ, দুই চারিটী কথা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মারাঠী ও বাঙ্গলা ভাষার গঠনে দুই একটী মূলগত প্রভেদ লক্ষিত হয়। মারাঠী ভাষায় তিন লিঙ্গ;—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। এই লিঙ্গভেদ প্রকরণ সকল সময়ে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নিষ্পন্ন হয় না। "দউত" (দোয়াৎ) শব্দ, "বাট" (পথ) শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; "বাস" (গন্ধ) শব্দ পুংলিঙ্গ; "মাঞ্জর" (মার্জ্জার-বিড়াল) শব্দ ক্লীবলিঙ্গ; "কুত্রা" (কুকুর) শব্দ পুংলিঙ্গ; "মনুষ্য" শব্দ কখনও পুংলিঙ্গ, কখনও ক্লীবলিঙ্গ। "বাট" শব্দ কেন স্ত্রীলিঙ্গ, এবং "মাঞ্জর" শব্দ কেন ক্লীবলিঙ্গ হইল, ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। চির-প্রচলিত ব্যবহারই ইহার একমাত্র কারণ। নাম ও সর্ব্বনামের লিঙ্গ অনুসারে, স্থলবিশেষে, ক্রিয়াপদের বিভক্তিতে রূপান্তর উপস্থিত হয়। বক্তা স্ত্রীলোক হইলে, "মী করিত্যে" (আমি করি) পুরুষ হইলে "মী

করিতো” এইরূপ প্রয়োগ হয়। এ গেল, কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগ। আবার কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগের সময়, কর্ত্তা যে লিঙ্গেরই হউক না, তাহার লিঙ্গ অনুসারে ক্রিয়াপদ পরিবর্ত্তিত না হইয়া, কর্ম্মপদের লিঙ্গ অনুসারে ক্রিয়া-পদের রূপান্তর হয়। যথা “মী কাম কেলে” (আমি কাজ করিতেছি—অথবা আমরা কর্ত্তৃক কাজ কৃত হয়েছে) “মী বাট পাহিলী” (আমি পথ দেখেছি—অথবা আমা কর্ত্তৃক পথ দেখা হইয়াছে) এই দুই বাক্যের মধ্যে “কাম” ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া “কেলে” এই ক্রিয়াপদ একারান্ত হইল এবং “বাট শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া “পাহিলী” এই ক্রিয়াপদ ঈকারান্ত হইল। ইহা কতকটা হিন্দী ভাষার অনুরূপ। আর এক প্রভেদ ;—বাঙ্গলায়, বহুবচনে ক্রিয়ার বিভক্তিতে কোন রূপান্তর হয় না, কিন্তু মারাঠী ভাষায় তাহা হইয়া থাকে। যথা,—“সে করে,” “তাহারা করে” ;—এই দুই বাক্যগত ক্রিয়াপদের রূপ একই ; কিন্তু মারাঠী ভাষায় এই স্থলে “তো করিতো”, “তে করিতাত” এইরূপ হইয়া থাকে। আরও কিছু কিছু প্রভেদ আছে। তাহা এখানে বলা অনাবশ্যক।

এই সকল কারণে,—বিশেষতঃ লিঙ্গভেদের কোন নিয়ম না থাকায়, কোন বৈদেশিকের পক্ষে মারাঠী ভাষায় শুদ্ধরূপে কথা কহা বড়ই কঠিন। পদে পদে তাঁহার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। বাঙ্গলায় লিঙ্গ-ভেদের কোন কড়াকড় নিয়ম নাই—এক প্রকার ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। আমরা ভাষার সৌন্দর্য্য ও উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, স্থলবিশেষে কখন বা “সুন্দরী ললনা” কখন বা “সুন্দর মেয়েটী” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি। এ বিষয়ে মারাঠী ভাষায় আবার একটু স্বতন্ত্র নিয়ম। যে বিশেষ্য শব্দগুলি খাস মারাঠী, বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে সেই সকল বিশেষণ পদের লিঙ্গভেদ হইয়া থাকে—কিন্তু যে সকল বিশেষণ পদ খাস সংস্কৃত তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। “মারাঠী “চাঙ্গলা” (ভাল-সুন্দর) শব্দ যখন স্ত্রী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, তখন

"চাঙ্গলী" এইরূপ প্রয়োগ হয়—কিন্তু "সুন্দরী" এই শব্দ, কোন স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে বসে না। "চাঙ্গলা বায়কো" (ভাল স্ত্রী) ও "সুন্দর স্ত্রী" এইরূপ প্রয়োগ হয়—কিন্তু "চাঙ্গলী বায়কো" (সুন্দরী স্ত্রী) এইরূপ প্রয়োগ কখনই হয় না। বাঙ্গলায় এই বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ স্বাধীনতা আছে। আমার বোধ হয়, কোন ভাষার মধ্যে কৃত্রিম নিয়মের যতই বাঁধাবাঁধি ও আঁটাআঁটি, ভাবস্ফূর্ত্তির পক্ষে ততই ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু মারাঠী ভাষায় এরূপ কৃত্রিম বাধাসত্ত্বেও, মারাঠী কবি মোরপন্ত কর্ত্তৃক ১৫৮ প্রকারের পদ্য-রামায়ণ রচিত হইয়াছে। ইহা সামান্য বাহাদুরী নহে। মোরোপন্তরচিত একটী রামায়ণের নাম "পরন্তু রামায়ণ" —অর্থাৎ, ইহার প্রত্যেক শ্লোকে "পরন্তু" এই শব্দটী কোন্ প্রকারে ঘটানো হইয়াছে। এই শব্দ-মল্ল কবিদিগের রচনায়, ভাব অপেক্ষা কথার কৌশলই অধিক। ফরাসী ভাষার মধ্যে এইরূপ লিঙ্গভেদের কৃত্রিমতা লক্ষিত হয়। কতকটা এই কারণে হয় তো ইংরাজী কবিতা ফরাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। কবিতাতে কতকটা বন্ধন আবশ্যক বটে, কিন্তু অতিবন্ধনও দোষাবহ। এই বন্ধন হইতে মুক্তি-লাভের জন্যই অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। সে যাহোক, ভাষার লিঙ্গভেদ রাখা যে একেবারেই দোষের, আমি এ কথা বলি না। তবে, মারাঠী ও ফরাসী ভাষার ন্যায় অতটা কৃত্রিম বাড়াবাড়ি ভাল নহে। লিঙ্গভেদে ভাষার কতকটা সুবিধাও আছে। সর্ব্বনামের মধ্যে লিঙ্গভেদ থাকায়, অনেক সময়, ভাষার অস্পষ্টতা নিবারণ হয় এবং বারম্বার নামের পুনরুক্তি করিতে হয় না। বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ লিঙ্গভেদ না থাকায়, সর্ব্বনাম ব্যবহার না করিয়া আসল নামই, অনেক সময়, পুনরাবৃত্তি করিতে আমরা বাধ্য হই। ইহাতে ভাষার জোরও কতকটা কমিয়া যায়।

বাঙ্গলা ভাষা অপেক্ষা, মারাঠী ভাষায় নাম ও সর্ব্বনামের বহুবচন

অতি শোভন ও সহজ ভাবে নিষ্পন্ন হয়। বাঙ্গলায়, "তোমার" এই পদের বহু বচনে "তোমাদের" বলিতে হইবে। সেই স্থলে মারাঠীতে "তুম্‌চা"-র বহু বচনে "তুম্‌চে" এইরূপ প্রয়োগ হয়। তা ছাড়া, বাঙ্গলা ভাষায় বস্তুবাচক নাম কিম্বা সর্ব্বনামের বহুবচন নিষ্পন্ন করিতে হইলে "সকল," "সমূহ" প্রভৃতি কথা জুড়িয়া দিতে হয়। "হেঁ"র বহু বচনে যেখানে "হীঁ" বলিলেই চলে, বাঙ্গলায় সেই স্থলে "এই"—র বহু বচনে "এই-সকল" বলিতে হয়। ফল কথা, ব্যাকরণের দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে, বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী ভাষার গঠন যে অধিকতর পরিপুষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর এক কথা, বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী জোরালো। তাহার প্রধান কারণ, বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী ভাষায় রূঢ়িক ক্রিয়াপদ অধিক আছে। বাঙ্গলা ভাষায়, বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সহিত 'কৃ' ও 'ভূ'-ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ যোগ করিয়া অধিকাংশ ক্রিয়াপদ সংগঠিত। এইরূপ যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রয়োগে ভাষার জোর কমিয়া যায়। আমাদের কবিবর মাইকেল মধুসূদন, কবিতার ভাষায় বলবিধান করিবার জন্যই অনেক রূঢ়িক ক্রিয়াপদ রচনা করিয়া স্বীয় কবিতা মধ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সকল অভিনব ক্রিয়াপদের প্রয়োগ, সেই সময়ে, অনেকেরই অসহ্য মনে হইয়াছিল। পদ্যেই যখন এইরূপ—গদ্যের তো কথাই নাই। ফল কথা, এই প্রকার প্রয়োগ অধিক পরিমাণে আমাদের ভাষায় চলে না—ইহা বাঙ্গলার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আমরা বাঙ্গলা গদ্যে, "রুষিছে" কিম্বা "লাজিছে"—এইরূপ বাক্য, কখনই প্রয়োগ করিতে পারি না। কিন্তু মারাঠী ভাষায় এইরূপ রূঢ়িক ক্রিয়াপদের প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী যে জোরালো, তাহা এই উভয় ভাষার উচ্চারণেই কতকটা প্রকাশ পায়। মারাঠীর উচ্চারণ অনেকটা সংস্কৃতের

অনুরূপ। যদিও মারাঠী অপেক্ষা বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ অধিক, তথাপি কোন মারাঠীর সম্মুখে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিলে, তাহার মধ্যে যে, কোন সংস্কৃত শব্দ আছে, এরূপ তাঁহার অনুভবই হয় না। আমাদের বিকৃত উচ্চারণই ইহার একমাত্র কারণ। আমাদিগের সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ যতই দিগ্‌গজ পণ্ডিত হউন না কেন, এই উচ্চারণের দোষে তাঁহারা অন্য প্রদেশীয় লোকদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন। সংস্কৃত, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় উচ্চারণের মুখ্য গতি যেরূপ খোলা আকারের দিকে, বাঙ্গলা ভাষার উচ্চারণপ্রবণতা সেইরূপ বোজা ও-কারের দিকে। আমার বোধ হয়, শারীরিক দুর্ব্বলতাই ইহার মূল-কারণ। বাঙ্গালী অপেক্ষা মারাঠীদিগকে দেখিতে যেরূপ মজবুৎ, উহাদের ভাষাতেও সেইরূপ অধিক বলের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেহ যেরূপ ক্ষীণ ও সুকুমার, আমাদের ভাষাও সেইরূপ।

পক্ষান্তরে বাঙ্গলা ভাষা মারাঠী অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সুললিত ও পরিমার্জ্জিত। মারাঠী ভাষার জোর, যেন একটু রূঢ়তার সীমায় গিয়া উপনীত হইয়াছে। 'ড়', 'ঢ', 'ণ', এই সকল কাঠ-খোট্টা কঠিন বর্ণ সকল মারাঠী ভাষায় বারম্বার শুনিতে পাওয়া যায়। মারাঠী ভাষা প্রথম শুনিলে মনে হয় যেন উহা উড়িয়া ও হিন্দী এই দুই ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মারাঠী ভাষার উচ্চারণে 'ড়', 'ঢ়' প্রভৃতি অক্ষর যেরূপ ক্রমাগত আমাদের কাণে আইসে, বাঙ্গলা ভাষার উচ্চারণে সেইরূপ 'চ', 'ছ'. অক্ষর মারাঠীদিগের কাণে বারম্বার উপস্থিত হয়। মারাঠী ভাষায় দুই চারিটী বর্ণের উচ্চারণেও একটু বিশেষত্ব আছে—উহা সংস্কৃতের অনুরূপ নহে। মারাঠীতে 'ল' এই অক্ষরের উচ্চারণ দুই প্রকার;—এক, সাদাসিধা ল-য়ের মত; আর এক, কতকটা আমাদের 'ড়'-এর মত। মারাঠীদিগের 'ড়'-এর উচ্চারণ অনেকটা 'ড'-ঘেঁসিয়া। উহাদের মধ্যে চ, ছ, ঝ,—এই অক্ষরগুলিরও

দুই প্রকার উচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায়। এক উচ্চারণ, আমাদের ন্যায়; আর এক উচ্চারণ, কতকটা আমাদের পূর্ব্ববঙ্গীয়দিগের ন্যায়। এই সকল বিভিন্ন উচ্চারণের স্বতন্ত্র লিপিচিহ্ন-পদ্ধতি আমাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ, ইংরাজী শব্দ বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিবার সময় এই সম্বন্ধে অসুবিধা বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। মহারাষ্ট্রীয়েরা তবু, এ বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা একটু অগ্রসর। ইংরাজী স্বরবর্ণের বিভিন্ন উচ্চারণ-প্রকাশক দুই একটী চিহ্ন তাঁহারা পুস্তকাদি ছাপাইবার সময় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "ইটালিক্স্" এর স্থলে একটু বড় ও মোটা অক্ষর ব্যবহৃত হয়। ইংরাজী v অক্ষর মরাঠীতে লিখিবার সময় "হ্ব" এই যুক্তাক্ষর তাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। গভর্ণমেণ্ট" না লিখিয়া তাঁহারা "গহ্বর্ণমেণ্ট" লিখেন। এইরূপ লিখিলে, ইংরাজী v অক্ষরের অনেকটা কাছাকাছি শুনায়।

বাঙ্গলা ভাষায় যদি একটী ভাল অভিধান প্রস্তুত করিতে হয়—যদি প্রচলিত দেশজ শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা আবশ্যক হয়, তবে মারাঠী প্রভৃতি প্রাকৃতের অপভ্রংশ ভাষাগুলির অনুশীলন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহার একটী দৃষ্টান্ত—যথা,—আমাদের "আনাড়ি" শব্দ;—এই শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? মারাঠী ভাষাতে আড়ানী বলিয়া একটী শব্দ আছে উহার প্রায় একই অর্থ। হইতে পারে "আড়ানী" এই শব্দটি উল্টাইয়া "আনাড়ি" শব্দে পরিণত হইয়াছে। মারাঠী পণ্ডিতগণ বলেন, "অজ্ঞানী" হইতে "আড়ানী" শব্দ উৎপন্ন।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষার অনুশীলনে আর একটী উপকার আছে। আজকাল আমরা ইংরাজী বিদ্যা ও সাহিত্যের সংশ্রবে অনেক নূতন কথা ও নূতন ভাব অর্জ্জন করিতেছি। এই সকল ভাব আমাদের দেশ-ভাষায় প্রকাশ করা আবশ্যক হওয়ায়, কি মারহাটি, কি বাঙ্গালী আমরা উভয়েই এই সকল কথা ও ভাবের অনুরূপ শব্দ রচনা ও সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত

হইয়াছি। আমাদের উভয়েরই সাধারণ শব্দ-ভাণ্ডার—সংস্কৃত ভাষা। অতএব আমাদের উভয়ের রচিত ও সংগৃহীত প্রতিশব্দগুলি যদি পরস্পর মিলাইয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব সেগুলি যথাযত হইতেছে কি না। যদি তাহাদিগের মধ্যে অমিল দেখি, তাহা হইলে আমাদিগের মনে স্বভাবতঃই সংশয় উপস্থিত হয়, এবং তখন, কোন্ প্রতিশব্দটী ঠিক্, তাহা আর একবার আমরা বিচার করিয়া দেখিতে পারি। দৃষ্টান্ত যথা, দুটী ইংরাজী শব্দ "nerve" ও "muscle"। ইহাদের প্রতিশব্দ কি ? আমরা "nerve"কে স্নায়ু বলি। মারাঠীতে "muscle"কে স্নায়ু বলে ও "nerve"কে মজ্জাতন্তু বলে। চরক প্রভৃতি পুরাতন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে স্নায়ুর যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা অতি অস্পষ্ট, তাহা হইতে প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা সুকঠিন। ইংরাজী "sinews" শব্দের সহিত "স্নায়ু" শব্দের কতকটা সাদৃশ্য আছে। এই জন্য মনে হয়, স্নায়ু "muscle" শব্দের প্রতিশব্দ হইলেও হইতে পারে।

"মহারাষ্ট্রীয় ভাষা"য় লেখক মহাশয় ইতিপূর্ব্বে মারাঠী ও বাঙ্গলা প্রতিশব্দের তুলনা করিয়া কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। আমিও আর কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

রাষ্ট্রীয় সভা (National Congress) রাষ্ট্রীয় স্তোত্র (National Anthem) সংস্থা (Institution) অনুক্রম-পত্র (Programme) আবৃত্তি (Edition) পদবীদান-সমারম্ভ (Convocation) স্থানিক স্বরাজ্য (Local self-government) ব্যবস্থাপক মণ্ডলী অথবা অন্তরঙ্গ সভা (Executive committee) অধ্যক্ষ (President) উপাধ্যক্ষ (Vice president) প্রমুখ (Chairman) মন্ত্রী (Secretary) দেশ-বান্ধব (Fellow-countryman) স্বাগত-সভা (Reception committee) মৃত্যু-পত্র (Will) আরোপী (Accused) প্রেক্ষক (Visitor) সাংস্থান (Native states) ভূত-দয়া (Humanity.)

উপরোক্ত শব্দগুলি বাঙ্গলা প্রতিশব্দের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, উহার মধ্যে কোন কোন শব্দ, বাঙ্গলা অপেক্ষা সুরচিত বলিয়া মনে হয়। "জাতীয় সভা" অপেক্ষা "রাষ্ট্রীয় সভা" আখ্যাটী অধিকতর উপযুক্ত; কেননা, যে সভার অন্তর্ভুত হিন্দু, মুসলমান, পারসী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোক, তাহাকে জাতীয় সভা না বলিয়া "রাষ্ট্রীয় সভা" বলাই সঙ্গত। "দেশ-বান্ধব" কথাটী মন্দ নয়। Institution শব্দের বাঙ্গলা কোন প্রতিশব্দ প্রচলিত আছে কি না বলিতে পারি না; কখন কখন, অনুষ্ঠান-শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু উহা ঠিক্ নহে। বরং "প্রতিষ্ঠান" এই অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মারাঠী "সংস্থা" শব্দ কি বাঙ্গলায় গ্রহণ করা যায় না? Edition এই শব্দের মারাঠী প্রতিশব্দ "আবৃত্তি" ও বাঙ্গলা প্রতিশব্দ "সংস্করণ"; এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক্? অনুক্রম-পত্র (Programme) ইহার স্থলে "অনুক্রমণিকা" বলিলে কি চলে না? "রাষ্ট্রীয় স্তোত্র"—National anthem-এর সুন্দর প্রতিশব্দ।

আর কতকগুলি ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের মারাঠী প্রতিশব্দ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—

উত্তর ধ্রুব (North Pole) গুরুত্ব-মধ্য (Centre of gravity) বর্গ (Class) "চতুর্থ ইয়ত্তা" (Fourth Standard) বাতাবরণ (Atmosphere) ভূশির (Cape) দ্বীপকল্প (Peninsula) দীর্ঘ-বর্ত্তুল (Ellipse) উপপদ (Article) সিদ্ধ বা অব্যুৎপন্ন শব্দ (Primitive word) সাধিত বা ব্যুৎপন্ন (Derivative word) উভয়াম্বয়ী (Con-junction) শব্দযোগী (Post-position) কেবল-প্রয়োগী অথবা উদ্গারবাচী (Interjection) দর্শক সর্ব্বনাম (Demonstrative Pronoun) স্বল্প-বিরাম চিহ্ন (Comma) অৰ্দ্ধ-বিরাম চিহ্ন (Semi-colon) অপূর্ণ-বিরাম চিহ্ন (Colon) পূর্ণ-বিরাম চিহ্ন (Full stop)

করণ-রূপ (Positive form) অকরণরূপ (Negative form) আখ্যাতরূপ (Conjugation) উদ্গার-চিহ্ন (Sign of admiration) শক্যার্থ (Potential mood) স্বার্থ (Indicative mood) সংকেতার্থ (Conditional mood) প্রয়োজক ক্রিয়াপদ (Causal verb) পক্ষান্তর বাচক (Alternative) স্নায়ুবন্ধন (Tendon) মজ্জাতন্তু (Nerve) কর্ণিকা (Auricle) মধ্যপর্দ্দা (Diaphragm) পরশু (Rib) কুর্চ্চাস্থি (Cartilage). জীবনেন্দ্রিয়-শাস্ত্র (Physiology) দ্বাদশাঙ্গুলান্ত্র (Duodemum) দ্বিশির স্নায়ু (Biceps) অস্থিবন্ধন (Ligament) মনঃপ্রেরণা (Mental transmission) রক্তাভিসরণ (Circulation of blood) রক্ত-পিণ্ড (Corpuscle) রক্তসঙ্কলন (Congestion) রক্তদ্রব (Serum) অন্তর্মিশ্রণ (Assimilation) আর্দ্রত্বচ (Mucus membrane ; দুগ্ধবাহিনী (Lactile) পরাবর্ত্তন (Reflection) বক্রীভবন (Refraction) ব্যাপক-ব্যাপ্য অনুমান অথবা ব্যাপকানুমান (Induction) ব্যাপক-ব্যাপ্য অনুমান অথবা ব্যাপ্যানুমান (Deduction) সন্ধায়ক (Copula) ত্র্যবয়ব অনুমান-বাক্য (Sylogism) ব্যাপ্যানুমান-বিষয়ী ন্যায় (Deductive Logic) জাতিবর্গ (Genus) অন্তর্জাতি (Species) কাদাচিৎক (Incidental) বিধায়ক বাক্য (Positive proposition) নিষেধকবাক্য (Negative proposition কাট কোণ (Right angle) বিশাল কোণ (Obtuse angle) লঘু কোণ (Acute angle) বায়ুভার-মাপক (Barometre) উষ্ণতামাপক (Thermometre) বর্গীকরণ (Classification) সমুদায়ীকরণ (Generalization) কার্য্যানুক্রম (Process) নিরোধ (Resistance)

উল্লিখিত পারিভাষিক শব্দের মধ্যে দুই চারিটী কথা আমরা বোধ হয় গ্রহণ করিতে পারি। ইহার মধ্যে কতকগুলি শব্দ আমাদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। Induction ও Deduction ইহাদের প্রতিশব্দ

বাঙ্গলায় আছে কি না জানি না। যদি না থাকে, তবে আমরা "ব্যাপকানুমান" ও "ব্যাপ্যানুমান" এই দুইটী শব্দ বোধ হয় গ্রহণ করিতে পারি। বাঙ্গলা "অন্তরীপ" অপেক্ষা "ভূশির" আমার বোধ হয়, Capeএর ঠিক প্রতিশব্দ। কেননা "অন্তরীপ" অর্থে দ্বীপ বুঝাইলেও বুঝাইতে পারে। আমাদিগের "উপদ্বীপ" অপেক্ষা মারাঠী "দ্বীপকল্প" শব্দটী Peninsula-র ঠিক্ প্রতিশব্দ। কেননা, উপদ্বীপ শব্দে ক্ষুদ্র দ্বীপও বুঝাইতে পারে। বিদ্যালয়ের "ক্লাস"কে আমরা "শ্রেণী" বলিয়া থাকি, তদপেক্ষা "বর্গ" শব্দটী উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। বিদ্যালয়ের Standard শব্দের কোন প্রতিশব্দ বাঙ্গলায় আছে কি না জানি না। মারাঠী "ইয়ত্তা" শব্দটী কি গ্রহণ করা যাইতে পারে না? Sine of admiration-এর মারাঠী প্রতিশব্দ "উদ্গার-চিহ্ন"। বাঙ্গলায় ইহার কোন কথা আছে কিনা জানি না। কিন্তু এই অর্থে "উদগার" শব্দ বাঙ্গলায় অচল। কেননা, ইহা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। এইরূপ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে "মহারাঠী ভাষা"র লেখক অনেকগুলি দিয়াছেন। আমিও আর কতকগুলি দিতেছি :—

(প্রথমে মারাঠী—তাহার পর বাঙ্গলা) অনুভব—অভিজ্ঞতা। অনুভবী—অভিজ্ঞ। প্রামাণিকপণা—খাঁটী ব্যবহার (honesty) শিক্ষা—দণ্ড। শিক্ষণ—শিক্ষা। অপবাদ—নিয়মের ব্যতিক্রম (exception) প্রান্ত—প্রদেশ। পারদর্শক—স্বচ্ছ (Transparent), স্বচ্ছ—পরিষ্কৃত। ভব্য—উন্নতকায়, মহৎ (noble, grand)। সূচনা—প্রস্তাব। প্রয়োগ—পরীক্ষা। বন্ধু—সহোদর ভ্রাতা। ইত্যাদি।

বাঙ্গলায় এক কথায় honestyর ঠিক্ কোন প্রতিশব্দ আছে কি না জানি না। অর্থ-সম্বন্ধীয় honesty কে সংস্কৃত ভাষায় অর্থ-শৌচ বলে; honest কে অর্থ-শুচি বলে। বাঙ্গলায় আমরা "examination" ও

"experiment" এই উভয় অর্থেই "পরীক্ষা" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু experiment-এর একটী স্বতন্ত্র প্রতিশব্দ থাকা আবশ্যক। আমার বোধ হয়, "experiment"কে "প্রয়োগ-পরীক্ষা" বলিলে মন্দ হয় না।

বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী ভাষায় অনেকগুলি যাবনিক শব্দ পাওয়া যায়। "মহারাষ্ট্র ভাষা"র লেখক মহাশয় তাহার কারণও দেখাইয়াছেন। যবন-সংসর্গই তাহার কারণ। দেড় শতাব্দি পূর্ব্বে, পেষোয়ার দফ্তরখানার লেখা-পড়ার কাজ সমস্তই পারস্য ভাষায় সম্পন্ন হইত। উক্ত লেখক মহাশয়ের মতে, এই সকল যাবনিক শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়া মহারাষ্ট্র-ভাষা যেন একটু অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের অনভ্যস্ত কানে, সংস্কৃত শব্দের পাশাপাশি, এই সকল যাবনিক শব্দ খারাপ শুনায় বটে; কিন্তু আমার বোধ হয় সে কেবল অভ্যাসের কথা। বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল যাবনিক শব্দ মিশিয়া গিয়াছে, তাহা তো আমাদের কাণে খারাপ লাগে না। বরং স্থলবিশেষে তাহা সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা ভাবব্যঞ্জক। যথা, "জোর" এই যাবনিক শব্দ, আর "বল" এই সংস্কৃত শব্দ। যেখানে "জোর" শব্দ বসে, সেখানে বল শব্দ কিছুতেই প্রয়োগ করা যায় না। যেমন, "কথার উপর জোর দেওয়া"। যে সকল চলিত বৈদেশিক কথা ভাষার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার স্থলে নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই কারণেই শিবজী, মহারাষ্ট্রীদিগের উপর অসীম আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার পণ্ডিতগণের রচিত শব্দগুলি মহারাষ্ট্র-ভাষার মধ্যে প্রচলিত করিতে সম্যক্‌রূপে সমর্থ হয়েন নাই। চলিত কথার মধ্যে এইরূপ অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিলে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যদি এখন আমরা "চাদর"-এর স্থলে "প্রাবরণী," "গোলাপের" স্থলে "মকরন্দ," "কারখানার" স্থলে "সম্ভারগৃহ"—"ফতুয়ার" স্থলে "পাহু-কঞ্চুক"

এবং "চৌকির" স্থলে "আসন্দিকা" ব্যবহার করি, তাহা হইলে কিরূপ শুনিতে হয়?

আর এক কথা, সংস্কৃত আমাদের গৃহ-ভাণ্ডার—উহার দ্বার আমাদিগের নিকট সততই উন্মুক্ত। যখন ইচ্ছা, আমরা সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া ভাষার পুষ্টি সাধন করিতে পারি। কিন্তু বৈদেশিক শব্দ, কোন ভাষার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে কাল ও ঘটনার অপেক্ষা করে। যদি সৌভাগ্যক্রমে, ঘটনাচক্রে কতকগুলি বৈদেশিক শব্দ ভাষার মধ্যে মিশিয়া গিয়া থাকে, সে তো আমাদিগের "উপরি-লাভ।" তাহার জন্য আক্ষেপ কেন? এখন আবার মহারাষ্ট্র-ভাষার মধ্যে সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিতেছে। প্রায় ২০ বৎসর অতীত হইল, মহারাষ্ট্র-পণ্ডিত মৃত মহাত্মা বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপ্‌লোঙ্কার, তাঁহার লেখায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ প্রথম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন—ইনিই বলিতে গেলে, মহারাষ্ট্র গদ্য-সাহিত্যের গতি ফিরাইয়া দিয়াছেন। ইনি মহারাষ্ট্র দেশে, মহারাষ্ট্রীয় "মেকলে" বলিয়া প্রখ্যাত। ইঁহার প্রণীত "নিবন্ধ-মালা" মহারাষ্ট্র গদ্যের আদর্শ স্থল। আধুনিক লেখকেরা এখন ইঁহারই পদানুসরণ করিতেছেন; সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের দিকে ইঁহাদিগের প্রবণতা দেখা যাইতেছে। তা ছাড়া, আজকাল প্রসিদ্ধ ইংরাজী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থ সকল মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে—সুতরাং অনেক শব্দ সংস্কৃত হইতে সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া উত্তরোত্তর ভাষার পুষ্টিসাধন করিতেছে।

তবে, এ কথা বলিতে হয়, মহারাষ্ট্র-সাহিত্য, বাঙ্গলার তুলনায় এখনও অনেকটা পশ্চাদ্বর্ত্তী। এখনও উহার মধ্যে নবোদ্ভাবিনী প্রতিভার অভ্যুদয় হয় নাই। মারাঠী ভাষার অধিকাংশ আধুনিক গদ্য-উপন্যাস "কাদম্বরীর" ন্যায় প্রাচীন কালের আদর্শে বিরচিত। এই জন্য, মারাঠী ভাষায়, গদ্য-উপন্যাস মাত্রেরই নাম "কাদম্বরী"। সম্প্রতি

একটী উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনেকটা আধুনিক ধরণের। * একটী স্ত্রীলোক তাঁহার বাল্যাবস্থার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন—ইহাই গ্রন্থের বিষয়। বেশ স্বাভাবিক সহজ ভাষায়, ঘরের লোকদিগের কথা, ঘরকন্নার কথা, এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙ্গলার ন্যায় বোম্বাই অঞ্চলেও নাট্যাভিনয়ের খুব ধুম। কোন মহারাষ্ট্র নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়া, মুণ্ডিত-মস্তক, শিখা-বিলম্বিত তিলক-চর্চ্চিত-ললাট, প্রকাণ্ড-উষ্ণীষধারী মহারাষ্ট্র-শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যেও যখন "এন্‌কোর" "এন্‌কোর" ধ্বনি ও হাততালির চট্‌চটা শব্দ প্রথম শুনিলাম, তখন নিতান্তই বিস্মিত হইয়াছিলাম। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকাংশ নাটকই পুরাতন সংস্কৃত নাটক ও ইংরাজী সেক্‌স্‌পিয়ারের নাটক অবলম্বনে রচিত। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে অনেকগুলি কবিও হইয়া গিয়াছেন। "জ্ঞানেশ্বরী", একনাথকৃত রামায়ণ, মুক্তেশ্বর-কৃত চার পর্ব্ব মহাভারত, তুকারাম, নামদেব, প্রভৃতির অভঙ্গ নামক ছন্দের পদাবলী, মোরোপন্ত-কৃত মহাভারত, ভাগবত ও রামায়ণ—এই সকল কবিতা-গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে অল্পই কবিদিগের স্বকল্পিত রচনা, অধিকাংশই রামায়ণ ও মহাভারতের ভাষান্তর। এই সকল মরাঠী কবিতার মধ্যে বৈরাগ্য ও পারমার্থিক রসেরই প্রাদুর্ভাব। রসের বৈচিত্র্য কিছুমাত্র নাই। তুকারাম, রামদাস, ইঁহারা কবি ও সাধু পুরুষ। তুকারামের অভঙ্গের ন্যায় ভক্তহৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস আর কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এক বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা ন্যায্যরূপে অহঙ্কার করিতে পারেন;—তাঁহাদের মধ্যে "বখর" নামক স্বদেশীয় ইতিবৃত্ত আছে। আমরা ইতিহাসের কোন ধার ধারি না—আমাদের যাহা কিছু ঐতিহাসিক গ্রন্থ আছে, তাহার উপকরণ ইংরাজীগ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত।

* এই গ্রন্থের নাম "পণ কোণ লক্ষাঁত ঘেতো" অর্থাৎ—"কিন্তু কে লক্ষ্য করে"—একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কর্ত্তৃক প্রণীত।

আজকাল সংবাদপত্রাদির পরিচালনে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রভূত উদ্যম ও তৎপরতা দেখা যায়; কৃতবিদ্যমণ্ডলীর শক্তি-সামর্থ্য, বলিতে গেলে, উহাতেই পর্য্যবসিত। দুই চারিটী মাসিক প্রবন্ধপত্রও যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। ইহার মধ্যে, একটীর নাম "ভাষান্তর"—উহাতে প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থাদি ক্রমশঃ অনুবাদিত হইয়া পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপে, মারাঠী ভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রের কৃতবিদ্যমণ্ডলী আর একটী বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ওয়েব্‌ষ্টার্ কৃত সমগ্র ইংরাজী অভিধান ইঁহারা মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে, মারাঠী-ভাষার বাস্তবিক উন্নতি হইবে কি না সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। যাহা হউক, ইহাতেও কতকটা উপকার হইতে পারে।

আমরা যেরূপ আজকাল মারাঠী ভাষার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি, মহারাষ্ট্রদেশের কৃতবিদ্য লোকেরাও সেইরূপ বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা অতীব আহ্লাদের বিষয়, সন্দেহ নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা প্রার্থনা-সমাজের অন্তর্ভূত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ" ও "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, মূল হইতে পড়িবার উদ্দেশেই বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করেন, এবং কেহ বা, বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের গ্রন্থ পড়িবার জন্য, কেহ বা বাঙ্গলা সংবাদ-পত্র ও সাহিত্যাদির গ্রন্থ পড়িবার জন্য বঙ্গালাভাষা শিক্ষা করিতে উৎসুক। "বধূ-দর্পণ" নামক একটী মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থে, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "মেঝ-বৌ" এবং অন্যান্য বাঙ্গালী লেখকদিগের প্রবন্ধ অনুবাদিত হইয়াছে। এইরূপ সাহিত্য-গত ভাবের আদান-প্রদানে আমাদের মধ্যে যে প্রভূত উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহা কে অস্বীকার করিবে? য়ুরোপে যেমন, ফরাসী, জর্ম্মান

প্রভৃতি আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষা করা, কৃতবিদ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সেইরূপ হিন্দী, বাঙ্গলা, মারাঠী, গুজরাটী, প্রভৃতির মধ্যে দুই একটী ভাষা আমাদের সকলেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয়, এ বিষয়ে উৎসাহ দিবেন, এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, আর এক দিক্ দিয়া, ইহার উত্তেজনা অল্প স্বল্প আরম্ভ হইয়াছে। এ দেশীয় লোক যাঁহারা চিহ্নিত-পদবীর সরকারী কর্ম্মচারী হইয়া বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বপ্রদেশে নিযুক্ত না হইয়া, ভারতবর্ষের ভিন্ন প্রদেশে নিযুক্ত হইতেছেন—সুতরাং তাঁহাদিগকে ভিন্ন প্রদেশের ভাষা বাধ্য হইয়া শিক্ষা করিতে হইতেছে। এইরূপে প্রকারান্তরে দেশ-ভাষাগুলির প্রসার বৃদ্ধি হইবার উপক্রম হইয়াছে। যখন দেখিব, আমাদের সাময়িক সাহিত্যপত্রাদিতে, মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থ সকলের সমালোচনা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখনই জানিব আমরা কতকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছি, এবং যখন দেখিব, এক সময়ে সমস্ত য়ুরোপে যেরূপ ফরাসী ভাষায় আদর ছিল, সেইরূপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক, বাঙ্গলার সাহিত্য-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া, বাঙ্গলা ভাষা আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সহিত শিক্ষা করিতেছে, তখনই জানিব, বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনে গৌরব-রবির উদয় হইয়াছে।

—০—

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি। *

ভারতে নাট্যবিদ্যা যে এক সময়ে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা প্রচলিত সংস্কৃত নাটকগুলি পাঠ করিলেই সহজে উপলব্ধি হয়। কাল-প্রভাবে, অনেকগুলি নাটক লুপ্ত হইয়া গিযাছে, যাহা অবশিষ্ট আছে য়ুরোপীয় নাট্য-সাহিত্যের তুলনায় তাহার সংখ্যা নিতান্তই অল্প। কিন্তু সংখ্যায় অল্প হইলেও, গুণগরিমায় জগতের নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে এখনও-পর্য্যন্ত উচ্চ-আসন অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন অমূল্য রত্নভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী হইয়াও আমরা ইহার যথার্থ মূল্য ও মর্য্যাদা বুঝি না; বিদেশীয় শিক্ষার প্রভাবেই হউক, বা যে কারণেই হউক, আমাদের রুচি এমনি বিকৃত হইয়া গিযাছে, যে আমাদের প্রাচীন নাট্য-সাহিত্যের অকৃত্রিম সরল সৌন্দর্য্য আর আমরা উপভোগ করিতে পারি না। এখন বিদেশীয় য়ুরোপদিগের মধ্যেও ইহার যতটা আদর আছে, আমাদিগের মধ্যে তাহাও নাই। এখনও মধ্যে মধ্যে ফ্রান্স ও জর্ম্মাণি দেশে, তত্তৎ ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত নাটকগুলি আগ্রহ-সহকারে অভিনীত হইয়া থাকে,—আর আমাদের মধ্যে কি দেখা যায়?—আমাদের রঙ্গপীঠে বিলাতি ভূতপ্রেতেরাও বরং স্থান পায়, তবু আমাদের সেই প্রাচীন সূত্রধার বিদূষকাদি ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা তাহার ত্রিসীমার মধ্যেও প্রবেশ করিতে পান না। সেই সূত্রধার-বিদূষকাদি পাত্র-সমন্বিত শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই জর্ম্মণির প্রসিদ্ধ কবি গত্তে বলিয়াছেন:—

চাহ কি দেখিতে তুমি অভিনব বরষের
ফুল, আর পরিণত বরষের ফল,

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

আর সেই সব যাহে, চিত্ত হয় বিমোহিত,
উল্লসিত, ভোগতৃপ্ত, সম্ভোগ-বিহ্বল ;
দেখিতে চাহগো যদি, একটি নামের মাঝে
স্বর্গমর্ত্ত সম্মিলিত দোঁহে একাধারে,
শকুন্তলে ! তোর নাম করি আমি উচ্চারণ,
তাহলেই সব বলা হয় একেবারে।(১)

পণ্ডিতবর হরেস উইলসন্, প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যের সমালোচনা করিয়া উপসংহারে এইরূপ বলিয়াছেন :—(২) "হিন্দুদিগের এমন অনেকগুলি নাটক আছে যাহা আধুনিক য়ুরোপের অধিকাংশ নাটকের সহিত প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে অনায়াসে টেক্কা দিতে পারে।" বৈদেশিকের মুখে ইহা বড় কম প্রশংসার কথা নহে।

কোন্ সময় হইতে ভারতে এই নাট্যবিদ্যার অনুশীলন ও প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে জানিবার জন্য স্বভাবতঃ আমাদের কৌতূহল উপস্থিত হয় ; কিন্তু এই কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার কোন সহজ উপায় নাই। ভারত সম্বন্ধীয় কোন তত্ত্বেরই সময় নিরূপণ করা বড়ই কঠিন। নানা প্রকার অনুমানের আশ্রয় ব্যতীত, কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর ভর দিয়া এ সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ভাগ্যে

(১) "Woulds't thou the young year's blossoms and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed, enraptured, feasted, fed,
Woulds't thou the earth and heaven itself in one sole name combine
I name thee, O Sakuntola ! and all at once is said."

(২) "......much of that of the Hindus may compete successfully with the greater number of dramatic productions of Modern Europe".—H. Wilson—"Theatre of the Hindus."

গ্রীকেরা ভারতে আসিয়াছিল, ভাগ্যে তৎকালীন বৃত্তান্ত তাহাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাই আজ আমরা ভারত-ইতিহাসের কোন্ কোন যুগের—বিশেষতঃ বৌদ্ধযুগের সময় নিরূপণ করিতে কিয়ৎ-পরিমাণে সমর্থ হইয়াছি। কোন্ সময়ে ভারতে নাট্যের আবির্ভাব হয়, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমেই প্রাচীন ভারতের সাহিত্যগ্রন্থাদি ও ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করা আবশ্যক।

ভারতে নাট্য-প্রয়োগ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে, সূত-মাগধেরা শ্লোক-নিবদ্ধ পৌরাণিক আখ্যান সকল পাঠ করিত, কুশীলবেরা বীণা বাদ্যাদি-সহকারে সেই সকল আখ্যান গান করিয়া আবৃত্তি করিত, এবং নটেরা নৃত্য করিত। প্রথমে উহারা কেবল অঙ্গবিক্ষেপ সহকারে নৃত্য করিত; পরে নৃত্যের সহিত যখন গীতের যোগ হইল, তখন উহারা ভাব-প্রকাশ করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। নটের এই ভাব-প্রকাশের অভ্যাস হইতেই নাট্যের প্রথম সূত্রপাত হয়। * তাই আমাদের শাস্ত্রে, নৃত্যের এইরূপ লক্ষণ ও ভেদ নিরূপিত হইয়াছে :—

যত প্রকার বিশেষ বিশেষ নৃত্য আছে, তত্তাবতের সাধারণ নাম নর্ত্তন। ফল, চিত্ত-রঞ্জক অঙ্গবিক্ষেপেরই নামই নর্ত্তন। যথা নর্ত্তক-নির্ণয়ে,—

"অঙ্গবিক্ষেপ-বৈশিষ্ট্যং জন-চিত্তানুরঞ্জনং।
নটেন দর্শিতং যত্র নর্ত্তনং কথ্যতে তদা॥"

অঙ্গবিক্ষেপের দ্বারা জন-চিত্তরঞ্জন যে বিশেষ ব্যাপার নটের দ্বারা প্রদর্শিত হয় তাহাকেই নর্ত্তন বলে। "নাট্যং নৃত্যং—নৃত্তমিতি ত্রিবিধং তৎ প্রকীর্ত্তিতং" নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত নর্ত্তনের এই ত্রিবিধ প্রভেদ।

"নাটকাদি কথা দেশবৃত্তি ভাব রসাশ্রয়ং।
চতুর্দ্ধাভিনয়োপেতং নাট্যমুক্তং মনীষিভিঃ॥"

* ঐতিহাসিক রহস্য, পৃঃ ৯৪।

অর্থাৎ দেশ, বৃত্তি ভাব-রসাশ্রিত চারি প্রকার অভিনয়ের দ্বারা নাটকাদি কথা প্রদর্শিত হইলে তাহাকে নাট্য বলা যায়।

নৃত্য।—"অপুস্ত সর্ব্বাভিনয় সম্পন্নং ভাবভূষিতং
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং নৃত্যং সর্ব্বলোক মনোহরং।"

নেপথ্য বিধানের অধীন নহে, অথচ রস-ভাবাদির দ্বারা বিভূষিত ও সর্ব্ব-প্রকার অভিনয়ের দ্বারা প্রদর্শিত যে নর্ত্তন তাহাকেই নৃত্য বলে।

এবং "হস্ত পাদাদি বিক্ষেপৈশ্চমৎকারাঙ্গশোভিতং
ত্যক্ত্বাভিনয়মানন্দকরং নৃত্তং জনপ্রিয়ং।"

অভিনয় বর্জ্জিত, চমৎকারজনক অঙ্গবিক্ষেপ বিশেষের নাম নৃত্ত। অতএব দেখা যাইতেছে পূর্ব্বে নর্ত্তন, নটেরই কাজ ছিল; কেন না, "নটেন দর্শিতং যত্র নর্ত্তনং কথ্যতে তদা।" আবার নাট্যশাস্ত্রে আছে,—

"নট ইতি ধাত্বর্থভূতং নাটয়তি লোক বৃত্তান্তং
রসভাব সত্ত্বযুক্তং যস্মাৎ তস্মাৎ নটো ভবেৎ।"

অর্থাৎ, রসভাবযুক্ত লোক-বৃত্তান্ত যে অভিনয় করে সেই নট। অতএব দেখা যাইতেছে, যে নট পূর্ব্বে কেবল নর্ত্তক ছিল, পরে সেই নটই ক্রমে অভিনেতা হইয়া দাঁড়ায়। বোধ হয়, সংস্কৃত "নর্ত্ত" শব্দ প্রাকৃত ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া নট্ এই আকার ধারণ করিয়াছে। তাই মনে হয়, প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ভারতে নাট্যের উদ্ভব হয় নাই।

পণ্ডিতবর ওয়েবর বলেন, ঋগ্বেদে, অথর্ব্ব সংহিতায় ও যযুর্ব্বেদে নৃত্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সমস্ত বেদের মধ্যে কুত্রাপি নট্ শব্দের প্রয়োগ নাই। এই নট্ শব্দ ও নট্ সূত্রের উল্লেখ সর্ব্ব-প্রথম পাণিনির গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। পাণিনি নাট্য-শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন:—"নটানাম্ ধর্ম্ম আম্নায়ো বা"; অর্থাৎ, নটদিগের ধর্ম্ম বা শিক্ষাপদ্ধতি; কিন্তু সে সময়ে নৃত্য ও নাট্যের মধ্যে কোন পার্থক্য

ছিল কি না, এই ব্যাখ্যা হইতে তাহা কিছুই স্পষ্ট জানা যায় না। পাণিনিতে যে দুই নট্-সূত্র-গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে একটির প্রণেতা "শিলালিন্" এবং অপরটির প্রণেতা "কৃশাশ্চ।" এই দুই নটসূত্রে নৃত্যকলার উপদেশ ছাড়া নাট্য-প্রয়োগ-সম্বন্ধে কোন উপদেশ ছিল কি না তাহা জানিবার উপায় নাই। গোল্ডষ্টুকার ও ভাণ্ডারকারের মতে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দিই পাণিনির আবির্ভাব কাল। তখনও শাক্যসিংহ আবির্ভূত হয়েন নাই। কিন্তু সে সময়ে ভরত-নাট্যসূত্র নামে কোন নাট্যসূত্র প্রচলিত ছিল কি না, এবং সে সময়ে নাট্য-প্রয়োগ হইত কি না, তাহারও কোন উল্লেখ বা নিদর্শন পাওয়া যায় না।

তাহার পর সর্ব্বপ্রথমে, পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে নাট্য-প্রয়োগের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। গোল্ডষ্টুকার ও ভাণ্ডারকার বলেন, বাহ্লিক প্রদেশের যবনরাজ মিন্যাণ্ডার এবং মৌর্য্যরাজ্যের উচ্ছেদকারী ও বৌদ্ধগণের উৎপীড়নকারী পুষ্পমিত্র, পতঞ্জলীর সমসাময়িক। এই যবন-বাহ্লিক রাজ্য খৃঃ পূঃ প্রায় সার্দ্ধ দুই শত বৎসর হইতে খৃঃ পূঃ ন্যূনাধিক সাতান্ন-বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অতএব পতঞ্জলী, ঐ কালের কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে। তাঁহার গ্রন্থে যখন নাট্য-প্রয়োগের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে, তখন সম্ভবতঃ তাঁহার পূর্ব্বেও উহা প্রচলিত ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থলে যদিও রঙ্গভূমি, রঙ্গস্ত্রী, নাট্যাগার, নাট্যালয় প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সে সমস্ত নৃত্য সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইত এরূপ অনুমান হয়; কেন না, রামায়ণ ও মহাভারতে সূত্রধার, বিদূষক প্রভৃতি নাটকীয় পারিভাষিক নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না—কেবল পাওয়া যায় এক হরিবংশে। ইহাতে রীতিমত নাট্য-প্রয়োগের বর্ণনা আছে। যদিও হরিবংশ মহাভারতেরই অংশ, কিন্তু উহা উত্তরকালে বিরচিত; এই নিমিত্তই উহার নাম "খিল"-হরিবংশ; খিল শব্দের

অর্থ—উত্তরকালে সংযোজিত। হরিবংশে রোমক-মুদ্রা ডিনারিয়াসের অপভ্রংশ দিনার শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় বলিয়া, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, খৃষ্টাব্দের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দির কোন সময়ে উহা মূল-মহাভারতের সহিত সংযোজিত হয়। আমরা মহাভারতকে এখন যে আকারে দেখিতে পাই, তাহা প্রক্ষিপ্ত অংশে পরিপূর্ণ; অনেক প্রসঙ্গ উহাতে ক্রমশঃ সংযোজিত হইয়াছে; এমন কি, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, খৃষ্টাব্দের ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত, এই সংযোজন কার্য্য চলিয়াছিল। এখন কথা হইতেছে যদি পতঞ্জলীর সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দিতে নাট্য-প্রয়োগ প্রচলিত থাকে, আর যদি মহাভারতের সংযোজন-কার্য্য খৃষ্টাব্দের চারি শতাব্দি পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে, তাহা হইলে হরিবংশর পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারতের আর কোন অংশে, নাট্য-প্রয়োগের কিম্বা নাটকীয় পারিভাষিক কোন নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন? ইহা একটি বিষম সমস্যার বিষয় সন্দেহ নাই। আমার এইরূপ অনুমান হয়, মূল-মহাভারতের সহিত অবান্তর প্রসঙ্গের সংযোজনা বরাবর সমান ভাবে চলে নাই। যে সময়ে মূল-মহাভারত রচিত হয়, সেই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালে সম্ভবতঃ নাট্য-প্রয়োগ প্রচলিত ছিল না। এবং আমার বিশ্বাস, মহাভারত ও রামায়ণের সংযোজন-কার্য্য পতঞ্জলীর উত্তর-কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং সেই জন্যই সর্ব্বপ্রথমে হরিবংশেই নাট্য-প্রয়োগের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। নানা প্রকার অবান্তর প্রসঙ্গ মূল-মহাভারতের সহিত উত্তরকালে কেন সংযোজিত হইয়াছিল, তাহারও একটি সঙ্গত কারণ সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। যতদিন প্রবল পরাক্রান্ত বৌদ্ধ নরপতি অশোক কিম্বা তাঁহার বংশধরগণের আধিপত্য ছিল, ততদিন বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম বড় একটা মাথা তুলিতে পারে নাই। তাহার পর যখন মৌর্য্য সেনাপতি পুষ্পমিত্র মৌর্য্যরাজত্ব ধ্বংস করিয়া কাশ্মীর হইতে মগধ পর্য্যন্ত স্বীয়

রাজত্ব বিস্তার করিলেন, তখন হইতে হিন্দুধর্ম্ম আবার প্রবল হইয়া উঠিল। খৃঃ পূঃ ২৫০ বৎসর হইতে কনিষ্কের রাজত্বের আরম্ভ-কাল খৃষ্টাব্দ ৭৮ বৎসর পর্য্যন্ত এই হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়েই ব্রাহ্মণেরা উৎসাহিত হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য নানা প্রকার পৌরাণিক উপাখ্যান মহাভারত রামায়ণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব যাহাতে হ্রাস হয়, তৎপক্ষে বিধিমতে চেষ্টা করেন।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মতন্ত্রে সার্ব্ববর্ণিক লোকশিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না, বরং ব্রাহ্মণেরা লোকশিক্ষায় বিরোধী ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া সেই অভাব কতকটা দূর করিয়াছিল; নানা প্রকার লোকচিত্ত-হারী আখ্যানাদি বিবৃত করিয়া বৌদ্ধেরা বর্ণ-নিরপেক্ষভাবে সাধারণ লোকের মধ্যে নীতিধর্ম্ম প্রচার করিতেন; পরে সময়ে সময়ে যখন হিন্দুরাজার আধিপত্য হয়, সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণেরাও বৌদ্ধ-দিগের প্রভাব প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত বৌদ্ধদিগেরই পন্থা অনুসরণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মানুগত লোকশিক্ষার নানা প্রকার ব্যবস্থা করেন। সেই সময়েই বিবিধ পৌরাণিক আখ্যান মূল-মহাভারত রামায়ণের মধ্যে সংযোজিত হয়! এবং দেবদেবী, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতির পবিত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়া সেই সময়েই নাট্য-প্রয়োগের আরম্ভ হয়।

সার্ব্ববর্ণিক লোকশিক্ষার উদ্দেশেই যে ভারতে নাট্যবিদ্যার প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহা ভরত-নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। নাট্য শাস্ত্রে আছে:—কোন সময়ে অনধ্যায়কালে আত্রেয় প্রমুখ মুণিগণ নাট্য-কোবিদ ভরত মুণিকে নাট্যবেদ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন, "সত্যযুগ অতীত হইলে ত্রেতাযুগের আবির্ভাবে ব্রহ্মাণ্ড যখন গ্রাম্যধর্ম্ম-প্রবৃত্ত কামলোভের বশীভূত হইল; ত্রিলোক যখন ঈর্ষা-ক্রোধ-বিমূঢ় ও সুখদুঃখে বিচলিত হইল; দেবাদানব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-

রক্ষাদির দ্বারা যখন লোকপাল-প্রতিষ্ঠিত জম্বুদ্বীপ সমাক্রান্ত হইল, তখন ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন, আমরা এমন একটি ক্রীড়নীয়ক পাইতে ইচ্ছা করি যাহা দৃশ্য ও শ্রব্য উভয়ই হইবে। ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া যোগস্থ হইলেন এবং যাহাতে শূদ্রজাতিরও শ্রাব্য হয় এই অভিপ্রায়ে এই নূতন পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করিলেন।” বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই, অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধদিগের প্রভাব প্রতিরোধ করিবার জন্যই ব্রাহ্মণেরা বর্ণ-নিরপেক্ষ লোকশিক্ষার উপায়-স্বরূপ নাটক ও নাট্য-প্রয়োগের সৃষ্টি করেন। নাট্য-প্রয়োগ লোক-শিক্ষার কিরূপ উপযোগী এবং তাহার দ্বারা কি কি বিষয়ে শিক্ষালাভ হইতে পারে, তাহাও নাট্যশাস্ত্রে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে :—“এই নাট্যে কোথাও দ্বন্দ্ব, কোথাও ক্রীড়া, কোথাও হাস্য, ও কোথাও বা যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তের ধর্ম্ম, কামীর কাম, দুর্বিনীতের নিগ্রহ, ধনাভিমানীর উৎসাহ, অবোধের বিরোধ, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, রাজার বিলাস, ও দুঃখার্ত্তের স্থৈর্য্য, নানাবস্থার নানাভাব এই নাট্যে গ্রথিত হইয়াছে। ইহা লোক চরিত্রের অনুকরণ। উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ লোকেরই কর্ম্ম ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা হিতোপদেশ-পূর্ণ। ইহা দুঃখার্ত্তের ধৈর্য্যসম্পাদক ও শোকার্ত্তের সুখজনক। বলিতে কি, ইহা সকলেরই চিত্ত-বিনোদন করিবে। এই নাট্যে যাহা না দৃষ্ট হইবে এমন বিদ্যা নাই, এমন কলা নাই, এমন যোগ নাই, এমন কর্ম্মই নাই।”

“মালবিকাগ্নিমিত্র” নাটকে কালীদাসও গণদাসের মুখ দিয়া নাট্য-বিদ্যায় গৌরব এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন :—

“দেবের বাঞ্ছিত অতি, নেত্র-তৃপ্তিকর যজ্ঞ
বলে মুনিগণ ;

রুদ্র এরে নিজ-অঙ্গে হর-গৌরী দুই ভাগে
করেন স্থাপন ;
ত্রৈগুণ্য-সমুদ্ভব নানারস-সমন্বিত
লোকের চরিত ইথে হয় প্রদর্শিত ;
নানাবিধ প্রকৃতির ভিন্নরুচি লোক যত
—সবারি সমান প্রিয়, সর্ব্ব আরাধিত।”

য়ুরোপের প্রধান নাট্য-সমালোচক শ্লেগেল একস্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই সকল কথারই যেন প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন “নাট্যালয়ে অনেক কলাবিদ্যা সমবেত হইয়া ইন্দ্রজালের ন্যায় ফলোৎপাদন করে ; উচ্চতম ও গভীরতম কবিত্ব, সম্পূর্ণ-সমাপ্ত কার্য্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। বাস্তুবিদ্যা, নানা প্রকার সমুজ্জ্বল ভূষণে উহাকে ভূষিত করে ; চিত্রবিদ্যা, দূর-নৈকট্যের বিভ্রম উৎপাদন করে ; সঙ্গীত চিত্রতন্ত্রীতে স্বর বাঁধিয়া, চিত্তের আবেগ আন্দোলন বর্দ্ধিত করে ; সকল বিদ্যাই উহাতে কিছু না কিছু আনুকূল্য করিয়া থাকে। কোন জাতির মধ্যে শত শত বর্ষ হইতে যাহা কিছু সমাজিক উন্নতি, কলা সম্বন্ধীয় যাহা কিছু বিদ্যা-সম্পদ বহু পরিশ্রমে সঞ্চিত হইয়াছে, তৎসমস্তই দুই চারি ঘণ্টার মধ্যে নাট্যালয়ে প্রদর্শিত হয়। তাই, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি উচ্চ, কি নীচ, সকল ব্যক্তির পক্ষেই নাট্য-প্রয়োগ চিত্তাকর্ষক এবং ইহাই সুশিক্ষিত সুসভ্য জাতিমাত্রেরই চিত্ত-বিনোদনের প্রধান উপায়। নাট্যালয়েই কি রাজা, কি সেনাপতি অতীত ঘটনা সকল, তাঁহাদের নিজ কার্য্যের ন্যায় প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করেন। এবং সেই সকল কার্য্যের অন্তরতম সূত্রস্থান ও উদ্দেশ্য তাঁহাদের নিকট উদ্ঘাটিত হয়। এমন কি, তত্ত্বজ্ঞানীরাও এই নাট্যপ্রয়োগে মানবপ্রকৃতি-সম্বন্ধে গভীরতম চিন্তার বিষয় প্রাপ্ত হন।” লোক শিক্ষাই যে নাট্যপ্রয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই

যে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগের সহিত প্রতিযোগিতার নাট্য-প্রয়োগ প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ভাবিয়া পান না, কি করিয়া এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণ-গঠিত নাট্য-সাহিত্য ভারতে উৎপন্ন হইল। ইহা যে স্বাভাবিক নিয়মে ভারত-ভূমিতেই উৎপন্ন হইয়াছে তাহা তাঁহারা সহসা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। ওয়েবর-প্রমুখ কতকগুলি য়ুরোপীয় পণ্ডিত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন,—আমাদের নাট্যকলা দেশের মাটিতে অঙ্কুরিত হইয়া কালসহকারে স্বাভাবিক নিয়মে পরিবর্দ্ধিত হয় নাই, পরন্তু বিদেশীয় গ্রীকদিগের সংস্রব-প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। ওয়েবার এইরূপ অনুমান করেন, যখন ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক্ রাজাদের দরবারে গ্রীসীয় নাটকের অভিনয় হইত, সেই সকল অভিনয় দেখিয়া পঞ্জাব ও গুজরাটের হিন্দুদের অনুকরণবৃত্তি উত্তেজিত হয়, এবং এইরূপে হিন্দুনাট্যের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু ওয়েবর সেই সঙ্গে এ কথাও বলিয়াছেন যে, গ্রীসীয় ও হিন্দুনাট্য-সাহিত্যের মধ্যে কোন আভ্যন্তরিক যোগ দৃষ্ট হয় না। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে তাঁহার অনুমানটি কতটা অসার ও ভিত্তিহীন। আসল কথা, সাহিত্য-কলা সম্বন্ধে গ্রীস্ই য়ুরোপের আদিম শিক্ষাগুরু; তাই প্রাচীন গ্রীসের প্রতি তাঁহাদের এতটা অন্ধভক্তি যে, কোন কলা-বিদ্যা গ্রীস ছাড়া আর কোথাও যে স্বতঃ উৎপন্ন হইতে পারে তাহা তাঁহারা যেন সহসা বিশ্বাস করিতে পারেন না। আবার ডেনিশ্ পণ্ডিত ই-ব্রাণ্ডিস্, ওয়েবার অপেক্ষা আর একটু বেশী দূর গিয়াছেন। তিনি বলেন, New Attic Comedy-র সহিত হিন্দুনাটকগুলির আভ্যন্তরিক যোগও দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষতঃ উক্ত গ্রীক কমেডি অবলম্বন করিয়া রোমক নাটককার প্লোটাস্ ও টেরেন্স যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাদেরই সহিত হিন্দুনাট্যের বিশেষ মিল আছে। এই ডেনিশ্ পণ্ডিতের মত অনুসরণ করিয়া, জর্ম্মাণ

পণ্ডিত উইণ্ডিশ্ (Windish) এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বলেন :—"প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূভাগের মধ্যে অনেক দিন হইতে গতিবিধি ছিল। দুইটি দ্বার দিয়া গ্রীসের বিজ্ঞান-কলা ভারতে প্রবেশ করে; স্থলপথে বাক্‌ট্রিয়া ও প্যালমাইরা দিয়া, এবং জলপথে অ্যালেকজ্যাণ্ড্রিয়া ও ভারত উপকূলের প্রাচীন বন্দর "বারিগোজা" অর্থাৎ আধুনিক "ব্রোচ" দিয়া। সেই সময়ে, অর্থাৎ ৮০।৯০ খৃষ্টাব্দে ব্রোচ ও উজ্জয়িনীর মধ্যে সতেজে বাণিজ্য চলিত। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নাটক মৃচ্ছকটিকের দৃশ্যস্থল উজ্জয়িনী। এইহেতু উইণ্ডিশ মনে করেন, ভারতীয় নাট্যকলা উজ্জয়িনীতেই প্রথম পরিপুষ্ট হয়, এবং অ্যালেক্‌জ্যাণ্ড্রিয়া ও উজ্জয়িনীর মধ্যে গতিবিধি থাকা প্রযুক্তই হিন্দুরা রোমকদিগের নিকট নাট্য-বিদ্যার আভাস পান। খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেও ইজিপ্টের সহিত ভারতবর্ষের গতিবিধি ছিল; কিন্তু খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই রোম ও রোমীয় প্রদেশাদির সহিত গতিবিধি আরম্ভ হয়। সুতরাং নূতন গ্রীক কমেডিগুলি—অন্ততঃ প্লৌটাস ও টেরেন্স সেই সকল কমেডির ছায়া অবলম্বন করিয়া যে নাটকগুলি রচনা করেন, তাহা খুব সম্ভব হিন্দুদিগের গোচরে আসিয়াছিল। সংস্কৃত নাটকের রচনা-পদ্ধতি অনেকটা প্লৌটাস ও টেরেন্সের রচনা-পদ্ধতির ন্যায়; উহাদিগেরই ন্যায় হিন্দু-নাটকগুলি অঙ্কে বিভক্ত, এবং প্রতি অঙ্কের আরম্ভে সংস্কৃত নাটকেও "প্রলোগ" অর্থাৎ প্রস্তাবনা দৃষ্ট হয়। ভারতীয় ও রোমীয় নাটকের আখ্যান-বস্তু, পরিপুষ্টি, উপসংহার, ধরণধারণ অনেকটা এক রকমের।" মানিলাম, হিন্দু ও রোমকদিগের মধ্যে সে সময়ে গতিবিধি ছিল; মানিলাম হিন্দু ও রোমক নাটকের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে; কিন্তু ইহা হইতে কি করিয়া প্রমাণ হইল যে হিন্দুরাই রোমকদিগের নাট্য-পদ্ধতির অনুকরণ করিয়াছে, এবং রোমকেরা হিন্দুদিগের নাট্য-পদ্ধতির অনুকরণ করে নাই? বরং ইহার বিপরীতটাই তো সম্ভব বলিয়া মনে

হয়। শ্লেগেল বলেন,—প্লৌটাস টেরেন্সের নাটকগুলি, New Attic Comedyর অর্থাৎ মিন্যাণ্ডার প্রভৃতি কবিগণ-রচিত নূতন গ্রীকনাটকেরই স্বাধীন অনুবাদ—অর্থাৎ ছায়া। শুধু তাহা নহে গত ফেব্রুয়ারি মাসের Ninteenth Century নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি মাসিক-পত্রিকায়, "গ্রীকভাষার অনুশীলন" এই শীর্ষক প্রবন্ধে হর্বার্ট পৌল বলেন:— "Terence, most graceful and elegant comedian is now supposed to have simply translated Menanden, unless indeed, as some say, he was a mere amanuensis of the real translator, Scipio Africanus Plautus, who wrote the purest and raciest vernacular, as became a slave, born in the house, is believed to have copied Dippisus and other Greeks as faithfully as Moliere in the Amphitryon, copied him"—অতএব এই লেখকের কথা যদি সত্য হয়, প্লৌটাস ও টেরেন্সের নাট্য-রচনা, গ্রীক নিউ-কমেডির শুধু ছায়া মাত্র নহে, উহা দাসবৎ অবিকল অনুবাদ। আমরা দেখিতে পাই, নূতন গ্রীক কমেডিতে অঙ্কচ্ছেদের কোন ব্যবস্থা ছিল না, তবে তাহার রোমক অনুবাদকারীরা এই পদ্ধতি কোথা হইতে পাইলেন? নিশ্চয় তাহা হইলে হিন্দুদিগের নিকট হইতেই পাইয়াছেন বলিতে হইবে। কেন না, যাহারা কেবল অনুবাদকারী, তাহাদের দ্বারা নূতন কিছু উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব নহে। জর্ম্মাণ পণ্ডিত Windish, আর এক কথা বলেন:—মৃচ্ছকটিকে যেরূপ বিদূষক, বিট, ও শকার দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীক কমেডিতেও তাহাদেরই অনুরূপ Servus currens, Parasitus edas ও Miles gloriosus, নামক পাত্রাদি দৃষ্ট হয়। তিনি আরও বলেন, যে সময় রোমকদিগের সহিত হিন্দুদিগের গতিবিধি ছিল, প্রায় সেই সময়কার নাটকেই, বিদূষকাদির উল্লেখ

পাওয়া যায়, ভবভূতীর নাটকাদিতে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু Windish সাহেব বোধ করি জানেন না, যে শৃঙ্গার-রস-প্রধান নাটকেই বিদূষকাদি পাত্রের অবতারণা প্রশস্ত, করুণ-রস ও বীর-রস-প্রধান নাটকে উহাদের অবতারণা আমাদের নাট্যশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। তা ছাড়া, অ্যালেকজ্যাণ্ডারের পরবর্ত্তী কালে নূতন গ্রীক কমেডির সৃষ্টি হয়, এবং সেই সময়েই হিন্দুদিগের সহিত ব্যাকৃট্রিয়া অর্থাৎ বাহ্লিকস্থ গ্রীকদিগের গতিবিধি ছিল; অতএব তাঁহারা যে আমাদের নাটকের অনুকরণে বিদূষকাদির ন্যায় পাত্র-সমূহ তাঁহাদের নাটকে সন্নিবেশিত করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। এই স্থলে মূল নিউকমেডির উল্লেখ করিলাম—কেন না, প্লৌটাস্ ও টেরেন্সের রচনাগুলি, নিউ-কমেডিরই হুবহু নকলমাত্র।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, হরিবংশে রোমক মুদ্রা দিনারের উল্লেখ পাওয়া যায়; অতএব যে সময়ে রোমদিগের সহিত হিন্দুদিগের গতিবিধি ছিল, সেই সময়েই যে হরিবংশ মূল-মহাভারতের সহিত সংযোজিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই হরিবংশে আমরা নাট্য-প্রয়োগের যেরূপ বর্ণনা পাই তাহাতে কি মনে হয়,—সূত্রধার, বিদূষক প্রভৃতি নাটকীয় পাত্রগণ কোন বিদেশীয় জাতি হইতে গৃহীত হইয়া নাট্যে সদ্য প্রবর্ত্তিত?—না উহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে? শচীনাম্নী একটী হংসী, দৈত্যরাজ বজ্রনাভের নিকট এইরূপ বলিতেছে:—

"রাজন!—এক নাটকে দেখিলাম, তিনি এক মুনির বর-প্রসাদে কামরূপী, সকলের প্রিয় ও নৃত্যকলাভিজ্ঞ হইয়া কখন উত্তরকুরু, কখন কলাপদ্বীপ, কখন ভদ্রাশ্ব, কখন কেতুমাল, কখন বা অন্যান্য স্থান, এইরূপে ত্রিভুবন বিচরণ করিতেছেন।" বজ্রনাভ কহিল "হংসি, অল্প দিন হইল, আমি সিদ্ধচারণ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রমুখাৎ ঐ নটের কথা অনেক শুনিয়াছি। তাহাকে দেখিবার জন্য আমার ঔৎসুক্য

জন্মিয়াছে। যাহাতে সে আমার গুণাবলী শ্রবণ করিয়া এখানে স্বয়ং উপস্থিত হয়, তুমি তাহাই কর।” হংসী কহিল, “দৈত্যরাজ! নটেরা স্বভাবতই গুণহার্য্য। মহারাজের গুণাবলী তাহার কর্ণগোচর হইলে অবশ্যই তাহাকেই আপনার নগরে আগমন করিতে হইবে।” হংসী এই কথা কহিলে, বজ্রনাভ পুনরায় কহিল, “তবে যাহাতে সে আমার নগরে আগমন করে, তুমি তাহার উপায় বিধান কর।” বজ্রনাভ আপনার কার্য্য উদ্দেশে হংসদিগের বিদায় দিলে, তাহারা দেবেন্দ্র ও কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিল। কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্নের প্রতি বজ্রনাভের কন্যা প্রভাবতী-পরিণয় এবং বজ্রনাভ-বিনাশ, এই দুই কার্য্যের ভার প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি মায়াদেবীর প্রভাবে, যাদবগণকে নটবেশে সজ্জীভূত করিয়া প্রেরণ করিলেন। প্রদ্যুম্ন নায়ক, শাম্ব বিদূষক, গদ ও অন্যান্য যাদবগণ পারিপার্শ্বিক, এবং বারবনিতাগণ নটীবেশে সজ্জীভূত হইয়া প্রদ্যুম্ন-বিহিত রথে অধিরোহণ পূর্ব্বক দেবগণের কার্য্য-সাধনার্থ প্রস্থান করিলেন। যথাকালে তাঁহারা দানবাকীর্ণ বজ্রপুরের সুপুর নামক উপনগরে উপস্থিত হইলেন। নট আসিয়াছে এই কথা শুনিয়া সুদূরবাসী দানবদিগের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। নটের বেশ-বিন্যাস জন্য তাহারা রাশি রাশি রত্ন প্রদান করিল। তাহার পর নট রঙ্গভূমিতে নৃত্য আরম্ভ করিলে পুরবাসীদিগের আর আহ্লাদ রাখিবার স্থান রহিল না। নৃত্যের পর, মহাকাব্য রামায়ণ অবলম্বন পূর্ব্বক নাটক আরম্ভ হইল। যখন এক একটি অংশ অভিনয় হইতে লাগিল, তখন দৈত্যেরা উঠিয়া মহানন্দে চীৎকার আরম্ভ করিল এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র, কণ্ঠী, বলয় ও বৈদূর্য্য-বিভূষিত হেমময় হার প্রভৃতি নানা উপহার প্রদান করিতে লাগিল। অর্থলাভের পর, যাদবগণও সঙ্গীত মধ্যে মুনি ও অসুরগণের নাম ও গোত্র নিবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর

ঐ উপনগর-নিবাসী দানববৃন্দ সেই সুনিপুণ নটের আগমনবার্ত্তা দানবেন্দ্রের কর্ণগোচর করিলে, দানবরাজ আনন্দিত হইয়া কহিল, "শীঘ্র তাহাকে পুরীমধ্যে আনয়ন কর।" আজ্ঞা মাত্র, উপনগর-নিবাসী দানবগণ নটবেশধারী যাদবদিগকে বজ্রপুরে লইয়া গেল। তখন দানব রুদ্র-মহোৎসব উপলক্ষ্য করিয়া সৈনিকদিগকে নাটকাভিনয় দর্শন করিতে আহ্বান করিল। অনন্তর সমাগত নট, সুন্দররূপে বিশ্রাম করিলে, তাহাদিগকে রত্নাদি প্রদান করিয়া নাটকাভিনয় করিতে আজ্ঞা করিল, এবং রঙ্গভূমির নিকটে যবনিকা মধ্যে অন্তঃপুরচারিনীদিগকে সংস্থাপন করিয়া, স্বয়ং জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, নাটকাভিনয় দর্শনে সভামধ্যে উপবিষ্ট হইল। অনন্তর অদ্ভুত-কঠোর-কর্ম্মা যাদবগণ নেপথ্য-বিধি সমাপনান্তে রঙ্গভূমে আসিয়া নৃত্যের উদ্যোগ করিলেন। প্রথমত বেণু, মুরজ, আনক এবং তন্ত্রীবদ্ধ বীণা সকল বাদিত হইতে লাগিল। অনন্তর বারবনিতাগণ গান্ধার, ছালিক্য প্রভৃতি অমৃতায়মান, শ্রবণ-সুখকর সঙ্গীত-সকল গান করিতে আরম্ভ করিল। নিষাদ, ঋষভ ও গান্ধাকাদি সপ্তস্বর, এবং মূর্চ্ছনা-সহকারে গঙ্গাবতারণ নামক সঙ্গীত সমালোচিত হইতে লাগিল। তাল-লয়-সংযুক্ত সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে দানবগণের আনন্দ সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। প্রদ্যুম্ন, গদ ও শাম্ব, নটবেশে নন্দিবাদ্য বাদন করিতে লাগিলেন। নন্দিবাদ্য (আখ্ড়াই) শেষ হইলে প্রদ্যুম্ন অভিনয়ের সহিত গঙ্গাবতারণ গান মিশ্রিত শ্লোকপাঠ আরম্ভ করিলেন। প্রদ্যুম্নের মাথায় কৈলাশ পর্ব্বত কল্পিত হইল। তাঁহাদিগের পাদোত্তোলনপূর্ব্বক নৃত্য ও অভিনয়ে দানবগণের আহ্লাদের সীমা রহিল না।"

এই নাট্যাভিনয়ের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, নাট্যকলা তখনও অপেক্ষাকৃত অমার্জ্জিত অবস্থায় ছিল; ইহার নৃত্যভঙ্গী ও ধরণধারণে যেরূপ গ্রাম্য-সরলতা লক্ষিত হয়, তাহাতে ইহা মৃচ্ছকটিকেরও পূর্ব্বে

রচিত বলিয়াই মনে হয়। ভারতে নাট্যকলার কিরূপ ক্রমবিকাশ হইয়াছে, ইহার মধ্যে তাহার যেন একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের আভাষ পাওয়া যায়। অভিনয়-সহকারে নৃত্য, অভিনয়-সহকারে গান-মিশ্রিত শ্লোক পাঠ, এবং বিদুষকাদি পাত্র সমন্বিত প্রকৃত নাট্যপ্রয়োগ এই তিনই ইহাতে দৃষ্ট হয়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ মৃচ্ছকটিক নাটককে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সমস্ত অনুমান-যুক্তি বিন্যাস করিয়াছেন। কিন্তু সূত্রধার বিদুষকাদি নাটকীয় পাত্রগণ মৃচ্ছকটিকে যে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তাহার পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে, তাহা মৃচ্ছকটিক পাঠে এবং হরিবংশের এই নাট্য-বর্ণনা পাঠে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়।

ইতিপূর্ব্বে আমি তর্কস্থলে বলিয়াছিলাম, গ্রীকদিগের নিউকমেডির অনুবাদকারী প্লৌটাস ও টেরেন্স প্রণীত নাটকের অঙ্কচ্ছেদ-পদ্ধতি, প্রস্তাবনা ও পাত্রাদি আমাদের প্রাচীন নাট্য-পদ্ধতি হইতেই গৃহীত; কিন্তু আমার আন্তরিক বিশ্বাস, বস্তুতঃ কেহ কাহারও অনুকরণ করে নাই। কি গ্রীস, কি ভারত উভয় দেশেরই নাট্যকলা স্বাভাবিক প্রয়োজনের উত্তেজনায়, উভয় দেশেই স্বতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। মানব-চরিত্র সর্ব্বত্রই সমান। বিদুষক, বিট ও শকারের ন্যায় লোক সকল দেশেই বর্ত্তমান। সেইজন্য, রোমীয় নাটকে যদি আমরা ঐরূপ কোন পাত্র দেখিতে পাই, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ দেখা যায় না। সকল দেশের সাহিত্যের মধ্যেই, কোন না কোন অংশে পরস্পরের ছায়া ও সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, এবং কোন কোন অংশে ঐরূপ সাদৃশ্য দেখিলেই, তাহা অপর কোন জাতির অনুকরণ বলিয়া সহসা সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহার দৃষ্টান্ত, ভবভূতীর উত্তর চরিতে, "নাটকের মধ্যে নাটক আছে"; সেক্‌সপিয়রের হ্যাম্‌লেটেও তাহাই আছে। ভবভূতি সপ্তম শতাব্দীর লোক, সেক্‌সপিয়র ষোড়শ শতাব্দীর লোক। সেই ষোড়শ শতাব্দীতে, দুই একজন ইংরাজ এদেশে যে না আসিয়া-

ছিলেন এমত নহে ; এমন হইতে পারে, তাহাদের মধ্যে সেক্‌সপিয়রের কোন বন্ধু ছিলেন। তিনি এই নাট্য-কৌশলটি ভারতবর্ষে অবগত হইয়া, দেশে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার বন্ধুর নিকট গল্পচ্ছলে প্রকাশ করেন, এবং সেক্‌সপিয়র তদনুসারে এইরূপ দৃশ্য তাঁহার নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। এইরূপ কাকতালীয় যুক্তি উইণ্ডিশ্‌-প্রমুখ পণ্ডিতগণের যুক্তি-প্রণালীরই অনুরূপ। আসল কথা ধরিতে গেলে, প্লৌটাস্‌ ও টেরেন্সের রচনার সহিত মৃচ্ছকটিকের অবান্তর বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

উক্ত রোমক নাট্যকারদিগের রচনা লঘুধরণের কমেডি মাত্র। কিন্তু মৃচ্ছকটিক নাটককে, কমেডি বলিব কি ট্রাজেডি বলিব, ভাবিয়া সহসা স্থির করা যায় না। উহাতে এক দিকে যেমন হাস্য-পরিহাস, আর এক দিকে তেমনি কারুণ্য-বিলাপ, এক দিকে যেমন নীচ ক্ষুদ্র চরিত্রের বর্ণনা, অপর দিকে তেমনি সদাশয় মহৎ চরিত্রের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় ; এক কথায়, উহা ঠিক কমেডিও নহে, ট্রাজেডিও নহে। যদি য়ুরোপীয় আদর্শ-অনুসারে কোনও শ্রেণীর মধ্যে উহাকে পরিগণিত করিতে হয়, তাহা হইলে উহাকে সেক্‌সপীয়র কৃত ইংরাজি নাটকাদি, কিম্বা স্পেন দেশীয় নাটকাদির ন্যায় Romantic—অর্থাৎ মিশ্র জাতীয় নাটক শ্রেণীর মধ্যে ধরা যাইতে পারে। আমাদের অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকই এই ধরণের। সেইহেতু প্রসিদ্ধ জর্ম্মান্‌ পণ্ডিত শ্লেগেল্‌, Sir William Jones-কৃত অভিজ্ঞান-শকুন্তলার ইংরাজি অনুবাদ যখন প্রথম পাঠ করেন, তখন উহা সংস্কৃত নাটকের যথাযথ অনুবাদ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই ; তিনি মনে করিয়াছিলেন, সেক্‌সপীয়রের রচনার প্রতি সার উইলিয়াম্‌ জোন্সের স্বাভাবিক অনুরাগ থাকা-প্রযুক্ত তাঁহার অনুবাদটিও সেক্‌সপীয়রের ভাবে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। তাহার পর যখন অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞ য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ঐ অনুবাদের বিশুদ্ধতা

সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন, তখনই তাঁহার প্রত্যয় হইল। যদি ঘটনাক্রমে সেক্‌সপীয়র ও কালিদাস সমসাময়িক হইতেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে গতিবিধির কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তিনিও Windish প্রভৃতির ন্যায় নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করিতেন যে, কালিদাসের শকুন্তলা সেক্‌সপীয়রের অনুকরণে লিখিত।

অলঙ্কার-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের মধ্যে ভরত কৃত নাট্যশাস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহাতেও দশরূপকের ভেদ ও সূত্রধার বিদূষকাদির লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। নাট্য সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত আলোচনা আর কোন অলঙ্কারশাস্ত্রে নাই। এই নাট্যশাস্ত্র কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহার কতকটা আভাস পাইলে, জানিতে পারা যায়, তাহারও কতকটা পূর্ব্ব হইতে, সম্ভবতঃ ভারতে নাট্য-সাহিত্য ও নাট্য-প্রয়োগের আরম্ভ হইয়াছে। ভরত মুনিই নাট্যবিদ্যার প্রবর্ত্তক ও গন্ধর্ব্ব-বেদের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। অথচ মহাভারতাদিতে ভরত মুনির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাহা হউক তিনি যে একজন সুনিপুণ অভিনেতা ও প্রতিভাশালী নাট্যাচার্য্য ছিলেন তাহা নাট্যশাস্ত্রে ভরত-সংজ্ঞার যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই উপলব্ধি হয়। ভরত মুনির শিষ্যগণ ভরত নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। "ভরতাশ্রয়াচ্চ ভরতঃ" :—

"ধূর্য্যবদেকো যস্মাদুদ্ধারোহনেক ভূমিকাযুক্তঃ
ভাণ্ডগ্রহোপকরণৈর্নাট্যং ভরতো ভবেত্তস্মাৎ।"

বৃহৎ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া, ধৃর্য্যবান্ হইয়া, একাকী যিনি বহু ভূমিকাযুক্ত নাট্য, ভাণ্ডগ্রহ উপরণ দ্বারা, অর্থাৎ সাজসজ্জার দ্বারা প্রদর্শন করেন তিনিই ভরত।

ভরত মুনির নাট্য-সূত্র অবলম্বন করিয়া যে নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থ কোন এক সময়ে প্রণীত হয়, তাহাই অধুনা ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র নামে খ্যাত। ভরতের নাট্য-সূত্র বলিয়া আর কোন পৃথক্ গ্রন্থ ছিল কি না, তাহার

কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু এই নাট্য-শাস্ত্রটীও একটি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীনত্বের একটা নিদর্শন এই, উহার গীতাধ্যায়ে রাগ রাগিণীর কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তবু ইহা হইতে বুঝা যায় না, ইহা কত প্রাচীন; কেন না আমাদের কোন প্রাচীন নাটকেই রাগ-রাগিণীর উল্লেখ নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে এই গ্রন্থটী দুষ্প্রাপ্য ছিল; পণ্ডিতবর ওয়েবার অন্যান্য অলঙ্কার-গ্রন্থে ইহার কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত দেখিয়াছিলেন এবং দশ-কুমারের প্রকাশক "হল" সাহেব ইহার ৪ অধ্যায় মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র।

এতদিনের পর সৌভাগ্যক্রমে-সপ্তত্রিংশ-অধ্যায়যুক্ত এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বোম্বাই নগরীর নির্ণয়-সাগর-যন্ত্রের প্রসাদে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রাচীন নাট্য-বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। আপাততঃ নাট্যকলার উৎপত্তি ও আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে কি কি তত্ত্ব উদ্ধার করা যাইতে পারে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। প্রথমে দেখা যাউক, এই গ্রন্থখানি কোন্ সময়ে রচিত। ইহার একস্থলে উক্ত হইয়াছে —

"উৎসার্য্যানি ত্বনিষ্টানি পাষণ্ডাশ্রমিনঃ স্তথা
কষায় বসনাশ্চৈব বিকলাশ্চৈব নরাঃ।"

অর্থাৎ "অনিষ্ট সমূহ এবং কাষায়বসন পাষণ্ডাশ্রমী ও বিকল মনুষ্যদিগকে নাট্যমণ্ডপ হইতে বহিষ্কৃত করিবে।"

আর এক স্থলে আছে :—

"যাবত্তং পূরয়েদ্দেশং ধ্বনি-র্ণাট্য সমাশ্রয়ঃ
ন স্থাস্যন্তি হি রক্ষাংসি তং দেশং ন বিনায়কাঃ।"

"যাবৎ কোন দেশ, নাট্য-সমাশ্রিত ধ্বনির দ্বারা পূরিত হইবে, তাবৎ সে দেশে রাক্ষসেরাও থাকিবে না, বিনায়কেরা অর্থাৎ বৌদ্ধেরাও থাকিবে না।"

অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই নাট্য-শাস্ত্র বৌদ্ধযুগে রচিত। শুধু তাহা নহে, যে সময়ে কোন বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজার রাজত্ব ছিল, ইহা সেই সময়কার গ্রন্থ। ইতিহাসে দেখা যায়, প্রায় অধিকাংশ সময়েই হিন্দু ও বৌদ্ধগণ, এখনকার শাক্ত বৈষ্ণবদিগের ন্যায় পাশাপাশি থাকিয়া নির্ব্বিবাদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত; তবে যে সময়ে কোন বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, সেই সময়েই কিছুকালের জন্য বৌদ্ধদিগের প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ হইত। এমন কি, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কাশ্মীরের শক-রাজা কনিষ্কের বংশধর নৃপতিদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এইরূপ বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম-নর যিনি আনুমানিক ১২০ খৃষ্টাব্দে, মুকুল যিনি ২৫০ খৃষ্টাব্দে এবং মিহিরকুল যিনি ২৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন—ইহাদের নাম করা যাইতে পারে। প্রচলিত সংস্কৃত নাটকগুলির মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সেই মৃচ্ছকটিক খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত বলিয়া পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। সেই মৃচ্ছকটিক নাটকে দেখা যায়, সে সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব বড় একটা ছিল না—প্রত্যুত সে সময়ে জনসাধারণ হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়াও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও বৌদ্ধনীতির পক্ষপাতী ছিল। তাই মনে হয় এই গ্রন্থখানি মৃচ্ছকটিকের কিছু পূর্ব্বে রচিত—বহুপূর্ব্বে রচিত নহে। কেন না "দর্দ্দুর" নামক বাদ্য-যন্ত্র যাহা মৃচ্ছকটিকের সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহা এই নাট্য-শাস্ত্রেও আতোদ্যের একটি প্রধান যন্ত্র বলিয়া পরিগণিত। এই দর্দ্দুর বাদ্য-যন্ত্রের উল্লেখ আর কোথায় বড় একটা পাওয়া যায় না, এমন কি হরিবংশেও পাওয়া যায় না।

যাবত্তং পুরয়েদ্দেশং ধ্বনি র্নাট্য-সমাশ্রয়ঃ
ন যাস্যন্তি হি রক্ষাংসি তং দেশং ন বিনায়কাঃ।

"যাবৎ নাট্য-সমাশ্রিত-ধ্বনি কোন দেশে থাকিবে, তাবৎ সেই দেশে

বিনায়কেরা থাকিবে না" এই শ্লোকটি যাহা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে; তাহা হইতে হিন্দুদিগের মধ্যে বৌদ্ধ-বিদ্বেষের আর একটি সহজ কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। সে কারণটি এই, বৌদ্ধগণ নাট্যক্রীড়া ও সঙ্গীতাদির বিরোধী ছিলেন! শাক্যসিংহ ভিক্ষুগণকে যে দশটি উপদেশ দেন, তাহার মধ্যে একটি উপদেশ এই যে * "নাট্য-ক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকিবে।" বৌদ্ধগণ যে নাট্যসঙ্গীতাদির বিরোধী ছিলেন, তাহার আর এক প্রমাণ এই, তির্ব্বৎপ্রদেশে বৌদ্ধ-দিগের পুস্তকাগারে কালীদাসের কাব্যাদি গ্রন্থের অনুবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকের অনুবাদ পাওয়া যায় না। মৃচ্ছকটিকের পূর্ব্ববর্ত্তী নাটকগুলি যে বিলুপ্ত হইয়াছে,—শকদিগের আক্রমণ, ম্লেচ্ছ-দিগের আক্রমণ, রাজ্যবিপ্লবাদি ছাড়া, নাট্যসঙ্গীতাদির প্রতি বৌদ্ধদিগের অনাদরও বোধ হয় অন্তর কারণ। এবং এইরূপ নাট্য-সঙ্গীতাদির প্রতি বৌদ্ধদিগের বিরাগ ও বিদ্বেষ, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের প্রথম যুগের মধ্যে হওয়াই সম্ভব! কেন না, বৌদ্ধধর্ম্মের শেষযুগে এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উপদেশ বড় একটা রক্ষিত হয় নাই। তাই মনে হয়, এই নাট্যশাস্ত্র বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম যুগেরই গ্রন্থ।

এই নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থ হইতে আর একটি তথ্য এই জানা যায়, যে সময়ে বাহ্লীক অর্থাৎ ব্যাকৃট্রিয়া প্রদেশে গ্রীকেরা রাজ্য স্থাপন করে, সেই খৃঃ পূঃ সার্দ্ধ দুই শতাব্দীর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হয় নাই। কেন না, নাট্যশাস্ত্রের আহার্য্যাভিনয়-অধ্যায়ের এক স্থলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে:—

"শকাশ্চ যবনাশ্চৈব পহ্লবা বাহ্লিকাশ্রয়া।
প্রায়েন গৌরাঃ কর্ত্তব্যা উত্তরাং পশ্চিমাং দিশাম্।"

অর্থাৎ উত্তর পশ্চিমদিকস্থ শক পহ্লব ও বাহ্লিকাশ্রিত যবনদিগের

* ঐতিহাসিক রহস্য।

প্রায় গৌরবর্ণ করাই কর্ত্তব্য। এই যবন ও শকশব্দে বাহ্লিকদেশস্থ গ্রীক ও ভারতবর্ষ-আক্রমণকারী জাতিই বুঝায়। গ্রীকদিগের এই বাহ্লিক রাজ্য খৃঃ পূঃ প্রায় সার্দ্ধ দুই শত বৎসর হইতে খৃঃ পূঃ সাতান্ন বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। যবন কাম্বোজ ও পারদ জাতির সহিত শক ও পহ্লব নামক দুইটি জাতির নাম নানা সংস্কৃত গ্রন্থে একত্র লিখিত হইয়া থাকে। উহারা সকলেই ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর-দেশ নিবাসী লোক। খৃষ্টাব্দের প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে শকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশ অধিকার করিয়া ক্রমশ উত্তরে, হিন্দুকোঃ পর্ব্বত হইতে দক্ষিণে, সিন্ধু নদীর মোহানা পর্য্যন্ত, আপনাদের অধিকার বিস্তার করে। *

এই গ্রন্থে যখন শক যবনের উল্লেখ আছে, তখন এই গ্রন্থখানি খৃঃ পূঃ দুই শতাব্দিরও উত্তরকালে লিখিত ইহা স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে। তা ছাড়া, এই গ্রন্থের ১৮৩ পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত "সুরঙ্গ" শব্দ হইতে জানা যায়, গ্রীকদিগের আগমনের অনেক পরে এই গ্রন্থখানি লিখিত। এই সুরঙ্গ শব্দটি গ্রীক শব্দ Syrenx হইতে উৎপন্ন। অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসরের কমে এই বিদেশীয় শব্দটী সংস্কৃতের মধ্যে প্রবেশলাভ করা এক প্রকার অসম্ভব। অতএব শব্দতত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলেও প্রতিপন্ন হয়, এই গ্রন্থখানি খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের শেষভাগে কিম্বা খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে রচিত হইয়াছিল।

"রঙ্গদৈবত পূজা বিধান" নামক নাট্যশাস্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে আর একটি তথ্য জানা যায়, নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মিত হইলে যথাবিধি সমস্ত পূজা সমাপ্ত করিয়া অবশেষে জর্জরের পূজা অর্থাৎ ইন্দ্রধ্বজের পূজা হইত। এমন কি, অভিনয়ের পূর্ব্ব-রঙ্গে, রঙ্গপীঠে যখন সূত্রধার প্রবেশ করিবে তখন তাহার একজন পার্শ্বিককে "জর্জ্জর" বংশখণ্ড হস্তে লইয়া প্রবেশ করিতে হইবে—এইরূপ নাট্যশাস্ত্রে বিধান আছে। এই ইন্দ্রধ্বজের

* শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত উপাসক-সম্প্রদায়।

উৎসব বর্ষারম্ভে ভারতের পশ্চিম প্রদেশেই প্রচলিত ছিল। কনিষ্ক যিনি কাশ্মীরের প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজত্ব করেন তাঁহার সভা-কবি অশ্বঘোষ-প্রণীত বুদ্ধচরিত নামক মহাকাব্যের কোন কোন অংশে, উপমা-স্থলে এই ইন্দ্রধ্বজের উল্লেখ আছে। অতএব ইহা হইতেও কতকটা প্রমাণ হয়, এই গ্রন্থ খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। এই নাট্য-শাস্ত্রে যখন দশ প্রকার রূপকের ভেদ বর্ণিত হইয়াছে, এবং অভিনয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তখন ঐ গ্রন্থসূচিত নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যকলা এইরূপ উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে যে ন্যূনতঃ পাঁচ শত বৎসর লাগিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নাট্যমণ্ডপের উৎপত্তি সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে— "ব্রহ্মা কহিলেন, সম্প্রতি ইন্দ্রধ্বজোৎসব উপস্থিত, এই অবসরে তুমি (ভরত) এই নাট্যাখ্য বেদ প্রদর্শন কর। তখন আমি "অসুর পরাজয়" অভিনয় আরম্ভ করিলাম। উহার প্রথমে আশীর্ব্বাদ-সংযুক্তা অষ্টপদা নান্দী রচনা করি। ঐ অভিনয়ে দৈত্যেরা যেরূপ দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, তাহার একটী অনুকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। ফলতঃ এই নাট্যযোগ দর্শনে ব্রহ্মাদি দেবগণ অত্যন্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে নানারূপ উপকরণ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এক উৎকৃষ্ট ধ্বজ, ব্রহ্মা কুটিলক, বরুণ ভৃঙ্গার, সূর্য্য ছত্র, বায়ু চামর, বিষ্ণু সিংহাসন ও কুবের মুকুট প্রদান করিয়াছেন। * * * * কিন্তু তৎকালে সভাস্থলে অসুরেরা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং কহিল, আমরা এইরূপ নাট্য দর্শন করিতে কিছুতেই ইচ্ছুক নহি, চল সকলে প্রস্থান করি। এই বলিয়া উহারা তৎক্ষণাৎ মায়াবলে আমাদের বাক্য দেহ-চেষ্টা স্মৃতি ও নৃত্য স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল। ইন্দ্র সূত্রধারের সমস্ত প্রয়াস বিধ্বস্ত দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, সমস্ত সভাস্থল বিঘ্নব্যাপ্ত; এবং সূত্রধার ও অন্যান্য পাত্রগণ

সংজ্ঞাহীন ও স্তব্ধ। পরে তিনি ক্রোধাবেগে শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া ধ্বজ গ্রহণ করিলেন এবং রঙ্গপীঠ-গত বিঘ্ন ও অসুরগণকে দমন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দৈত্যেরা কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। উহারা প্রায়ই নাট্যের বিঘ্নাচরণ করিতে লাগিল। তখন আমি পুত্রগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট গিয়া কহিলাম, ভগবন্ নাট্যে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত, এক্ষণে যাহাতে ইহার রক্ষা হয় আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

অনন্তর ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ধীমন্ তুমি যত্নসহকারে একটি নাধ্যগৃহ নির্ম্মাণ কর। বিশ্বকর্ম্মাও তাঁহার আদেশে শীঘ্র এক বিশাল নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেব, আমি আপনার আজ্ঞাক্রমে সমস্তই প্রস্তুত করিয়াছি। আপনি আসিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। তখন ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত নাট্যমণ্ডপ দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন এবং যমকে উহার দ্বারদেশে রাখিয়া অপরাপর দেবতাদের উহার নানাস্থান রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। তখন দেবতারা কহিলেন, ভগবন্, ব্রহ্মা অসুরদিগকে কহিলেন, তোমরা কি জন্য বিঘ্নাচরণ করিতেছ। অসুরেরা কহিল, আপনি দেবগণের ইচ্ছাক্রমে যে নাট্যবেদ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের তুষ্টির জন্য উহাতে আমাদের অবমাননা করা হইয়াছে। দেবগণের ন্যায় আমাদের প্রতিও আপনার সমদৃষ্টি থাকে এক্ষণে আমরা এই টুকু প্রার্থনা করি।

ব্রহ্মা কহিলেন, অসুরগণ, তোমরা রুষ্ট হইও না, বিষাদ পরিত্যাগ কর। আমি তোমাদের ও দেবতাদের কর্ম্মভাব ও বংশ পর্য্যালোচনা করিয়া এই নাট্যবেদ রচনা করিয়াছি। ইহাতে কেবল যে তোমাদের ভাবানুবদ্ধ আছে তাহা নহে—ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোকের ভাবানুকীর্ত্তনই এই নাট্য।”

যাহা হউক নাট্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্র হইতে এই টুকু সার সংগ্রহ করা যাইতে পারে যে, সার্ব্বর্ণিক লোক শিক্ষার উদ্দেশেই ভরত মুনি, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ যুগে, নাট্যবিদ্যার প্রয়োগ, ভারতে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন; এবং ইন্দ্রধ্বজ উৎসবের সময়, ভারতের পশ্চিম প্রদেশেই নাট্য-প্রয়োগের প্রথম আরম্ভ হয়।

——০——
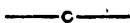
ভারতের নাট্যকলা ও রচনা-পদ্ধতি।

সকল দেশেরই সাহিত্য ও নাট্যের রচনা-পদ্ধতিতে কতকগুলি সাধারণ ও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

নাটক বলিলে আমরা সাধারণতঃ কি বুঝিয়া থাকি? নাটক কাহাকে বলে? যখন কবি নিজমুখে কিছু বর্ণনা না করিয়া, কোন আখ্যায়িকায় কতকগুলি পাত্রকে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া, তাহাদের নিজমুখে নিজকথা কথোপকথনচ্ছলে ব্যক্ত করান, তখনই তাহা নাটকের আকার ধারণ করে। কিন্তু উহা কেবল নাটকের বাহ্য আকার মাত্র। ঐ সকল পাত্রগণ পরস্পরের সহিত এমন ভাবেও কথা কহিতে পারে, যাহাতে পরস্পরের মনে কোন প্রকার বিকার উৎপন্ন হয় না— এরূপস্থলে উহাকে কি নাটক বলা যাইতে পারে? "তুমি কেমন আছ? —আমি ভাল আছি" ইত্যাকার কথাবার্ত্তায় নাটকীয় ভাব প্রকাশ পায় না, উহাকে নাটক বলা যায় না। এই প্রকার কথোপকথন, অন্য হিসাবে যতই মনোরম হউক না, নাটকের হিসাবে আদৌ ফলপ্রদ নহে। প্রধান পাত্রদিগের পরস্পরের মনে কোন প্রকার বিকার উৎপাদন করাই নাটকের প্রধান কার্য্য, এবং তাহার উপরেই নাটকের নাটকত্ব নির্ভর করে। এই মানসিক বিকারের সমষ্টিই মনুষ্যের প্রকৃত জীবন। এই সুখদুঃখময় জীবনে, মানুষ সুখকে আলিঙ্গন ও দুঃখকে পরিহার করিবার জন্য সতত চেষ্টা করে, এবং ভবিতব্যতার সহিত সংগ্রাম করিয়া, নিজ পুরুষকার প্রকটিত করে। এই মানসিক জীবন-সংগ্রামে মানুষ উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, নিজ স্বার্থকেও বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। তাই, নাটকে আমরা দেখিতে পাই, মানুষ পরস্পরের সহিত নানা সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া, কখন শত্রুভাবে, কখন মিত্রভাবে পরস্পরের সহিত ব্যবহার করিতেছে। এই কার্য্যশীলতাই নাটকের প্রাণ। নাট্য-কবি,

জীবনের সামান্য দৈনিক ঘটনাগুলি বাদ দিয়া, যে গুলি প্রধান ঘটনা—যাহা পরস্পরের মনোবিকার উৎপাদনে সমর্থ—তাহাই নির্দ্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে, মুখ্যরূপে প্রদর্শন করেন এবং এমন ভাবে প্রদর্শন করেন, যাহাতে তাঁহার নাটকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। ইহার উপরেই নাট্য-কবির গুণপনা নির্ভর করে।

আধুনিক উপন্যাসেও এইরূপ কথোপকথন মধ্যে মধ্যে থাকে বটে, কিন্তু সেই কথাবার্ত্তার মধ্যে কখন কখন যে ফাঁক পড়িয়া যায়, আখ্যান-কবি তাহা নিজ কথায় পূরণ করিয়া দেন; অর্থাৎ সেই আনুষঙ্গিক অবস্থা ও ঘটনাগুলি তাঁহার নিজ মুখে বর্ণনা করেন। কিন্তু নাট্য-কবি সেরূপ উপায় অবলম্বন করেন না। তিনি সকল স্থলেই তাঁহার পাত্র-গণকে জীবন্ত ব্যক্তিরূপে সাজাইয়া আসরে আনয়ন করেন; এবং তাহাদের অবস্থার অনুরূপ কথাবার্ত্তা তাহাদের নিজের মুখ দিয়াই ব্যক্ত করেন। উপন্যাস ও নাটকের রচনায় এই মুখ্য প্রভেদটি স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। এই জন্যই রঙ্গপীঠের আবশ্যকতা। অভিনয় প্রদর্শন করাই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। অনুকরণবৃত্তিই অভিনয়ের মূল। কোন নাট্য রচনাকে দুই হিসাবে বিচার ও পরীক্ষা করা যাইতে পারে। এক, উহার কাব্যাংশ লইয়া, আর এক, উহার নাট্যাংশ লইয়া। নাটক দৃশ্য-কাব্যের অন্তর্গত; অভিনয়ই উহার প্রাণ। উৎকৃষ্ট নাটক মাত্রই কতকটা কাব্যরসাত্মক। এ স্থলে শুধু ছন্দোবদ্ধ লেখাকেই আমি কবিতা বলিতেছি না। কি গদ্য, কি পদ্য, উভয়েতেই কাব্য-রস প্রকাশ পায়, তাহা কাব্যাংশেরই সামিল। নাটকের নাট্যকলা বিশেষ-রূপে কিসের উপর নির্ভর করে? যখন সমস্ত নাটকের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড স্বসম্পূর্ণ যোগ প্রকাশ পায়, তখনই উহা কলার মধ্যে পরিগণিত হয়। শিল্পকলা মাত্রেরই এইরূপ প্রকৃতি। প্রত্যেক ললিত কলার বিশেষ সৌন্দর্য্য একএকটি বিশেষ-বিশেষ আকারে অভিব্যক্ত

হইয়া থাকে। এই আকার-রচনা, এই রূপ-কল্পনা প্রত্যেক কলা-বিদ্যার ভিত্তিভূমি। যখন কোন কলা-কবি স্বকীয় কোন সুন্দর মানস-প্রতিমাকে বাহিরে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রকাশ করেন, তখনই তাহা ললিত কলার অন্তর্গত হয়। তাজমহলের গঠনে যে রূপ-কল্পনা লক্ষিত হয়, তাহার বিচিত্রতার মধ্যেও একটি সুন্দর একতা আছে। এই বিচিত্রতার মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য ও একতা রক্ষিত হইয়াছে বলিয়াই, তাহার শিল্প-নৈপুণ্যের এত প্রশংসা। গ্রীশদেশীয় নাট্য-সমালোচকগণ এইজন্য নাট্য-কলার তিনটি একতার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেন। প্রথম—কালের একতা, দ্বিতীয়—স্থানের একতা, তৃতীয়—আখ্যান-বস্তুর একতা। কিন্তু সেক্সপিয়ার প্রভৃতি কতকগুলি য়ুরোপীয় নাটকে দেশকালের একতা ততটা রক্ষিত হয় না। আধুনিক য়ুরোপীয় সমা-লোচকগণ, বস্তুগত একতা ও উদ্দেশ্যগত একতাকেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়া থাকেন। আমাদের সাহিত্য-দর্পণও কতকটা এই মতের পক্ষ-পাতী। সাহিত্য-দর্পণ বলেন—

"বিচ্ছিন্নাবন্তরৈকার্থঃ কিঞ্চিৎ সংলগ্নবিন্দুকঃ।
যুক্তোন বহুভিঃ কার্য্যৈর্বীজসংহৃতিমান্ ন চ॥"

অর্থাৎ "নাটকের বিচ্ছিন্ন অবান্তর অংশগুলির মধ্যে মূল উদ্দেশ্যের সমতা রক্ষিত হওয়া চাই; বিন্দুগুলি—অর্থাৎ মুখ্য ঘটনার অংশগুলিও কিঞ্চিৎ সংলগ্ন হওয়া চাই; নাটকে বহু ব্যাপার থাকা সঙ্গত নহে এবং বীজ অর্থাৎ গ্রন্থের প্রকৃতিরূপ মূল-কারণের যাহাতে সংহার না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা চাই।" নাটকের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি-সম্বন্ধে আধুনিক য়ুরোপীয় সমালোচকগণ যাহা বলেন, আমাদের প্রাচীন সমালোচকগণও ঠিক তাহাই প্রতিপাদন করেন!

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে অভিনয়ই নাট্যকলার প্রাণ। নাট্যশাস্ত্রে চারি প্রকার অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়,—বাচিক, আহার্য্য, সাত্ত্বিক

ও আঙ্গিক। গদ্য পদ্যাদির দ্বারা অর্থযুক্ত রচিত বাক্যের দ্বারা যে অভিনয় হয়, তাহাকে বাচিক অভিনয় বলে। নেপথ্য-বিধানের দ্বারা যে অভিনয় হয়, তাহাকে আহার্য্য অভিনয় বলে। নেপথ্য-বিধি চারি প্রকার,—পুস্ত, অলঙ্কার, সংজীব ও অঙ্গ-রচনা। শৈল, যান, বিমান, ছর্ম্ম, বর্ম্ম, অস্ত্র, ধ্বজ, পতাকা, এই সকলের নাম পুস্ত। মাল্য আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্বারা যথাযোগ্যরূপে অঙ্গাদি ভূষিত করাকে অলঙ্কার-নেপথ্য কহে। নেপথ্য হইতে যে প্রাণী প্রবেশ হয়, তাহার নাম সংজীব। পূর্ব্বোক্ত মাল্যাভরণাদি ও বিবিধ বর্ণের দ্বারা সজ্জিত করাকে অঙ্গরচনা বলে। সুখদুঃখাদি মনোবিকারকে সত্ত্ব বলে। এই মনোবিকার আট প্রকার। যথা,—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বিবর্ণতা, অশ্রু ও প্রলয়। এই সকল ভাব প্রকাশ করিয়া যে অভিনয় হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক অভিনয় বলে।

বস্ত্র বা চর্ম্মাদি দ্বারা যে দৃশ্য নির্ম্মাণ করা যায়, তাহার নাম সন্ধিমা; সেই দৃশ্য যদি যন্ত্রঘটিত হয়, তবে তাহাকে ভঙ্গিমা বলে; যে দৃশ্য চেষ্টমান থাকে তাহা চেষ্টমান। ইহার মধ্যে সচিত্র দৃশ্যের কোন উল্লেখ নাই। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে চিত্রপটের দৃশ্যও রঙ্গালয়ে ব্যবহৃত হইত; তাঁহারা বলেন, ভবভূতীর "উত্তর রামচরিতে," সীতাকে লক্ষ্মণ তাঁহাদের পূর্ব্বতন ভ্রমণ-পথের যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রমাণ হয় যে, সেকালে সচিত্র দৃশ্যও ছিল। কিন্তু এই যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা আখ্যান-বস্তুরই অঙ্গীভূত, তাহা নাট্যদৃশ্যের হিসাবে প্রদর্শিত হয় নাই। আর এক কথা, সেকালের চিত্রকলার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দূরনৈকট্য-সূচক পরিপ্রেক্ষিত চিত্রলেখা-পদ্ধতি জানা ছিল কি না, কিম্বা প্রচলিত ছিল কি না, সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। বাস্তবের কতকটা অনুকরণ করিয়া, দর্শকের চিত্ত-বিভ্রম উৎপাদন করাই অভিনয়ের

একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু যে দৃশ্য-চিত্রে দূরনৈকট্যের কৌশল প্রকটিত না হয়, তাহা বাস্তবিক বলিয়া ভ্রম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই বোধ হয়, তখনকার নাট্যাভিনয়ে সচিত্র দৃশ্যের ব্যবহার ছিল না। রথ, বিমান, জীবজন্তু প্রভৃতি রঙ্গপীঠে আনীত হইত, কিন্তু কোন প্রকার সচিত্র দৃশ্য প্রদর্শিত হইত না। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার আবশ্যক হইলে দৃশ্য পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইত না—রঙ্গপীঠের উপর চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিয়াই তাহা সূচিত হইত। ফলকথা এখনকার ন্যায় সেকালে দৃশ্যাদির আড়ম্বর ছিল না, অনেকটা দর্শকদের কল্পনার উপরেই নির্ভর করা হইত। একালে, সর্ব্বদেশের রঙ্গালয়েই দৃশ্য প্রদর্শনের আড়ম্বর বাড়িতেছে এবং প্রকৃত অভিনয়ের ক্রমশই অবনতি হইতেছে। প্রাচীন ভারতের রঙ্গালয়ে দৃশ্য আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু অভিনয়-বিদ্যা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। অভিনয়-বিদ্যার কতটা উন্নতি হইয়াছিল, তাহা ভরতের নাট্যশাস্ত্র পাঠ করিলেই উপলব্ধি হয়। আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যে expression—অর্থাৎ অনুভাব-সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, কিন্তু আমাদের নাট্যশাস্ত্রের ভাবপ্রকাশের ব্যাপারসমূহ যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে, সেরূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। আমাদের নাট্যশাস্ত্রে ভাবপ্রকাশসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম দর্শনের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা-পদ্ধতিও অতি বিশুদ্ধ। উহাতে বিভাব, ভাব, অনুভাব ও রস এই চারিটি তথ্য অনুসরণ করিয়া অভিনয়-বিদ্যার তত্ত্ব সকল নিরূপিত হইয়াছে।

বিভাব কি?—না, যে বাহ্য অবস্থা ও ঘটনা হইতে মনুষ্যহৃদয়ে ভাব উদ্দীপিত হয় তাহাই বিভাব; এবং এই হৃদয়-ভাবের বাহ্য লক্ষণ সকল যাহা মুখাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রকটিত হয়, তাহাই অনুভাব। ভাব ও রসে বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। ভাবগুলি যখন উপভোগ্য

করা যায়, অথবা আস্বাদন করা যায়, তখনই তাহা রস নামে অভিহিত হয়। নাট্যব্যাপারে এই রস, স্বাভাবিক অভিনয়ের দ্বারা, প্রেক্ষক-মণ্ডলীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। যে ভাবের অভিনয় হইতেছে, সেই ভাব যখন উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর মনে উদ্দীপিত হয় সেই অভিনয়কেই উৎকৃষ্ট অভিনয়,—সরস অভিনয় বলা যায়। নাট্যশাস্ত্রোল্লিলিখিত এই রস আট প্রকার,—শৃঙ্গার, হাস্ত, করুণ, রৌদ্র, বীর ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত; এবং ইহারই অনুরূপ আট প্রকার স্থায়ী ভাব, যথা:—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। নাট্যশাস্ত্র বলেন, "যেমন মনুষ্যের মধ্যে রাজা, শিষ্যের মধ্যে গুরু, সমস্ত ভাবের মধ্যে স্থায়ীভাব সেইরূপ। যেমন রাজা বহুজন-পরিবৃত হইলেও রাজা এই নাম পাইয়া থাকেন, অন্য কোন পুরুষ তাহা পায় না, সেইরূপ বিভাব ও ব্যভিচারী-পরিবৃত স্থায়ী ভাবই রসত্ব লাভ করিয়া থাকে।" এই সকল স্থায়ী ভাব হইতে যে সকল গৌণভাব অবস্থানুসারে উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব বলা যায়। নির্ব্বেদ গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা অপস্মার, সুপ্তি, জাগরণ, অমর্ষ, অবহিত্থ, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস ও বিতর্ক এইগুলি ব্যভিচারী ভাব। এইগুলি সর্ব্বসমেত তেত্রিশটি। সাত্ত্বিক ভাব আটটি, যথা:—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়। কিন্তু আমার বিবেচনায়, এই সাত্ত্বিক ভাবগুলিকে অনুভাবের শ্রেণীতে ধরিলেই সঙ্গত হইত; কারণ, এই সকল ভাবও ভাবেরই শারীরিক বাহ্য লক্ষণ মাত্র। বিভাব, অনুভাব, ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগেই রসের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ভরতমুনি বলেন, "যেমন নানা ব্যঞ্জন ও ঔষধিদ্রব্য সংযোগে রসের সমাবেশ হয়, সেইরূপ স্থায়ীভাব-সকল নানা ভাব দ্বারা অনুগত হইয়া রসত্ব

প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রস কিরূপ—না, যাহা আস্বাদ্য। যেমন লোকে নানা ব্যঞ্জনযুক্ত সুসংস্কৃত অন্নভোজন করিয়া রস আস্বাদন করে, সেইরূপ মনস্বী নাট্যদর্শকেরা নানা ভাবাভিনয়-প্রকাশিত স্থায়ীভাব-সকল আস্বাদন করিয়া থাকেন। ভাবহীন রস নাই, এবং ভাবও রস-হীন নহে; অভিনয়ে উভয়ের সিদ্ধি পরস্পরকৃত জানিবে। যেমন ব্যঞ্জন ও ঔষধি সংযোগে অন্ন স্বাদু হয়, রসভাবকে সেইরূপ জানিবে; ফলতঃ এই দুই অন্যোন্যাপেক্ষ।" ভরতমুনি বলেন, শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস এই চারিটি অন্যান্য রসের মূল। শৃঙ্গার হইতে হাস্য, রৌদ্র হইতে করুণ, বীর হইতে অদ্ভুত, এবং বীভৎস হইতে ভয়ানক উৎপন্ন হয়। শৃঙ্গারের যাহা কার্য্য তাহা হাস্য; রৌদ্রের যাহা কার্য্য তাহা করুণ, বীরের যাহা কার্য্য তাহা অদ্ভুত; আর যাহা বিভৎসদর্শন তাহা ভায়ানক।

এই সকল বিভাব, ভাব ও অনুভাব অনুসরণ করিয়া নাট্যশাস্ত্রে নাট্যাভিনয়ের কিরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত এইখানে উদ্ধৃত করি,—তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, অভিনয় সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রকারের কতটা সূক্ষ্মদর্শিতা ছিল। শোক অভিনয়ের এইরূপ উপদেশ আছে :—"প্রিয়-বিয়োগ, বিভব-নাশ, বধ বন্ধন ইত্যাদি বিভাব হইতে শোক জন্মে। অশ্রুপাত, বিলাপ, পরিবেদন, বিবর্ণতা, স্বরভঙ্গ, দেহ-শৈথিল্য, ভূমিপাত, ক্রন্দন, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ইত্যাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে। রোদন তিন প্রকার—আনন্দজ, কাতরতা-জনিত, ও ঈর্ষাকৃত। তন্মধ্যে যাহা আনন্দজ তাহাতে গণ্ড হর্ষে উৎফুল্ল, এবং অনুস্মরণহেতু অপাঙ্গ হইতে অশ্রুপাত ও রোমাঞ্চাদি হয়। যাহা কাতরতা-জনিত, তাহাতে পর্য্যায়রূপে অশ্রুপাত মুক্তকণ্ঠতা, অস্থিরদেহের নানারূপ চেষ্টা, ভূমিসাত, ও বিলাপাদি হয়। যাহা স্ত্রীলোকের ঈর্ষাকৃত তাহাতে গণ্ড ও ওষ্ঠ স্ফুরণ, শিরঃকম্প,

ভ্রূকুটি ও কটাক্ষের কুটিলতা ইত্যাদি হইয়া থাকে। স্ত্রী ও নীচ-প্রকৃতি মনুষ্যের দুঃখজ শোক হয়; উত্তম ও মধ্যমের ধৈর্য্যের সহিত এবং নীচের রোদনের সহিত ইহার অভিব্যক্তি হইবে।"

ক্রোধ সম্বন্ধে, ভরতমুনি এইরূপ বলিয়াছেন:—"বিষাদ, কলহ ও প্রতিকুলাচরণাদিদ্বারা ক্রোধ জন্মে। শত্রু নির্যাতন করিবার সময়ে ক্রোধে মুখ কুটিল ও উৎকট হইবে, কর-পরামর্ষণ, ঘনঘন ভুজদণ্ডে দৃষ্টি নিক্ষেপ. ও দন্ত প্রকাশ করিবে। কোন গুরুলোকের উপর ক্রোধ হইলে দৃষ্টিটা কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইবে, দেহের অল্প অল্প ঘর্ম্ম মুছিতে থাকিবে, এবং কঠোর চেষ্টা অব্যক্ত রাখিবে। কোন প্রণয়ীর ক্রোধ হইলে বিচরণ স্বল্পতর হইবে, অপাঙ্গ বিক্ষেপের সহিত অশ্রুপাত ভ্রূকুটি ও ওষ্ঠস্ফুরণ করিবে! পরিজনের উপর ক্রোধ হইলে ক্রুরতা-রহিত হইয়া তর্জ্জন, ভর্ৎসনা, নেত্রবিস্ফারণ ও বিবিধ প্রকার দৃষ্টিপাত করিবে।" বাহুল্যভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না। এই দুইটি দৃষ্টান্ত হইতেই উপলব্ধি হইবে, নাট্যশাস্ত্রকারের কতটা ভূয়োদর্শন ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-শক্তি ছিল।

এক্ষণে, প্রাচীন ভারতে নাট্য-রচনা-পদ্ধতি কিরূপ ছিল, তাহার আলোচনা করা যাউক।

দৃশ্য ও শ্রাব্য ভেদে কাব্য দুই প্রকার। দৃশ্যকাব্যই অভিনয়ের যোগ্য। দৃশ্যকাব্যকে রূপক বলে; কারণ তাহার পাত্রাদিতে ব্যক্তি-বিশেষের রূপ আরোপ করা হয়। রূপকের ভেদে এইগুলি:—নাটক, প্রকরণ, ভাণ ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী, প্রহসন—এই দশ প্রকার। উপরূপক এইগুলি:—নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠি, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খন, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণী, হল্লীশ ও ভাণিক;—এই অষ্টাদশ উপরূপক। এই উপরূপক ও রূপক স্বরূপতঃ একই, এবং

সংহার না হয়, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নানা বিধান-সংযুক্ত হইবে। পদ্যের অতি প্রাচুর্য্য না থাকে, আবশ্যক কার্য্যের কোন ব্যাঘাত না হয় তাহাও দেখিতে হইবে; যে আখ্যান বা কথা অনেক দিনে সম্পাদিত না হয়, সেইরূপ আখ্যান বা কথা ইহাতে সংযুক্ত হইবে। ইহাতে নায়ক আসন্ন অথবা সমীপবর্ত্তী থাকা চাই, এবং তিন চারিটি পাত্রও ইহাতে সন্নিবেশিত করা চাই। দুরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, রাজ্যদেশাদির বিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, শাপ, উৎসর্গ, মৃত্যু, রতি, দন্তচ্ছেদন, যাহা ব্রীড়াজনক, শয়ন, অধরপান, নগরাদি অবরোধ, স্নান, অনুলেপনাদি ইহাতে বিবর্জ্জিত হইবে। অঙ্কের শেষে সমস্ত পাত্র নিষ্ক্রান্ত হইবে। (অঙ্কের এই নিয়মটি ফরাসী নাটকেও দৃষ্ট হয়)।

নাটকের প্রথমেই পূর্ব্বরঙ্গ, তারপর সভাপূজা অর্থাৎ সভাপ্রশংসন, তারপর কবির নামাদি কীর্ত্তন, তাহার পর প্রস্তাবনা। নাট্যবস্তুর পূর্ব্বে নটেরা যাহা কহে তাহাকে পূর্ব্বরঙ্গ অথবা মঙ্গলাচরণ বলে। পূর্ব্বরঙ্গে বিঘ্নোপশান্তির জন্য নান্দী অবশ্যকর্ত্তব্য। দেব দ্বিজ নৃপ প্রভৃতির আনন্দদায়িনী স্তুতি কিম্বা আশীর্ব্বাদকেই নান্দী বলে।

পূর্ব্বরঙ্গবিধান সমাধা করিয়া সূত্রধর রঙ্গস্থলে ফিরিয়া আইসেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি কাব্যস্থাপনা করেন; বীজ, মুখ বা পাত্রের সূচনা করেন; উপস্থিত অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া শ্রোতৃবর্গের প্ররোচনা করেন। যিনি এই সকল কার্য্য করেন, তিনি স্থাপক নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। সূত্রধর কিম্বা স্থাপকের সহকারীকে পারিপার্শ্বিক কহে —তাহার নীচে নট।

সূত্রধারের বাক্যে যখন কোন পাত্র প্রবেশ করে, তখন তাহাকে কথোদ্ঘাত কহে। যদি এক প্রয়োগে অন্য প্রয়োগ প্রয়োজিত হয় এবং এবং সেই দ্বিতীয় প্রয়োগে পাত্রের প্রবেশ হয়, তাহাকে প্রয়োগাতিশয় কহে। উপস্থিত কালকে আশ্রয় করিয়া সূত্রধার যে বর্ণনা করে, সেই

বর্ণনা অবলম্বন করিয়া যখন কোন পাত্র প্রবেশ করে, তখন তাহাকে প্রবর্ত্তক কহে। সাদৃশ্য উদ্ভাবনা হইতে যখন পাত্র প্রবেশরূপ অন্য কার্য্য সাধিত হয়, তখন তাহাকে আসাগিত কহে। নেপথ্যভাষিত ও আকাশভাষিত অবলম্বন করিয়া প্রস্তাবনা কর্ত্তব্য। প্রস্তাবনা করিয়া সূত্রধার রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করে, তাহার পর বস্তু আরম্ভ হয়।

এই বস্তু দুই প্রকার; এক আধিকারিক। আর এক প্রাসঙ্গিক, আধিকারিক অর্থাৎ মুখ্য;—এই মুখ্য ইতিবৃত্তের আনুষঙ্গিক যে চরিত বর্ণিত হয়, তাহাই প্রাসঙ্গিক।

কোন এক কার্য্য চিন্তা করিবার সময়, তৎলক্ষণান্বিত অন্য কার্য্য আগন্তুক ভাবে—অতর্কিত ভাবে প্রযোজিত হইলে তাহাকে পতাকা-স্থান কহে।

যে কার্য্য সম্পূর্ণ একদিবসের মধ্যে সম্পাদিত হয় সেইখানে অঙ্কচ্ছেদ করিয়া, দিবাবসানে অর্থোপক্ষেপ পূর্ব্বক বাক্য প্রযুক্ত হয়। কার্য্যের উপক্ষেপ পাঁচটী;—বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা, অঙ্কাবতার ও অঙ্কমুখ।

অতীত কিম্বা আগামী কথাংশের সূচনা করিয়া অঙ্কের প্রথমে যাহা সংক্ষেপে উক্ত হয়, সেই কথাবিভাগকে বিষ্কম্ভক কহে। নীচ পাত্র প্রয়োজিত প্রাকৃত ভাষায় রচিত কথাবিভাগকে প্রবেশক কহে। উহা দুই অঙ্কের মধ্যস্থলে বিষ্কম্ভের ন্যায় সংক্ষেপে উক্ত হয়। যবনিকার অন্তরাল হইতে যে কার্য্যের সূচনা হয় তাহাকে চূলিকা কহে। কোন অঙ্কের অন্তে, সেই অঙ্কের অবিচ্ছেদে অর্থাৎ তাহার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া, পাত্রাদি সূচিত হইলে তাহাকে অঙ্কাবতার কহে। যে অঙ্কের মধ্যে সমস্ত অঙ্কের মূল ঘটনা অর্থাৎ সমস্ত নাটকের বীজার্থ সূচিত হয়, তাহাকে অঙ্ক-মুখ কহে।

বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, ও কার্য্য এই পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রয়োজন-সিদ্ধি-হেতু।

(১) যে মূল ঘটনার উপর সমস্ত আখ্যান-বস্তু স্থাপিত, তাহাকে কহে।

(২) নাটকের অবান্তর বিচ্ছেদ-স্থলগুলির শেষে যে অবিচ্ছেদের কারণ বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ যে ঘটনাগুলি থাকায় সমস্ত নাটকের মধ্যে উদ্দেশ্যগত অবিচ্ছিন্নতা ও যোগ রক্ষিত হয়, তাহাকেই বিন্দু কহে।

(৩) নির্ব্বহণ অর্থাৎ উপসংহারপর্য্যন্তস্থায়ী প্রাসঙ্গিক চরিতকে পতাকা কহে ; যথা রাম চরিতে—সুগ্রীবাদি, শকুন্তলায়—বিদূষকাদি।

(৪) যে সাধনীয় ব্যাপার আকাঙ্খিত ও অপেক্ষিত, যাহা প্রাসঙ্গিক নহে, যাহার সিদ্ধির জন্য আরম্ভ, উদ্যোগ ও উপসংহার হইয়া থাকে তাহাই নাটকের কার্য্য।

এই কার্য্যের পঞ্চ অবস্থা :—আরম্ভ, যত্ন, প্রত্যাশা নিয়তাপ্তি ও ফলাগম।

নিয়তাপ্তি কি ?—না, বিঘ্নের অপগমে নিশ্চিত প্রাপ্তি অর্থাৎ ফললাভ। এই অবস্থায়, বিঘ্নেরই প্রাধান্য সূচিত হয়। এই কার্য্যগত পঞ্চ অবস্থার যোগে আখ্যানবস্তুর পঞ্চ সন্ধি অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। যথা :—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি।

(১) যেখানে বীজের অর্থাৎ মূল কারণের উৎপত্তি তাহাকে মুখসন্ধি কহে।

(২) প্রধান উপায়ে প্রধান ফলের যেখানে ঈষৎ উদ্ভেদ হয় তাহাকে প্রতিমুখ কহে।

(৩) সেই উপায় ঈষৎ প্রকাশিত হইয়া যখন পুনঃপুনঃ তিরোহিত ও আবার তাহার সন্ধান পাওয়া যায়, তখন তাহাকে গর্ভসন্ধি কহে।

(৪) যখন সেই প্রধান উপায় গর্ভ হইতে উদ্ভিন্ন হইয়া, সান্তরায় অর্থাৎ সবিঘ্ন হয়, তখন তাহাকে বিমর্ষ কহে।

(৫) যখন মুখাদি সমস্ত সন্ধিগুলিই এক প্রয়োজনসাধনে পর্য্যবসিত হয়, তখন তাহাকে নির্ব্বহণ কহে।

এই পঞ্চসন্ধি সর্ব্বজাতীয় নাটকের স্বাভাবিক মুখ্য বিভাগ। এমন কি কোন য়ুরোপীয় নাটককে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, এই পঞ্চ সন্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোমীও জুলিয়েট নাটককে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ক্যাপুলেটের গৃহে নৃত্য-ব্যাপারই উক্ত নাটকের মুখসন্ধি; জুলিয়েটের সহিত রোমিওর সাক্ষাৎকারই প্রতিমুখসন্ধি; প্যারিসের সহিত বিবাহে জুলিয়েটের বাহ্যিক সম্মতি—ইহাই গর্ভসন্ধি; জুলিয়েটের প্রকৃত প্রেমনিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্য যে কৌশল অবলম্বিত হয়, তাহাতে রোমিওর যে নৈরাশ্য—তাহাই বিমর্ষ সন্ধি; তাহার পর, যে পরিণাম হইল, তাহাই উপসংহৃতি। পূর্ব্বোক্ত অর্থপ্রকৃতির সহিত কার্য্যের পঞ্চ অবস্থা, ও পঞ্চসন্ধির কিরূপ মিল আছে, ঐ তিনটীকে উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত করিলেই তাহা সহজে উপলব্ধি হইবে।

অর্থপ্রকৃতি।—বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, কার্য্য।

পঞ্চাবস্থা।—আরম্ভ, যত্ন, প্রত্যাশা, নিয়তাপ্তি, ফলাগম।

পঞ্চসন্ধি।—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি।

——০——

আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফেণলজি।

আমাদিগের যেমন যুগল পদ, যুগল হস্ত, যুগল চক্ষু, যুগল কর্ণ, সেইরূপ আমাদিগের মস্তিষ্কও যুগল। মস্তকের অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক দুই সমান অংশে বিভক্ত—একাংশ বিনষ্ট হইলেও অপরাংশে কাজ কথঞ্চিৎ চলিতে পারে। এই দুই অংশই অক্ষত থাকিলে কাজ যতটা ভাল রকমে চলে—একটির দ্বারা অবশ্য সেরূপ চলিতে পারে না। সমস্ত মস্তিষ্কপিণ্ড একপ্রকার সাদা পদার্থে গঠিত; তাহার উপরিভাগে যেন একটা ধূসর পদার্থের পাতলা প্রলেপ বিদ্যমান। মস্তিষ্কের এই ধূসর অংশ অনু-বীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া জানা যায় যে উহা বিচিত্র আকার-বিশিষ্ট স্নায়ু-কোষের সমষ্টি মাত্র; ঐ প্রত্যেক স্নায়ু-কোশের সহিত দুই চারিটি করিয়া সূক্ষ্ম স্নায়ু-সূত্র সংযুক্ত এবং অভ্যন্তরস্থ শুভ্র পদার্থটি নিরবচ্ছিন্ন স্নায়ু-সূত্রের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই স্নায়ু-কোষ ও স্নায়ু-সূত্র অতি সূক্ষ্ম ও উহাদের জাল-বিস্তার অতীব জটিল। এই স্নায়ু-কোষগুলি এক প্রকার শক্তির আধার এবং স্নায়ু-সূত্রগুলি ঐ শক্তির বাহক-স্বরূপ। মোটামুটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে; বৈদ্যুতিক যন্ত্রে বিদ্যুৎ-পদার্থ উৎপন্ন হইয়া যেরূপ তারযোগে অন্যত্র প্রবাহিত হয় ইহাও কতকটা সেইরূপ। মস্তিষ্কের অভ্যন্তর-প্রদেশে দুইটি বড় বড় স্নায়ু-পিণ্ড আছে যাহাকে ইংরাজিতে "গ্যাংলিয়ন" বলে—একটির নাম "অপ্‌টিক থ্যালামস" আর একটির নাম "কর্পস্ ষ্ট্রায়াটম্"। এই স্নায়ুপিণ্ডদ্বয় উপরিস্থ ধূসর প্রলেপের সহিত স্নায়ু-সূত্রের দ্বারা সংযুক্ত। উহারা স্নায়ু-শক্তির উৎপাদন, পুঞ্জী-করণ, ও বণ্টনের প্রধান কেন্দ্র-স্থল।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন পাক-চক্র ও বিবিধ অংশের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগ আছে যে একস্থানে কোন উৎপাত উপস্থিত হইলেই তাহার ফল

দূরবর্ত্তী অংশেও পৌঁছিয়া থাকে। মস্তিষ্ক যে দুই অর্দ্ধাংশে বিভক্ত—সেই দুই অর্দ্ধাংশ স্নায়ু-সূত্রগঠিত একটা চৌড়া পটীর দ্বারা সংযুক্ত। এই বৃহৎ মস্তিষ্কের পশ্চাতে আবার একটি ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আছে—ইহারও প্রধান উপাদান স্নায়ু-কোষ ও স্নায়ু-সূত্র।

মস্তিষ্কের গঠন কিরূপ—মোটামুটি একপ্রকার বলা হইল। এখন দেখা যাক্, মস্তিষ্কেম ক্রিয়াসকল কিরূপে সম্পন্ন হয়। ফ্রেণলজিষ্ট সম্প্রদায় বলেন, মস্তিষ্কের প্রত্যেক অংশ এক একটি বিশেষ মানসিক বৃত্তির আধার, এবং কোন ব্যক্তির মাথার গঠন দেখিয়া বলা যাইতে পারে তাহার প্রবৃত্তি কোন্ দিকে। তাঁহাদের মত কতদূর সত্য—একথা এখানে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তবে, ইহার মূলে যে কতকটা সত্য নিহিত আছে তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। গল্ ও স্পুরজ্হেম্ নামক জর্ম্মান পণ্ডিতদ্বয় এই সত্যটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, মস্তিষ্কের প্রত্যেক অংশেরই স্বতন্ত্র কাজ আছে এবং এখনকার বৈজ্ঞানিকদিগের পরীক্ষায় তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। তবে ফ্রেণলজিষ্ট-সম্প্রদায় মস্তিষ্কের যে-যে অংশ যে-যে প্রবৃত্তির আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহার সহিত এখনকার বৈজ্ঞানিকদিগের মতের ঐক্য হয় না।

গল্ ফ্রেণলজির মত জারি করিবার অনেক দিন পরে ফ্লুরাঁ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, কোন পশুর মস্তিষ্কের কোন অংশ—সমগ্র মস্তিষ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিরা লইলে সেই অংশের বিশেষ ক্রিয়া স্থগিদ হইয়া যায়। তাহার পর ষিফ্ আবিষ্কার করিলেন, ভিন্ন ভিন্ন অনুভবক্রিয়ার প্রভাবে মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশে তাপ বর্দ্ধিত হয়। তাহার পর ফ্রিস্ ও হিট্সিগ্ একটা কুকুরের মাথার খুলি অনাবৃত করিয়া তাহার মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন যে, মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ ঐরূপে উত্তেজিত করিলে তাহার বিপরীত দিকের দেহ

নড়িয়া উঠে। এই সময় হইতেই আধুনিক মনস্তত্ত্ববাদের স্থত্রপাত হয়। তাহার পর ফেরিয়ার হর্সলি ষাফের প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পরীক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আরও অনেক আবিষ্কার করেন।

তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া মস্তিষ্কের একটা মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন;—দৃষ্টি-কেন্দ্র, শ্রুতি-কেন্দ্র, স্পর্শকেন্দ্র, ঘ্রাণকেন্দ্র, আস্বাদ-কেন্দ্র এবং পৈষিক গতি-কেন্দ্র প্রভৃতি কেন্দ্রস্থানগুলি মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ অংশে আছে তাহা ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

মস্তিষ্কমণ্ডলের উপরিভাগে ও পার্শ্বে—যেখানে ফ্রেণলজিষ্টেরা আত্ম-সম্ভ্রম, দৃঢ়তা, উপচিকীর্ষা, অনুচিকীর্ষা, বিস্ময়, আশা ও সৌন্দর্য্যানু-রাগের বৃত্তি নির্দ্দেশ করেন—তত্রস্থ ধূসর পদার্থের কোন ক্ষতি হইলে তাহার বিপরীত দিকের সমস্ত শরীরের পেশী-সমূহ অসাড় হইয়া পড়ে এবং ঐ অংশ উত্তেজিত করিলে বিপরীত দিকের দেহস্থ পেশীসমূহ উত্তেজিত হইয়া উঠে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে, মস্তিষ্কের ঐ সকল অংশ—হস্ত পদ, বাহু, মস্তক, মুখ ওষ্ঠ প্রভৃতির গতি নিয়মিত করিবার কেন্দ্র-স্থান। বামদিকের কপালের রগ—যেখানে ফ্রেণলজি-ষ্টেরা নির্ম্মিমিৎসার স্থান নির্দ্দেশ করেন তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক-দিগের মতে বাক্যোচ্চারণ-ক্রিয়ার গতি নিয়মিত করিবার কেন্দ্রস্থান। যাহার এই কেন্দ্রটি ধ্বংশ হইয়া যায় সে অভাষা (Aphasia) রোগে আক্রান্ত হয়। অভাষা-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, সব কথাই বেশ বুঝিতে পারে অথচ কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারে না। উহার নিকটস্থ আর একটি অংশ ধ্বংশ হইয়া গেলে লিখন-বিকার (Agraphia) উপস্থিত হয়; যে ব্যক্তি লিখনবিকারগ্রস্ত তাহার লেখা কেহ বুঝিতে পারে না। সে ব্যক্তির হস্তচালনা-ক্রিয়া নিজের আয়ত্তে থাকে না. সুতরাং যাহা মনে করে তাহা কিছু লিখিতে না পারিয়া নানাপ্রকার হিজিবিজি আঁক পাড়িতে থাকে। মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগ—যেখানে

ফ্রেণলজিষ্টরা, লোকাদর-স্পৃহা, বাস্তুনিষ্ঠা, সখ্য, অপত্যস্নেহ প্রভৃতির স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে দৃষ্টির কেন্দ্রস্থান। কানের উপরিভাগে যেখানে ফ্রেণলজিষ্টরা অর্জ্জনস্পৃহা ও জুজুগুপ্সার স্থান নির্দ্দেশ করেন উহা শ্রুতির কেন্দ্রস্থান। তাহার পর ঘ্রাণ, আস্বাদ এবং স্পর্শের কেন্দ্রসকল মস্তিষ্কের আরও নিম্নতর স্তরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাতে ফ্রেণলজি-সম্বন্ধে কিছুই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে না—কেন না, তাঁহারা মস্তিষ্কের কোন অংশ উত্তেজিত করিবার সময় অন্য পার্শ্ববর্ত্তী অংশসকল দগ্ধ করিয়া ফেলেন। মস্তিষ্কের সকল অংশের সঙ্গে যেরূপ পরস্পর যোগাযোগ আছে তাহাতে একাংশ নষ্ট হইলে অন্য অংশের ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে প্রকাশ না হইতেও পারে; দৃষ্টি শ্রুতি প্রভৃতি সরলতর বৃত্তির ক্রিয়া হদ্দ প্রকাশ হইতে পারে—কিন্তু তদপেক্ষা জটিলতর বৃত্তির ক্রিয়া প্রকাশ না হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

ললাটস্থ মস্তিষ্কের দ্বারাই যে বুদ্ধিক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও একরূপ স্বীকার করেন; অথচ পরীক্ষার দ্বারা এ বিষয়ে তাঁহারা কোন বিশেষফল পান নাই। ফ্রেণলজিষ্ট সম্প্রদায় এই কথা বলিতে পারেন, তবে তাঁহারা কেন ইহা বিশ্বাস করেন? ফেরিয়ার পরীক্ষা করিয়া এইমাত্র দেখিয়াছেন, কপালের রগদেশ উত্তেজন করিলে মনোযোগ-ক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এখনকার বৈজ্ঞানিক-দের মতে প্রশস্ত কপাল বুদ্ধির নিদর্শন বটে, কিন্তু শুদ্ধ কপালের মস্তিষ্কই যে বুদ্ধির স্থান তাহা নহে—মস্তিষ্কের বোধবাহক ও গতিবাহক যতগুলি প্রধান কেন্দ্রস্থান আছে, সকলের সম্মিলিত ক্রিয়া-প্রভাবেই বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। তবে কপালের মস্তিষ্কই যে বুদ্ধির প্রধান স্থান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে কতকটা অভাব-পক্ষের প্রমাণ

পাওয়া যায়। যথা, যে সকল জীবের কপাল-প্রদেশের মস্তিষ্কখণ্ড বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই সঙ্গে তাহাদের বুদ্ধিও লোপ পায়। তাহারা অবাধে আহার করিতে পারে কিন্তু কোথায় তাহাদের খাদ্য তাহা তাহারা জানিতে পারে না। যে কুকুরের এইরূপ কপালের মস্তিষ্ক নষ্ট হয় তাহার নিকট যদি একটা অস্থিখণ্ড নিক্ষেপ কর—তাহা হইলে সে অস্থি ধরিবার জন্য আগ্রহের সহিত দৌড়িয়া যাইবে, কিন্তু ঠিক্ কোন্ সময়ে থামিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারিবে না—হয়তো যেখানে অস্থিটি আছে তাহা ছাড়াইয়া কিয়ৎদুর চলিয়া যাইবে।

ব্যাশ্চিয়ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ফ্রেণলজিকে যে একেবারেই উড়াইয়া দেন, তাহাও ঠিক্ নহে—আবার যাঁহারা বলেন ফ্রেণলজির দ্বারা মনুষ্য-চরিত্রের সমস্ত অন্ধি-সন্ধি সম্পূর্ণরূপে জানা যায়, তাঁহাদের কথাও ঠিক্ নহে। পণ্ডিতবর বেন্ এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাই যুক্তি-সিদ্ধ। তিনি বলেন—"মস্তকের গঠনের সহিত মানসিক বিশেষত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনেকটা লক্ষিত হয়—তবে, ফ্রেণলজিতন্ত্রে এই সকল বিশেষত্বের যতগুলি উল্লেখ আছে তন্মধ্যে কতকগুলি টিঁকিয়া যাইতে পারে—আর কতকগুলি ভুল বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতে পারে।" শুধু মাথার খুলির গঠন দেখিয়া একজনের মস্তিষ্কের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বলা যাইতে পারে না। মনুষ্যচরিত্রের বিশেষত্ব মস্তিষ্কের আভ্যন্তরিক প্রকৃতির উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা অনেক প্রতিভাশালী বিখ্যাত লোকের মস্তিষ্ক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের মস্তিষ্কের পাকচক্র সাধারণ লোকের অপেক্ষা অনেক জটিল। সুতরাং, মাথা বড় কি ছোট ইহা শুধু দেখিলে চলিবে না—মস্তিষ্ক-পাকচক্রের অবস্থা কিরূপ তাহাও দেখা আবশ্যক। ফ্রেণলজিতে তাহা দেখিবার উপায় নাই। তাই, ফ্রেণলজি কতকটা সত্য হইলেও অসম্পূর্ণ।

ফ্রেণলজির সহিত আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্বের আর কোন বিষয়ে ঐক্য

হউক বা না হউক, ফ্রেণলজি যে মূল-ভিত্তির উপর স্থাপিত তাহা এখনকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—অর্থাৎ তাঁহারা স্বীকার করেন যে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ,—বিভিন্ন মানসিক বৃত্তি ও শারীরিক ক্রিয়া প্রকাশের স্বতন্ত্র কেন্দ্রস্থল।

—o—

সম্মোহন-তত্ত্ব।

আজকাল সম্মোহন-তত্ত্ব লইয়া য়ুরোপে খুব আন্দোলন চলিতেছে। প্রথম, মেস্‌মের্ নামক একজন পণ্ডিত এই বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করেন। তিনি বলিতেন, একপ্রকার তরল পদার্থ বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া আছে—সেই পদার্থ মানব-দেহেও বর্ত্তমান। এই পদার্থ যাহার শরীরে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আছে, সে আপন অপেক্ষা হীনতর ব্যক্তির উপর প্রভাব প্রকটন করিয়া তাহাকে বশ করিতে পারে;—সেই প্রভাবের নাম তিনি "প্রাণীদেহের চুম্বক-শক্তি" রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এ কথা বড় মানিতে চাহেন না;—মেস্‌মেরিজমে যে একটা রহস্যময় আবরণ ছিল, সেই আবরণটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া, ভেল্কির রাজ্য হইতে উদ্ধার করিয়া, উহাকে তাঁহারা চলিত ঘটনার সামিলে আনিতে চাহেন। তাই মেসমেরিজমের পরিবর্ত্তে তাঁহারা হিপ্‌নটিজম্ এই শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হিপ্‌নটিজমের ঠিক্ অনুবাদ—সুপ্তি-প্রবর্ত্তন-ক্রিয়া। অর্থাৎ তাঁহারা বলিতে চাহেন, নিদ্রা, স্বপ্ন প্রভৃতি যেরূপ স্বাভাবিক ব্যাপার ইহাও তদনুরূপ। ফলতঃ ইহা একপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে নিদ্রা বা স্বপ্ন প্রবর্ত্তন করা। এ নিদ্রা একপ্রকার সজাগ নিদ্রা এবং ইহা কতকটা স্নায়ু-বিকারের ফল। তাই হিপ্‌নটিজমের অনুবাদে উপসুপ্তি-প্রকরণ বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

মেস্‌মেরিক সম্মোহনে, মুখের সাম্‌নে হস্ত সঞ্চালন করিয়া নিদ্রা আকর্ষণ করাই চলিত পদ্ধতি—কিন্তু আধুনিক উপসুপ্তি-প্রবর্ত্তকেরা এ পদ্ধতিটি প্রায় অবলম্বন করেন না।

উপসুপ্তি সঞ্চার করিবার তাঁহাদের দুইপ্রকার প্রণালী আছে। দুইটি পরীক্ষা-বিবরণ এস্থলে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেই পাঠকগণ

সহজে বুঝিতে পারিবেন সেই দুই প্রণালী কিরূপ। জর্ম্মান পণ্ডিত মল পরীক্ষা করিতেছেন।

(১) "২০ বৎসর বয়স্ক একটি যুবকের উপর পরীক্ষা করিতেছি। তাহাকে একটা চৌকিতে বসিতে বলিলাম এবং তাহার হস্তে একটা বোতাম দিয়া বলিলাম—এই বোতামটির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাক। তিন মিনিটের পরে তাহার চোখের পাতা ঢলিয়া পড়িল! হাজার চেষ্টা করিয়াও চোখ খুলিতে পারিল না। এতক্ষণ বোতামটি সে খুব শক্ত করিয়া ধরিয়াছিল—এক্ষণে তাহার হস্ত শিথিল হইয়া হাঁটুর উপর ঢলিয়া পড়িল। আমি তাহাকে বলিলাম তুমি কিছুতেই চোখ্ মেলিতে পারিবে না—সে চোখ্ মেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু পারিল না—ইত্যাদি।

(২) "একজন ৪১ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি চৌকিতে বসিল। আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেই হইবে। ক্রমাগত এইরূপ ভাবে যে তোমার ঘুমাইতে হইবে—এ ছাড়া আর কিছুই ভাবিও না। এখন তোমার চোখ্ বুজিয়া আসিতেছে; তোমার চোখের পাতা ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া আসিতেছে। তোমার চোখের পাতা ঈষৎ কাঁপিতেছে—তোমার সমস্ত দেহে শ্রান্তি বোধ হইতেছে, একটা ভার বোধ হইতেছে, একটা ঘুমের ভাব আসিতেছে—এই তোমার চোখ্ বুজিল; তোমার মাথায় জড়তা আসিতেছে—তোমার চিন্তা-সকল ক্রমশঃ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছে। আর তুমি ঘুম চাপিতে পারিতেছ না—এই তোমার চোখ বন্ধ হইল—এখন ঘুমাও। সে চক্ষু বুজিলে আমি তাহাকে বলিলাম, এখন চোখ্ খুলিতে পার কি? (চোখ্ খুজিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু পারিল না) আমি তাহার বাম হস্ত তুলিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলাম। (হাত সেইখানেই রহিল, হাজার চেষ্টাতেও হাত নাবাইতে পারিল না)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

ঘুমাইয়াছ কি? উত্তর—হাঁ ঘুমাইয়াছি। একেবারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছ? —উত্তর—হাঁ। ঐক্যতান বাদ্য শুনিতে পাইতেছ কি? উত্তর "পাইতেছি বৈকি"। একটা কালো কাপড় তাহার হস্তে দিয়া বলিলাম —এইটা যে কুকুর ইহা তুমি হাত দিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিতেছ তো? উত্তর "স্পষ্ট পারিতেছি"। এখন তুমি চোখ্ খুলিতে পার— চোখ্ খুলিলে কুকুরকে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। তাহার পর তুমি ঘুমাইয়া পড়িবে এবং যতক্ষণ না আমি বলিব ততক্ষণ আর উঠিবে না। (সে চোখ্ খুলিল, কল্পিত কুকুরের পানে তাকাইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল) আমি সেই কালো কাপড়টা তাহার হাত হইতে লইয়া মাটিতে বিছাইয়া দিলাম। (সে দাঁড়াইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতে লাগিল।) তাহার পর আমি তাহাকে বলিলাম, সে এক্ষণে পশু-শালার উদ্যানে আছে—যদিও আমার ঘরে ছিল, সে তাহাই বিশ্বাস করিল—বৃক্ষাদি দেখিতে লাগিল ইত্যাদি।"

অতএব দেখা যাইতেছে প্রথম প্রণালীতে একটা বস্তুর উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া মনোনিবেশ করিতে বলা হয় এবং দ্বিতীয় প্রণালীতে ঘুমের ভাব কথার দ্বারা মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের যোগীরা ভ্রূমধ্য-বিন্দুতে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া আপনাকে আপনি এইরূপে সম্মোহিত করিতেন—ইহাকে স্বকৃত-উপসুপ্তি বলা যাইতে পারে। উপসুপ্তি-তত্ত্বের মূলমন্ত্র—উপসুপ্তাবস্থায় কোন উপায়ে কল্পনা উত্তেজিত করিয়া দেওয়া;—কথা কিম্বা ভাবভঙ্গির দ্বারা কোন প্রকার ধারণা মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়া। তৎকালে মনে যে ধারণার উদ্রেক হয় তাহাতেই ধ্রুববিশ্বাস জন্মে—এবং উপযুক্ত ব্যক্তি সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্য করে। উপসুপ্ত ব্যক্তি, উপসুপ্তি-প্রবর্ত্তকের কথার নিতান্ত বাধ্য —তিনি যাহা বলেন সে তাহাই করে। স্বকৃত-উপসুপ্তির আর এক দৃষ্টান্ত—মন্দির-প্রাঙ্গণে রোগী ব্যক্তির স্বপ্নৌষধ-লাভ। আমাদের

এখানে তারকেশ্বরের মন্দিরে রোগীরা হত্যা দেয়—হত্যা দিয়া কখন কখন স্বপ্নৌষধি লাভ করে। সেই স্বপ্নৌষধিতে যে উপকার হইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। পুরাকালে গ্রীকদিগের মধ্যেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। রোগী ব্যক্তি নিরশন থাকিয়া এক মনে আপনার শারীরিক অবস্থার বিষয় ভাবিতে থাকে—অধিক কাল নিরশন থাকিলে একটু না একটু স্নায়ু-বিকার স্বভাবতই উপস্থিত হয়;—তাহার উপর আবার একাগ্রচিন্তা—ইহাতে করিয়া উপসুপ্তাবস্থা সহজেই উৎপন্ন হয়; এই সময়ে যে ঔষধির বিষয় স্বপ্ন দেখা যায় তাহাতে সহজেই ধ্রুব বিশ্বাস জন্মে। এইরূপে যে ঔষধ ধ্রুববিশ্বাসের সহিত সেবন করা যায় তাহাতে রোগ আরোগ্য হইবারই কথা। আজকাল য়ুরোপের ডাক্তারেরা উপসুপ্তিপ্রবর্ত্তন দ্বারা অনেক রোগ আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইতেছেন। যে সকল রোগ স্নায়ু-ঘটিত তাহাই বিশেষরূপে এই পদ্ধতির দ্বারা প্রশমিত হয়। অনেকের পান-রোগ এই পদ্ধতির দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধারণা উদ্রেক করিয়া দেওয়াই উপসুপ্তিতত্ত্বের মূলমন্ত্র;—সেই ধারণা যে শুধু উপসুপ্তাবস্থাতেই থাকে তাহা নহে, উপসুপ্তি ভাঙ্গিয়া গেলেও সেই ধারণাটি কাজ করিতে থাকে। মনে কর, উপসুপ্তি প্রবর্ত্তক উপসুপ্ত ব্যক্তিকে বলিলেন—তোমার মদ ভাল লাগে না—না?—সে বলিল "না"। তুমি জাগ্রত হইলেও তোমার মদ ভাল লাগিবে না—না? সে বলিল "না"। বাস্তবিকও সে জাগিয়া উঠিয়া এই ধারণানুসারেই কাজ করে। তাহার মদ খাইতে আর ভাল লাগে না। উপসুপ্তি-প্রকরণে এইরূপ ধারণার উদ্রেককে উত্তর-ধারণার উদ্রেক বলে। যাহার প্রকৃতিতে ধারণার উদ্রেক-শীলতা অধিক, সেই উপসুপ্তি-প্রক্রিয়ার অনুকূল পাত্র। সকল প্রকৃতিতে উপসুপ্তি সমানরূপে কার্য্যকরী হয় না॥ অনেকে মনে করে, যাহারা দুর্ব্বল, যাহাদের

ইচ্ছার জোর নাই তাহারাই বুঝি সহজে উপসুপ্তির অধীন হয়। কিন্তু এ কথা ঠিক্ নহে। যাহারা মনস্থির করিতে পারে, একাগ্রচিত্ত হইতে পারে তাহাদের উপরেই বরং এই প্রক্রিয়া অধিক ফলবতী হয়। উপ-সুপ্তি-প্রক্রিয়ার দ্বারা যেরূপ লোকের মনকে ভালোর দিকে লইয়া যাওয়া যায়, সেইরূপ মন্দের দিকেও প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে। এই উপসুপ্তি-প্রক্রিয়ার দ্বারা য়ুরোপে মধ্যে মধ্যে বদ্‌মাইশিও হইয়া থাকে। আদা-লতের বিচারে অনেক সময়ে প্রকাশ হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি উপ-সুপ্তি-প্রবর্ত্তকের আদেশক্রমে কোন বদমাইশি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে—স্বেচ্ছাক্রমে সে কাজ করে নাই। কিরূপ আইন করিলে এই প্রকার ঘটনা নিবারণ হইতে পারে সেই বিষয়ে য়ুরোপে আজ কাল আন্দোলন চলিতেছে। সম্মোহনতত্ত্বকে এখন আর গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। জর্ম্মনি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন অন্যান্য বিজ্ঞান-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয় সেইরূপ উপসুপ্তিতত্ত্ব বিষয়েও রীতিমত বক্তৃতা হইয়া থাকে।

———o———

ভারতের দারিদ্র্য ও সাক্ষাৎ বাণিজ্য।

ভারতের দারিদ্র্য যে ক্রমশই বাড়িতেছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? এ দারিদ্র্য হইতে দেশকে উদ্ধার করা কঠিন; সকল শ্রেণীর লোকেরাই ঋণে আকণ্ঠ মগ্ন। কাহারই প্রায় স্বচ্ছল অবস্থা নহে। বিভিন্ন লোকে ইহার বিভিন্ন কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহার কারণ একটি নহে। অদৃষ্টবাদ, বৈরাগ্য, উপেক্ষা, আলস্য, বাল্য-বিবাহ, সাধারণ শিক্ষার অভাব, শিল্প-শিক্ষার অভাব, সৎসাহসের অভাব প্রভৃতি আমাদের দারিদ্র্যের অনেকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, বৈদেশিক শাসনভারে প্রপীড়িত হইয়া আমাদের স্বাধীনভাব, আমাদের উন্নতি-স্পৃহা, আমাদের মনুষ্যত্ব, উদ্যম উৎসাহ সমস্তই তিরোহিত হইয়াছে; কাজেই আমরা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি। কেহ কেহ বলেন, ইংরাজদিগের কর আদায় করিবার প্রণালীটাই দূষণীয়। স্বদেশীয় রাজাদিগের আমলে, উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশ করস্বরূপে লওয়া হইত, অর্থ লওয়া হইত না। শুখা হাজা অজন্মা হইলে প্রজাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না। এখন শস্যের অবস্থা যাহাই হোক না কেন, একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ করস্বরূপ প্রজাকে দিতেই হইবে। বিস্তীর্ণ দুর্ভিক্ষ না হইলে, বর্ত্তমান রাজসরকার কখনই প্রজাদিগকে ছাড় দেন না। তা ছাড়া, ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেতে অজন্মা হইলে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের ছাড় দিবার কোনও একতিয়ার নাই। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। কৃষকদিগের অবস্থা মন্দ হইলে, সমস্ত দেশের অবস্থাই মন্দ হইয়া পড়ে। কৃষি ও বাণিজ্য দুই যদি আমাদের দেশে প্রবল থাকিত, তাহা হইলে আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইত না। একের অভাব, সময়বিশেষে অপরের দ্বারা পূরণ হইতে পারিত। তা ছাড়া, অর্থশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, উৎকৃষ্ট ভূমিতে

গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ১০০ কিম্বা ১২০ জনের মত আহার যোগান হইতে পারে—সেই ভূমির উপর যদি ১৫০, কিম্বা ২০০ লোক নির্ভর করিয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের জঙ্গল, বন, মরু-স্থান প্রভৃতি যদি কেবল কৃষিযোগ্য ভূমি ধরা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে প্রতি বর্গমাইলে ২০০ হইতে ৩০০ লোক অবস্থিত। সমস্ত লোকসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮৬ জনের কৃষিই একমাত্র নির্ভর স্থল। অতএব আমাদের দারিদ্র্যের কারণ এইখানেই তো হাতে-হাতে দেখা যাইতেছে। অবশ্য, বিজ্ঞান-সঙ্গত আধুনিক উপায়সকল অবলম্বন করিলে, কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধিত হইয়া দেশের অপেক্ষাকৃত শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে; সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিতে হইলে, কৃষি ও বাণিজ্য উভয়েরই উৎকর্ষ সাধন করা চাই। কিন্তু এই বাণিজ্যের কতকগুলি অন্তরায় আছে। কেহ কেহ মনে করেন, ব্যবসা-বাণিজ্যমাত্রই নীচ কাজ। কেহ বা দ্রব্যবিশেষের ব্যবসায়ে আপত্তি করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকের আপত্তি সমুদ্রযাত্রা। এই সমুদ্রযাত্রার বাধা খণ্ডন না হইলে, আমাদের বৈষয়িক উন্নতির বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। আমাদের গোঁড়া লোকেরাও হয়তো বাণিজ্যের কথা শুনিবামাত্রই "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই প্রচলিত বচনটি আওড়াইবেন এবং আর্য্যমহিমা কীর্ত্তনকালে সভাস্থলে বলিবেন, পুরাকালে আমাদের পোতসকল মার্কিনদেশ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। কিন্তু তাঁহাদের কোন আত্মীয় স্বজন "কালাপাণি" পার হইয়া বাণিজ্যার্থে বিলাতে গিয়া বাস করুন দেখি, অমনি তখন তাঁহারা তাহাকে জাত্যন্তর করিবার জন্য ঘোঁট করিতে থাকিবেন। আর একদল এইরূপ চীৎকার করেন, আমাদের দেশের টাকা ইংরাজেরা লুটিয়া লইয়া যাইতেছে, বিলাতের কল কারখানায় আমাদের দেশের শিল্পসকল লুপ্ত করিতেছে। এ কথাগুল সত্য, কিন্তু ইহা নিবারণের জন্য তোমরা কি উপায় করিতেছ? শুধু

কাঁদুনি গাহিয়া কি ফল ? যদি কেবলমাত্র যোগ সাধন করিয়া, বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া পারত্রিক ধ্যান ধারণায় জীবন কাটাইতে চাহ—তাই কর। কিন্তু তাহা হইলে আপনাদিগের ঐহিক অবস্থা লইয়া আক্ষেপ করিয়ো না কিম্বা বৈদেশিকদিগের পৌরুষে কটাক্ষপাত করিয়ো না। আজকাল যোগবলের কাল গিয়াছে, কর্ম্মবল অর্জ্জন করা এক্ষণে নিতান্তই আবশ্যক। ইংরাজের যদি সমকক্ষ হইতে চাও, দেশের দুঃখ দারিদ্র্য যদি মোচন করিতে চাও, তবে ভস্মাবশিষ্ট মৃত অতীতকে ভস্মের মধ্যে রাখিয়া, জীবন্ত বর্ত্তমানে জীবন্তভাবে কাজ করিতে থাক।

এ বিষয়ে বোম্বাইবাসীরা আমাদের অপেক্ষা দূরদর্শী ও কাজের লোক। তাঁহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা ও অভাব বুঝিতে পারিয়া আধুনিক পদ্ধতি-অনুসারে কতকগুলি তুলার কারখানা খুলিলেন ; পূর্ব্বে যে তুলা বিদেশে চলিয়া যাইত তাহা দেশেই রহিয়া গেল এবং তাহাতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এবং এই দৃষ্টান্তে অন্যান্য দ্রব্যের কারখানাও ক্রমশঃ ইতস্ততঃ দেখা দিতেছে। ইহা আমাদের সৌভাগ্যের প্রথম সূত্রপাত। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। শুধু গৃহ-বাণিজ্য হস্তগত করিলে চলিবে না, বহির্বাণিজ্যের দিকেও আমাদের হস্ত প্রসারণ করিতে হইবে।

এক্ষণে আমাদের দেশের বহির্বাণিজ্য সমস্তই প্রায় য়ুরোপীয়দিগের হস্তগত। আমাদের যাহা বেচিবার আছে তৎসমস্ত তাঁহারা এখানে ক্রয় করেন এবং আমাদের যাহা ক্রয় করা প্রয়োজন তৎসমস্ত তাঁহারা বিলাত হইতে এদেশে লইয়া আইসেন ; শুধু লইয়া আইসেন নহে, সেই সমস্ত দ্রব্যজাত ভারতবর্ষের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে বণ্টন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এরূপ দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় না ; একটি বৃহৎ দেশের কোটি কোটি অধিবাসী হাত গুটাইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান—আর কতিপয় বৈদেশিক আসিয়া তাহাদের সমস্ত

কাজ করিয়া দিতেছে। এই প্রকার হীন অধীনতা হইতে যদি মুক্ত হইতে চাও, তো অব্যবহিত বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ কর।

অব্যবহিত বাণিজ্যের মূল মন্ত্রটি এই :—যে বাজার সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা সেই বাজারে মাল খরিদ কর, এবং যে বাজার সর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ্য সেই বাজারে গিয়া ঐ মাল বিক্রয় কর। যেখানে কোন দ্রব্য গোড়ায় প্রস্তুত হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা বাজার, এবং যে ব্যক্তি নিজ হস্তে সেই দ্রব্য প্রস্তুত করে এবং যে ব্যক্তি উহা ব্যবহার করে, ইহাদের মধ্যে যদি সাক্ষাৎ ভাবে আদান প্রদান চলে, তাহা হইলে উভয়েরই অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ হয়। কিন্তু আজকালের দিনে, ইহা প্রায়ই কার্য্যত ঘটিয়া উঠে না। বড় একটা কোন কাজ করিতে গেলেই দশজনে মিলিয়া করিতে হয় এবং অধিক মূল্যের যন্ত্রাদি খরিদ না করিলে তাহা সহজে সম্পন্ন হয় না। অতএব এক্ষণে কারখানার অধ্যক্ষেরাই দ্রব্য প্রস্তুতকারীর স্থলাভিষিক্ত এবং সওদাগরেরাই ব্যবহারকারীর স্থলাভিষিক্ত। যাহাতে এই উভয় দলের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে কাজ চলিতে পারে তাহাই বিলাতের বণিকদের বিশেষ চেষ্টা।

কিন্তু আমাদের দেশে এই লভ্যজনক বাণিজ্যনিয়মটির মর্ম্ম কেহই বুঝে না। এ দেশের সহিত যে নিয়মে বাণিজ্যকার্য্য হইয়া থাকে তাহা এইরূপ :—বিলাতের কারখানা-ওয়ালা কোনও দ্রব্যবিশেষ প্রস্তুত করিয়া সেখানকার কোনও বড় সওদাগরকে প্রথম বিক্রয় করেন; তৎপরে ভারতবর্ষের কোনও য়ুরোপীয় বণিকের কোন য়ুরোপীয় প্রতিনিধি সেই দ্রব্য তাঁহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া ভারতে চালান করেন। সেই দ্রব্য ভারতে পৌঁছিলে, হাউসওয়ালা তাঁহার অধীনে যে সকল ছোট ছোট কার্য্যস্থান ও আড়ত আছে, সেই সকল স্থানে উহা চালান করিয়া দেন; এই প্রকারে ঐ দ্রব্য ভারতবর্ষে সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিভিন্ন খরিদ্দারের আয়ত্তের মধ্যে আইসে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে,

এই কারবারে যতগুলি মধ্যবর্ত্তী থাকেন সকলেরই কিছুনা কিছু লাভ হয় এবং ইহার আদানপ্রদানে যতই হাতফের হয় ততই দ্রব্যটির মূল্য মহার্ঘ্য হইয়া উঠে। ভারতবর্ষীয় পণ্যেরও এই নিয়মে মূল্য স্থির হয়। ভারত-বর্ষে কোন দ্রব্য খরিদ করিয়া বিলাতে চালান করিতে হইলে, এরূপ মূল্যে সেখানে বিক্রয় করিতে হয়, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার মধ্যবর্ত্তীদিগের লভ্য দিয়াও নিজের কিছু লভ্য অবশিষ্ট থাকে।

এইরূপ নিয়মে যখন বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, য়ুরোপীয় ব্যবসাদার য়ুরোপীয় দ্রব্যজাতের মূল্য যতদূর পারেন বাড়াইবার চেষ্টা করিবেন এবং ভারতবর্ষীয় দ্রব্যজাত যতদূর পারেন সুলভ মূল্যে খরিদ করিতে চেষ্টা করিবেন। এই উভয় স্থলেই ভারত-বর্ষের খরিদ্দার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে এবং এইরূপ কারবারে ভারতবর্ষ ধনী হওয়া দূরে থাক্, দরিদ্র হইয়া পড়ে। এস্থলে আর একটি কথা মনে করা আবশ্যক। য়ুরোপীয় বণিকের দেশে স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত, সুতরাং য়ুরোপীয় বণিক আমাদের টাকার বিনিময়-মূল্য অনুসারে তাঁহার লভ্যের হিসাব করিয়া থাকেন। বিলাতি জিনিস বিক্রয় করিয়া যে মূল্য প্রাপ্ত হন তাহা স্বর্ণমুদ্রায় পরিণত করিতে হয়—কেন না স্বর্ণমুদ্রাই তাঁহার দেশের প্রচলিত মুদ্রা।

কিন্তু তিনি যখন এ দেশের দ্রব্য খরিদ করেন তখন টাকার মূল্যে খরিদ করিয়া থাকেন। এই প্রকার মুদ্রা-বিনিময়ে ইংরাজ বণিকেরই লাভ। তবে যে টাকার ঘাটতি সম্বন্ধে এতাধিক চীৎকার শুনা যাইতেছে তাহার কারণ—যতদিন এই অব্যবহিত ঘাটতি অনতিরিক্ত পরিমাণে ছিল ততদিন ইংরাজ বণিকের ইহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু যখন টাকার মূল্য এতটা কমিয়া গেল, যে দ্রব্যের মূল্য বাড়াইয়াও সে ঘাটতি পূরণ করা অসাধ্য হইয়া উঠিল, তখনই এই চীৎকারধ্বনি সমু-খিত হইল। যে সকল য়ুরোপীয়েরা ভারতবর্ষে কোন নির্দ্দিষ্ট বেতন

ভোগ করে তাহারাও টাকার ঘাট্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টাকার ঘাট্তির দরুণ যা কিছু ক্ষতি সমস্তই বৈদেশিকদিগের। যদি বহির্বাণিজ্য আমাদের দেশীয় লোকদের হস্তে থাকিত, তাহা হইলে ভাবী মুদ্রাবিপ্লব সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা থাকিত না।

পণ্য দ্রব্যের উপর কোন বাটা নাই। ভারতবাসীরা এ গুরুতর কথাটা ভাল করিয়া তলাইয়া দেখেন না। যে ভারতবর্ষীয় সওদাগর সাক্ষাৎভাবে বিলাতের সহিত কারবার করেন তাঁহাকে বাটার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্:—মনে, কর, কোন ভারতবর্ষীয় বণিক ১০০০৲ টাকায় একজন ইংরাজ বণিককে শস্য বিক্রয় করিল। এবং সেই টাকায় একটা বিলাতি কল খরিদ করিল। এক্ষণে, প্রতি টাকায় যদি ১ শিলিং আড়াই পেন্স পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই বিলাতি কলের দাম হইল ৬০ পৌণ্ড ৮ শিলিং ৪ পেন্স মাত্র। যদি ঐ ভারতবর্ষীয় বণিক ঐ শস্য এখানে বিক্রয় না করিয়া একেবারে বিলাতে চালান করেন, তাহা হইলে এখানকার অপেক্ষা তিনি সেখানে অধিক মূল্য পাইবেন তাহার সন্দেহ নাই। এবং তিনি যদি ঐ শস্য বিক্রয় করিয়া ১০০০৲ টাকা কিম্বা ১০০০ ফ্লরিন মুদ্রা পান তাহা হইলে তিনি ঐ টাকায় ১০০ পৌণ্ড মূল্যের কল খরিদ করিতে পারিবেন এবং ঐ কল ভারতবর্ষে চালান করিয়া বিক্রয় করিলে তিনি ১,৬৫৫ টাকা ৷৹ আনা প্রাপ্ত হইবেন। কারণ প্রতি টাকার বিনিময় মূল্য ১ শিলিং আড়াই পেন্স হইলে ঐ ১০০ পৌণ্ডের বিনিময় মূল্য, ১,৬৫৫৷৹ টাকা হয়। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সাক্ষাৎভাবে বিলাতের সহিত কারবার না করিলে ভারতবর্ষীয় বণিকের কতটা ক্ষতি হয়। শুধু ঐখানে ক্ষতির শেষ হয় না। সেখানে কোন ইংরাজ আড়তদারের ওখানে ভারতবর্ষ হইতে মাল পাঠাইলে, বিলাতের আড়তদারি দিতে হয়—তা ছাড়া সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যত হাতফের হয়

সকলকেই কিছু না কিছু সেই পরিমাণে লভ্য দিতে হয়। কিন্তু খরিদ বিক্রয় যদি বিলাতেই হয় তাহা হইলে অত খরচ পড়ে না—যাহা কিছু দিতে হয় তাহা একজন ব্যবসাদারকেই দিতে হয়। জাহাজভাড়া প্রভৃতি খরচ এ স্থলে ধরা গেল না। কেন না, সাক্ষাৎভাবেই চালান কর বা কোন বিলাতের আড়তেই পাঠাও সে খরচ উভয়েতেই সমান। অতএব, এখন, যে প্রণালীতে বিলাতের সহিত কারবার চলে তাহাতে সমস্ত লভ্য বৈদেশিকদের হস্তে যায়, এবং সাক্ষাৎভাবে কারবার করিলে যাহা কিছু লাভ হয় সমস্ত দেশীয়দের হস্তে আইসে।

সাক্ষাৎ বাণিজ্যের নৈতিক ফলও বিলক্ষণ আছে। ভারতবর্ষীয়েরা বিলাতে বাণিজ্যার্থে কিছু দিন বাস করিলে জানিতে পারেন আমাদের কত প্রকার প্রাকৃতিক সম্বল—ধনাগমের কত অসংখ্য পথ। বিদেশীয় লোকদিগের কি কি দ্রব্য প্রয়োজন তাহা তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিতে পান এবং তাহাদের কিসে অভাব পূরণ করিয়া কিরূপে আমরা লাভবান হইতে পারি তাহারও নানা প্রকার সন্ধান জানিতে পারেন। তা ছাড়া, আমাদের এখন যে উদ্যম সাহসের অভাব, সাক্ষাৎ বাণিজ্যে সেই উদ্যম সাহস অর্জ্জন করিতে পারি। এবং এই প্রকার সাহসিক উদ্যমের অনুশীলনের দ্বারা আমাদের জাতীয় চরিত্র সবল ও স্বাধীন ভাবাপন্ন হইতে পারে।

প্রথম প্রথম বিলাতে বিলাতি-আড়তে মাল চালান করিয়া আড়ৎ স্থাপন করিয়া লাভ বিবেচনা করিলে, ভারতবর্ষীয় সওদাগরের নিজ হিসাবে কাজ চালাইবার জন্য সেখানে পণ্যালয় স্থাপন করিতে পারেন। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় যে, যে দ্রব্য বিলাতে বারমাস কাটতি সেই দ্রব্য লইয়াই প্রথম কাজ আরম্ভ করা হয়। যথা—বিবিধ শস্য-বীজ, চামড়া, তৈল প্রভৃতি। এবং এ সকল দ্রব্যের কারবার করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। বিলাতে কিছু দিন বাস করিলেই ভারতবর্ষীয়

সওদাগর জানিতে পারিবেন যে, সেখানে সমস্ত দ্রব্য একেবারে বিক্রয় হয়—খুচরা খুচরা বিক্রয় হয় না। এবং বিক্রয়েরও নানা প্রকার পদ্ধতি আছে। ইংলণ্ডে অধিকাংশ পণ্য দ্রব্যই সমগ্রভাবে নিলামে বিক্রয় হয়। যখন বাজার চড়া থাকে তখন শীঘ্র বেচিয়া ফেলিতে হয়, কিম্বা যদি মনে হয় আরও চড়িবার সম্ভাবনা আছে তাহা হইলে কিছু দিন ধরিয়া রাখিতে হয়। এই প্রকার বাজারের অনিশ্চিততায় ভয় পাইবার কারণ নাই, যে হেতু ভারতবর্ষে ঐ সব দ্রব্য যে মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে তাহা অপেক্ষা বিলাতের বাজার অনেক চড়া থাকে এবং খরিদ্দারদিগের সংখ্যাও অনেক।

শস্য প্রভৃতি কাঁচা মাল বিক্রয় করিতে কোন মুস্কিল নাই—বারমাসই উহা সেখানে বিক্রয় হয়। কিন্তু সেখানকার তৈয়ারী মাল কিরূপে খরিদ করিতে হয় সে বিষয়ে একটু ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। ইংলণ্ডে সওদাগরের প্রতিনিধি কর্ম্মাধ্যক্ষ যেই থাকুক, তিনি য়ুরোপীয়ই হউন বা ভারতবর্ষীয়ই হউন, সেখানকার কোন ব্যাঙ্কে তাঁহার নগদ টাকার খাতা থাকা চাই। কোন কারখানাওয়ালা ভারতবর্ষে চালানের জন্য কোন মাল ছাড়িয়া দিবেন না যদি কারখানাওয়ালার এই বিশ্বাস না থাকে যে, তাঁহার প্রাপ্য টাকা কোন মাতব্বর জমিদারের নিকট আদায় হইবে। এই সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যবহার এই, জাহাজে মাল উঠাইবার পূর্ব্বেই মালের দাম বুঝাইয়া দেওয়া হয়। যাহারা মাল বিক্রয় করে, তাহাদিগের দাম প্রভৃতি বুঝাইয়া দিবার কাজ সেখানে Messrs Hutchinson & Co. করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় সওদাগরের প্রতিনিধি কর্ম্মাধ্যক্ষ যিনি লণ্ডনে থাকেন তাঁহার নিকট মালের চালান প্রথম আইসে, তিনি তাহা বিক্রয় করিয়া যে টাকা পান তাহা কোন লণ্ডন-ব্যাঙ্কে জমা দিয়া থাকেন। সেই লণ্ডন ব্যাঙ্কের শাখা ভারতবর্ষেও আছে বুঝিতে হইবে। সেই জমা টাকার মাতব্বরিতে

ঐ প্রতিনিধি কর্ম্মাধ্যক্ষ আবশ্যকীয় মালের ফরমাইস করেন, কিন্তু তাঁহার ইহা বিশেষ করিয়া দেখিতে হয়, যাহাতে সকল সময়েই ব্যাঙ্কে কিছু অবশিষ্ট টাকা মজুদ থাকে। এবং কয়েকবার এইরূপ ক্রয়বিক্রয় হইবার পর ব্যাঙ্কের টাকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া একটা মূলধন জমিয়া যায়—তখন আর কোন ভয় থাকে না। তখন সকল সময়েই ইচ্ছামত খরিদাদি করা যাইতে পারে।

হচিনসন কোম্পানীর নিকট যদি কেহ মাল চালান করে, সেই মাল যতদিন না বিক্রয় হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মূল্যের জন্য চালানকারীকে অপেক্ষা করিতে হয় না। উক্ত কোম্পানীর ভারতবর্ষীয়-কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট চালানকারী বিলেডিং অর্পণ করিবামাত্র ঐ মালের মূল্যের শতকরা ৭৫ টাকা তখনই আদায় করিতে পারেন। ভারতবর্ষেও এই প্রণালীতে কাজ হইয়া থাকে; আড়ৎদারের মারফৎ বিলাত হইতে মাল না আনিয়া ভারতবর্ষীয় সওদাগর নিজ বন্দোবস্তে সেই মাল আনিতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহার আড়ৎদারি খরচাটা বাঁচিয়া যায়। এবং ইংলণ্ড হইতে সাক্ষাৎভাবে মাল খরিদপত্র করিলে সেই মাল কারখানা-মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে—তাহাতে অনেক সস্তা পড়ে। ভারতবর্ষের মাল ইংলণ্ডে চালান করিয়া সেখানে সাক্ষাৎভাবে বিক্রয় করিলে তাহাতেও সওদাগরের অনেক সুবিধা হয়। আর কিছু না হউক, আড়ৎদারির খরচাটা তো বাঁচিয়া যায়। আর এক কথা এই, দেশের সমস্ত বাণিজ্য বৈদেশিকদিগের হস্তে থাকিলে, দেশীয় অর্থাগমের পথসকল উদ্ভাবন ও তাহার উৎকর্ষ সাধন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। আমাদের অভাবের জন্য যদি বৈদেশিকদিগের উপর নির্ভর করা না হয় তবে আমাদের অভাব পূরণ করিয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের স্বার্থ যে, আমাদের অভাব আমাদের দেশ হইতে পূরণ না হয়।

ভারতের যেরূপ ভৌগোলিক সংস্থান তাহাতে এসিয়ার সকল দেশ অপেক্ষা বাণিজ্যবিষয়ে ভারতের যে বিশেষ সুবিধা তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। ইহার তিনদিকে সমুদ্র—এবং তাহার উপকূলে প্রায় ৩০০ বন্দর অবস্থিত। ভারতকে এসিয়ার বিপণি বলা যাইতে পারে। অবাধ বাণিজ্যের এই একটি মূলমন্ত্র,—যদি প্রত্যেক দেশ আপন আপন প্রাকৃতিক সুবিধা সম্বলকে যথোপযুক্তরূপে আপনার কাজে লাগায় তাহা হইলে তাহাতে সকল দেশেরই উপকার। ইংরাজেরা মুখে বলেন এবং আমরাও বিশ্বাস করিয়া থাকি যে, আমাদের দেশে অবাধ বাণিজ্য চলিতেছে, কিন্তু আসলে আমাদের দেশের বাণিজ্য সংরক্ষিত বাণিজ্যেরই একপ্রকার রূপান্তর মাত্র। কারণ, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্বলসমূহকে দমাইয়া রাখিয়াই এই বাণিজ্য মাথা তুলিতে পারিতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ ভারতবাসী বণিক্‌দিগের উন্নতিতে য়ুরোপীয় বণিকদিগেরও উন্নতি। ভারতের বাণিজ্য যতই পরিপুষ্ট হইবে, ততই ভারতে ইংরাজি কলের অধিক চাহিদা হইবে; এবং বাণিজ্যের দ্বারা ভারতবর্ষীয়েরা ধনবান হইলে—যে সকল উৎকৃষ্ট প্রকারের কল, ধনের অভাবে এক্ষণে তাহারা কিনিতে পারিতেছে না, তখন সেই সকল অধিক মূল্যের কল তাহারা কিনিতে পারিবে। গরিব জাতি কখনই ভাল খরিদ্দার হইতে পারে না। ধন বাড়িলেই আয়েসের বৃদ্ধি হয়। এবং ভারত ধনী হইলে, বিলাতের বিলাস-সামগ্রী তখন এখানে অধিকতর কাটতি হইবে। ইংরাজদিগের যদি দূরদৃষ্টি থাকে তবে আমাদিগের আর্থিক উন্নতিতে তাঁহারা যেন উপেক্ষা না করেন।

——o——

বৃত্তিনির্ব্বাচন

"যার কর্ম্ম তাকে সাজে, অন্যকে তা লাঠি বাজে" এই কথাটি খুব সত্য। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, যে কর্ম্ম যাকে সাজে সে-কর্ম্ম সে পায় না, বা করে না। যে ডাক্তার হইবার উপযুক্ত, সে হয় তো আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে—যে আইন-ব্যবসায়ীর উপযুক্ত সে হয় তো ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিতেছে। এইরূপ অনুপযোগী কাজে প্রবেশ করিয়া কেহই সফলতা লাভ করিতে পারে না—তাহার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। অনেক সময় ইহা অভিভাবকদিগের অবিবেচনার ফল। আমাদের দেশে কোন যুবক বি-এ পাশ করিয়াছে কি অমনি আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিবার জন্য তাহার অভিভাবক তাহাকে অনুরোধ করেন—সে তাহার উপযুক্ত কি না তাহা তিনি আদৌ বিবেচনা করেন না। অমুক লোক আইন-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ধনশালী হইয়াছে, তবে সেই বা কেন না হইবে—এই তাঁহার যুক্তি। তিনি এটা বুঝেন না—সকলেই সব কাজের উপযুক্ত নহে। ব্যক্তিবিশেষের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা-অনুসারে প্রত্যেকের বৃত্তি নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। কেহ বা দৈহিক বলসাপেক্ষ কাজের উপযুক্ত, কেহ বা সুকুমার সূক্ষ্ম কাজের উপযুক্ত, কেহ বা দৌড়ধাপের কাজ ভাল করিতে পারে। কেহ বা চুপ করিয়া একস্থানে বসিয়া লেখাপড়ার কাজ ভাল করিতে পারে। যে কামারের কাজের উপযুক্ত তাহাকে ঘড়ির সূক্ষ্ম কাজে নিযুক্ত করা যেমন বিড়ম্বনা—যে পুলিসের কাজের উপযুক্ত তাহাকে মুন্সেফি কাজে নিযুক্ত করা তেমনি বিড়ম্বনা। কিন্তু এ কথা স্বীকার করি, এই বৃত্তি-নির্ব্বাচন কাজটিও বড় সোজা নহে। তা-ছাড়া, আমাদের দেশে কাজ-কর্ম্মের নির্ব্বাচন-পরিসরও এত সংকীর্ণ যে, অনেককে দায়ে পড়িয়া অনুপযোগী ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়। আরও এক কথা, আমাদের

যেরূপ জাতীয় প্রকৃতি তাহাতে নূতন পথ উদ্ভাবন করিবার শক্তি অত্যন্ত কম। আমরা অনুকরণ করিতে খুব মজবুৎ। কোন নূতন ব্যবসায়ে যদি কাহাকে সফলতা লাভ করিতে দেখি, অমনি গড্ডালিকা-প্রবাহের ন্যায় আমরা সেইদিকে সবেগে অগ্রসর হই। উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত সে বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করি না। একজন যদি "বুক সপ্" খুলিয়া সফল হইয়া থাকে অমনি দেখিবে—রাস্তায় "বুক্ সপ্" খোলা হইয়াছে; একজন যদি ফুলের দোকান খুলিয়া ধনী হইয়া থাকে তবে দেখিবে রাস্তায় রাস্তায় ফুলের দোকান বসিয়াছে। কলিকাতায় এক সময়ে ময়দা ও তৈলের কলকারখানার ছড়াছড়ি হইয়াছিল, এক্ষণে আবার দর্জ্জির দোকানের বিস্তার দেখা যাইতেছে। ইহার ফল এই দাঁড়ায়, কখন কখন এক একটা ব্যবসায় একেবারে মাটি হইয়া যায়। অনর্থক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি হওয়ায়, অনেক সময়ে উপযুক্ত লোকেরাও স্বীয় যোগ্যতার অনুরূপ যথেষ্ট ফললাভ করিতে পারে না এবং যে ব্যবসায়ের যে অনুপযুক্ত সেই ব্যবসায়ে সে নিযুক্ত হইলে তাহার সমস্ত উদ্যম বৃথা নষ্ট হয় এবং যে কাজে সে হয়তো জনসমাজকে উপকৃত করিতে পারিত—সেই উপকার হইতে জনসমাজ বঞ্চিত হয়।

কে কোন্ কাজের উপযুক্ত এবং কি জন্য উপযুক্ত তাহার মোটামুটি কতকগুলি নিয়ম এই জন্য সকলেরই জানা উচিত। এ বিষয়ে ফ্রেনলজি কতকটা পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে। প্রচলিত প্রধান প্রধান বৃত্তি ব্যবসায়ের পক্ষে, কিরূপ দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ উপযোগী তাহা আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি।

চিকিৎসক। চিকিৎসকের দেহ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ এবং তাঁহার দেহে প্রকৃতি-সামঞ্জস্য রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ প্রাণ-প্রধান প্রকৃতি, বল-প্রধান প্রকৃতি ও মন-প্রধান প্রকৃতি তাঁহার দেহে সমান ভাবে সংমিশ্রিত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার প্রাণ-প্রকৃতি যথেষ্ট থাকা চাই, কেন

না, তাহা হইলে তাঁহার দৈহিক ক্ষয় দ্রুতভাবে ও অজস্রভাবে পূরণ করিতে তিনি সক্ষম হইবেন। তা ছাড়া, এই প্রকৃতি প্রবল থাকিলে, প্রফুল্লতা, উৎসাহ, হৃদ্যতা উৎপন্ন হয়; রোগীর ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে এই সকল গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। এই প্রকৃতিতে মানুষ একটু স্থূল—একটু মাংসল হয়। বক্ষদেশ গভীর হয় এবং শ্বাস গ্রহণ-শক্তি প্রচুররূপে থাকে। রক্ত-চলাচল দ্রুতভাবে ও প্রচুররূপে হয়, এবং তাহাতে উৎসাহ, আগ্রহ, হৃদ্যতা বর্দ্ধিত হয়। বল-প্রকৃতিও তাঁহার যথেষ্ট থাকা আবশ্যক। মজবুৎ দেহের কাঠাম—বড় বড় ও সমুন্নত মুখাবয়ব, শক্ত চুল—এই সমস্ত লক্ষণে বল-প্রকৃতি সূচিত হয়। তাঁহার মন-প্রকৃতিও বিলক্ষণ থাকা চাই। মন-প্রকৃতির প্রাবল্য থাকিলে মনের ক্রিয়া সচেষ্ট ও বেগবান হয়, শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্তি হয়, জ্ঞানের স্পৃহা হয়,—সর্ব্বপ্রকার তথ্য অনুসন্ধানে আগ্রহ হয়। পরিষ্কার তীক্ষ্ণ নেত্র, সুনির্দ্দিষ্ট সুকুমার মুখাবয়ব, সূক্ষ্ম কেশ ও ত্বক্, অপেক্ষাকৃত লঘু অস্থি ও মাংশপেশী, বৃহৎ মস্তিষ্ক, দেহের সচেষ্ট চট্‌পটে ভাব, সূক্ষ্মমর্ম্মিতা ও অনুভবের তীব্রতা ইত্যাদি লক্ষণে মন-প্রকৃতি সূচিত হয়। এই প্রকৃতি-ত্রয় সমানভাবে সংমিশ্রিত হইলে দেহ-পঞ্জর যথেষ্ট সবল হয়—অথচ এতটা বল থাকে না যাহাতে পাশবতা বা পরুষতা উৎপন্ন হইতে পারে। দেহ পুষ্ট থাকে কিন্তু স্থূল হয় না। সুমার্জ্জিত ভাব হয় কিন্তু অপৌরুষিকতা আইসে না। অর্থাৎ তাঁহার দেহ প্রকৃত সুরে বাঁধা সেতারের তিন সপ্তক পর্দ্দার তারের ন্যায় সমানভাবে সুরে বাজিতে থাকে। ডাক্তারের জীবন উদ্বেগ, চিন্তা, শ্রান্তি, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় এবং আত্ম-ত্যাগের সমষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই জন্য তাঁহার এই প্রকার দেহ-প্রকৃতি হওয়া উচিত যাহাতে এই সকল গুণ স্ফূর্ত্তি পাইয়াও তাঁহার দেহকে নষ্ট করিতে না পারে। যদি কাহারও মন-প্রকৃতির আতিশয্য থাকে, তাহা হইলে সে সহজে ক্ষয়গ্রস্ত এবং উদ্বিগ্ন, চটা-মেজাজ ও

অসুখী হয়। যদি বল-প্রকৃতি অতিমাত্রায় থাকে—তাহা হইলে মুখাবয়ব কর্কশ ও চুল শক্ত হয়—চরিত্রে ভদ্রতা, সুমার্জ্জিত-ভাব ও সুরুচির অভাব হয়। প্রাণ-প্রকৃতি অতিশয় প্রবল হইলে, শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্তি চলিয়া যায়—অতিরিক্ত পরিমাণে আহার পান করিয়া বুদ্ধি ঘোলাইয়া যায়, ব্যবহারেও অভদ্রতা বর্ব্বরতা ইতরামি আসিয়া পড়ে। চিকিৎসকের শারীরিক প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত উপরে বলা গেল—এক্ষণে কিরূপ মানসিক লক্ষণ তাহার কাজের পক্ষে উপযোগী তাহা বলা যাইতেছে।

প্রথমতঃ তিনি যে জ্ঞানরাশি অর্জ্জন করিবেন তাহা কেজো ধরণের হওয়া আবশ্যক। রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা শারীর বিজ্ঞান, রোগ বিজ্ঞান ইত্যাদি তাঁহার আলোচনীয় বিষয়। এই সকল বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য কপালের অধোভাগ বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হওয়া চাই—অর্থাৎ তাঁহার পর্য্যবেক্ষণী বৃত্তিসমূহ থাকা চাই। কপালের উপরের দিক পরিপুষ্ট হইলে, যে সকল কাজে মৎলব-আঁটা ও ফন্দি-খাটানো দরকার সেই সকল কাজ ভালরূপে করা যাইতে পারে; কিন্তু ডাক্তার হইতে গেলে, নীচের দিকের কপাল পরিপুষ্ট হওয়া চাই। ডাক্তারের মেধা ও স্মরণশক্তি প্রবল থাকা চাই। তাঁহার কপালের মধ্যদেশও বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হওয়া আবশ্যক। কেন না, তিনি কেতাবে যাহা কিছু পড়িয়াছেন, দেখিয়া শুনিয়া যাহা কিছু তাঁহার অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে প্রতিপদে কাজে খাটাইতে হইবে। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিও প্রবল থাকা চাই—বিশেষত তুলনা-শক্তি। কপালের ঊর্দ্ধভাগ বুদ্ধিবৃত্তির স্থান। তুলনাশক্তি প্রবল থাকিলে, তিনি বিচার করিয়া রোগের মূল নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। যাঁহার কেবল পর্য্যবেক্ষণী বৃত্তিগুলিই প্রবল তিনি রোগের ঠিক কারণ ধরিতে পারেন না;—যাহা একবার একস্থলে দেখিয়াছেন তাহাই হয়তো ভিন্ন অবস্থাতেও অন্য স্থলে প্রয়োগ করিবেন; অবস্থার পরিবর্ত্তনে ও প্রয়োগের পরিবর্ত্তন যে অনেক সময় আবশ্যক তিনি

তাহা বুঝিতে পারেন না। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার বাহিরে কিছুমাত্র বিচার করিতে সমর্থ হন না। যাঁদের আবার কেবল উপরের দিকের কপাল পরিপুষ্ট তাঁহারা থিয়োরি করিতে পারেন কিন্তু অনেক তথ্য ঠিক্ ধরিতে পারেন না। এমন অনেক সুযোগ্য চিকিৎসক আছেন যাঁদের কেবল পরামর্শের জন্যই ডাকা হয়;—সমস্ত ঘটনা ও লক্ষণ আনুপূর্ব্বিক তাঁহাদের বলিলে, তাঁহারা তবে বিচার করিয়া ঠিক্ কারণ নির্ণয় করিতে পারেন। তাঁহারা কালেজে বেশ লেক্‌চার দিতে পারিবেন কিন্তু ব্যবহারিক চিকিৎসায় হয়তো তাঁহারা কিছুমাত্র খ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন না।

চিকিৎসকের সামাজিক ভাবও বিলক্ষণ থাকা চাই। সেইজন্য মাথার পশ্চাদ্ভাগ যথেষ্ট পরিপুষ্ট হওয়া আবশ্যক। তিনি যে পরিবারে চিকিৎসা করিবেন সেই পরিবারের আবালবৃদ্ধ সকলেই তাহাকে ভালবাসিবে—তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে—তাঁহাকে দেখিয়া রোগী প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে।

চিকিৎসকের দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভর বিলক্ষণ থাকা চাই। এতটা আত্মাভিমান থাকা চাই যে নিজের স্কন্ধে স্থলবিশেষে সমস্ত ঝুঁকি লইতে পারেন এবং যাহা রোগীর জন্য ব্যবস্থা করিবেন তাহার উপাদেয়তা সম্বন্ধে নিজেরও দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই।

চিকিৎসকের সাহস ও জেদ্ থাকা আবশ্যক। প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা বৃত্তি পরিপুষ্ট হওয়া চাই। তাহা না হইলে তিনি কাটাকুটির কাজে সংকুচিত হইবেন। আসল কথা, তাঁহার হৃদয় সিংহের মত নির্ভীক ও তাঁহার হস্ত স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল হওয়া আবশ্যক।

তাঁহার সাবধানতা ও গোপন করিবার শক্তি থাকা চাই। অনেক সময়ে গোপন করিবার শক্তির অভাবে ডাক্তার রোগীর মুখের সামনেই হয় তো তাহাকে কোন অপ্রিয় কথা বলিয়া তাহাকে নৈরাশ্য-সাগরে মগ্ন করিতে পারেন। তাহাতে রোগের উপশম হওয়া দূরে থাকুক্ তাহাতে তাহার অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়ে।

ডাক্তারের আশা ও হাস্যপ্রিয়তা থাকাও আবশ্যক। যে সকল রোগী রোগের প্রভাবে বিমর্ষ ও অপ্রফুল্ল হইয়া পড়ে—ডাক্তার তাহাদিগকে আশার কথা বলিয়া, হাস্য পরিহাস করিয়া, তাহাদিগকে একটু প্রফুল্ল করিতে পারেন। রোগীর ঘরে গিয়া ডাক্তারও যদি বিষণ্ণভাব প্রদর্শন করেন তাহা হইলে রোগী আরও ভীত হইয়া পড়ে।

চিকিৎসকের হস্তপটুতাও বিলক্ষণ চাই—নহিলে কাটাকুটির কাজে কিম্বা পটিবাঁধার কাজে অদক্ষ হইবেন।

আইন ব্যবসায়ী। "আমি উকীল কিম্বা ব্যারিষ্টার হইব" একজন হয় তো মনে মনে স্থির করিলেন। কিন্তু উকীল কিম্বা ব্যারিষ্টার হইতে গেলে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক তাহা কি জানা আছে? আইন ব্যবসায়ে যে সকল জ্ঞান অর্জ্জন করা আবশ্যক তাহা কি আয়ত্ত করিতে তুমি সমর্থ হইবে? ঐ ব্যবসায়ে প্রতিপক্ষের নিকট হইতে যে বাধা পাওয়া যায় তাহার উপযুক্ত সাহস তো তোমার আছে?—তাহাদের বাক্যবাণের সমক্ষে তুমি তো অক্ষতভাবে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবে? তাহাদের সহিত তর্ক করিতে সমর্থ হইবে তো? আবশ্যকীয় কথা মনে রাখিবার জন্য যথেষ্ট স্মরণশক্তি আছে তো? উপস্থিতমত চট্ করিয়া কোন কথা ধরিয়া আপনার কাজে লাগাইবার ক্ষমতা তোমার আছে তো?

আইনের মূলতত্ত্ব বুঝিবার মত তোমার দার্শনিক বুদ্ধি আছে তো? যথাযথরূপে তোমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার বাক্পটুতা আছে তো? মানবচরিত্র-জ্ঞান তোমার আছে তো?—সাক্ষী, উকীল, ও জুরির মনোভাব চট্ করিয়া ধরিতে পারিবে তো? একটা কোন আইনের তর্ক মীমাংসা করিবার জন্য রাশি রাশি আইন গ্রন্থ ধৈর্য্য-সহকারে হাৎড়াইতে পারিবে তো? তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না;—কেন না তাহা হইলে তোমার মক্কেলের হানি হইতে পারে—তোমারও

অযশ হইতে পারে। তোমার সমস্ত মানসিক বৃত্তির সামঞ্জস্য আছে তো? তোমার কি সেরূপ বিদ্যার জোর আছে যে তুমি বিদ্বানদের মধ্যে সপ্রতিভ হইয়া থাকিতে পারিবে? তোমার কি এতটা স্বাস্থ্য-বল আছে যে তুমি ক্রমাগত সাতদিন ধরিয়া অশ্রান্তভাবে বিপক্ষ উকীলের সহিত তর্কবিতর্ক করিতে সমর্থ হইবে? যখন সকল চোখ, সকল কান তোমার উপর ন্যস্ত তখন তুমি প্রশান্তচিত্তে অটলভাবে সুস্পষ্টরূপে আপনার বক্তব্য কি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে? সকল প্রকার প্রলোভন অতিক্রম করিতে পার এরূপ প্রবল ধর্ম্মবুদ্ধি তোমার আছে কি? যদি এই সমস্ত গুণ থাকে তবে তুমি এই কাজে অগ্রসর হও। সর্ব্বত্রই দেখা যায় আইনব্যবসায়ী-শ্রেণী হইতেই উৎকৃষ্ট রাজনীতিকুশল পুরুষেরা সমুত্থিত হন। আমাদের সভাসমিতে, রাজদরবারে, আইন-ব্যবসায়ীরই প্রাধান্য দেখা যায়। চৌকোশ লোক না হইলে, আইন-ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিতে দেখা যায় না।—

আইন ব্যবসায়ীদিগের প্রবল স্মৃতিশক্তি থাকা চাই—কারণ, মোকদ্দমার সময় উপস্থিতমত তাহাদিগকে নজির দেখাইতে হয়। প্রবল তুলনা-শক্তি থাকা চাই,—যাহাতে করিয়া তাহারা আইনের বিভিন্ন অংশ ও প্রমাণ তুলনা করিয়া দেখিতে পারে, বিচার করিতে পারে, জেরা করিতে পারে, দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারে এবং সদৃশ মোকদ্দমার কথা উত্থাপন করিতে পারে; এবং বিপুল ভাষাশক্তি থাকা চাই, —যাহাতে করিয়া অনর্গল কথা যোগাইতে পারে।

৩। এঞ্জিনিয়ার। এঞ্জিনিয়ারের গণিত-বিদ্যায় স্বাভাবিক ক্ষমতা, নির্ম্মাণ-পটুতা, স্থাননির্ণয়শক্তি, বস্তুপার্থক্যবোধ, তুলনাশক্তি, অর্জ্জন-স্পৃহা, সাবধানতা, একাগ্রতা থাকা আবশ্যক এবং তাহার দৈহিক প্রকৃতি প্রাণ-প্রধান অপেক্ষা বল-প্রধান হইলে ভাল হয়। অর্থাৎ মেদ মাংস অপেক্ষা তাহার দেহে অস্থি ও পেশীর প্রাবল্য থাকা

আবশ্যক। কেন না, তাহার যে কাজ—তাহাতে শ্রমসহিষ্ণুতা নিতান্ত প্রয়োজন।

আমাদের দেশে সুশিক্ষিত যুবকেরা উপরিউক্ত তিন কাজের মধ্যে একটা না একটা সচরাচর অবলম্বন করিয়া থাকেন। যদিও অনেকগুলি মানসিকবৃত্তি এই তিন কাজেরই উপযোগী, তথাপি দুই একটি মানসিক বৃত্তি এই প্রত্যেক কাজে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয়;—এমন কি, না থাকিলে চলে না। তিনজন বালক যদি কর্ম্ম নির্ব্বাচনের পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য তোমার নিকট আইসে, আর যদি তাহাদের সকলেরই মানসিক বৃত্তি প্রায় সমান হয়—তাহা হইলে যাহার কপালের উপরের অংশ অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট তাহাকে আইনের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে, যাহার কপালের নিম্নস্থ দেশ অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট তাহাকে ডাক্তারি কাজ শিক্ষা করিতে পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে এবং যাহার পাশের কপাল প্রশস্ত তাহাকে ইঞ্জিনিয়ারের কাজে প্রবেশ করিতে পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের বিবিধ বিভাগ আছে—তন্মধ্যে সিভিল অর্থাৎ পূর্ত্তকার্য্যের ইঞ্জিনিয়ার ও যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ারের কাজই প্রধান। রেলওএ, খাল, বাঁধ, সুড়ঙ্গ, পয়ঃ-প্রণালী প্রভৃতি স্থায়ী ব্যাপার সকল সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিংএর অন্তর্ভূত এবং কলকারখানা ও জাহাজ প্রভৃতির কল-চালানো অথবা তাহার তত্ত্বাবধান করা যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য। এই বিশেষ বিশেষ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের বিশেষত্ব-অনুসারে ব্যক্তিবিশেষের যোগ্যতা পরীক্ষা করা আবশ্যক। তবে, সাধারণতঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের কেন্দ্রস্থল হ'চ্চে নির্ম্মাণ-কুশলতা বা হস্তপটুতা। এইটি না থাকিলেই নয়।

যাহার আকৃতিবোধ আছে সে ছবি আঁকিতে পারে, যাহার তুলনা ও কার্য্যকারণ-জ্ঞান আছে সে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি হইতে পারে—কিন্তু

তাই বলিয়া সে ইঞ্জিনিয়ার না হইতেও পারে। তবে, নির্ম্মাণ-কুশলতার সহিত অধিকন্তু যদি তাহার এই বৃত্তিগুলি থাকে, তাহা হইলে সে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ আরও ভাল করিয়া চালাইতে পারিবে সন্দেহ নাই। এঞ্জিনিয়ারের গণিত-বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। আকৃতিবোধ, বিস্তৃতিবোধ, ভারবোধ, কার্য্যকারণ ও তুলনাশক্তি প্রবল থাকিলে গণিত-বিদ্যায় সফলতা লাভ করা যায়। ইঞ্জিনিয়ারের ভূপরিমাপের কাজ অভ্যাস করা চাই, ইহাতে পর্য্যবেক্ষণী বৃত্তিসমূহ ও হস্তপটুতার আবশ্যক হয়। ইঞ্জিনিয়ারের ভাষাশক্তি না থাকিলেও কোন হানি নাই।

পত্রিকা-সম্পাদক। পত্রিকা-সম্পাদকদিগের প্রবল পর্য্যবেক্ষণী শক্তি ও স্মৃতিশক্তি থাকা চাই,—যাহাতে করিয়া ঘটনা, তথ্য, সংবাদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাহারা প্রচার করিতে পারে। সম্পাদকের কেজো-ভাব থাকা চাই। প্রবল তুলনা-শক্তি চাই,—যাহাতে-করিয়া সম্পাদক প্রসঙ্গ-সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারে, সকল বিষয়ের দোষগুণ সমালোচনা করিতে পারে, ভুল ধরিতে পারে ইত্যাদি। তেজস্বী হইবার জন্য প্রবল প্রতিবিধিৎসা-বৃত্তি থাকাও আবশ্যক। তাহাদের লেখায় যাহাতে কথার অভাব না হয়, তাহাদের ভাষা সহজ মস্‌লাদার ও সরস হয়—এই জন্য তাহাদের প্রবল ভাষাশক্তি থাকা চাই। এবং সুরুচি ও উন্নতভাবের জন্য ভাবুকতা থাকাও আবশ্যক।

ব্যবসাদার। কাজ করিতে প্রবৃত্তি দিবার জন্য ব্যবসাদারদিগের অর্জ্জনস্পৃহা থাকা চাই। সাহসের কাজে প্রবৃত্ত করিবার জন্য প্রচুর আশাবৃত্তি থাকা চাই; নিরাপদ হইবার জন্য সাবধানতা থাকা চাই। মাল সকল ঠিক্ করিয়া চিনিবার জন্য প্রবল পর্য্যবেক্ষণী বৃত্তি থাকা চাই। যথাযথরূপে ও তাড়াতাড়ি হিসাব করিবার জন্য গণনা-শক্তি প্রবল থাকা চাই। লোকের নিকট ভদ্র ও বিনয়ী হইবার জন্য লোকাদরপ্রিয়তা থাকা চাই এবং খরিদ্দারদিগের সহিত বন্ধুতা করিবার জন্য আসঙ্গলিপ্সা

থাকা চাই। একজন ভাল কেনাবেচা করিতে পারে, একজন পারে না কেন? ইহার উত্তর উভয়ের প্রকৃতির অন্তরেই পাওয়া যায়।

মিস্ত্রী। যন্ত্র ব্যবহার করা যাহাদিগের কাজ তাহাদিগের দৈহিক প্রকৃতি খুব মজ্‌বুৎ হওয়া চাই—যাহাতে-করিয়া তাহারা বল-সাপেক্ষ শ্রমসাধ্য কাজ অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে; হস্তপটুতা ও অনুকরণ-শক্তি বিলক্ষণ থাকা চাই,—যাহাতে-করিয়া দক্ষতার সহিত যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারে—নমুনা দেখিয়া জিনিস তৈয়ারি করিতে পারে; এবং প্রচুর পর্য্যবেক্ষণীশক্তি থাকা চাই—যাহাতে-করিয়া জিনিসের ভালমন্দ ও উপযোগিতা শীঘ্র বুঝিতে পারে।

চারুশিল্পী। কলাবিৎ চারুশিল্পীদিগের ভাবুকতা প্রবল থাকা চাই,—যাহাতে-করিয়া তাহারা সৌন্দর্য্যের নিয়ম ও সুরুচির নিয়ম সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারে এবং পরিমার্জিত সূক্ষ্মভাব ও কাল্পনিক বিষয়-সকল সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। হস্তপটুতা থাকা চাই—যাহাতে-করিয়া শিল্পবিশেষের উপযোগী যন্ত্র দক্ষতার সহিত ব্যবহার করিতে পারে। অনুকরণ-শক্তি থাকা চাই,—যাহাতে-করিয়া ভাল নকল তুলিতে পারে; এবং পর্য্যবেক্ষণী-শক্তি প্রচুর থাকা চাই—যাহাতে-করিয়া দ্রব্যের ভাল মন্দ ও আকার প্রকার ঠিক্ বুঝিতে পারে।

শিক্ষক। শিক্ষকের সচেষ্ট ও ক্রিয়াশীল মস্তিষ্ক হইবে, কপালের নিম্নভাগ পরিপুষ্ট হইবে, বড় বড় চোখ হইবে, স্মৃতি-শক্তি প্রবল থাকিবে, দয়া সাহস আত্মনির্ভর থাকিবে এবং শিশুদের প্রতি বাৎসল্য থাকিবে।

কোন্ কোন্ মানসিক বৃত্তি, কোন্ কোন কাজের উপযোগী উপরে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা গেল। এই সকল বৃত্তি মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিত এবং ইহাদের ফলাফল কি "লোকচেনা" প্রবন্ধে পাঠকেরা কিছু কিছু অবগত হইতে পারিবেন।

আপাততঃ, বল-প্রকৃতি, প্রাণ-প্রকৃতি ও মন-প্রকৃতি এই প্রকৃতি-

ত্রয়ের মধ্যে কোন্ প্রকৃতি কোন্ কোন্ কাজের উপযোগী তাহাই একটু বিস্তৃতভাবে বলা যাইতেছে।

প্রথমতঃ বল-প্রকৃতি—যাহাকে ইংরাজি ফ্রেনলজির ভাষায় মোটিভ টেম্প্যারেমেণ্ট বলে। এই প্রকার প্রকৃতি হইলে দেহের অস্থি মোটা ও লম্বা হয়, মাংসপেশী ঘন, শক্ত ও তারের ন্যায় পাকানো হয়। ইহাতে দেহের বল, সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতা উৎপন্ন হয়। যাহার বল-প্রকৃতি সে শ্রমসাধ্য কাজ করিতে ভালবাসে। কামার, ছুতার, কৃষক, খনক, সৈনিক্, নাবিক প্রভৃতি অধিকাংশ শ্রমজীবীরা এই প্রকৃতির লোক। এই প্রকৃতির লোকেরা নূতন দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিবার উপযুক্ত। যেখানে কঠিন পরিশ্রমের দরকার, বড় বড় বাধা যেখানে অতিক্রম করিতে হইবে, যেখানে বিপদের আশঙ্কা আছে, যেখানে সাহস উদ্যম অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, সেইখানেই এই প্রকৃতির লোককে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। অতএব, যাহাদের বল-প্রকৃতি,—তাহারা লৌহকার, প্রস্তরকার, কর্ম্মকার, ছুতার প্রভৃতির কাজে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা সফলতা লাভ করিতে পারে। আবার, এই প্রকৃতির লোকেরা যদি সুশিক্ষিত হয় তাহা হইলে শ্রমজীবী অপেক্ষা উচ্চতর কাজেও নিযুক্ত হইতে পারে। তাহারা শুধু যে দৈহিক শ্রম করিতে পারে, তাহা নহে, মানসিক শ্রমেও তাহারা কাতর হয় না। তাহারা প্রভু হইয়া শ্রমজীবী-দিগকে খাটাইতে পারে। তাহারা দেশ-আবিষ্কারক, নবদেশানুসন্ধায়ী, জাহাজ-পরিচালক নাবিক্, রেলপথের নির্ম্মাতা, রেলপথের তত্ত্বাবধায়ক হইতে পারে। রাজনৈতিক বিপ্লবের সময়, অরাজকতার সময়, ইহারাই অনেক সময়ে বিদ্রোহের প্রবর্ত্তক ও নেতা হইয়া উঠে।

আইন, ডাক্তারি পাদ্রিগিরি এই সকল বিদ্যা-ব্যবসায়েও কখন কখন এই প্রকৃতির লোকদিগকে সফল হইতে দেখা যায়; কিন্তু সাধা-রণতঃ, আফিস আদালৎ বিদ্যালয় অপেক্ষা মাঠ ময়দান রাস্তা ঘাটই

ইহাদের উপযোগী কর্ম্মক্ষেত্র। যে পাদ্রির বল-প্রকৃতি, তাহার দেশ বিদেশে প্রচারক হইয়া বেড়ান উচিত।

দ্বিতীয়তঃ প্রাণ-প্রকৃতি—ফ্রেণলজির ভাষায় ইংরাজিতে যাহাকে ভাইটাল টেমপারেমেণ্ট বলে। বল-প্রকৃতিতে যেমন অস্থি, পেশী প্রভৃতির প্রাধান্য, প্রাণ-প্রকৃতিতে সেইরূপ মেদমাংসের প্রাধান্য। এক্ষণে দেখা যাক্, হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল মোটা-সোটা প্রাণ প্রকৃতির লোকেরা কিরূপ কাজের উপযুক্ত। প্রাণ-প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোকের জীবন উৎসাহ আবেগ উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, তাহারা মুক্ত বায়ুতে বহির্দ্দেশে কাজ-কর্ম্ম করিতে ভালবাসে এবং কিসে আরামে থাকিতে পারে—সর্ব্বদাই তাহার চেষ্টা করে; তাহাদের কেজো সহজ বুদ্ধি। মানুষ দেখিলেই তাহারা চিনিতে পারে ও দ্রব্যের ভাল-মন্দ সহজে ধরিতে পারে। তাহারা খুব চতুর, দ্রুত-বুদ্ধি, উপায়জ্ঞ, প্রত্যুৎপন্নমতি ও চৌকোশ হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের চিন্তায় গভীরতা নাই—যথাযথরূপে, পুঙ্খানু-পুঙ্খ করিয়া তাহারা জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে না; তাহাদের স্থৈর্য্য ও অধ্যবসায়ও কম; তাহারা ঝোঁকের মাথায় কাজ করে, ও তাহাদের মনের আবেগ অত্যন্ত প্রবল; কর্ত্তব্য অপেক্ষা আমোদের দিকে তাহা-দের অধিক টান্ এবং শ্রমসাধ্য কাজ করিতে তাহাদের ভাল লাগে না।

এই প্রকৃতির লোক সেই সকল কাজ করিতে পারে যাহাতে বদ্ধভাব নাই, যাহাতে ক্রমাগত লাগিয়া থাকিতে হয় না, যাহাতে দৈহিক কিম্বা মানসিক শ্রমের আতিশয্য নাই। তাহাদের অর্জ্জনস্পৃহা ও বিষয়-বুদ্ধি প্রবল; সুতরাং তাহারা ব্যবসা-কাজের বেশ উপযুক্ত। তবে, এক জায়গায় বদ্ধ হইয়া নিছক্ খাটুনির কাজ তাহারা করিতে পারে না—কেরাণীর দ্বারা সে-সব কাজ তাহাদের করিয়া লইতে হয়। তাহারা বিবিধ ব্যবসায়ে ও কাজকর্ম্মে কন্‌ট্রাক্‌টর, এজেণ্ট ও তত্ত্বাবধায়ক হইতে পারে, রাজনৈতিক ব্যাপারে কিম্বা আফিসের কাজেও তাহারা

নারাজ নহে। এই সঙ্গে যদি তাহাদের বল-প্রকৃতিও কতকটা থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, কাজ করিবার শক্তি অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ স্থলে তাহাদের মানসিক ক্রিয়া কিঞ্চিৎ শ্লথগতি ও অনিশ্চিত হয়, চরিত্রে একটু কঠোরতা পরুষতা আসিয়া পড়ে ও মার্জ্জিতভাবের অভাব হয়।

এই প্রকৃতির লোক সকল-ব্যবসায়ের মধ্যেই দেখা যায়—তবে ডাক্তার ও পাদ্রির মধ্যে এই প্রকৃতির লোকই অধিক। প্রাণ-প্রকৃতির সহিত মন-প্রকৃতির কতকটা সম্মিলন হইলে, ভাল ডাক্তার ও ধর্ম্মপ্রচারক হওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ডাক্তারের প্রফুল্ল হাসি-মুখ রোগীর পক্ষে অত্যন্ত উপাদেয়;—তাই ডাক্তারের প্রাণ-প্রকৃতি থাকা নিতান্তই আবশ্যক। বরং একটু বিদ্যার অভাব হইলে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু গোম্‌সামুখো, খিট্‌খিটে অস্থিচর্ম্মসার ডাক্তার চিকিৎসা-কার্য্যের পক্ষে নিতান্তই অনুপযুক্ত।

প্রাণপ্রকৃতিসম্পন্ন ধর্ম্মপ্রচারকেরা অনর্গল-বক্তা, আন্তরিক আগ্রহসম্পন্ন, উৎসাহী ও আবেগবান হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের ততটা গভীরতা, পাণ্ডিত্য বা বিচারশক্তি থাকে না;—তাহারা যখন বক্তৃতা করে তখন তাহারা বুদ্ধির দিক দিয়া না গিয়া হৃদয়ের দিক দিয়াই লোকদিগকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে।

তৃতীয়তঃ মন-প্রকৃতি—যাহাকে ফ্রেনলজির ভাষায় ইংরাজিতে মেন্‌টাল টেম্‌পারেমেণ্ট বলে। প্রাণ-প্রকৃতিতে যেমন মেদ মাংসের প্রাধান্য, মন-প্রকৃতিতে তেমনি মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর প্রাধান্য। মন-প্রকৃতির লক্ষণ :— অপেক্ষাকৃত পাত্‌লা সুকুমার গঠনের দেহ—ছোট ছোট হাড়—পাতলা পাত্‌লা মাংসপেশী—পাত্‌লা পাত্‌লা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং মাথা অপেক্ষাকৃত বড় এবং মস্তিষ্ক সজাগ ও সচেষ্ট। যে সকল কাজে বাহুবল অপেক্ষা বুদ্ধিবল ও কৌশলের প্রয়োজন, সেই সকল কাজ মন-প্রকৃতির উপযোগী। ছোট ছোট হাত, সুকুমার স্পর্শ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি—মনপ্রকৃতির এই

সকল লক্ষণ যাহার আছে, সে হাল্‌কা ধরণের যন্ত্রশিল্পীর কাজ করিবার উপযুক্ত। যথা, স্বর্ণকার, জহুরীর কাজ, ঘড়ি তৈয়ারী বা মেরামতের কাজ, তন্তুবায়ের কাজ ইত্যাদি।

যাহাদের মন-প্রকৃতি, তাহাদের মনের স্বাভাবিক টান্ সেই সকল কাজের দিকে—যাহাতে বুদ্ধি খাটানো আবশ্যক হয় কিম্বা যাহাতে সৌন্দর্য্যবৃত্তি চরিতার্থ হয়; যেমন,—আইনের কাজ, চিকিৎসার কাজ, পত্রসম্পাদকের কাজ, পুস্তকপ্রণেতার কাজ, শিক্ষকের কাজ, চিত্রকরের কাজ, গায়কের কাজ ইত্যাদি। যাহাদের মন-প্রকৃতি প্রবল, তাহারা এই সকল কাজে সফলতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু ইহার সঙ্গে যথেষ্ট প্রাণ-প্রকৃতি না থাকিলে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে না। কেননা, ইহার দরুণ আবশ্যকীয় মানসিক পরিশ্রম করিতে হইলে, দেহের পুষ্টি যথেষ্ট থাকা আবশ্যক; নচেৎ, অতটা মানসিক শ্রম সহ্য হয় না। মানসিক প্রকৃতির দোষ এই, এই প্রকৃতির লোকেরা বুদ্ধি জ্ঞানের চর্চ্চাতেই অবিরত নিযুক্ত থাকে—ব্যায়াম কি বিরাম-বিনোদনের প্রতি তাহাদের বড় লক্ষ্য থাকে না। অনেক সময়ে তাহারা যে যথোচিত সফলতা লাভ করিতে পারে না, দৈহিক দুর্ব্বলতাই তাহার কারণ।

মন-প্রকৃতির সহিত যদি বল-প্রকৃতির সংযোগ হয়, তাহা হইলে, কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য, কি কলাবিদ্যা সকল বিষয়েই চরম উৎকর্ষ লাভ করা যায়। এই প্রকার প্রকৃতির লোকেরা যে-সকল রচনা প্রকাশ করে তাহা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী ধরণের হয়। মন-প্রকৃতির সহিত যাহাদের প্রাণ-প্রকৃতি সম্মিলিত হয় তাহারাও এই সকল বিষয়ে বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করে, কিন্তু তাহাদের কাজ বল-সংযুক্ত মনপ্রকৃতির ন্যায় ততটা উৎকৃষ্ট হয় না; তাহারা আপাততঃ খুব চটক্ লাগাইতে পারে, কিন্তু তাহাদের কাজ বহুকাল স্থায়ী হয় না। অনেক সদ্‌বক্তা, উৎকৃষ্ট লেখক, বিখ্যাত রাজমন্ত্রী, ধর্ম্মাচার্য্য, আইনব্যবসায়ী, চিকিৎসক এই প্রকৃতির লোক।

বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কোন্ প্রকৃতি প্রবল? প্রাণ-প্রকৃতি ও মন-প্রকৃতির লোকই অধিকাংশ আমাদের মধ্যে দেখা যায়। বল-প্রকৃতির লোক অতি বিরল। সেই জন্য স্থায়ী বৃহৎ কাজ আমাদের মধ্যে বড় দেখা যায় না। আমরা ভাল বক্তা হইতে পারি, ধর্ম্মপ্রচারক হইতে পারি, শিক্ষক হইতে পারি, বিচারক হইতে পারি, মন্ত্রী হইতে পারি, কিন্তু যাহাতে দৈহিক বল ও শ্রমসহিষ্ণুতার আবশ্যক সেই সকল কাজে উৎকর্ষ লাভ করা আমাদের পক্ষে আপাততঃ অসম্ভব। যথা, সৈনিকের কাজ—নাবিকের কাজ ইত্যাদি: যাহাতে বাঙ্গালীর বল-প্রকৃতি পরিপুষ্ট হয় তদ্বিষয়ে সকলের যত্ন করা উচিত। যে সকল কাজের জন্য আমরা এক্ষণে অনুপযুক্ত, বল-প্রকৃতির উন্নতি হইলে, সেই সকল কাজের জন্য আমরা উপযুক্ত হইতে পারি। অনেক কাজের দ্বার যাহা এক্ষণে আমাদের নিকট রুদ্ধ, তখন তাহা আপনা হইতেই উদ্‌ঘাটিত হইবে। কল-কারখানার কাজে আমরা যে প্রবেশ করিতে চাহি না তাহার অর্থ এই, আমাদের দৈহিক প্রকৃতি এখনও সেই সকল কাজের উপযুক্ত হয় নাই। ঘোড়সওয়ারের কাজ—জাহাজচালকের কাজ—রেলগাড়ি চালকের কাজ—অর্থাৎ যে সকল কাজে শ্রমসহিষ্ণুতা বল ও সাহসের আবশ্যক সেই সকল কাজে বাঙ্গালী হিন্দুরা প্রায়ই অগ্রসর হয় না। বল-প্রকৃতি পরিপুষ্ট হইলে এই সকল কাজের দ্বার আমাদের নিকট উন্মুক্ত হইবে। তখন আপনা হইতেই এই সকল কাজে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে—এই সকল কাজকে তখন আর অপমানের কাজ বলিয়া আমাদের মনে হইবে না। কেরাণী ও আইন-ব্যবসায়ীর সংখ্যায় দেশ ছাইয়া গেল। আর চলে না। এখন জীবিকার নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে।

——o——

লোক-চেনা।

ইতিপূর্ব্বে "বালক"-পত্রিকায় মুখ-চেনা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল। কিন্তু মুখ-চেনা অপেক্ষা লোক-চেনা আরও ব্যাপক; ইহার মধ্যে মুখ-চেনা, মাথা-চেনা, আকৃতি-চেনা, প্রকৃতি-চেনা সকলই আইসে। আমরা সকলেই একটু না একটু লোক চিনিবার চেষ্টা করিয়া থাকি—কখনও চিনিতে পারি; কখনও বা ভুল করি। অধিক স্থলেই আমরা মোটামুটি একরকম চিনিতে পারি। একজন লোককে প্রথম দেখিবামাত্রই তাহার সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা আমাদের মনোমধ্যে স্বতই উদয় হয়; এই ধারণা সকল সময়েই যে ঠিক্ হয় তাহা বলা যায় না। লোকের সহিত যাহার যত বেশি ব্যবহার, লোক-চরিত্র-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যার যত বেশি, তার সেই পরিমাণে লোক-চেনায় কম ভুল হয়। লোকের সহিত ব্যবহার থাকিলেই যে লোক চিনিবার শক্তি সকলের হয় তাহাও নহে। কেহ কেহ চিরজীবন লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিয়াও লোক চিনিতে পারে না, কেহবা স্বভাবতই লোক চিনিতে পটু। লোক-চরিত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা লোক-চেনা সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম বাহির করিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু একথাও বলিয়া রাখি, এখনও লোকচরিত্র-বিদ্যা অসম্পূর্ণ—এখনও উহা বিজ্ঞানের সামিলে আসে নাই। সেই জন্য তাহাদের সব কথাই যে বেদ-বাক্য-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে এরূপ নহে। নিয়মগুলি প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবন-ক্ষেত্রে মিলাইয়া দেখিবেন—ইহাতে আর কিছু উপকার না হউক্ অন্তত সব জিনিস খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার একটা অভ্যাস জন্মিবে—পর্য্যবেক্ষণ শক্তির বৃদ্ধি হইবে। য়ুরোপীয়দিগের তুলনায় আমাদের এই পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি অতি কম। আমরা বাহিরের সকল জিনিসই যেন চোখ বুজিয়া দেখি,—বহির্দৃষ্টি আমাদের নাই বলিলেই হয়, আমাদের

অন্তর্দৃষ্টিই প্রবল। লোকচরিত্রাভিজ্ঞ আচার্য্যেরা লোক-চেনা সম্বন্ধে যে সকল সূক্ষ্ম নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সমস্ত ঠিক না হইলেও তাঁহাদের বিবৃত মূলতত্ত্বগুলি যে সত্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহাদের একটি মূল কথা এই—"যেমন আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি; যেমন প্রকৃতি তেমনি আকৃতি।" একজন কুস্তিগির পালোয়ানকে দেখ—আর একজন টুলো ভট্টাচার্য্যকে দেখ—উহাদের আকৃতি দেখিবামাত্র উহাদের প্রকৃতি একেবারেই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। আর একটি মূল কথা এই ব্যক্তিবিশেষ বা জীববিশেষের যেরূপ দেহের আকার তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রত্যেক অংশও সেই দেহের অনুযায়ী—সমস্তের সহিত প্রত্যেক অংশের একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। একজনের কেবল হাতের তেলো দেখিয়া বলা যাইতে পারে তাহার সমস্ত দেহের প্রকৃতি কিরূপ। Agassiez প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভূস্তর-নিহিত একটি অস্থি খণ্ড দেখিয়াই বলিতে পারেন, সে অস্থিটি কোন্ শ্রেণীয় জীবের। লোক-চেনার উপকারিতা সম্বন্ধে বোধ হয় বেশি কথা বলা অনাবশ্যক। ব্যবসায়-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে, আদালতে, বর-কন্যা-নির্ব্বাচনে, কর্ম্মচারী-নিয়োগে লোক-চেনা যে বিশেষ কাজে আইসে তাহা কে অস্বীকার করিবে? অতএব আর বেশি বাক্যব্যয় না করিয়া আসল কথায় আসা যাক্।

একজন লোককে দেখিবামাত্র প্রথমে দেখিতে হইবে তাহার দৈহিক প্রকৃতি কিরূপ, দৈহিক প্রকৃতির অবস্থা জানিতে পারিলে তাহার সম্বন্ধে কতকটা মোটামুটি জ্ঞান জন্মে। আমাদের আয়ুর্ব্বেদে তিন প্রকার দৈহিক ধাতুর উল্লেখ আছে—বাত, পিত্ত ও কফ। যাহার শরীরে বায়ুর প্রাধান্য তাহার বায়ু-প্রকৃতি, যাহার শ্লেষ্মা বা কফের প্রাধান্য তাহার কফ-প্রকৃতি, যাহার পিত্তের প্রাধান্য তাহার পিত্ত-প্রকৃতি। পুরাতন য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যেও কতকটা এইরূপ শ্রেণীবিভাগ

প্রচলিত ছিল : আমরা যাহাকে বায়ু-প্রকৃতি বলি, তাঁহারা তাঁহাকে নর্ভাস্ অর্থাৎ স্নায়ু-প্রকৃতি বলিতেন, আমরা যাহাকে কফ-প্রকৃতি বলি তাঁহারা তাহাকে লিম্ফ্যাটিক অর্থাৎ রস-প্রকৃতি বলিতেন—কিন্তু পৈত্তিক প্রকৃতির নামকরণে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। আমাদের যা তাঁহাদেরও তাই। তবে, তাঁহাদের আর একটি শ্রেণী বেশি ছিল—তাহা রক্ত-প্রকৃতি। আধুনিক শিরোতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আবার ইহাই ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া আর এক প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। তাহা এই :—(১) মনোময়ী প্রকৃতি; (২) প্রাণময়ী প্রকৃতি (৩) বলময়ী প্রকৃতি। প্রাণময়ী প্রকৃতির অন্তর্গত রক্তময়ী ও রসময়ী প্রকৃতি। যাহাদিগের দেহে অস্থি ও পেশীতন্ত্রের প্রাবল্য তাহাদিগেরই বলময়ী প্রকৃতি। পর্ব্বতবাসীদিগের মধ্যে এই প্রকৃতির লোক অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপে হাইলণ্ডীয় স্কট ও সুইস্‌জাতি এই লক্ষণাক্রান্ত। আমাদের পাঠান আফ্‌গান ও শিখ্‌দিগেরও বলময়ী প্রকৃতির প্রাধান্য। এই প্রকৃতির লোকদিগের মোটা মোটা হাড়, পাকানো পাকানো দৃঢ় পেশী—ইহাতে করিয়া শরীর বলবান ও কষ্টসহ হয়। যাহাদিগের বলময়ী প্রকৃতি প্রবলা তাহাদিগের স্বভাবও প্রবল; তাহারা সাহসী, পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ; কার্য্যক্ষেত্রে তাহারাই নেতা। চিন্তাশীলতা অপেক্ষা তাহাদিগের দর্শন-পরতা অধিক। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে কার্য্যোপায়-প্রণালী স্থির করেন, এই প্রকৃতির লোকেরা তাহাই কার্য্যে পরিণত করে। তাহারা উদ্ধত ও প্রভুত্বাকাঙ্খী; যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যে সকল জাতি খ্যাতিলাভ করিয়াছে তাহারা অধিকাংশ এই প্রকৃতির লোক। বলময়ী প্রকৃতির আবার দুই প্রকার ভেদ আছে—এক পেশীময়ী, আর এক অস্থিময়ী। যে শরীরে অস্থির প্রাবল্য অথচ পেশী কম, তাহাদিগের গঠন-রেখা কোণ-বিশিষ্ট ও খোঁচাল—তাহারা বড়ই অলস; তাহাদিগকে কোন কাজে শীঘ্র চাগান যায় না, কিন্তু একবার চাগাইয়া তুলিতে পারিলে, তাহাদের আবার

থামানো যায় না। এই ধাঁচার লোকদিগের কাজ-কর্ম্ম, চলা-ফেরা বড়ই অশোভন ও অপটু, ইহাদের রকম-সকমও বর্ব্বরের ন্যায়। অস্থি ও পেশীর যখন সামঞ্জস্য হয় তখনই বলের সহিত শোভনতা ও পটুতা মিলিত হয়, তখনই বলময়ী প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ হয়।

যাহাদিগের দেহে পুষ্টি-তন্ত্রের প্রাধান্য—অর্থাৎ পরিপাক-যন্ত্র, শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্র ও রক্ত-পরিচালন-যন্ত্রসকল অধিক কার্য্যকরী তাহাদিগেরই প্রাণময়ী প্রকৃতি। যাহাদের বক্ষদেশ প্রশস্ত, যাহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র ও রক্ত-চালন-যন্ত্র অপেক্ষাকৃত অধিক কার্যকরী তাহাদিগকে রক্ত-প্রকৃতি বলা যায়। তাহারা একটুতেই উত্তেজিত হইয়া উঠে ও সর্ব্বদাই ঝোঁকের মাথায় কাজ করে। তাহারা যেরূপ চিরোৎফুল্ল ও দৈহিক স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট তাহাতে অতিরিক্তমাত্রায় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার দিকে তাহা-দিগের ঝোঁক থাকা অসম্ভব নহে।

যাহাদের ঔদরিক যন্ত্র সকল বেশি কার্য্যকরী, তাহারা রসময়ী প্রকৃ-তির লোক—তাহারা লম্বোদর, নাদুস্-নুদুস্ ও গোল-গাল; তাহাদিগের রক্ত-চালনা ঢিমা-চালে সম্পন্ন হয়—তাহাদের মস্তিষ্ক-ক্রিয়াও মন্দীভূত, ক্ষীণ ও আলস্য-জড়িত। এই প্রকৃতির লোকদের না আছে মনের বল, না আছে শরীরের বল। ইহারা নিদ্রালু, অলস, ও উদর-পরায়ণ—রোগ দ্বারা ইহারা শীঘ্র আক্রান্ত হয়। কিন্তু রক্তময়ী ও রসময়ী প্রকৃতির যদি সামঞ্জস্য হয়—অর্থাৎ বক্ষ ও উদর এই উভয় প্রদেশেরই যন্ত্রগুলি যদি যথানিয়মে কার্য করে, তাহা হইলে প্রাণময়ী প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ হয়—শরীরের স্বাস্থ্য ও বলের বৃদ্ধি হয়। এইরূপ প্রকৃতিতে, পার্থিব বিষয়ের দিকে একটু বেশি টান হয়—নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলও একটু বেশি সক্রিয় হইয়া উঠে; কিন্তু ইহার সহিত কিয়ৎপরিমাণে উন্নত বৃত্তির সংযোগ ঘটিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বড় একটা মাথা তুলিতে পারে না। যাহাদের প্রাণময়ী প্রকৃতি প্রবলা তাহাদের শারীরিক উদ্যমের কাজ ভাল লাগে ও

তাহাদের মানসিক-ক্রিয়া-সকলও সহজ ও বহুপথগামিনী; দৃঢ়তা অপেক্ষা তাহাদিগের মনের স্থিতিস্থাপকতা সমধিক। ইহারা যতটা পরিশ্রমী ততটা অবিরত-চেষ্ট নহে অর্থাৎ কোন বিষয় সংসাধনের জন্য ইহারা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে পারে না। ইহারা চট্ করিয়া কোন একটা বিষয় বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে; ইহাদের কল্পনা তেজস্বিনী, নিজ মনের ভাবও ইহারা শীঘ্র ও সহজে প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু ইহাদের গভীরতা অপেক্ষা চটকই বেশি। এক বিষয়ে ইহারা অধিকক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না—কারণ, ইহারা বৈচিত্র্য ভালবাসে। ইহাদের রিপুবেগ প্রবল, কিন্তু কোনও ভাবই অধিক্ষণ স্থায়ী হয় না—সর্ব্বদাই মেজাজের পরিবর্ত্তন হয়। ইহারা প্রফুল্ল, উচ্ছ্বাসময়, খোলা-প্রাণ, প্রিয়দর্শন; ইহারা উপাদেয় আহারাভিলাষী, আরাম ও আয়েসের অনুরাগী। বল-প্রকৃতি লোক অপেক্ষা ইহারা সহজে কুপথগামী হইতে পারে, কিন্তু উৎকৃষ্ট বৃত্তির শাসনাধীনে থাকিতে পারিলে এই প্রকৃতির লোকেরা বড়ই সুখী হয়। তাহারা যেমন নিজে সুখী হয়—অন্যকেও তেমনি সুখী করিয়া থাকে। যাঁহারা মনোময়ী প্রকৃতির লোক তাঁহাদের বড় মাথা, কপাল প্রশস্ত ও উন্নত—কিন্তু শরীর অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ও সুকুমার। তাঁহাদের মুখ আম্র-দীর্ঘ। কপালের দিক চওড়া হইয়া মুখ ক্রমশঃ সরু হইয়া আইসে। তাঁহাদের হৃদয়ভাব ও ভাষা সমুন্নত ও সুরুচি-সম্পন্ন;—যাহা কিছু স্থূল, কদর্য্য, মলিন ও ইতর তৎপ্রতি তাঁহারা সহজেই বীতরাগ। তাঁহারা হৃদয়ে যে ভাব অনুভব করেন তাহা অতি জ্বলন্ত, সুস্পষ্ট ও সুতীব্র এবং তাঁহাদের ধারণা ও কল্পনা অতিশয় দ্রুতগতি; তাঁহারা মানসিক বৃত্তির পরিচালনায় যতটা সুখানুভব করেন—অন্য প্রকৃতির লোক ততটা করে না। শারীরিক অপেক্ষা মানসিক ব্যাপারের অনুশীলনে তাঁহারা অধিক রত। সাহিত্য, কবিতা, চারুশিল্প তাঁহাদিগের সাধের জিনিস।

মন প্রাণ বল এই ধাতুত্রয়ের এক একটি কাহারও প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র-

ভাবে ও পূর্ণ মাত্রায় থাকিলে যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে তাহাই এতক্ষণ বর্ণনা করা হইল; কিন্তু আসলে এরূপ স্বতন্ত্রভাবে উহাদিগকে দেখা যায় না; প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রকৃতিতে এই তিন ধাতু বিমিশ্র ভাবে থাকে—কাহারও কোনটা কম, কাহারও কোনটা বেশি। এই ধাতুত্রয়ের পূর্ণ সামঞ্জস্য অতি বিরল; তবে কাহারও কাহারও প্রকৃতি, সামঞ্জস্যের দিকে অপেক্ষাকৃত অধিক অগ্রসর। এই ধাতুত্রয় তাহাদের প্রকৃতিতে এরূপভাবে মিশ্রিত থাকে যে উহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রবল তাহা সহজে বুঝা যায় না। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় তিনটির মধ্যে দুইটি প্রবল ও একটি ক্ষীণতর; এই ধাতুত্রয়ের বিভিন্ন সমাবেশ-অনুসারে কাহারও বা মনোপ্রাণময় প্রকৃতি কাহারও বা বলপ্রাণময় প্রকৃতি—কাহারও বা মনো-বলময় প্রকৃতি—এরূপ নানাপ্রকার মিশ্র প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক মিশ্র প্রকৃতির আবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লক্ষণ আছে—তাহা এই প্রবন্ধে বর্ণনা করিলে বাহুল্য হইয়া পড়ে। মোট কথা, লোক চিনিতে গেলে প্রথমত দেখা আবশ্যক—যাহাকে চিনিতে চেষ্টা করিতেছি সে কিরূপ ধাতের লোক। মোটামুটি তাহার প্রকৃতি জানা হইলে আরও সূক্ষ্মরূপে তাহার অবয়বাদি পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

অবিমিশ্র প্রকৃতি-ত্রয়ের আর একবার সংক্ষেপে আবৃত্তি করা যাক। বলময়ী অর্থাৎ অস্থি-পেশীময়ী প্রকৃতির লক্ষণ—বলবতী ইচ্ছাশক্তি; স্থির বিবেচনাশক্তি; অক্লান্ত উদ্যম; অসীম সাহস; অবিরত-চেষ্ট সঙ্কল্প; দুর্দ্দমনীয় প্রভুত্ব-লালসা; অবিচলিত আত্মনির্ভর। প্রাণময়ী অর্থাৎ দৈহিক পুষ্টি-সাধনোপযোগিনী প্রকৃতির লক্ষণ—দৈহিক স্ফূর্ত্তি, সর্ব্বতো-মুখী বুদ্ধি, আবেগ-বশবর্ত্তিতা, উৎসাহ, আগ্রহ, সুখ-লালসা, বৈচিত্র্যা-নুরাগ, আরাম-বাসনা, ভোগলালসা, দ্রুত ও চটকদার বুদ্ধি, উদ্দেশ্যের অস্থিরতা, সৌম্যতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য। মনোময়ী প্রকৃতির লক্ষণ—জ্ঞান-স্পৃহা, মনস্বিতা, সুরুচি, ভব্যতা, উচ্চস্পৃহা, উন্নত কল্পনা, তীব্র অনুভূতি,

সাহিত্য শিল্পানুরাগ ইত্যাদি। এই তিন প্রকৃতির পূর্ণ সামঞ্জস্যই পূর্ণাবয়ব চরিত্রের লক্ষণ; কিন্তু ইহার দৃষ্টান্ত লোকসমাজে অতি বিরল। প্রায়ই দেখা যায় প্রত্যেক লোকের চরিত্রে দুইটি প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত প্রবল, অপরটি ক্ষীণতর। আপেক্ষিক প্রাবল্য অনুসারে এই মিশ্র প্রকৃতিকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

১। বল-প্রাণময়ী প্রকৃতি।
২। বল-মনোময়ী প্রকৃতি।
৩। প্রাণ-বলময়ী প্রকৃতি।
৪। প্রাণ-মনোময়ী প্রকৃতি।
৫। মন-বলময়ী প্রকৃতি।
৬। মন-প্রাণময়ী প্রকৃতি।

এই মিশ্র প্রকৃতির নামকরণ দেখিলেই বুঝা যায় উহার প্রত্যেকটিতে কোন্ ধাতুর বিশেষ প্রভাব। অপেক্ষাকৃত যাহার অধিক প্রভাব তাহাকেই প্রথম আসন দেওয়া হয়। যথা, যে স্থলে প্রাণ অপেক্ষা বলের কিঞ্চিৎ প্রাধান্য, সে স্থলে বল প্রাণময়ী প্রকৃতি বলা যায় এবং যে স্থলে বল অপেক্ষা প্রাণের প্রাধান্য সে স্থলে প্রাণ-বলময়ী প্রকৃতি বলা যায়।

১। বল-প্রাণময়ী প্রকৃতি। পাশব বলের পক্ষে এই প্রকৃতি অতীব উপযোগী। অস্থি-পেশী বেশ পরিপুষ্ট; স্কন্ধদেশ চওড়া; বক্ষদেশ প্রশস্ত; জীবনীশক্তি যথেষ্ট; দৃঢ়তা, স্থিরতা ও অবিচলিততার সহিত কর্ম্মশীলতা জড়িত। এই প্রকৃতিতে একটু আনাড়িপনা থাকিতে পারে, কিন্তু সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, কঠোর শ্রমশীলতা এই প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ। ইহা বুদ্ধি বিদ্যার পক্ষে তেমন উপযোগী নহে—শিল্প সাহিত্য আলোচনার পক্ষে অনুকূল নহে। কিন্তু এই প্রকৃতির লোকদিগের সহজ বিষয়বুদ্ধি সতেজ—বিষয়কর্ম্মে তাহারা বেশ স্থিরবুদ্ধি। অনেক সচ্চরিত্র লোকের এইরূপ প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়—আবার অনেক বদ্‌মাইশ অপরাধীও

এই প্রকৃতি-বিশিষ্ট। উচ্চ ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অধীনে না রাখিতে পারিলে, এই প্রকৃতি অত্যন্ত জঘন্য আকার ধারণ করে। রাগ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি রিপুসকল প্রবল হইয়া এই প্রকৃতিকে কুৎসিৎ করিয়া তোলে। লড়াকা পালোয়ান, খালাসী, সেপাহি, কৃষক প্রভৃতি—মুক্তবায়ুতে যাহাদিগের দৈহিক শ্রম করিতে হয়—প্রায় তাহাদিগেরই মধ্যে এইরূপ প্রকৃতির লোক পাওয়া যায়।

২। বল-মনোময়ী প্রকৃতি।—যে প্রকৃতিতে বলের ভাগ বেশি, মনের ভাগ তার নীচে এবং প্রাণের ভাগ সকলের নীচে। এই মিশ্রণ-ফলে বুদ্ধিশক্তি এবং তাহার সহিত দৈহিক বল, কঠোরতা ও সহিষ্ণুতা উৎপন্ন হয়। বল-প্রাণময়ী প্রকৃতি অপেক্ষা দেহ যদিও কিছু সরু—কিন্তু পেশী অপেক্ষাকৃত অধিক দৃঢ় এবং এই প্রকৃতির লোক অপেক্ষাকৃত অধিক উদ্যমশীল হইয়া থাকে। উহারা দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হয়, দ্রুত-ভাবে ও উদ্যমসহকারে পদচারণ করে এবং উহাদের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, সুস্পষ্ট ও সবল। এই প্রকার মিশ্র প্রকৃতির লোকেরা তীক্ষ্ণবুদ্ধি, গভীর চিন্তাশীল, কার্য্যে সাহসী, উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়ী। ইহাদের দুর্দ্দান্ত রিপুসকলও কতকটা উচ্চ ধর্ম্মবৃত্তি ও সৌন্দর্য্য-বৃত্তির অধীনে থাকে। গভীর বিদ্যা, অকপট কার্য্যোৎসাহ, ব্যবহারিক বিষয়-বুদ্ধি, উচ্চাভিলাষ, কর্ম্মক্ষেত্রে নেতৃত্ব লাভের বাসনা, এই সকল লক্ষণ এই প্রকৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যোদ্ধা, নবদেশানুসন্ধায়ী, যন্ত্রশিল্পী—জাহাজ-নেতা নাবিক প্রভৃতি অধিকাংশ এই প্রকৃতির লোক। ইহারা চিন্তাশীল ও কাজের লোক উভয়ই।

৩। প্রাণ-বলময়ী প্রকৃতি।—বৃহৎ চওড়া শরীর, স্কন্ধ প্রশস্ত, ঘাড় মোটা, পেশী-বহুল দেহ, সবল অস্থি-সন্ধি—কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুষ্ট ও সুগোল—এবং মুখাবয়বসকল বহির্ম্মুখ ও দৃষ্টি-আকর্ষক; মুখের ভাব একটু কর্কশ; পদচারণ সজোর ও দ্রুত— কিন্তু সে চলা-ফেরায় শ্রীর

অভাব।—এই সমস্ত প্রাণ-বলময়ী প্রকৃতির লক্ষণ। যাহাদিগের এইরূপ প্রকৃতি তাহারা কঠিন শ্রমে কাতর নহে, মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম ও অঙ্গচালনা করিতে ভালবাসে এবং তাহারা কোনপ্রকার আটক বা বন্ধন সহ্য করিতে পারে না। প্রাণ-ধাতুর প্রাধান্যবশতঃ তাহারা বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট ও আবেগ-বশবর্ত্তী; কিন্তু অস্থিপেশীতন্ত্রেরও কতকটা প্রভাব থাকায়, তাহারা মনের উচ্ছ্বাসকে একটু সংযত করিয়া রাখিতে পারে। এই প্রকৃতির লোকেরা চটুল কিম্বা চটক্‌দার হয় না; ইহারা কাজের লোক; সাহিত্যের সঙ্গে ইহাদের বড় সম্পর্ক নাই। ইহাদের বেশ সহজ বুদ্ধি; কাজকর্ম্ম বেশ চালাইতে পারে; ইহারা সফরী-ফর্ফরবৎ ভাসা-ভাসা নানা বিদ্যার অধিকারী হয় না। উচ্চ ধর্ম্মবৃত্তির বল না থাকিলে, ইহাদের প্রচণ্ড রিপুবেগ ইহাদিগকে সহজেই বিপথে লইয়া যাইতে পারে।

৪। প্রাণ-মনোময়ী প্রকৃতি। এই মিশ্রণের ফল;—মোটা-সোটা সুগোল গঠন; মুখ বড় ও পরিপুষ্ট; মুখাবয়ব সুশ্রী, বেশি বহিরুন্মুখ নহে, কিন্তু বেশ স্পষ্টরেখাঙ্কিত ও সমবিন্যস্ত। অনেক স্ত্রীলোকের এইরূপ প্রকৃতি দেখা যায়। স্ত্রী-উপযোগী অনেক বাঞ্ছনীয় মনোরঞ্জন গুণ এই প্রকৃতিতে বর্ত্তে। যথা, স্নেহ মমতা, দয়া, ভালবাসা, সৌম্যতা, প্রফুল্লতা এবং তাহার সঙ্গে দৈহিক শ্রীসৌন্দর্য্য। এই প্রকৃতি কতকটা আমোদ-প্রিয় প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে কতকটা ধর্ম্মবৃত্তির অধীনে না রাখিতে পারিলে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। এই প্রকৃতির পুরুষেরা বাহিরের কাজের উপযোগী। ভাল শিক্ষা পাইলে, ইহারা উৎকৃষ্ট বক্তা হইতে পারে; ইহারা কোন সার-গর্ভ বিষয়ে পারদর্শী হইতে পারে না; গভীর চিন্তা কিম্বা কোন বিষয়ে তন্নতন্ন অনুসন্ধান ইহাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। ইহারা একটু চটুল ও চটক্‌দার; ইহাদের নূতনত্ব কিম্বা উদ্ভাবনী বুদ্ধি তেমন নাই। ইহাদের লেখা ও বক্তৃতা অনর্গল-প্রবাহী,

প্রায়ই অলঙ্কারপূর্ণ এবং কখন কখন অতিপ্রাচুর্য্যদোষে দুষিত। ইহারা দ্রুতগামী, চলাফেরায় শ্রীবিশিষ্ট এবং কথাবার্ত্তায় বিলক্ষণ মুদ্রা প্রকাশ করিয়া থাকে।

৫। মন-বলময়ী প্রকৃতি। এই প্রকৃতির লোকে একটু লম্বা ও ঈষৎ পাতলা ধরণের; অবয়ব-রেখা একটু কোণবিশিষ্ট—একটু খোঁচ্-বিশিষ্ট; কিন্তু ইহাদের আকার-প্রকার বেশ সম্ভ্রান্ত ও দৃষ্টি-আকর্ষক; ইহাদের দাঁড়াইবার ভাবে বেশ একটু ঋজুতা আছে; মুখাবয়ব সকল একটু বহিরুন্মুখ কিন্তু পাথরে খোদা মূর্ত্তির ন্যায় বেশ স্পষ্ট রেখাবিশিষ্ট ও চাঁচা-ছোলা; মুখের ভাব গম্ভীর; কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, উচ্চ-গ্রাম-স্পর্শী ও সুনম্য; চলাফেরা বেশ দৃঢ় ও স্থিরলক্ষ্যানুবর্ত্তী। এই মন ও বল-ধাতুর সহিত কতকটা প্রাণ-ধাতুর সংযোগ হইলে অপূর্ব্ব ফল প্রসূত হয়। যাহাদের এইপ্রকার প্রকৃতি তাহাদের বুদ্ধিশক্তির সহিত কার্য্যক্ষমতা জড়িত। কি সাহিত্য, কি শিল্প, কি বিজ্ঞান, কি কাজকর্ম্ম, যে-কোন বিষয়ে তাহারা বিশেষ সুখ্যাতি ও সফলতা লাভ করিতে পারে। এই প্রকৃতির লোকেরা গম্ভীর ও সারাল ধরণের সাহিত্যের অনুরাগী, বিজ্ঞানের ভক্ত; এই প্রকার আকৃতি গ্রন্থকার হইবার পক্ষে উপযোগী। অনেক খ্যাতনামা গ্রন্থকার এই প্রকৃতির লোক। ইঁহাদের লেখায় ধর্ম্মনীতির একটা অন্তঃসলিলা ধারা প্রবাহিত থাকে—ইঁহাদের পাশব-প্রবৃত্তি সমূহ স্বভাবতই ক্ষীণ এবং উৎকৃষ্ট বৃত্তির অধীন।

৬। মন-প্রাণময়ী প্রকৃতি। এই প্রকৃতিটিও অতিশয় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই প্রকৃতির লোকেরা যতটা উন্নতমনা, প্রিয়দর্শন ও চটক্‌দার, ততটা সারাল, জোরাল, দৃঢ়সঙ্কল্প কিম্বা অবিরতচেষ্ট নহে। ইহাদের দেহ ঈষৎ খর্ব্ব; দেহ ও মুখ মাঝামাঝি পরিপুষ্ট এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুডৌল ও ক্রম-সংকীর্ণ। মুখাবয়ব তেমন বহিরুন্মুখ ও দৃষ্টি-আকর্ষক নহে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট-রেখা-বিশিষ্ট এবং সৌষ্ঠব-সম্পন্ন ও সুন্দর। মুখের

ভাবে বুদ্ধিমত্তা, মধুরতা ও সহৃদয়তা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। চঞ্চল মস্তিষ্ক, সর্ব্বতোমুখী বুদ্ধি, সাহিত্য ও সৌখীন শিল্পে অনুরাগ, প্রবল গার্হস্থ্য ও সামাজিক ভাব, সমুন্নত নীতি ও ধর্ম্মভাব, আত্যন্তিক সৌমাত্য, দয়া মমতা কোমলতা ও চরিত্রগত বিশুদ্ধতা—এইসকল লক্ষণ এই প্রকৃতিতে প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহাতে মন-বলময়ী-প্রকৃতি-সুলভ ওজস্বিতা, দৃঢ়তা, উদ্যমশীলতার অভাব লক্ষিত হয়। অনেক বক্তা, কবি, উপন্যাস-লেখক শিল্পীর মধ্যে এই প্রকৃতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় (যদিও তাহারা ঐ দলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে)। অনেক স্ত্রীলোকও এই প্রকৃতি বিশিষ্ট।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, মন-বলময়ী ও মন-প্রাণময়ী এই দুই মিশ্র-প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অধিকাংশ বড়লোক এই দুই প্রকৃতিবিশিষ্ট। পৃথিবীতে যত বড়লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের সমঞ্জসীভূত প্রকৃতি। তবে, মন প্রাণ বল এই তিন ধাতুর মধ্যে কোন দুইটির প্রভাব যেন চরিত্র-বিশেষে অপেক্ষাকৃত একটু স্পষ্টরূপ লক্ষিত হয় এই মাত্র। কেন না, পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রায়ই কাহারও ভাগ্যে ঘটে না—একটু উনিশ বিশ হইযাই থাকে। যেমন- মনে কর, ব্রাইট্ ও গ্লাড্‌ষ্টোন্। এই দুই জনেরই প্রকৃতিতে উল্লিখিত তিন ধাতুর প্রায়ই সমঞ্জসীভূত সমাবেশ আছে। তবে ব্রাইটের প্রকৃতিতে প্রাণাংশ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকাতে তাঁহার প্রকৃতিকে মন-প্রাণ-প্রকৃতির কোটায় ফেলা যায়, আর গ্লাড্‌ষ্টোনের প্রকৃতিতে বলাংশ অপেক্ষকৃত অধিক থাকাতে তাঁহার প্রকৃতিকে মন-বল-প্রকৃতির সামিলে আনা যায়। যাঁহারা এই দুই জনের প্রতিকৃতি তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা উভয়ের প্রকৃতিগত প্রভেদ স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবেন। উভয়েরই প্রশস্ত ও উন্নত ললাট —কিন্তু ব্রাইটের প্রকৃতিতে পুষ্টিতন্ত্রের কিঞ্চিৎ আধিক্য ও গ্লাড্‌ষ্টোনের

প্রকৃতিতে অস্থিপেশী-তন্ত্রের আধিক্য। ইঁহাদের চরিত্র ও বক্তৃতাতেও এই প্রভেদ বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। ব্রাইটের বক্তৃতা পড়িয়া দেখ, উহা বেশ প্রাঞ্জল, সুললিত, জলবত্তরল—উহাতে ঘোরো কথার আধিক্য। এবং গ্লাড্‌ষ্টোনের বক্তৃতার বাক্যসমূহ অপেক্ষাকৃত জটিল, গভীর ও ওজস্বী। ইহাতে একজনের হৃষ্টপুষ্ট মুখের আমেজ্ পাওয়া যায়—আর একজনের দৃঢ় কঠোর অস্থি-পেশীর আভাস উপলব্ধি হয়। ইঁহাদের বক্তৃতা দিবার ধরণেও এই প্রভেদ অনুভূত হয়। শুনিয়াছি ব্রাইট্ যখন বক্তৃতা করিতেন তখন মনে হইত যেন তিনি আপনার বন্ধুবান্ধবদের সহিত সহৃদয়-ভাবে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন; কিন্তু গ্লাড্‌ষ্টোন্ যেন প্রতি কথা নিংড়াইয়া নিংড়াইয়া সবলে বাহির করেন—এবং তাঁহার এক একটি ওজস্বী কথা যেন শ্রোতাদিগের মধ্যে হাতুড়ির ঘায়ের মত আসিয়া পড়ে। তা ছাড়া দৃঢ়তা, উদ্যম, শ্রমশীলতা, অবিরত-চেষ্টতা—যাহা বল-প্রকৃতির লক্ষণ, তাহা ব্রাইট্ অপেক্ষা গ্লাড্‌ষ্টোনে শতগুণ অধিক।

আমাদের দেশের দুই একটা ঘোরো দৃষ্টান্তও দেওয়া যাইতে পারে। বঙ্কিম বাবু তাঁহার এজ্‌লাসি কাজকর্ম্ম সত্ত্বেও যে এতগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিতে পারিয়াছেন—তাহা কেবল অস্থিপেশীতন্ত্রের প্রভাবে। যদি তাঁহার বলাংশ অপেক্ষা প্রাণাংশের প্রভাব বেশি হইত তাহা হইলে পারিয়া উঠিতেন কি না সন্দেহ। আমাদের অক্ষয় বাবুর (অক্ষয়কুমার দত্ত) দৈহিক প্রকৃতিতে বলধাতুর অভাব থাকায়, তিনি গোটাকতক ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াই অচিরাৎ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার লেখায় যে লালিত্য, সুন্দর বাক্যবিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার প্রাণময়ী প্রকৃতির গুণে বলা যাইতে পারে। বঙ্কিম বাবুর প্রকৃতিগত প্রাণধাতুর প্রভাবে তাঁহার লেখায় ভাবের এত সরসতা—এবং তাঁহার প্রকৃতিগত বল-ধাতুর প্রভাবে তাঁহার লেখনীর এত প্রখরতা। এই জন্য তাঁহার লেখা "প্রখরে মধুরে" বেশ মিশিয়াছে।

এইজন্য বঙ্কিম বাবুর লেখায় যুক্তির এত বাঁধুনি ও ফাল্‌ত বাজে-বকুনির অভাব। যাঁহাদের প্রকৃতিতে বলাংশ অপেক্ষা প্রাণাংশের আধিক্য, অর্থসঙ্গতি রক্ষা করা অপেক্ষা ললিত বাক্যবিন্যাসের দিকে তাঁহাদের অধিক টান। তাঁহাদের লেখায় একটু শব্দবাহুল্যও হইয়া পড়ে। বাক্যকে সুশ্রাব্য করিবার জন্য হয়তো একই ভাব তাঁহারা ভিন্ন কথায় তিনবার করিয়া ব্যক্ত করিবেন। তাঁহাদের লেখায় যুক্তির ভাগ কম, উচ্ছ্বাসের ভাগ একটু অধিক। তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, যতটা গর্জ্জন ততটা বর্ষণ নহে—যতটা শব্দঘটা, ততটা সার নাই। আর এক দৃষ্টান্ত, আমাদের চন্দ্রনাথ বাবু। ইনি সুলেখক বটে, কিন্তু ইঁহার লেখায় যেন প্রাণ-ধাতুর অংশ একটু বেশি মাত্রায় আছে বলিয়া বোধ হয়—একটু যেন অস্থি-পেশীর অভাব। বঙ্কিম বাবুর মন-বলময়ী প্রকৃতি; চন্দ্রনাথ বাবুর মন-প্রাণময়ী প্রকৃতি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাঁরা মন-বলময়ী প্রকৃতির জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। বাঙ্গালার মধ্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত যত পাই ততই আশার সঞ্চার হয়। আমাদের সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কেও বোধ হয় এই কোটায় ফেলা যাইতে পারে—তাঁহারও শ্রমশীলতা ও উদ্যম য়ুরোপীয়-সুলভ।

আমাদের বঙ্গদেশে প্রাণ-ধাতুরই একটু বেশি প্রাদুর্ভাব। প্রাণ-ধাতু সম্পূর্ণাবয়ব হইলে মন্দ নয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাণের দুই উপাদান রস ও রক্তের মধ্যে রসাংশটিই বাঙ্গালীর দৈহিক প্রকৃতিতে বেশি দেখা যায়—তাহাতে তমোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়া আলস্য ও জড়তা উৎপন্ন হয়। যে দেশের জলবায়ু আর্দ্র সেই দেশের জনসাধারণের প্রকৃতি এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের প্রাণধাতুর আধিক্য ও বলধাতুর অভাব থাকায় আমরা সহজে হুজুকে মাতিয়া উঠি—বৈদেশিকদিগের টিটকারি সহ্য করিতে না পারিয়া হয় আমাদের নিজত্ব সহজে ছাড়িয়া

দিই—অথবা সমাজের ভয়ে জড়সড় হইয়া বাস্তবিক কোন অশুভ প্রথাও পরিত্যাগ করিতে সাহসী হই না। আমরা কোন বৃহদ্ব্যাপার সমাধা করিয়া তুলিতে পারি না; যাহাতে অবিরত চেষ্টা—অবিশ্রান্ত শ্রমের প্রয়োজন এরূপ কার্য্যে আমরা সফলতা লাভ করিতে পারিনা। যে সকল কার্য্যে উপস্থিতমত বাহবা পাওয়া যায় এইরূপ কার্য্য করিতেই আমরা ভালবাসি—আমরা খুব চটক্ লাগাইয়া দিতে পারি, কিন্তু কোন সারবান্ স্থায়ী কার্য্য আমাদের দ্বারা হইয়া উঠে না। অতএব মনোময়ী ও বলময়ী প্রকৃতির যাহাতে উন্নতি হয় সে বিষয়ে আমাদের সকলের যত্ন করা কর্ত্তব্য—তাহার প্রধান উপায় জ্ঞানধর্ম্মের আলোচনা, উপযোগী আহার ও ব্যায়াম-চর্চ্চা। মন, বল, প্রাণ—আর এক কথায় জ্ঞান কর্ম্ম ও ভাব—কিম্বা দার্শনিক ভাষায় বলিতে হইলে—সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনের সামঞ্জস্য না হইলে মানব-চরিত্রের কখনই পূর্ণতা লাভ হয় না।

দৈহিক প্রকৃতির লক্ষণ দেখিয়া কি রূপে লোক চিনিতে হয় তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করা গিয়াছে। এক্ষণে মস্তকের গঠন দেখিয়া কিরূপে চরিত্র নির্ণয় করিতে হয় তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। আমাদের মনোবৃত্তি কতকগুলি, তাহাদের কি কি কার্য্য, মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ অংশে তাহাদের স্থান, ইত্যাদি তথ্যগুলি প্রথমতঃ মোটা-মুটি জানা আবশ্যক।

মনোবৃত্তির দুই প্রকাণ্ড বিভাগ—জ্ঞান ও ভাব। তন্মধ্যে জ্ঞান ও বুদ্ধির স্থান হচ্চে কপাল—মস্তকের বাকি অংশ যাহা কেশে আবৃত তৎ-সমস্তই ভাবের স্থান। ভাব দুই ভাগে বিভক্ত;—নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও উৎ-কৃষ্ট প্রবৃত্তি। মস্তকের নিম্নপার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির স্থান। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আধিক্য হইলে কানের উপরে ও পশ্চাতে মাথার গঠন চওড়া ও ভরপুর দেখায়। যাহাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ক্ষীণতর তাহাদের ঐ অংশ অর্থাৎ মাথার দুই পার্শ্ব পাতলা ও সংকীর্ণ। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আবার

দুই ভাগে বিভক্ত;—গার্হস্থ্যপ্রবৃত্তি ও স্বার্থপ্রবৃত্তি। গার্হস্থ্যপ্রবৃত্তি চারিটি;—স্ত্রৈপুরুষিক আসক্তি, বাৎসল্য, সখ্য, ও বাস্তুনিষ্ঠা অর্থাৎ নিজ বাসস্থানের উপর মায়া। গার্হস্থ্যপ্রবৃত্তির আধিক্য হইলে মাথার পিছন দিক্‌টা লম্বাটে ও ভরপুর দেখায়। এবং উহার লাঘব হইলে ঐ অংশ চ্যাপ্‌টা ও বসা দেখায়। স্বার্থ-প্রবৃত্তি এতগুলি যথা,—(১) প্রতিবিধিৎসা অর্থাৎ বাধা আক্রমের ইচ্ছা—যুঝাযুঝি করিবার ইচ্ছা—সাহস; (২) জিঘাংসা অর্থাৎ ধ্বংস করিবার—হানি করিবার ইচ্ছা—ক্রোধ; (৩) বুভুক্ষা অর্থাৎ আহারের ইচ্ছা; (৪) অর্জ্জন স্পৃহা; (৫) জুগোপিষা অর্থাৎ মনের ভাব গোপন করিবার ইচ্ছা। মস্তকের পার্শ্বদেশে ও কানের চতুষ্পার্শ্বে এই সকল প্রবৃত্তির স্থান। উহাদের আধিক্য হইলে মাথার ঐ অংশ স্থূল ও বর্ত্তুলাকার দেখায়—কিন্তু উহাদের স্বল্পতা হইলে ঐ অংশ চ্যাপ্‌টা ও সংকীর্ণ দেখায়। উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি তিনভাগে বিভক্ত। যথা;—(১) উচ্চতর স্বার্থভাব (২) ধর্ম্মভাব ও (৩) বুদ্ধি-মিশ্র ভাব। উচ্চতর স্বার্থভাব এত গুলি যথা;—সাবধানতা, লোকাদরপ্রিয়তা, আত্মসম্ভ্রম ও দৃঢ়তা—মাথার তেলোর শেষাংশ ও সেই শেষাংশের পার্শ্বদেশ এত সকল ভাবের স্থান। মাথার তেলোর বাকি অংশ ধর্ম্মভাবের স্থান। ধর্ম্মভাব এইগুলি যথা;—সত্যনিষ্ঠা, আশা, বিশ্বাস, ভক্তি ও দয়া। মাথার তেলোর পুরোভাগ ও মধ্যদেশ এই সকল ধর্ম্মভাবের স্থান—ধর্ম্মভাবের আধিক্য হইলে ঐ অংশ দীর্ঘ ও উচ্চ ও সুডৌল হইয়া থাকে; এবং উহার স্বল্পতা হইলে ঐ অংশ নিচু হয় ও ক্রমবক্র না হইয়া যেন হঠাৎ নামিয়া গিয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হয় বুদ্ধি-মিশ্র ভাব এইগুলি;—যথা, নির্ম্মিৎসা অর্থাৎ নির্ম্মাণ করিবার প্রবৃত্তি—হস্তনৈপুণ্য ইত্যাদি; ভাবুকতা বা সৌন্দর্য্যানুরাগ; অনুচিকীর্ষা অর্থাৎ অনুকরণ করিবার ইচ্ছা এবং জিহসিষা অর্থাৎ হাস্তপ্রিয়তা। ইহার কিয়দংশ কপালের পার্শ্বদেশে ও কিয়দংশ সাম্‌নেকার মাথার তেলোর পার্শ্বদেশে অবস্থিত।

এই সকল বৃত্তির আধিক্য হইলে মস্তকের ঐ অংশ চওড়া ও পরিপুষ্ট বলিয়া মনে হয়—এবং উহাদের স্বল্পতা হইলে ঐ অংশ চ্যাপ্টা ও সংকীর্ণ দেখায়।

প্রত্যক্ষজ্ঞান এইগুলি যথা;—বস্তুবোধ, আকার-বোধ, পরিমাণ-বোধ, ভার-বোধ, বর্ণ-বোধ, শৃঙ্খলা-বোধ, সংখ্যা-বোধ ও স্থান-বোধ। এই সকল বৃত্তির দ্বারা বস্তুর বস্তুত্ব ও বিবিধ ভৌতিক গুণ আমাদের উপলব্ধি হয়। কাজকর্ম্মের সময় এই সকল জ্ঞান বড়ই আমাদের সহায়তা করে। এই সমস্ত জ্ঞানের আধিক্য হইলে কপালের নিম্নদেশ অর্থাৎ যেখানে ভুরু থাকে সেই স্থান বাহির করা ও ঝোঁকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান—এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর জ্ঞান আছে যাহাকে বিমিশ্র প্রত্যক্ষজ্ঞান বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ উহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। বিমিশ্র প্রত্যক্ষ-জ্ঞান এইগুলি;—যথা, ঘটনা-বোধ বা স্মৃতি, কাল-বোধ, সুর-বোধ, ভাষা-শক্তি অর্থাৎ কথার দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিবার শক্তি; ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কপালের মধ্যভাগে অবস্থিত। এই জ্ঞানের আধিক্য হইলে কপালের মধ্যভাগ ফুলিয়া উঠে—এবং লাঘব হইলে ঐ স্থান বসা-বসা দেখায়। বুদ্ধিবৃত্তি দুইভাগে বিভক্ত। যথা অনুমিতি অর্থাৎ কার্য্য হইতে কারণ অনুমান করিবার শক্তি ও উপমিতি অর্থাৎ বিবিধ পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ ও সৌসাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উপলব্ধি করিবার শক্তি। বুদ্ধি-বৃত্তির আধিক্য হইলে কপালের উপরাংশ উচ্চ, প্রশস্ত, ও বহিরুন্মুখ হইয়া থাকে।

মাথার পশ্চাদ্ভাগে সামাজিক ও গার্হস্থ্য প্রবৃত্তির স্থান; মাথার তলদেশে স্বার্থ-প্রবৃত্তির স্থান; মাথার তেলোদেশে ধর্ম্মবৃত্তির স্থান এবং কপালে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির স্থান। এই সকল বৃত্তির বিভিন্ন মাত্রা ও সংযোগফলে ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রগত পার্থক্য উৎপন্ন হয়। যাহার

মস্তকের পুরোভাগ অপেক্ষা পশ্চাদ্ভাগ বড়, মোটামুটি বলিতে হইলে, জ্ঞান অপেক্ষা তাহার ভাবাংশ সমধিক প্রবল। যাহার মস্তকের তেলো-দেশ অপেক্ষা তলদেশ ও পার্শ্বদেশ বড়, তাহার স্বার্থ-প্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল ও ধর্ম্মবৃত্তি ক্ষীণভাবাপন্ন। কার্য্যে তাহার খুব উদ্যম, উৎসাহ কিন্তু তাহা সৎপথে নিয়োজিত না হইতেও পারে। ইহার বিপরীতে, যাহার মস্তকের তলদেশ অপেক্ষা তেলোদেশ বড়, তাহার ধর্ম্মভাব প্রবল কিন্তু কার্য্য করিবার উদ্যম উৎসাহ কম অর্থাৎ তাহার চালকবৃত্তি অপেক্ষা নায়কবৃত্তি প্রবল।

যাহার স্বার্থ-প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উভয়ই খুব প্রবল কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ততটা প্রবল নহে সে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বটে, কিন্তু সংগ্রামে সে অনেক সময়েই পরাভূত হয়; তাহার জীবনে অসঙ্গতি লক্ষিত হয়; কখন মনে হইবে লোকটা বড়ই প্রবৃত্তির বশীভূত, কখন মনে হইবে বেশ ধর্ম্মিষ্ঠ। কিন্তু ঐ সঙ্গে যাহার বুদ্ধিবৃত্তিও বলবতী, তাহার জীবনে এরূপ অসঙ্গতি লক্ষিত হয় না। যাহার স্বার্থ-প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল অথচ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দুর্ব্বল, তাহার মানসিক শক্তিসমূহ কার্য্যকরী ও উদ্যমবিশিষ্ট হইলেও তাহার নৈতিক চরিত্র জঘন্য—তাহার সমস্ত বুদ্ধি উদ্যম কুপথে চালিত হয়।

যাহার বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা প্রত্যক্ষবৃত্তি প্রবল তাহার মনোভাণ্ডার বিবিধ বিষয়ের তথ্যে পরিপূর্ণ—তাহার জ্ঞানস্পৃহা অতীব বলবতী—সহজেই সে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে, খুটিনাটি করিয়া দেখিবার শক্তি তাহার বিল-ক্ষণ থাকে—কাজকর্ম্মের ব্যবহারিক বুদ্ধি তাহার সমধিক প্রবল, কিন্তু তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, গভীরতা, ও উদ্ভাবনী শক্তির অভাব। কাজকর্ম্মে বেশ দক্ষ কিন্তু কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিতে সে সহজে পারে না এবং সে সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধানতা তাহার দ্বারা হইয়া উঠিবে না। লোকটা গুণী হইতে পারে,

পণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু কোন বিষয়ের গভীর চিন্তা তাহার দ্বারা হইয়া উঠে না—কোন বিষয়ের মূলতত্ত্ব সে ভাল বুঝিতে পারে না। যাহার কপা-লের নিম্নাংশ অপেক্ষা উপরাংশ বড় অর্থাৎ যাহার প্রত্যক্ষবৃত্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল তাহার দর্শনশক্তি অপেক্ষা চিন্তাশক্তি বল-বতী—তথ্য অপেক্ষা তত্ত্বেরদিকে তাহার অধিক টান্। কোন বিষয়ের খুটি-নাটি দেখিতে তাহার ভাল লাগে না—সকল বিষয়ের মূলতত্ত্ব জানি-য়াই সে সন্তুষ্ট; পদার্থের গুণাগুণ অপেক্ষা পদার্থ-সমূহের সম্বন্ধ নির্ণয়ে তাহার অধিক অনুরাগ; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অপেক্ষা যে-সকল বিজ্ঞান বিশ্লেষণ ও প্রমাণসাপেক্ষ তাহারই অনুশীলনে তাহার অধিক প্রীতি। যাহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রত্যক্ষবৃত্তি উভয়ই প্রবল এবং দৈহিক প্রকৃতিও সতেজ তাহার বিশ্ব-প্রসারিণী চৌকোষ বুদ্ধি এবং তাহার মন তথ্য ও তত্ত্ব উভয়েই সুসজ্জিত। যাহার মাথার চারিদিক বেশ সমান, তাহার সকল বৃত্তিই সমান পরিপুষ্ট, তাহার চরিত্রগত বিশেষত্ব বড় উপলব্ধি হয় না—তাহার কোন বিষয়ে আধিক্যও নাই, ন্যূনতাও নাই; সে বেশ একরকম কাজ কর্ম্ম চালাইতে পারে; যেরূপ চারিদিককার অবস্থা তদনুসারে তাহার চরিত্র গঠিত হয় এবং সে নিঃশব্দে ও শান্তভাবে জীবন-পথ অতিবাহিত করে; কিন্তু যদি ঐ সঙ্গে তাহার মস্তিষ্ক বৃহদায়তন ও সক্রিয় হয় এবং অবস্থাও যদি অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী হয়—সকল বিষয়েই সে মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে। যাহার মাথার সব দিক সমান নহে—কোন দিক বেশি, কোন দিক কম তাহার চরি-ত্রের খুব বিশেষত্ব উপলব্ধি হয়। যাহার আত্মসম্ভ্রম প্রবল, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি প্রবলতর এবং স্বার্থ-প্রবৃত্তি প্রবল নহে, তাহার চরিত্রে সম্ভ্রান্ত ভাব, পুরুষোচিত আত্ম-নির্ভর, উদারতা, উন্নত মহৎভাবের প্রকাশ দেখা যায়—সকল প্রকার নীচতা, ইতরামি তাহার নিকট অতীব হেয়। কিন্তু এইরূপ প্রবল আত্মসম্ভ্রমের সহিত যদি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তির লাঘব হয়

এবং স্বার্থ প্রবৃত্তির অধিক্য থাকে তাহা হইলে সে ব্যক্তির চরিত্রে অহং-কার, উদ্ধতভাব, প্রভুত্বপ্রিয়তা, অনধিকার-চর্চ্চা প্রভৃতি অপ্রীতিকর লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রবল বৃত্তিগুলি অপ্রবল বৃত্তির উপর আধিপত্য করে—চরিত্রের নেতারূপে অবস্থিতি করে। যথা ;—যাহার জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা সমধিক, এবং তাহার সঙ্গে আত্মসম্ভ্রমও প্রবল, সে অপমানিত হইলে প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে, নিজ স্বার্থসাধনে তৎপর হইবে—অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবে ইত্যাদি ; কিন্তু তাহার যদি আত্মসম্ভ্রম প্রবল না হয় এবং দয়া ও কর্ত্তব্যপরতা প্রবল হয় তাহা হইলে সে নিজের জন্য প্রতিশোধ লইতে বিরত হইবে—কিন্তু পরের স্বার্থরক্ষার্থ, সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, সে বদ্ধপরিকর হইবে। এইরূপ বিবিধ বৃত্তির প্রবলতা ও অপ্রবলতা হইতে চরিত্রের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

——০——

তুকারামের অভঙ্গ।

পুণা হইতে ৯ ক্রোশ দূরে দেহু নামক একটি ক্ষুদ্র নগরে তুকারামের বসতি ছিল। ইঁহার পিতা জাতিতে শূদ্র; বেণিয়ার ব্যবসা অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তুকারামের চিত্ত, অল্প বয়স হইতেই সংসারে বীত-রাগ হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী, জিজাবাই, অত্যন্ত উগ্রচণ্ডা ছিলেন এবং তাঁহার কঠোর ব্যবহারে তুকারাম বড়ই কষ্ট পাইতেন; ইহাও তাঁহার বৈরাগ্যের অন্যতর কারণ।

তুকারাম কথকতা করিতেন। তাঁহার কথকতায় সঙ্গীতাদি চিত্তরঞ্জনের কোন সাধন ছিল না। অভঙ্গ-নামক ছন্দে বিরচিত স্বীয় পদাবলী আবৃত্তি করিয়া লোকের নিকট তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। কথিত আছে, কথকতার প্রথা, বোম্বাই-অঞ্চলে, তুকারামই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন।

তুকারাম শিবাজীর আমলের লোক। তাঁহার অভঙ্গ, বোম্বাই অঞ্চলে অতীব লোকপ্রিয়। তাহাতে ভগবদ্ভক্তি, সংসার-বৈরাগ্য, আধ্যাত্মিকতা, সত্যনিষ্ঠা, অকপটতা ও নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সুশিক্ষিত লোক ছিলেন না; তিনি কেবল তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা-বলেই কবিতা-সকল রচনা করিতেন। তাই, তাঁর কবিতাতে তেমন পদ-লালিত্য না থাকিলেও, একটি অকৃত্রিম সরল সৌন্দর্য্য বেশ অনুভব করা যায়। অরণ্যের অযত্নলালিত তরুরাজির ন্যায়, তাঁহার কবিতায়, না আছে শৃঙ্খলা -- না আছে পারিপাট্য। হয় তো কোন স্থলে ডাল-পালার এত ঘেঁসাঘেঁসি ও জটিলতা যে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। হয় তো, কোন স্থলে শাখা-পল্লবের একেবারেই বিরলতা। উদ্যানে, যেমন স্থানবিশেষে বাছা-বাছা সুরভি-পুষ্পতরুর কেয়ারি থাকে—কোথায় গেলে কোন্ ফুলের আঘ্রাণ পাওয়া যাইবে তাহা যেমন পূর্ব্ব হইতেই জানা যায়, তুকারামের কবিতাকানন সেরূপ নহে;—অলক্ষিত ও

অনপেক্ষিত ভাবে কোথা হইতে যে কোন্ ফুলের আঘ্রাণ পাওয়া যাইবে তাহা কিছুই বলা যায় না। কোথাও বা হয় তো কোন সৌন্দর্য্যই উপলব্ধি হইবে না। কোথাও, সামান্য-জাতীয় তরুর সন্নিবেশ;— কোথাও বা হয় তো স্বর্গীয় পারিজাত, স্বীয় কুসুমবিভব বিকাশ করিয়া, তাহার দিব্য বিমল সৌরভে দিগ্‌বিদিক্ আমোদিত করিয়া রহিয়াছে।

কবি অপেক্ষা সাধুপুরুষ বলিয়াই তুকারাম বেশি বিখ্যাত। সাধারণতঃ দেখা যায়, উন্নত মহান ভাব-সমূহ, কোন শুভ মুহূর্ত্তে কবির হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া তাহাই তাঁহার লেখনী হইতে প্রসূত হয়—সেই ক্ষণিক সময়ের জন্যই কবির হৃদয়, সেই সকল মহান্‌ভাবে বিস্ফুরিত হইয়া উঠে; তুকারামের ন্যায় একজন ভক্ত কবির রচনা সেরূপ নহে। তাঁহার জীবনের সহিত তাঁহার কবিতা গ্রথিত। তাঁহার কবিতা জীবনময় এবং তাঁহার জীবন কবিতাময়। তাঁহার রচনাগুলি শিক্ষিত কবির রচনা-হিসাবে না দেখিয়া, একজন অশিক্ষিত ভক্ত সাধুর অকৃত্রিম হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এই ভাবে দেখিলেই তাঁহার সুবিচার হয় এবং তাঁহার রচনার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়।

নমুনা-স্বরূপ, আমি তুকারামের কতিপয় অভঙ্গ অনুবাদ করিয়া পাঠক বৃন্দের নিকট অর্পণ করিতেছি। মূলের সহিত যতটা ঐক্য রাখা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা গিয়াছে। তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই অমিত্রাক্ষরে রচিত। তাই, আমিও অমিত্রাক্ষর ছন্দ অবলম্বন করিলাম।

(১)

নাহি মিলে সাধুপনা, হাটে কি বাজারে;
না মিলে খুঁজিলে উহা গিরি-গুহা, বনে;
ধন-রাশি দিয়া উহা কেনা নাহি যায়;
আকাশে নাহিক উহা অথবা পাতালে,
তুকা ভণে, আছে শুধু আপন অন্তরে।

(২)

সাজে যথা বহুরূপী, পালটিয়া বেশ ;
বক যথা ধ্যানে বসে মাছ ধরিবারে ;
অথবা ধীবর যথা ছিপ্ ফেলি জলে
দেখিতে না দেয় তার বড়শির কাঁটা ;
অথবা, কশাই যথা, কাটিবারে গলা,
মিষ্টভাষে পশু পালে' করিয়া যতন ;
সেই-মত আমি তুকা সাধু লোক-মাঝে ;
ভাগ্যে প্রভু আমা পরে তুমি কৃপাবান্।

(৩)

সহিতে পারি না আমি বিরোধের বাণী,
তাহে মোর চিত্ত হয় বড়ই বিকল ;
লোক-সঙ্গ তাই মোর সহে নাকো প্রাণে,
একান্তে থাকিতে আমি তাই ভাল বাসি।
দেহের ভাবনা, আর বাসনার সঙ্গ
একেবারে নাহি রুচে, উপজে বিরক্তি।
তুকা ভণে, আমা-ছাড়ি আছ প্রভু দূরে
তারি লাগি দুখ পাই আশা-মোহ-জালে।

(৪)

মায়েরে ডাকেনা শিশু সান্ত্বনার তরে,
মাতা ধায় শিশু-পাশে আপনারি টানে,
যার ভার সেই দায়ী—আমি ভাবি কেন ?
শিশুর ভাবনা-ভার মাতারি উপরে।
আপনি না খেয়ে মাতা, শিশুটির তরে
মিষ্টান্ন রাখেন, আহা, চাহিবার আগে ;

খেলা-মগ্ন যবে শিশু—জননী তাহার
জোর করি ধরি আনি স্তন দেন তাঁরে,
জননীর হিয়া দহে সন্তানের দুঃখে,
কটাহের তাপে যথা খই ওঠে ফুটি;
তুকা ভণে, বিসরিয়া আপনার দেহ
ঘা লাগিতে নাহি দেন শিশুটির গায়।

(৫)

স্বর্ণ-থালে ক্ষীর দাও কুকুরে খাইতে,
মুক্তাহার গর্দ্দভেরে—শূকরে কস্তুরী;
বধিরে শুনাও বেদ—মর্ম্ম সে কি জানে?
তুকা ভণে, সেই জানে—সাধু যেই জনা,
ভক্তির-মহিমা-মর্ম্ম—সেই জানে একা।

(৬)

সাধুর নগরে রাজে প্রেমের সুকাল,
নাহিক তথায় কোন দুখের উদ্বেগ।
তথায় থাকিব আমি হইয়া ভিখারী,
ভিক্ষা মোরে দিবে তথা যত সাধুজনে।
সাধুর নগরে পূর্ণ অন্নের ভাণ্ডার,
তার মাঝে ভগবান একমাত্র ধন।
সাধুর ভোজন পান কেবলি অমৃত,
ঈশ্বরের নাম সদা করেন কীর্ত্তন।
উপদেশ-হাটে সদা সাধুর ব্যাপার,
কেনা-বেচা চলে সেথা প্রেম-সুধা লাগি।
তুকা ভণে, আর কিছু নাহি মিলে তথা,
তাই আমি হইয়াছি সাধুর ভিখারী।

(৭)

ব্রহ্মজ্ঞান ঘরে ঘরে ; কিন্তু যে তাহায়
ভেজাল্ অনেক ; যদি থাকে কারো কাছে
খাঁটি এক রতি, দেরে দুর্ব্বল এজনে।
আশা, তৃষা, দম্ভ, আর কাম ক্রোধ লোভ—
মিশিয়া হয়েছে উহা কালকূট-ভরা ;
কাজ নাহি তাহে মোর—চাহি না সে জ্ঞানে,
ব্যর্থ তাহে হয় মাত্র সমস্ত জীবন।

(৮)

লুচি মণ্ডা-কথা বলি' করিহে বড়াই ;
মুখে লালা—খালি হাত ঘসিরে এদিকে।
ওইরূপ বাজে কথা অপদার্থ অতি,
লুন বিনা অন্ন যথা আস্বাদবিহীন।
দেহে নাহি শুর-পনা, কথায় কেবলি
রাজা মন্ত্রি মারি—ধিক্ অমন কথায় !
তুকা ভণে, মুখে যেই বড়ই বাচাল
মিথ্যা তার মূলে আছে জানিবে নিশ্চয়।

(৯)

ক্ষুদ্র হওয়া বড় ভাল, না থাকে কাহারো দ্বেষ,
বানে গাছ ভেসে যায়, খাগ্ড়া শুধু থাকে।
নু'লে, ঢেউ চলে যায় মাথার উপর দিয়া ;
তুকা ভণে, প'লে পায়ে, বলে কিবা করে।

(১০)

প্রাণ্ই এক দেব তার—ভোজন্ই ভজন ;
মরণ মুকতি তার—পাষণ্ড যে জন ;

জনম কাটায় শুধু দেহেরি পোষণে,
বেদ কি পুরাণ সব মিথ্যা বলি মানে ;
যাহা মনে আসে, তাহা করয়ে বিচার ;
বলে, ভবে পুন আর আসিতে না হবে ;
পরলোক, পরজন্ম ভাবে সে অলীক,
বিবাদ করিয়া ভরে নিজের উদর।
তুকা ভণে, পাপ পুণ্য নাহি করে ভেদ,
যমদণ্ড পিঠে তার রয়েছে উদ্যত।

(১১)

কন্যা যায় শ্বশ্রূ-গৃহে ফিরে ফিরে চায়,
—তেমতি আমার প্রাণ ; বল' প্রভু কবে
দেখা দিবে ? যথা শিশু, হারাইয়া মায়
তাকায় বিহ্বলপ্রায় ; কিম্বা যথা মীন
হ'লে জলহীন ; তথা, তুকার এ দশা।

(১২)

কুমুদিনী জানে কি সে নিজ পরিমল ?
ভ্রমর শুধুই তাহা করে উপভোগ ;
তব নাম তব কাছে তাই অগোচর,
আমিই করিহে তব প্রেমরসাস্বাদ।
মাতা তৃণভোজী, বৎস পিয়ে' তার দুধ,
যার যাহা তার তাহা নাহি আসে কাজে।
তুকা ভণে, মুক্তা থাকে শুক্তিকা-উদরে,
কিন্তু তাহা শুক্তিকার আসেনাকো ভোগে !

(১৩)

কায়মনোবাক্যে তব লয়েছি শরণ,
আর কোন চিন্তা দেব নাহি মোর মনে ;
দুঃখ-ক্লেশ-ভার যাহা বহিতেছি আমি,
তোমা বিনা আর কেবা করিবে মোচন !
তুমি মম প্রভু, নাথ—আমি তব দাস।
দূর হতে আসিতেছি তোমারি পশ্চাৎ ;
তুকা ভণে, ধন্না দিয়া আছি তব পদে,
মিটাও হিসাব প্রভু দিয়া দরশন।

(১৪)

করহে করুণা, দেব, যাচি সকাতরে,
সংসার-বন্ধন মোর ঘুচাও এখনি।
শুনিয়া আমার এই কাতর বচন
হবে নাকি, প্রভু তুমি, উতলা অধীর ?
শূন্য হেরি চারি দিক্, শূন্য সব ঠাঁই,
ও-পদে ভরসা রাখি' দেখি মাত্র পথ,
কোরো না বিলম্ব আর—এস হে সত্বর
ও গো পিতা ! ও গো মাতা ! বিঠ্ঠল * আমার।
আমার যা কিছু এবে—তুমিই সকলি ;
আর সব শূন্য, আমি জেনেছি বিচারি।
তুকা ভণে, এবে প্রভু, করি' কৃপাদান
দেহ তব চরণের পূর্ণ দরশন।

---

* তুকারামের দেবতার নাম বিঠ্ঠল।

বসন্ত-রোগ।

আমরা উপহাসচ্ছলে বলিয়া থাকি, "চোর পালাইলে বুদ্ধি বাড়ে" কিন্তু চোর পালাইবার পরেও যদি একটু বুদ্ধির বিকাশ হয়, তাহাতেও উপকার আছে। সব সময়ে, তাহাও ঘটে না। সম্প্রতি বসন্ত-রোগ তস্করের ন্যায় কলিকাতা নগরে প্রবেশ করিয়া কত জীবন ধন হরণ করিয়া লইয়া গেল; ইহাতে যদি আমাদের কিছুমাত্র চেতনা হইয়া থাকে, তবে ভবিষ্যতের জন্য আমাদিগের বিশেষরূপে সতর্ক হওয়া উচিত। কলিকাতার পৌরসভায় প্রশ্নোত্তর ও বাদানুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া যাহাতে এই ভীষণ মারাত্মক রোগ নিবারণ ও প্রশমনের জন্য স্থায়ী উপায় সকল অবলম্বিত হয়, এখন হইতেই তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

গো-বসন্তের টীকা লইলে, ইচ্ছা-বসন্ত সহসা আক্রমণ করিতে পারে না—যদি বা আক্রমণ করে, উহা মারাত্মক হয় না, ইহাই এখনকার প্রচলিত মত। কিন্তু এ কথা কতদূর সত্য, এ বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন। আবার, কেহ কেহ মনে করেন, টীকা লইলে অন্য শরীরের রোগ-বীজ নিজ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এই আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা টীকা লইতে বিরত হয়েন।

বহুপুরাকাল হইতে প্রাচ্য-খণ্ডের লোকেরা জানিত যে, বসন্ত-রোগ একবার হইয়া গেলে চিরজীবনের মত ঐ রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। একথাও তাহারা জানিত যে টীকার দ্বারা ইচ্ছা-বসন্ত অন্যের শরীরে সংক্রামিত করা যায় এবং এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে সংক্রামিত হইলে, উহার তেজ ও তীব্রতার অনেকটা হ্রাস হইয়া থাকে। বহু পুরাকালে, আফ্রিকা, পারস্য ও চীনদেশে, টীকা দিবার রীতি প্রচলিত ছিল। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ইস্তাম্বুল নগরে ইহা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় এবং ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে লেডি মেরি ওয়ার্টলি মনটেগ ইংলণ্ডে ইহা প্রবর্ত্তিত করেন।

টীকা দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে বসন্তরোগজনিত মৃত্যুর হার যে অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, তাহার রাশি রাশি প্রমাণ পাওয়া যায়। তথ্য-তালিকার লতা বিস্তার করিলে সাধারণ পাঠকের বিরক্তিকর হইতে পারে, সেই জন্য তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া দুই চারিটী প্রমাণের উল্লেখ মাত্র করা যাইতেছে।

ডাক্তার গয় বলেন, গতশতাব্দীতে ইংলণ্ডে, প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন করিয়া বসন্ত-রোগে মরিত। তাহার পর, ইচ্ছা-বসন্ত-বীজ-টীকা প্রবর্ত্তিত হইলে পর, প্রতি পঞ্চাশের মধ্যে একজন—পরে আরও ভাল বন্দোবস্ত হইলে—পাঁচশত লোকের মধ্যে একজন করিয়া মরিত। যদিও এইরূপ ইচ্ছা-বসন্ত-টীকার দ্বারা মৃত্যুর সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ইহার দ্বারা বসন্ত-রোগ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। তাহার পর গো-বসন্ত টীকা পদ্ধতি আবিষ্কার হইল।

জেনর সাহেব গোজাতির মধ্যে বসন্তের ন্যায় এক প্রকার রোগ দেখিতে পাইয়া তাহার নাম গো-বসন্ত রাখিলেন।

মানব-দেহ হইতে গরুর শরীরে সংক্রামিত হইয়া, ইচ্ছাবসন্তই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ইহার যদিও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তথাপি একটা আশ্চর্য্য এই দেখা যায়, যে অবধি ইচ্ছাবসন্ত মানুষের মধ্যে কমিয়া গেল সেই অবধি গো-বসন্তেরও হ্রাস হইল। আর একটী কথা, গো-বসন্ত গাভীদিগের বাঁটের উপরেই বাহির হইয়া থাকে, তাহাতেই কেহ কেহ অনুমান করেন দোহন করিবার সময় মানব-দেহ হইতে বসন্ত-রোগ উহাদের দেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে। মানুষের বসন্ত-রোগ গরুতেই সংক্রামিত হউক, কিম্বা গোজাতির স্বতন্ত্র কোনও রোগই হউক, ইহা নিশ্চয় যে, ইচ্ছাবসন্তের সহিত উহার কতকটা সাদৃশ্য আছে; অথচ ইচ্ছা-বসন্তের যে সংক্রমণীশক্তি আছে, তাহা উহাতে নাই। এই গো-বসন্তকে যদি ক্ষীণবীর্য্য ইচ্ছা-বসন্ত বলা

যায় তাহা হইলে, আজকাল যে একটী মত উঠিয়াছে যে, কোন রোগের ক্ষীণবীর্য্য বীজ শরীরে প্রবিষ্ট করাইলে, আসল রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, গো-বসন্ত-টীকাপদ্ধতির দ্বারা তাহাই সপ্রমাণ হয়। অথবা, ইহাকে যদি ইচ্ছাবসন্তের সদৃশ কোন রোগ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও, সদৃশ চিকিৎসার "বিষে বিষক্ষয়" এই মূলতত্ত্বটী অনুসারে ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মূল-সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, কার্য্যতঃ গো-বসন্তটীকার অনেক পরীক্ষা হইয়া উহার রক্ষণী-শক্তি যে অকাট্যরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে, বসন্ত-রোগের নাম মসূরিকা।' বসন্ত-কালে এই রোগ দেখা দেয় বলিয়া, সাধারণ লোকে ইহাকে বসন্ত-রোগ বলিয়া থাকে। মারাঠীদিগের মধ্যেও ইহার কোন বিশেষ নাম নাই—ইচ্ছা-বসন্তকে উহারা "দেবী" বলিয়া থাকে। আমরাও বসন্তের অধিষ্ঠাত্রীকে "শীতলা দেবী" বলিয়া থাকি। এবং দেবীর ইচ্ছানুসারে দেহ-বিশেষে তাঁহার আবির্ভাব হয় বলিয়া, বোধ হয়, ইহার নাম ইচ্ছা-বসন্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্রিগেড্ সারজন প্রিংগেল সাহেব ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ব্যাপক-রোগানুসন্ধায়িনী সভার সমক্ষে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহার একস্থলে, কোন পুরাতন হিন্দু গ্রন্থ হইতে এই অংশটী উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

গরুর বাঁট হইতে যে ইচ্ছাবসন্ত উৎপন্ন হয়, উহা মূল রোগের প্রকৃতিরই অনুরূপ মৃদু ধরণের··· ··· ··· দুই তিন দিন সামান্য জ্বর হয় মাত্র—যাহার এই বসন্ত একবার হয়, জীবনে আর কখন তাহার ইচ্ছা-বসন্ত হইবার ভয় থাকে না।

ষ্ট্যান্‌লি সাহেবের উদ্ধার সাধনার্থ যে এক দল লোক আফ্রিকায় যাত্রা করে, তাহার মধ্যে ডাক্তার পার্কে ছিলেন। তিনি রয়্যাল-কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার সময় এইরূপ বলেন যে, ব্যাপক বসন্ত রোগের সময়

যে ২৫০ ব্যক্তি রোগাধিকৃত স্থলে উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই পূর্ব্বে টীকা হইয়াছিল, কাহারও কাহারও আসল বসন্ত হইয়া গিয়াছিল। উপস্থিত ক্ষেত্রে, এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কেবল মাত্র চারি-জনের মৃদুধরণের বসন্ত রোগ হয়। তিন জন আরোগ্যলাভ করে ও চতুর্থ ব্যক্তি আত্মহত্যা করে। পক্ষান্তরে, টিপু টিব যে ৩-০ বাহক পাঠা-ইয়া দিয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রায় কেহই পূর্ব্বে টীকা লয় নাই; তাহারা সকলেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাহাদের মৃতদেহে সমস্ত গ্রাম পূর্ণ হইয়া যায়। মারীভয়ের প্রশমন হইলে, ডাক্তার সাহেব যে সকল ব্যক্তির টীকা দিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্য হইতে কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, তিনি যে ঔষধ দিয়াছিলেন তাহা অতি উৎকৃষ্ট। ব্রিগেড সার্জ্জন প্রিঙ্গল যিনি ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষে সঞ্চয় করিয়া-ছিলেন, তিনি বলেন, দেশীয় রাজাদের রাজ্যের মধ্যে, তাঁহার তত্ত্বাব-ধানে যখন টীকাদিবার রীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন সেখানকার লোকেরা পুং-শিশু অপেক্ষা স্ত্রী-শিশুর টীকা অধিক দিতে আরম্ভ করে; কিন্তু যখন পরীক্ষায় দেখিল টীকা-দেওয়া স্ত্রী-শিশু অপেক্ষা টীকা-না-দেওয়া পুং-শিশুদের বসন্তে অধিক মৃত্যু হইতেছে তখন তাহারা বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করিল—স্ত্রী-শিশু অপেক্ষা, পুং-শিশুদিগের অধিক টীকা দিতে লাগিল।

একবার ইচ্ছা-বসন্ত হইয়া গেলে, কিম্বা ইচ্ছা-বসন্তের টীকা লইলে যেরূপ স্থায়ী ফল হয়, অর্থাৎ জীবনে আর কখন ইচ্ছা-বসন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না, গো-বসন্ত টীকার দ্বারা সেরূপ স্থায়ী ফল লাভ হয় না। মধ্যে মধ্যে আবার টীকা লওয়া আবশ্যক হয়। এই জন্য পূর্ব্বে যখন গো-বসন্ত টীকা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তখন প্রায় অধিকাংশ শিশুরই কোন-না-কোন সময়ে ইচ্ছা-বসন্ত হইত এবং অনেক শিশু মারা পড়িত। তাহাদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া যাইত, তাহারা চিরজীবনের মত বসন্ত-

রোগ হইতে অব্যাহতি পাইত। কিন্তু গো-বসন্ত টীকা প্রচলিত হইবার পর হইতে, শিশুদিগের মৃত্যুর হার কমিয়া বয়স্কদিগের মৃত্যুর হার অপেক্ষাকৃত বাড়িয়াছে। তাহার কারণ, গো-বসন্ত টীকা একবার লইলেই যথেষ্ট হয় না, যত সময় যায়, ততই উহার ফলদায়িতা কমিয়া যায়।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, জর্ম্মণদেশের গো-বসন্ত টীকার রাজ-নিয়োজিত অনুসন্ধায়ক-মণ্ডলী, জর্ম্মণ রাজসরকারের নিকট যে বিবরণী প্রেরণ করেন তাহাতে তাঁহারা যে সকল সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

(১) ইচ্ছা-বসন্ত একবার হইয়া গেলে, জীবনে আর কখন হয় না।

(২) গো বসন্ত টীকা হইলেও এই একই ফল হয়, তবে ততটা স্থায়ী হয় না—গড়ে দশ বৎসর অন্তর পুনর্ব্বার লইতে হয়। টীকা-স্থলে অন্ততঃ দুইটী পূর্ণাবয়ব ফুশকুড়ি বাহির হওয়া আবশ্যক, প্রথম টীকার দশ বৎসর পরে পুনর্ব্বার আর একবার টীকা লওয়া নিতান্তই আবশ্যক।

(৩) আশ-পাশের লোকদিগের মধ্যে যে পরিমাণে টীকার ব্যবহার অধিক হয়, সেই পরিমাণে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে টীকার রক্ষণী-শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

(৪) গো-বসন্ত টীকা হইতে যে পরিমাণে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অধিক ইষ্ট হইয়া থাকে। টীকার দ্বারা কখন কখন উপদংশ-রোগ যে সংক্রামিত হইতে পারে না এরূপ নহে—কিন্তু তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। অন্য কারণে খোঁচা-খুঁচি লাগিয়া যেরূপ দুষ্ট ক্ষত হইতে পারে, টীকা লইবার সময়েও কখন কখন তাহা হইতে পারে। পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে, তাহার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না।

(৫) গো-বসন্ত টীকার দ্বারা কোন বিশেষ রোগের যে বৃদ্ধি হইয়াছে এরূপ দেখা যায় না। তথাপি, অনুসন্ধায়ক-মণ্ডলী এইরূপ অভিপ্রায়

স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, নরদেহ হইতে টীকার বীজ-রস গ্রহণ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে গোবৎসের দেহ হইতেই গ্রহণ করা ভাল।

তাঁহাদিগের বিবরণীতে আর একটী গুরুতর তথ্য প্রকাশ হইয়াছে—তাহা এই;—আইনের সাহায্যে বলপূর্ব্বক পুনঃ-টীকা লোকের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করায়, বর্লিন্ প্রভৃতি নগরে, বসন্ত জনিত মৃত্যুর সংখ্যা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। তাহারা এ সম্বন্ধে যে তথ্য-তালিকা দিয়াছেন তাহার প্রমাণ অকাট্য। অতএব, দেখা যাইতেছে, গো-বসন্ত-টীকা একবার লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকা যায় না—মধ্যে মধ্যে তাহার পুনঃপ্রয়োগ করিতে হয়। হাইগেটের ইচ্ছা-বসন্ত-হাঁসপাতালে, প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, যে সকল পরিচারিকা বসন্ত-রোগীর সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হয়, হাঁসপাতালে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগের পুনর্ব্বার টীকা দেওয়া হইয়া থাকে। এই জন্য এই হাঁসপাতালের কোন পরিচারকদিগের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কখন বসন্ত হয় নাই।

কাহারও কাহারও এরূপ বিশ্বাস আছে, কোন বিশেষ বয়স পার হইলে, বসন্ত হইবার আর বড় সম্ভাবনা থাকে না, কিম্বা কোন বিশেষ দৈহিক প্রকৃতি বসন্ত-রোগের প্রভাব-বহির্ভূত। কিন্তু এ সকল বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্মক। আমাদের দেশে অনেক সময়ে আনাড়ি ব্যক্তি টীকা দেয় বলিয়া টীকার সুফল হয় না—বরং কখন কখন অনিষ্ট হইয়া থাকে। এই বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। পশু-দেহ গৃহীত বীজরসের দ্বারা টীকা দিলে এবং সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা টীকা দিবার কাজ সম্পাদিত হইলে, অনিষ্টের খুব কমই সম্ভাবনা থাকে।

বসন্ত-রোগ যাহাতে ব্যাপক হইয়া না উঠে, তজ্জন্য বিলাত-অঞ্চলে তিনটি উপায় অবলম্বিত হয়। (১) বিজ্ঞাপন। (২) পৃথক-করণ। (৩) বায়ুশোধন ও রোগবীজনাশন। (১) কোন গৃহস্থের গৃহে বসন্ত-রোগ

উপস্থিত হইলেই, গৃহস্বামী (কিম্বা কোন কোন স্থানে গৃহস্বামী এবং রোগীর চিকিৎসক) উভয়কেই ঘটনার কথা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে জানাইতে হয়। আইন-অনুসারে তাঁহারা জানাইতে বাধ্য। (২) পৃথক্‌করণ। অর্থাৎ লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিত, বসন্তরোগীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কোন হাঁসপাতালে রোগীদিগকে স্থাপন করা। সেখানে লইয়া যাইবার জন্য, বাহক ও বাহনের বিশেষ আয়োজন রাখা হয়। কোন কোন সংক্রামক রোগে সাধারণ হাঁসপাতালের মধ্যেই বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করিলেই চলিতে পারে। কিন্তু বসন্ত-রোগের সম্বন্ধে সেরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে না। বসন্ত-রোগের সংক্রমণ-শক্তি, অধিককালস্থায়ী ও সুদূরব্যাপী। রোগীদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার সুবন্দোবস্ত থাকিলে, রোগীদিগের বিশেষ কোন কষ্ট হইবার কথা নহে। সহরের অনতিদূরে নদীসুগম কোন নিরালয় স্থানে, হাঁসপাতাল স্থাপন করিলে, নৌকাযোগে লইয়া যাইবার বেশ সুবিধা হইতে পারে। রোগীরও কোন কষ্ট হয় না। (৩) সংক্রমণ-নিবারক উপচারের দ্বারা বায়ু শোধন করা, জলাদির দ্বারা স্থান পরিষ্কার করা, বস্ত্রাদির অগ্নি-সংস্কার করা ইত্যাদি উপায় সকল অবলম্বন করিতে হয়। বায়ু শোধনের পক্ষে ক্লোরিণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বায়ু-শোধনের সময় একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত, যাহাতে রোগ-বীজ ধ্বংস হয় এইরূপ পদার্থ ব্যবহার করা উচিত—কেবল দুর্গন্ধ নাশ হইলেই যথেষ্ট হয় না। যে ঘরে গন্ধকাদির ধূম-প্রয়োগ করা হয় সে ঘরটী অষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধ করা আবশ্যক, কোন রন্ধ্রের দ্বারা ধূম বহির্গত হইয়া না যায় ধোঁয়া দিয়া অন্ততঃ একঘণ্টা কাল এইরূপ বন্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক। এই সমস্ত কার্য্য, স্বাস্থ্য-বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারীদিগের তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাহ হইলেই ভাল হয়।

———c———

* ফরাসী ও ইংরাজ।

ফিলিপ গিলবর্ট হ্যামার্টন সাহেব, "ফরাসী ও ইংরাজ" এই নামে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জ্ঞান ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, বল বিক্রম প্রভৃতি সকল বিষয়ে এই দুই জাতির মধ্যে কি ভেদাভেদ তাহা নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন। ভিন্ন জাতির আচারব্যবহার প্রভৃতি নিরপেক্ষভাবে ও ন্যায্যভাবে কিরূপে সমালোচনা করিতে হয়, এই গ্রন্থখানি তাহার আদর্শ-স্থল। ফরাসী ও ইংরাজ পরস্পরের চির-শত্রু। উহাদের মধ্যে কুকুর বিড়ালের সম্বন্ধ। কেহ কাহারও খুঁৎ পাইলে ছাড়িয়া কথা কন না—এমন কি, অন্যায় করিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। এরূপ স্থলে, ঔদার্য্য ও অপক্ষপাতিতা বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। গ্রন্থ পড়িয়া মনে হয়, গ্রন্থকার ইংরাজ হইয়াও ফরাসীদিগের হাট-হদ্দ সমস্তই জানেন। শুধু পারী নগর নহে—ফ্রান্সের মফস্বল বিভাগেও ইনি ভ্রমণ করিয়াছেন ও ফমস্বলবাসী ফরাসীদিগের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেশামিশি করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি পড়িলে, ফরাসী ও ইংরাজ এই উভয় জাতিরই প্রকৃত চরিত্র অনেক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়।

ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেন; "আমার মনে হয়, ভিন্ন দেশ সম্বন্ধে মন্দ কথা বলায় প্রকৃত স্বদেশানুরাগ প্রকাশ পায় না। পরন্তু, স্বদেশের শুভসাধন চেষ্টাতেই প্রকৃত স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশের কাজ নানা প্রকারে করা যাইতে পারে। লেখকের মুখ্য কাজ—সত্য কথা বলা;—স্বদেশীয় লোকেরা প্রতারিত হইতে চাহিলেও উহাদিগকে প্রতারিত না করা। সত্য হইতে বিচ্যুত হইলে, দেশের

---

* French and English—A comparison.
—By Philip Gildert Hamerton.

লোকের মনে ভ্রান্ত সংস্কার উৎপাদন করিয়া স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।”

ভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে বন্ধুত্ব-স্থাপন সম্বন্ধে গ্রন্থকারের এইরূপ মত :—“ভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপন বিষয়ে আমার বড় বিশ্বাস নাই। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে কখনই দৃঢ় বন্ধুতা স্থাপিত হইবে না। যদি কখন ক্ষণিক অনুরাগ পরস্পরের মধ্যে উৎপন্ন হয়, তাহাতে বরং আমার এই ভয় হয়, পাছে পরে আবার একটা অপরিহার্য্য প্রতিক্রিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। আমি এইমাত্র আশা করি ও বাস্তবিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি যে, যাহাতে পরস্পর পরস্পরকে বুঝাইবার চেষ্টা করে ও পরস্পরের বিষয় ন্যায্যভাবে বিচার করে। ইহাই কেবল সম্ভব ও সাধ্য।

কিন্তু সুবিচার ও ন্যায়পরতার আশ্রয় লইলে সাহিত্যে বড় চটক্ লাগানো যায় না, আমি একথা বিলক্ষণ অবগত আছি। আমি জানি, সুবিচার করিবার চেষ্টা না করিলে আমি ইহা অপেক্ষা চটক্‌দার গ্রন্থ লিখিতে পারিতাম। ন্যায্য লেখায় আমোদ হয় না, কিন্তু কুৎসা ও পরনিন্দা করিলে লোকের খুব ভাল লাগে। সাহিত্য পেষাদারেরা একথা বিলক্ষণ জানেন, ঘৃণা ও রাগের ভাণ করিলে লেখায় চটক্ লাগানো যায়—কিন্তু ন্যায়ের অনুসরণ করিতে গেলে সে কাজে ব্যাঘাত জন্মে। একটা ঘোরালো পদবিন্যাস করিয়া এক কলমের ঘায়ে সমস্ত জাতিকে উড়াইয়া দিতে কেমন মজা! নীতি-গর্ব্বিত লেখক যখন তিন কোটি মানবের কুচরিত্র লইয়া আক্ষেপ প্রকাশ করেন, তখন তাঁহাকে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য ধারণ করিতে হয়। তিন কোটি লোক অপেক্ষা আমি ভাল—আমি উন্নত এই গর্ব্বভাব লেখক হইতে পাঠকের মনেও সংক্রামিত হয়। ন্যায়পরতা এই সময়ে আসিয়া বলে—‘কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রমস্থল আছে, সে গুলিকে বাদ দেওয়া ভাল হয় না।’ ইহার প্রত্যুত্তরে চটক্‌দার সাহিত্য বলেন,—‘তাহা হইতে পারে, কিন্তু এই

সকল কথার জন্য থামিতে গেলে, লেখার ফলাও-ভাব কমিয়া যায়—লেখায় তেমন জোর পৌঁছে না। বাজে সত্যের খাতিরে সুলেখাকে জলাঞ্জলি দেওয়া যাইতে পারে না।”

গ্রন্থকার বলেন, প্রতীয়মান বৈসাদৃশ্যের মধ্যে কতটা প্রকৃত সৌসাদৃশ্য আছে তাহাই প্রদর্শন করা এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য। ভিন্ন জাতীয় লোকেরা কেবল যে নামের দ্বারা আপনাদিগকে প্রতারিত করে এরূপ নহে, প্রতারিত হইতেই তাহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা—তাহারা প্রতারিত হইতেই চাহে। তাহার দৃষ্টান্ত, রাজ্যশাসন সম্বন্ধে ‘রাজতন্ত্র’ ও ‘সাধারণ তন্ত্র’ এই দুই পদের ভ্রান্তিজনক ব্যবহার। পার্থক্য দেখাইবার হিসাবে যখন বলা হয়, ইংলণ্ড রাজতন্ত্র-শাসিত দেশ, তখন অবশ্য একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না; কারণ, নামত, কথাটা ঠিক কিন্তু আসলে ঠিক নহে। আসল কথা, মূলে উভয়েরই শাসনতন্ত্র এক ধরণের। উভয়েরই শাসনতন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই ব্যবস্থাপক সভাই সর্ব্ব প্রধান; একটি মন্ত্রী-সভা সেই ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী এবং সেই ব্যবস্থাপক সভার স্থায়িত্ব-অনিশ্চিত অধিক সংখ্যক লোকের মতের উপর নির্ভর করে। উভয় দেশেরই ব্যবস্থাপক সভা প্রজা-সাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়; প্রভেদ এই মাত্র, ফরাসী-দেশে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার সম্পূর্ণরূপে সার্ব্বজনিক—পক্ষান্তরে ইংলণ্ডে ইহা প্রায় সার্ব্ব-জনিক। সকল শাসন-প্রণালীই রাজ্যশাসনের সাময়িক ও ক্ষণিক উপায় মাত্র। কোন জাতির বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ, তাহারই সম্পূর্ণ উপযোগী যে শাসনপ্রণালী, তাহাই সেই জাতির পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যদি কোন দেশ যেমনটি আছে তেমনি থাকে—বাহিরের লোক আসিয়া তাহাতে হস্তার্পণ না করে, তবে প্রকৃতির নিয়মানুসারে, তাহার উপযোগী শাসনপ্রণালী আপনা-আপনি গঠিত হইয়া উঠে। যেমন অবস্থার পরি-বর্ত্তন হয়, সেই সঙ্গে শাসনপ্রণালীরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে;

এ পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। গ্রন্থকার বলেন, "আমার বিশ্বাস, অধুনা, ইংলণ্ড ও ফরাসীদেশে পার্লেমেণ্টীয় শাসনতন্ত্রই একমাত্র প্রণালী যাহা সম্ভাব্য ও সুসাধ্য। এ বিষয়ে আমার কোন মোহান্ধতা নাই কিম্বা অপরিমিত উৎসাহও নাই। এই পার্লেমেণ্টীয় প্রণালী এত অসম্পূর্ণ যে, ইংলণ্ডে ইহা অতি ঢিমা চালে ও অপরিপাটী ভাবে চলিতেছে—ফ্রান্সে তো এক এক সময় একেবারে অচল হইয়া পড়ে। যদি পার্লেমেণ্ট সভায় দুই দল থাকে, ছিদ্রান্বেষণে যাহার বাগ্মিতা বেশি সেই দলই প্রাধান্য লাভ করে; কিন্তু যদি তিন দল থাকে তবে মন্ত্রীসভার অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্ট লোকের তেমন ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে না এবং ফরাসী পার্লেমেণ্ট দেখিলে আদৌ ভক্তির উদ্রেক হয় না। তথাপি আমরা পার্লেমেণ্টের পক্ষপাতী। পার্লেমেণ্ট সভায় লম্বা লম্বা বক্তৃতা হয় এই জন্য নহে—আমরা এই জন্য পক্ষপাতী যে, এই প্রণালীর দ্বারা সভার বাহিরে সার্ব্বজনিক স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়; এই বিষয়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশের মধ্যে প্রভেদ এই, ফ্রান্সে পার্লেমেণ্ট সভার সভ্য হইতে হইলে, সাধারণতন্ত্রী না হইলে চলে না—কেন না সেখানকার আপামর-সাধারণ-নির্ব্বাচন প্রণালীর সহিত রাজতন্ত্র আদবে মিশ খায় না। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডে রাণী ভিক্টোরিয়ার গুণে, তাঁহার প্রজারা পার্লেমেণ্ট-ওয়ালা হইয়াও রাজভক্ত হইতে পারে।"

মানসিক জাতীয়তা রক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার এইরূপ বলেন:—"অন্তরে বিশুদ্ধ জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইলে, ছাঁকা অজ্ঞতার আশ্রয় লইতে হয়। একজন ইংরাজ চাষা, ছাঁকা ইংরাজ হইতে পারে; কিন্তু কোন ইংরাজ ভদ্রসন্তান, যে ল্যাটিন ও গ্রীক শিক্ষা করে সে আংশিকভাবে গ্রীক জাতিতে পরিণত হয়; আরও, যদি সে ভাল করিয়া ফরাসী বলিতে পারে, তবে সে কতকটা ফরাসী জাতিতেও পরিণত হয়। যদি বিশুদ্ধ

ইংরাজী ভাব রক্ষা করিতে চাও, তবে শিক্ষার বিষয় হইতে ইংরাজি ছাড়া আর সব শিক্ষা বাদ দেও। এমন কি, তাহা হইলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সৌখিন শিল্পকেও তাহা হইতে বাদ দিতে হয়। কেন না, উহার অধিকাংশ বৈদেশিকদিগের দ্বারা গঠিত—ঐ সকল বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইলে ক্রমাগত বৈদেশিক গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে হয়। কিন্তু এই সকল বস্তু কোন জাতি বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি হইতে পারে না—উহাতে সমস্ত সভ্য জগতের অধিকার আছে। যেমন, আইভান্‌হোতে, রেবেকা বলিয়াছিল, ইংলণ্ড সমস্ত জগৎ নহে। ইংরাজ বৈজ্ঞানিকেরা ক্রমাগত তাঁহাদের গ্রন্থে বৈদেশিক প্রামাণিক গ্রন্থকারদিগের লেখা হইতে উদ্ধৃত করেন; ইংরাজ চিত্রকর ও সঙ্গীতবেত্তারা আশৈশব য়ুরোপ মহাদেশের প্রতিভার দ্বারা লালিত পালিত। কিন্তু যদিও একজন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে মানসিক জাতীয়তার বিশুদ্ধতা রক্ষা অসম্ভব,—বিদেশী ভাব সকল সাধারণ লোকের সহজাধিগম্য হওয়া প্রযুক্ত কেবল ইংরাজি ভাবের মধ্যে এক্ষণে বাস করা সুকঠিন; তথাপি এ কথা বলা যাইতে পারে, অশিক্ষিত অপেক্ষা শিক্ষিত ইংরাজের মনে বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাব এখনও বেশিমাত্রায় বর্ত্তমান। বিদেশী ভাষা জানা আছে বলিয়া যাহাকে 'অর্দ্ধ-বিদেশী' বলা হয়, আসলে হয় তো সে তাহার সমালোচক অপেক্ষা বেশি ইংরাজ। একজন ধনী লোকের বিদেশী সম্পত্তি থাকিলেও, দেশের সম্পত্তিও তাঁহার দরিদ্র প্রতিবেশী অপেক্ষা বেশি থাকিতে পারে। স্বদেশবাৎসল্য সম্বন্ধেও এ কথা খাটে; এমন অনেক ইংরাজ আছে যাহারা ইটালী দেশকে খুব ভালবাসে—অথচ ইংলণ্ডকেও এতটা ভালবাসে—যে, তাহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয় বুঝি তাহারা ইংলণ্ডের বাহিরে এক পদও অগ্রসর হয় নাই।"

গ্রন্থকার ফরাসী ও ইংরাজের ব্যায়াম-শিক্ষা সম্বন্ধে তুলনা করিয়া বলেন;—ইংলণ্ডে সাধারণের মধ্যে জিমন্যাষ্টিক ব্যায়ামের ততটা আদর

নাই—পক্ষান্তরে, ফ্রান্সে জিমন্যাষ্টিকের চর্চ্চা বিলক্ষণ আছে। ইংরাজেরা রীতিমত ব্যায়াম শিক্ষায় নারাজ—মাঠ ময়দানে ছুটাছুটি করিয়া ক্রিকেট প্রভৃতি খেলা—নৌকায় চড়িয়া দাঁড়াটানা—এই সকল ব্যায়ামে ইংরাজেরা বেশি অনুরক্ত। পক্ষান্তরে, ফ্রান্সে ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার চলন নাই—এমন কি, লন্-টেনিস্ খেলা, গোড়ায় ফারাসীদেশের খেলা হইলেও, বেশি ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া ফরাসী দেশে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। ফরাসীরা পূর্ব্বে নৌকায় দাঁড়টানা হীন কাজ বলিয়া মনে করিত! এখন নৌকার বাচ-খেলা, কতকটা আরম্ভ হইয়াছে। ফরাসীদিগের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ এখনও প্রচলিত থাকায় অনেকেইত তলোয়ার খেলা শিক্ষা করে। এই তলোয়ার খেলায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চটুলতা বর্দ্ধিত হয়। এখন ফ্রান্সে জিম্ন্যাষ্টিক ও সমরোপযোগী অঙ্গ-চালনার শিক্ষা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত। এখনকার সামরিক নিয়মানুসারে, প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ফরাসীকে সৈন্যদলভুক্ত হইতে হয়। ইহাতে একটা এই উপকার হইয়াছে, সকলকেই বাধ্য হইয়া ব্যায়ামশিক্ষা করিতে হয়।

গ্রন্থকার বলেন, ১৮৩০ খৃঃ হইতে ১৮৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত ফরাসীরা শরীরের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া কেবল মস্তিষ্কের চালনা করিত। এমন কি, একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলে এখনও দেখিতে পাইবে, কোন কোন বয়স্ক ফরাসী চট্পট্ নৌকায় উঠিতে পারিতেছে না—গাড়ি হইতে নামিবার সময় খুব সাবধানে নামিতেছে—হয় তো জীবনে সে ঘোড়ায় কখন চড়ে নাই। কিন্তু এখনকার নব্য দলের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখনকার ফরাসী যুবকেরা খুব উদ্যমশীল ও চট্পটে —আজকাল জিম্ন্যাষ্টিক শিক্ষার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। সন্তরণ ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সে অধিক প্রচলিত। ইংরাজদিগের অপেক্ষা ফরাসীরা বেঁটে। কিন্তু ফরাসীদিগের শরীর পেশী-বহুল ও মজবুৎ—কতকটা বর্ম্মা টাটুর মত।

জ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন, ইংলণ্ডে গ্রীক ভাষার ও ফরাসী-দেশে ল্যাটিন ভাষার বেশি আদর। ল্যাটিন না জানিলে ফরাসীরা কাহাকেও শিক্ষিত বলিয়া গণ্য করে না। ইংরাজেরা গ্রীক ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই সাধারণতঃ পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করে। আজকাল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা যে ল্যাটিন গ্রীক্ শিক্ষা করে তাহা অতি ভাসা-ভাসা —সে শিক্ষায় প্রকৃত পাণ্ডিত্য জন্মে না। প্রত্যেক ছাত্রকে নির্ব্বিশেষে ল্যাটিন গ্রীক না শিখাইয়া, যোগ্যতা বুঝিয়া কতকগুলি বাছা-বাছা ছাত্রকে ল্যাটিন গ্রীক শিখাইলে বেশি কাজ হয়। তবে, ল্যাটিন গ্রীক শিক্ষাতে কতকটা মানসিক ব্যায়ামের ফল হয়। মসিও ফ্রারি বলেন, ল্যাটিন গ্রীক যাহারা শিক্ষা করে তাহারা অন্যান্য বিষয়ও সহজে বুঝিতে পারে, কিন্তু যাহারা ল্যাটিন গ্রীক্ জানে না, তাহারা সেরূপ সহজে সে সব বিষয় বুঝিতে পারে না। আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক ইংলণ্ডেও নাই—ফরাসীদেশেও নাই। বরং আজ-কাল আধুনিক ভাষা শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত ফরাসীদেশে হইতেছে।—ভাষা-পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হয় তাহাদের জন্য বিশেষ উপাধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আসল কথা, আধুনিক ভাষা শিক্ষা করিয়া পাণ্ডিত্য কিছুই বাড়িতেছে না, কেবল নভেল পড়ার বৃদ্ধি হইতেছে মাত্র। অতি অল্পলোকেই বিদেশীভাষা শিখিয়া উচ্চদরের গ্রন্থ পাড়বার কষ্ট স্বীকার করে। প্রকৃত সাহিত্যসেবক লোকের সংখ্যা উভয় দেশেই অল্প। বেশির ভাগ লোক কাজকর্ম্ম আমোদপ্রমোদ লইয়াই জীবন যাপন করে। ফরাসী দেশে যদি কেহ মিল্টনের নাম না জানে তাহাকে লোকে মুর্খ বলিয়া মনে করে—কিন্তু স্পেন্‌সরকে না জানায় মুর্খতা হয় না। সেইরূপ, কবি বায়রণের নাম না জানা অজ্ঞতার চিহ্ন কিন্তু শেলি ও কীট্‌সের নাম না জানিলেও চলে। ফরাসীরা

ইংলণ্ডের সমসাময়িক উৎকৃষ্ট গ্রন্থকারদিগের বড় খবর রাখেন না। একবার ইংলণ্ডে ফরাসী অ্যাকাডেমির ন্যায় একটা সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন করিবার কথা হয়—তাহাতে রস্‌কিন্, আর্নল্ড্‌, লেকি প্রভৃতি বড় বড় লেখক সভ্য হইবেন এইরূপ স্থির হয়। ফরাসীরা এই প্রস্তাবের কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না—তাহারা বলিল, যাহাদের নামও তাহারা কখন শোনে নাই, তাহারা কখন ফরাসী অ্যাকাডেমির অমর চল্লিশ জনের সমকক্ষ হইতে পারে?

আধুনিক শিক্ষায়, সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ়—কারণ বিজ্ঞানের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। ফরাসীদেশে যাহারা কেজো জ্ঞানের শিক্ষার্থী তাহারা রীতিমত সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা পায়। কিন্তু সেই সকল বিদ্যালয়ে সাহিত্যকে একেবারে ছাঁটিয়া দেওয়া হয়। এরূপ শিক্ষার ফলে মনোবৃত্তিসকল তীক্ষ্ণ হইতে পারে, জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-বিহীন শিক্ষায় শিক্ষার উৎকৃষ্ট ও মনোরম অংশ বাদ পড়িয়া যায়।

সৌখীন শিল্প সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন, সঙ্গীত ও চিত্রকর্ম্মে ফরাসীরা উৎকৃষ্ট শিক্ষক। ফরাসীদিগের শিক্ষা-প্রণালী উৎকৃষ্ট। এবং শিক্ষকেরাও উদারচেতা নিঃস্বার্থ ব্যক্তি। খ্যাতনামা চিত্রকরেরা প্রায় বিনা বেতনে বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে চিত্রবিদ্যায় শিক্ষা দেন। প্যারী নগর চিত্রবিদ্যার প্রধান আড্ডা। চিত্র-শিল্পে প্যারী নগর এপর্য্যন্ত স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ইংরাজ চিত্রকরেরা স্বভাবের অনুকরণ বেশি করিতে যায় বলিয়া প্রকৃত গুণপনার ব্যাঘাত হয়। ইংরাজদিগের অতিমাত্র নীতিবোধই উহাদের শিল্পকর্ম্মের অন্তরায়। উহাদের নৈতিক ক্ষুধার সময় নাই অসময় নাই। রস্‌কিন সাহেব, বাস্তবিকতা, শ্রমশীলতা, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রভৃতি নৈতিকগুণের উপর কলাবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করায় ইংরাজের নৈতিক বুদ্ধি পরিতৃপ্ত হইয়াছে

বটে, কিন্তু উহাতে বাস্তবিক গুণপনার ব্যাঘাত হইয়াছে। ইংরাজেরা মনে করে, প্রকৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুকরণ করিলেই যথেষ্ট হইল—উহাতে চিত্রশিল্পের কোন নিজস্ব গুণপনা নাই। উহারা মনে করে, যেহেতু শ্রমশীলতা সকল কার্য্যেই একটা গুণের মধ্যে ধর্ত্তব্য, চিত্রশিল্পে শ্রমশীল হইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকৃতিকে অনুকরণ করাই চিত্রশিল্পের পরাকাষ্ঠা। নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন, নীতিশিক্ষার ফলাফল বিচার করা বড় কঠিন। শিক্ষকেরা কি বিষয় শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগের পিতামাতারা জানিতে পারেন, কিন্তু সে শিক্ষায় কতদূর চরিত্র গঠিত হইল জানা দুষ্কর। ছাত্রদিগের বয়োবৃদ্ধি হইলে তবে যদি কিছু জানা যায়। আসল কথা, নীতিশিক্ষা সকলেই দিতে পারে না। শিক্ষকের চরিত্র-প্রভাবের উপর নীতিশিক্ষা নির্ভর করে। সেরূপ প্রভাব দেবদত্ত—অতি বিরল। ফরাসীদিগের অপেক্ষা ইংরাজদিগের নীতিবোধ স্বভাবতঃ প্রখর। কোন ভীষণ অপরাধের কথা শুনিলে ইংরাজেরা শিহরিয়া উঠে—সত্যসত্যই তাহাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ফরাসীদিগের অল্প বয়সেই হৃদয়ের এই নবীনতা ও স্পর্শকাতরতা চলিয়া যায়। তাহারা মনে করে পৃথিবীর স্বাভাবিক গতিই এইরূপ—তাই কোন পাপ কার্য্যের কথা শুনিয়া উহারা চমকিত হয় না। কিন্তু ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে, তাহারা নিজে নীচমনা ও পাপাসক্ত। এইমাত্র বলা যায়, তাহারা দুনিয়াকে একটু বেশিমাত্রায় জানিয়াছে এবং অল্পবয়সেই জীবনের খারাপ দিক্‌টা দেখিতে পাইয়াছে। নীতিশিক্ষা বিষয়ে ইংরাজদিগের আর একটা এই সুবিধা, উহাদের ধর্ম্ম-সমাজের শাসন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রিদিগের শাসনের ন্যায় অত কড়াক্কড় নহে। ইংরাজ পাদ্রিদিগের সহিত ইতর সাধারণের পার্থক্য ততটা প্রবল ও সুস্পষ্ট নহে। পক্ষান্তরে, ফরাসীদেশে রোমান ক্যাথলিক পাদ্রির প্রভাব অতীব প্রবল—উহাদের

অনুশাসন ইতর-সাধারণকে নির্ব্বিচারচিত্তে মানিয়া চলিতে হয়। এক হিসাবে, নীতিশিক্ষা বিষয়ে এ প্রণালীতে কতকটা সুবিধাও আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির যুক্তি ও বিচারের উপর নীতিশিক্ষা নির্ভর করে না। পাদ্রিদিগের উপদেশই যুক্তি ও প্রমাণের চরম স্থান, তাহার উপর আর প্রমাণ নাই—তাহাতে কোনও দ্বিরুক্তি করিবার যো নাই। তবে, ছাত্রেরা অবিশ্বাসী হইলে উহাতে আরও উল্টা উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা। তাহাদিগের বাধ্য হইয়া কপটতা ও ভণ্ডামির আশ্রয় লইতে হয়। ফরাসীদিগের মধ্যে অনেকেই খৃষ্টধর্ম্মে অবিশ্বাসী—অনেকে অজ্ঞেয়বাদী। আসল কথা, শুধু বক্তৃতায় নীতিশিক্ষা হয় না। আর এক কথা, কি ইংলণ্ড কি ফ্রান্স্ উভয় দেশের বালকেরা যখন দেখে, ভিন্ন দেশের সহিত ব্যবহারে রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণ নীতি রক্ষা করিয়া চলেন না, দুর্ব্বল জাতিকে অকারণে আক্রমণ ও উৎপীড়ন করেন তখন বালকদিগের নীতিশিক্ষা কি করিয়া হইবে? চিন্তাশীল ইংরাজ ও ফরাসীরা বলেন, আজকাল একটা সর্ব্ববাদিসম্মত নৈতিক শাসনের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে, প্রবল লোক-মত সেই শাসন-ভার গ্রহণ করিতে পারে। এখন যে সমাজ-শাসন আছে তাহা কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠান লইয়া দণ্ড পুরস্কার বিতরণ করিয়া থাকে। জনসাধারণের এরূপ প্রবল মত হওয়া চাই, যাহাতে তাহার দ্বারা আত্মবিসর্জ্জন, মিতাচার, সরলতা প্রভৃতি প্রকৃত সদ্‌গুণের পোষণ ও উৎসাহ বর্দ্ধন হইতে পারে। তাহার একটা দৃষ্টান্ত যেমন, ফরাসী-দিগের মধ্যে টাকা ধার করা নিতান্ত লোক-মতবিরুদ্ধ। এই মতটি জনসমাজে প্রবল থাকায়, ফরাসীরা বিশেষতঃ মফস্বলবাসী ফরাসীরা আদপে অতিব্যয়ী হয় না—আপন আপন আর্থিক অবস্থা-অনুসারে সকলে সাদাসিধাভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। আর এক দৃষ্টান্ত, মার্কিন জাতির মধ্যে, ধনী হইলেও অলস হইবে না—এই মতটি

জনসাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল; এবং উচ্চশ্রেণীর ইংরাজদিগের মধ্যে এই লোকমতটি প্রবল যে, সর্ব্বপ্রকার অভদ্রতা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। এই প্রকার প্রবল লোকমত অনেক সময় জনসমাজের প্রভূত হিতসাধন করিয়া থাকে।

হৃদয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন, জন্ মিল্ অনেক দিন হইল দেখাইয়া দিয়াছেন, ফরাসীদিগের এক বিষয়ে সুবিধা এই, উহাদের মধ্যে সহৃদয়তার সাধনা হইয়া থাকে। হৃদয়ের ভাব ভাষায় সর্ব্বদা প্রকাশ করিবার অভ্যাস রাখিলে, ভাবগুলি যে সজাগ থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য, কখন কখন এই ভাবপ্রকাশ মৌখিক হইয়া পড়ে; কিন্তু সাধারণতঃ উহার দ্বারা প্রকৃত হৃদয়ভাব পরিব্যক্ত হয়। এই প্রকারে, ভাবের যেন একটা প্রাণ-বায়ু ফরাসীদিগের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে এবং তাহার দ্বারা হৃদয়ের কোমল ভাবগুলি সজীব থাকে। ইংরাজেরা স্বভাবতঃ অত্যন্ত চাপা—উহাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ অত্যন্ত প্রবল—উহারা কঠোরতাকে গৌরবের বিষয় মনে করে এবং কোন প্রকার কোমল ভাব প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করে। এই কারণে উহাদের মধ্যে সহৃদয়তার অনুশীলন হয় না। ফরাসীদিগের মাতৃ-অনুরাগ ইংরাজদিগের নিকট হাস্যজনক বলিয়া মনে হয়—পক্ষান্তরে ফরাসীরা এই মাতৃ-অনুরাগকে হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে।

বাস্তবিকই কি ইংরাজদিগের কোন সহৃদয়তা নাই? না,—সহৃদয়তাকে উহারা দমাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। হৃদয়ের ভাব বাহিরে প্রকাশ করা উহাদের লোকাচারবিরুদ্ধ—সুতরাং সহৃদয়তার অনুশীলন পক্ষে উহাদের লোকাচার অনুকূল নহে। তাই বলিয়া, উহাদের সহৃদয়তা একেবারে নাই একথাও বলা যায় না। কঠিন পাষাণ-চীরের মধ্য দিয়াও ঘাসের শীষ সময়ে সময়ে গজাইয়া উঠে। তবে, এ কথা ঠিক্, ইংরাজসমাজ সহৃদ-

য়তা-বিকাশের অনুকূল স্থান নহে। কর্ত্তব্য-আচরণে যতটুকু সহৃদয়তার প্রয়োজন, ততটুকু সহৃদয়তা ইংরাজের আছে—তাহার বেশি নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোন ইংরাজ হৃদয়বান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সে ইংরাজ-সমাজে প্রতিপদে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়। হয় তো মমতা প্রকাশ করিতে গিয়া সে দেখিতে পায়, যাহার প্রতি সে মমতা প্রকাশ করিতেছে সে কুণ্ঠিত হইয়া সেই মমতা গ্রহণ করিতেছে, কিম্বা সে যাহার নিকট মমতার প্রত্যাশী সেখানে নিরাশ হইতেছে। এরূপ স্থলে, লাভের মধ্যে কষ্টই সার। ইংরাজদিগের পারিবারিক স্নেহ-মমতা অত্যন্ত ক্লম। অনেক স্থলে দেখা যায়, পিতামাতার সহিত সন্তানদিগের ভাবের গাঢ়তা নাই—যেন তাহাদের মধ্যে দূর-সম্পর্ক। এই জন্য, পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ হইলেও কোনও পক্ষেরই বিশেষ কষ্ট হয় না। ভ্রাতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেখ—দেখিবে, তাহারা যেন পর—তাহারা পরস্পর হইতে দূরে অবস্থান করিতেছে—তাহাদের মধ্যে পত্রব্যবহারও নাই। একটু দূরে থাকিলে কিম্বা কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিলে, আত্মীয়স্বজনের অন্ত্যেষ্টি সৎকারে যোগ দিবার পক্ষে তাহাই বিপুল বাধা বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, আর্থিক অবস্থায় ইতরবিশেষ হওয়া প্রযুক্ত নিতান্ত আত্মীয়দিগের মধ্যেও পর-ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। কোন কোন ইংরাজ এরূপ কথাও বলেন যে, আত্মীয় অপেক্ষা বন্ধু থাকা ভাল—কেন না, বন্ধু-নির্ব্বাচন সকলের আয়ত্তাধীন কিন্তু আত্মীয় নির্ব্বাচনে কাহারও এক্তিয়ার নাই, আত্মীয় থাকা 'বিষম জ্বালা'—'বিড়ম্বনা'। ফরাসী দেশে, আত্মীয়স্বজনেরা যদি কোন কারণবশতঃ পর্ব্বোৎসবাদিতে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারে, অন্ততঃ তাহারা পরস্পরকে পত্র লেখে। নববর্ষে বন্ধুরা অন্ততঃ দুই এক ছত্র পরস্পরকে পত্র লিখিয়া থাকে এবং আলাপীরা পরস্পরের মধ্যে 'কার্ড' বিনিময় করে। একজন বুদ্ধিমান ফরাসী, গ্রন্থকারের নিকট একবার এইরূপ বলিয়াছিল :—কখন

কখন আমাদের পারিবারিক প্রেমে কপটতা প্রকাশ পায়, কখন কখন আমরা যাহা মুখে ব্যক্ত করি তাহা হৃদয়ে অনুভব করি না, কিন্তু মোটের উপর, আমাদের যেরূপ লোকাচার তাহাতে শুদ্ধ যে স্নেহমমতার বাহ্যিক আকার রক্ষা হয় তাহা নহে, পরন্তু উহার দ্বারা প্রকৃত ভালবাসাও সজীব থাকে"। ইংরাজেরা সহৃদয়তাকে দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করে—কিন্তু এ কথা লোহিতাঙ্গ অসভ্য ইণ্ডীয় জাতিরই উপযুক্ত। এ বিষয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বীয় প্রজাদের সমক্ষে নিজ গার্হস্থ্য জীবনের কথা অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়া—নিজ হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সহৃদয়তার এক বিভাগে ইংরাজ ফরাসী-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—নিকৃষ্ট জীবের প্রতি ইংরাজের মমতা ফরাসী অপেক্ষা সমধিক। আর এক বিষয়ে ফরাসীদিগের হীনতা দেখা যায়—উহাদের ভক্তির অভাব। সাধারণ-তন্ত্রীরা কাহাকেই ভক্তি করে না। এমন কি, তাহাদের ভূতপূর্ব্ব অধিনেতা বেচারা গ্রেভিও তাহাদের ভক্তির পাত্র ছিল না। ভিক্টর্ হ্যুগোকে ফরাসীরা ভক্তি করিত বটে, কিন্তু তাহার স্থান এখনও পর্য্যন্ত কেহ অধিকার করিতে পারে নাই। রাজভক্তি তো ফরাসীদিগের মূলেই নাই। রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকেও উহারা যথোচিত সম্মান করে না। উচ্চ উপাধিও উহাদের ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে না। উহাদের পারিবারিক জীবনে ভালবাসা আছে কিন্তু ভক্তি নাই। পুরাতন সাহিত্যের প্রতি পূর্ব্বে উহাদের অচলা ভক্তি ছিল—এখন তাহাও চলিয়া যাইতেছে।

ফরাসী উপন্যাস সম্বন্ধে গ্রন্থকার এইরূপ বলেন;—"ইংরাজেরা সচরাচর এইরূপ বলিয়া থাকেন, ফরাসীরা যে দুর্নীতিপরায়ণ তাহার প্রমাণ তাহাদের নভেল হইতেই পাওয়া যায়—কিন্তু এ কথা আমি মানি না। কেন মানি না, তাহার সঙ্গত কারণ আমি দেখাইতেছি। ইংরাজ জাতির দুর্নীতির কথা শুনিলেও আমি যথেষ্ট প্রমাণ না পাইলে তাহা

গ্রাহ্য করি না। "পেলমেল গেজেটের রহস্য প্রকাশ" সম্বন্ধে ইংরাজের চিরশত্রু ফরাসীরা বিশ্বাস করিয়াছিল কিন্তু আমি উহার প্রযুক্ত প্রমাণ যথেষ্ট বলিয়া মনে করি না। ফরাসীদিগের দুশ্চরিত্র সম্বন্ধে ইংরাজদিগের যুক্তির দুইটি প্রকরণ এইরূপ দেখা যায়—যথা (১) উপন্যাস-লেখকেরা সমাজের জীবন্ত ছবি আঁকিয়া থাকে—ফরাসীদিগের নভেলে স্ত্রী-পুরুষের ব্যভিচার সংক্রান্ত ঘটনা প্রায়ই থাকে—সুতরাং ফরাসীরা ব্যভিচারপরায়ণ। (২) ফরাসীরা এই সকল ব্যভিচার-ঘটনামূলক নভেল বিস্তর ক্রয় করিয়া থাকে, সুতরাং এই সকল নভেলের পাঠকেরাও ব্যভিচারপরায়ণ। প্রথম প্রকরণটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, সচরাচর একঘেয়ে বাস্তব জীবনে যত না অপরাধের ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তদপেক্ষা কাল্পনিক সাহিত্যে সেই সকল ঘটনার কথা অনেক বেশি থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত, সচরাচর ইংরাজদিগের বাস্তব জীবনে যাহা দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা সেক্‌সপিয়ারের নাটকে হত্যাকাণ্ডের কথা বেশি পাওয়া যায়। এমন কি, যে সকল উপন্যাস নিতান্ত নির্দোষ ও বালকের পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, যথা, 'আরব্য-উপন্যাস', 'রবিন্‌সন্ ক্রুসো' এবং আধুনিক ষ্টিভেনসন্ প্রণীত "ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার দ্বীপ'—এই সকল গ্রন্থও শঠতা ও নরহত্যার ব্যাপারে পূর্ণ—কেবল পাঠকের ঔৎসুক্য উত্তেজন করিবার উদ্দেশে এই সকল ঘটনা উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ... ... বাস্তব জগৎ উপন্যাসিক জগতের মত হইবেই হইবে এই যে যুক্তি—অন্যদিক্ দিয়া দেখিলেও—ইহার হীনতা উপলব্ধি হইবে। নভেল-লেখকের সৃষ্ট চরিত্র অপেক্ষা বাস্তব জগতের লোকসংখ্যা অনেক বেশি একথা কে না স্বীকার করিবে? অতএব যদি বাস্তব জগৎ হইতেই উপন্যাসের চরিত্র সকল গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এইমাত্র প্রমাণ হয়, চিকিৎসা-শিক্ষার্থীরা যেমন মোটের উপর কোন স্বাস্থ্যজনক পল্লী হইতে রোগীর দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে, সেইরূপ এই সকল উপন্যাস-

লেখকেরা সাধারণতঃ নিরপরাধী সমাজ হইতেই অপরাধকাণ্ড সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু আসল কথা, উপন্যাস-লেখকেরা বাস্তব জীবন হইতে ঘটনা সকল সচরাচর সংগ্রহ করে না—প্রায়ই উহারা প্রকৃতির আদর্শে চরিত্রগুলি রচনা করিয়া থাকে এবং ঘটনা ও অবস্থানগুলি প্রায়ই স্বকপোলকল্পিত।"

গ্রন্থকার আরও অনেক বিষয়ে ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন, সে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলে প্রবন্ধের আয়তন অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে সুতরাং এইখানেই শেষ করা গেল।

——০——
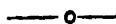
মুখ-চেনা।

রাস্তায় বাহির হইলে কত রকম ধরণের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়; কোন মুখ দেখিলে কাছে যাইতে ইচ্ছা করে—কোন মুখ দেখিলে পলাইতে ইচ্ছা হয়। কোন মুখ দেখিলে মনে হয় সে হাজার অপরাধী হউক, সে যেন আমার কত দিনের জানা-শুনা, আবার কোন মুখ দেখিলে মনে হয় যেন আমাদের মারিতে আসিতেছে, না খাইতে আসিতেছে।

কত রকম নাক দেখিতে পাওয়া যায়! কোনটা খাঁদা, কোনটা তোলা—কোনটা সোজা—কোনটা বাঁকা। কোন নাক দেখিলে মনে হয়, লোকটা বেশ সৌখীন—কোন নাক দেখিলে মনে হয়, লোকটা বড় জাঁহাবাজ।

যাহারা ভাল করিয়া কিছুই দেখেনা তাহারা মনে করে সব মানুষের ঠোঁট প্রায় এক রকম। কিন্তু ঠোঁটের কত রকম গড়ন দেখা যায়। কোন ঠোঁট্ দেখ্‌লে মনে হয় স্নেহের চুম্বনে গড়া। কোন ঠোঁট্ দেখলে মনে হয়, লোকটা বড় খট্‌খটে, তার স্নেহ মমতা কিছুই নাই।

একজন লোককে দেখ্‌বামাত্রই তার সম্বন্ধে একটা-না-একটা ভাব আমাদের মনে উদয় হয়। লোক-চেনার অভ্যাস ভাল রকম না থাকিলে অনেক সময় আমরা ভুল করিতে পারি। ভাল লোককেও মন্দ মনে করিতে পারি, মন্দ লোককেও ভাল মনে করিতে পারি। লোক চেনাও বড় সহজ নয়। কতকগুলি অক্ষর ও তাহার যোগাযোগে যত বাক্য হয় তাহা শিখিলে যেমন আমরা একটি ভাষা শিখিতে পারি, সেইরূপ মুখ-চিহ্ন দেখিয়াও আমরা মানুষের চরিত্র বুঝিতে পারি। কিন্তু মনুষ্য-চরিত্র এত বিভিন্ন যে তাহার অনুরূপ মুখের গঠন-[illegible]ও অসংখ্য। তাহা আয়ত্ত করা সহজ নহে। সেই জন্য পাণ্ডি[illegible]

এখনও ইহাকে বিজ্ঞানে পরিণত করিতে পারেন নাই। এই বিষয় অনুশীলন করিয়া তাঁহারা যে সকল চিহ্ন ও নিয়ম বাহির করিয়াছেন তাহা সকলেই অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এইরূপ পরীক্ষায় আমোদও আছে, উপকারও আছে।

কারবারের অধিকাংশ কাজ বিশ্বাসে বিশ্বাসে চলে। যাহাদের লোক চিনিবার অভ্যাস নাই তাহারা, যে কাজের যে উপযুক্ত তাহা বুঝিয়া লোক রাখিতে পারে না, হয়তো অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং এইরূপ করিয়া কত লোকে ক্ষতিগ্রস্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হয়। এইরূপ মুখ-পরীক্ষার আর একটি সুফল আছে। আমরা বাঙ্গালী আমরা চতুর্দ্দিকে যাহা দেখি, কিছুই ভাল করিয়া দেখি না। সব জিনিসই যেন আমরা চোক বুজিয়া দেখি। সম্প্রতি কলিকাতায় যে মহামেলা হয় তাহা দেখিবার জন্য অসংখ্য লোক-ত গিয়াছিল, কিন্তু কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর দেখি, অমুক জিনিসটা কিরূপ দেখিলে—অমনি চক্ষুস্থির। কেহ হয়তো বলিবে "বেশ দেখিলাম, চমৎকার দেখিলাম, এমন ভাল যে না দেখিলে বুঝান যায় না"—কেহ বলিবে—"তাতে এমন একটা ইয়ে আছে যে ইয়ে হয়েছে সেটা কিছুতেই ইয়ে করা যায় না।"—একজন ইংরাজকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি প্রত্যেক জিনিসের তন্নতন্ন বর্ণনা করিবেন—একটি খড়িকা পর্য্যন্ত তিনি ছাড়িবেন না। তাই বলিতেছি যদি এই মুখ পরীক্ষায় আর কোন ফল না হয়, অন্ততঃ খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার অভ্যাসটি হয়। এইবার তবে আসল বিষয়ে আসা যাক।

কপাল যে বুদ্ধির প্রধান স্থান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বুদ্ধি দুই রকম। একটি হচ্চে—খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার ক্ষমতা; আর একটি—আলোচনা ও চিন্তা করিবার ক্ষমতা।

কপালের উপর ভাগে চিন্তা শক্তি অবস্থিত।

চিন্তা শক্তি—অর্থাৎ তুলনা করিবার শক্তি, বস্তু সকল পৃথক্ করিয়া

দেখিবার শক্তি, শ্রেণী বিভাগ করিবার শক্তি, এবং কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান করিবার শক্তি। যাহাদিগের কপালের উপর দিকটা উঁচু—তাহাদিগের এই চিন্তাশক্তি প্রবল।

কপালের নীচের ভাগে, খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার শক্তি অর্থাৎ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি অবস্থিত। এই শক্তি যাহাদিগের প্রবল তাহাদিগের সমস্ত পৃথবী দেখিবার ইচ্ছা হয়, বিজ্ঞান শিখিতে ইচ্ছা হয়, ভাষা শিখিতে ইচ্ছা হয়, এবং সকল তথ্য তন্ন তন্ন করিয়া জানিবার ইচ্ছা হয়। এই শক্তি ডারুইন্, ও জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিলের অত্যন্ত প্রবল ছিল।

কপালের মধ্যভাগ ভরা থাকিলে, ঘটনার স্মরণ শক্তি প্রকাশ পায়।

যদি কপালের উপরের ভাগ নীচের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় হয় তাহা হইলে এই বুঝায় যে সেই লোকের যতটা বেশি চিন্তাশক্তি ততটা পর্য্য-বেক্ষণ-শক্তি নাই। বিজ্ঞান অপেক্ষা দর্শনে তাহার বেশি ঝোঁক্—ধরা-ছুঁয়া যায় এরূপ লৌকিক বিষয় অপেক্ষা সৃষ্টিছাড়া আসমানি চিন্তায় তাঁহার অধিক আমোদ। অধ্যাপক Owen কতকটা ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

উপরি ভাগের কপালের পাশের দিক যাঁহার বেশি বড় হয় তাঁহার কারণ অনুসন্ধানের শক্তির সঙ্গে সঙ্গে রসিকতা ও হাসি তামাসার ভাব প্রবল। এই ভাবটি থাকিলে, যাহা কিছু হাস্যজনক বা অদ্ভুত সহজেই তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়। এবং বর্ত্তমান সমাজের কুপ্রথা লইয়া বিদ্রূপ করিতে ইচ্ছা যায়। Sterne, Hogarth, Hood—বঙ্কিম বাবু ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

আরও উঁচু দিকে ও পশ্চাদ্দিকে যদি কপাল প্রশস্ত হয় তাহা হইলে কল্পনা শক্তি কবিতা শক্তি বা শিল্পশক্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেক্স-পিয়ার, গেস্তে, র‍্যাফেল, ডোরে প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

কপালের মধ্যস্থলে কসি-টানা বলি-রেখা থাকিলে বুঝায় যে যাহার উহা আছে, সে ব্যক্তি লোকের উপকার সাধনে রত। দুই ভুরুর মধ্য-

ভাগে যাহার দাঁড়ি-টানা বলি-রেখা আছে, সে লোক খাঁটি ও সত্য-পরায়ণ।

যাহার নীচের দিকের কপাল অত্যন্ত ছোট এবং মনে হয় যেন ভিতরে বসা, সচরাচর চলিত ঘটনা ও তথ্য সম্বন্ধে তাহার অত্যন্ত ভাসা-ভাসা জ্ঞান এবং আপনার দোষের প্রতি সে ব্যক্তি অন্ধ। এই সকল ব্যক্তি প্রায়ই হতভাগ্য দুরদৃষ্ট ও অকৃতকার্য্য হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে তাহারা চক্ষু মেলিয়া চারিদিকের পদার্থ দেখে না—এবং চারিদিক-কার পদার্থ তাহাদিগের মনের উপর ভাল করিয়া বসে না। এইজন্য তাহারা ক্রমাগত ভুল করে এবং প্রায়ই আপনার দুর্দ্দশার জন্য অন্যকে দোষী করে। এই সকল লোকের ব্যবসা বাণিজ্যে হাত দেওয়া উচিত নহে। পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিকে বলবতী করিয়া তবে কাজকর্ম্মে প্রবেশ করা উচিত। নতুবা পরিণামে অকৃতকার্য্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

প্রশস্ত উচ্চ এবং ভরা কপাল হইলে, বিশেষতঃ তাহার সহিত যদি দৃঢ় ওষ্ঠ থাকে এবং পরিষ্কার তীক্ষ্ণ চক্ষু থাকে তাহা হইলে উন্নতিশীল, সর্ব্বগ্রাসী দার্শনিক, সমাজ-সংস্কার-রত এবং বৃহৎ ব্যাপারে নিযুক্ত মন সূচিত হয়। যেমন Bentham, Mill Cobden, বিদ্যাসাগর।

সংস্কারকগণ মাত্রেরই কপাল উচ্চ প্রশস্ত এবং ভরা-ভরা।

ছোট বেলায় কব্‌ডেনের কপাল বড় প্রশস্ত ছিল না কিন্তু লোকের জন্য খাটিতে খাটিতে এবং বুদ্ধি চালনা করিয়া তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে তাঁহার কপাল বিলক্ষণ প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহাদিগের কপাল অত্যন্ত নীচু তাহাদিগের স্নেহ মমতা, চরিত্রের উদারতা কম। যাহাদিগের কপাল উচ্চ এবং খোলারকম মুখের ভাব তাহারা পরোপকারে রত এবং অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকারে পরাঙ্মুখ হয় না। যেমন বিদ্যাসাগর।

এক্ষণে, আমাদের দেশের খ্যাতনামা দুই ব্যক্তির চিত্র দেওয়া যাই-

তেছে। রাজনারায়ণ বাবু ও বঙ্কিম বাবু। যাঁহার দাড়ি গোঁফ আছে তিনি রাজনারায়ণ বাবু, যাঁহার দাড়ি গোঁফ কামান দেখিতেছ তিনি বঙ্কিম বাবু। ইঁহাদের কপাল লক্ষ্য করিয়া দেখ। উভয়েরই কপাল উৎকৃষ্ট। রাজনারায়ণ বাবুর উপরিভাগের কপাল নিম্নভাগের কপাল অপেক্ষা বেশি ভরাট। এই জন্য বিজ্ঞান অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞানের দিকে রাজনারায়ণ বাবুর বেশি ঝোঁক। ইহার ফল,—তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থ "ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা।" রাজনায়ণ বাবুর মধ্য-কপালও ভরাভরা—ইহাতে ইঁহার ঘটনার স্মরণ শক্তি সূচিত হইতেছে। এই জন্য ইতিহাসে তাঁহার বিলক্ষণ দখল আছে এবং ছোট ছোট রাশি রাশি ঘটনার গল্প তিনি অজস্র করিতে পারেন এবং তাঁহার লেখাতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—তাঁহার লেখা "সেকাল-একাল" তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহার উপর-দিক্‌কার কপাল ভর-পুর থাকায় তাঁহার নানাপ্রকার মৎলব (Plan) মাথায় আইসে—এবং নীচের দিককার কপাল ততটা ভরাট না থাকায় এক একাসময় সে সব মৎলব অনেকটা আসমান-বিলাসী ও সৃষ্টিছাড়া হইয়া পড়ে।

বঙ্কিম বাবুর উপরি ভাগের কপাল উচ্চ ও প্রশস্ত। ইহাতে বিশ্লেষণ শক্তি, সমালোচন শক্তি ও হাস্যরস প্রকাশ পায়। আবার ইঁহার নীচের দিককার কপাল বেশ উঁচু—ইহাতে ছোট খাট জিনিস খুব ইঁহার নজরে পড়ে। তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞানের দিকে ইঁহার বেশি ঝোঁক প্রকাশ পায়। তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় লিখিতে গেলেও ইঁনি বিজ্ঞানের প্রণালী অবলম্বন করিয়া লিখিতে ইচ্ছা করিবেন। বিশ্লেষণ-শক্তি, পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি অধিক পরিমাণে থাকায় তাঁহার উপন্যাসে মানব চরিত্রের ও বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনায় এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর অসাধারণ নাক। এই নাকে, সুরুচি, অভিনিবেশ, মানব-চরিত্র-জ্ঞান ও অসাধারণ উদ্যম প্রকাশ পায়। তাঁহার এজ্‌লাসি কাজসত্ত্বেও,

উপর্য্যুপরি এত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে তিনি লিখিতে পারিয়াছেন সে কেবল তাঁর নাকের জোরে। রাজনারায়ণ বাবুও তাঁহার রোগের ভাণ্ডার শরীরটিকে লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যে এত খাটিয়াছেন তাহাও তাঁহার নাকের জোরে। ইঁহার নাকেও মনের বল প্রকাশ পায়। বঙ্কিম বাবুর ঠোঁট খুব সরু—ইহাতে কার্য্যকরী বুদ্ধি—সূক্ষ্ম রুচি ও অসাধারণ দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। বঙ্কিম বাবুর চোখে বহির্দৃষ্টি ও তীক্ষ্নতা প্রকাশ পায় এবং রাজনারায়ণ বাবুর চোখে অন্তর্দৃষ্টি ও স্বপ্নভাব প্রকাশ পায়। বঙ্কিম বাবুর চেহারায় নেপোলিয়নের মুখের কিছু আভাস আছে। নেতার লক্ষণ ইঁহার মুখে জাজ্বল্যমান। ইঁহার খড়্গ-নাসা, চাপা ঠোঁট, তীক্ষ্ন চোখ লইয়া ইনি যদি কাহারও উপরে গিয়া পড়েন তবে সে হত-ভাগ্য বজ্রাঘাতের মর্ম্ম বুঝিতে পারে। বঙ্কিম বাবুর নাকের নিম্নদেশ যেরূপ ঝুঁকিয়া আসিয়াছে, এবং তাঁহার চিবুকের নীচে যেরূপ ফুলা দেখা যাইতেছে ইহাতে তাঁহার অর্থোপার্জ্জনস্পৃহা ও মিতব্যয়িতা প্রকাশ পাইতেছে। বঙ্কিম বাবুর চরিত্রের সহিত আমাদের এ কথা মেলে কি না আমরা ঠিক বলিতে পারি না। চোখ নাক ঠোঁট প্রভৃতি মুখাবয়বের কি কি লক্ষণে কি কি ভাব প্রকাশ পায় তাহা পরে লেখা যাইবে।

কপাল সম্বন্ধে একটি সাধারণ নিয়ম বলিয়া কপালের কথাটা শেষ করা যাক্। যার কপাল যত গড়ানে, তার চিন্তাশক্তি—বিবেচনা-শক্তি সেই পরিমাণে কম। তারা ঝোঁকের মাথায় কাজ করে।

১। চিত্রের সারি সারি মুখগুলি দেখিলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারিবে।

চোখ্।

এখন চোখ্ ও ভুরুর কথা বলা যাক্। সমস্ত মুখাবয়বের মধ্যে চোখে যেমন ভাব প্রকাশ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। একজন কবি বলিয়াছেন, চোখ্ হচ্চে "আত্মার গবাক্ষ।" এ কথা খুব ঠিক্।

ছবি আঁকিবার সময় দেখা যায়—একটু আধটু চোখের রেখার ইতর বিশেষে মুখের ভাব কতটা বদ্‌লিয়া যায়। আমাদের দেশের কবিরা আমাদের সুন্দরীদিগের নেত্র হরিণ নেত্রের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। কারণ হরিণের ড্যাবা ড্যাবা চোখে চকিত ভয়ের ভাব সুন্দর প্রকাশ পায়। লজ্জা ভয় আমাদের স্ত্রী-সৌন্দর্য্যের প্রধান উপকরণ বলিয়া এই উপমাটি ঠিক খাটিয়াছে। চোখ্ দেখিবার সময়, প্রথমে দেখা উচিত, চোখ ছোট কি বড়। শরীরতত্ত্বের এই একটি সাধারণ নিয়ম, যার যত বড় চোখ্, তার সেই পরিমাণে দৃষ্টিশক্তি অধিক। এই জন্য হরিণ, কাঠাবড়ালী, খর্গস, বিড়াল ইহাদের চোখ্ বড়; আর, শূয়োর, গাণ্ডার প্রভৃতির চোখ্ ছোট এবং তাহাদের দৃষ্টিশক্তি কম। হরিণ ও শূকরের ছবি দেখ। হরিণের চোখ কত বড়, আর শূয়োরের চোখ কত ছোট। যেমন শরীরতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে চোখের আয়তনের উপর দৃষ্টিশক্তির তারতম্য নির্ভর করে, তেমনি মুখ-চেনা বিদ্যার মতে চোখে বুদ্ধিবৃত্তির উজ্জ্বলতা, তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি প্রকাশ পায়—বিশেষতঃ সামাজিক ভাবের—ধর্ম্মভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়।

যাহাদিগের বড় চোখ তাহাদিগকে দেখিলেই মনে হয় যেন তাহারা খুব "জাগ্রত জীবন্ত" এবং কার্য্যের জন্য সদাই উন্মুখ। আর যাদের ছোট চোখ তাদের দেখিলে মনে হয় যেন তাদের শরীর মনে কেমন একটা জড়তা অলসতা ও ঘুমন্ত ভাব আছে। ডাক্তার রেড্‌ফীল্ড বলেন যে, যাহাদের চোখ্ বড় তাদের চঞ্চল হৃদয়ে ভাব-লহরী খেলিতে থাকে, তাদের চিন্তাক্রিয়া খুব দ্রুত, আর তারা খুব ভড়বড় করিয়া কথা কহে। আর যাদের ছোট চোখ্ তাদের ভাব ইহার বিপরীত। যাদের বড় চোখ্ তারা একটু সাদাসিদে খোলা রকমের লোক—তাদের মনের ভাব কথায় স্বতই প্রকাশ হয়; আর, যাদের

চোখ ছোট তারা ভাবিতে দেরি করে ও সাত পাঁচ ভাবিয়া একটি কথা কহে—ও তাহারা স্বভাবতঃ একটু কুটীল।

চোখে ভাষাশক্তি প্রকাশ পায়। যাদের চোখ্ বাহির দিকে ও নীচের দিকে বের-করা ফুলো-ফুলো ও বড় তাদের ভাষাশক্তি বিলক্ষণ আছে, কথার উপর তাদের খুব দখল, তারা উপস্থিত বক্তা ও দ্রুত লেখক। বের-করা চোখে বহির্বস্তুর ছবি সহজে পড়ে। যাদের এই প্রকার চোখ তারা একদৃষ্টিতে সাধারণভাবে সমস্ত পদার্থ দেখিয়া লইতে পারে—কিন্তু তাহারা প্রত্যেক বস্তু তেমন খুঁটিনাটি করিয়া দেখিতে পারে না, যাদের চোখ ভিতরে ঢোকা তারা যাহা দেখে তাহা খুব ঠিক করিয়া দেখে—খুব তন্ন তন্ন করিয়া দেখে। কিন্তু তারা তেমন চট্ করিয়া ভাবগ্রহ করিতে পারে না। ফুলো চোখ্ ও কোটরে চোখের এই প্রভেদ। ১ ও ২ সংখ্যক চিত্র দেখ, সুবক্তা মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের ছবিটি দেখ—ইঁহার চোখের নীচের পাতা কেমন ফুলো—ইহাতেই ইঁহার ভাষা-শক্তি প্রকাশ পাইতেছে।

সুন্দর চোখ্‌গুলি প্রায় লম্বাদিকে খোলা—চওড়াদিকে ততটা খোলা নয়। চোখের উপরের পাতা ও নীচের পাতা চওড়া ভাবে বিস্তৃত হলে—চোখ্‌টাকে কেমন গোল দেখায়। যেমন বিড়ালের চোখ্ কিম্বা পেঁচার চোখ্। তাহারা অল্প আলোয় অনেক দেখিতে পায় ও সহজে বহির্বস্তুর ভাবগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের এই ভাব সকল তেমন স্পষ্ট ও ঠিক হয় না—আর, যাদের চোখের পাতা চোখের উপর পড়িয়া চোখ্‌কে একটু ঢাকিয়া রাখে, তারা যদিও বহির্বস্তুর ততটা শীঘ্র ভাবগ্রহ করিতে পারে না কিন্তু তাহারা যে ভাবগ্রহ করে তাহা বেশী ঠিক ও স্পষ্ট হয়। গোল-চোখো লোকেরা অনেক দেখে কিন্তু কম ভাবে। আর যাদের চোখ্ দীর্ঘায়ত তারা বেশি ভাবে ও বেশি তীব্ররূপে অনুভব করে। ৩ ও ৪ সংখ্যক চিত্র দেখ, যাদের বড় বড় গোল চোখ্ তারা

আমুদে, বুদ্ধিমান—উজ্জ্বল ভাবাপন্ন—খোলা—ও তাদের মন উচু দরের। কিন্তু দীর্ঘায়ত কিম্বা প্রশস্তচক্ষু লোকদিগের ন্যায় তাহাদের তেমন গভীরতা, বা উদ্ভাবনা শক্তি নাই। .

যাদের চোখ্ পিট্‌পিটে, মিট্‌মিটে তারা ভারি ধূর্ত্ত।

যাদের চোখ্ পটল-চেরা ও টানা তারা খুব মমতাময় ও সৌখীন। যাদের চোখের উপরের পাতা বড় ও চোখ্ও একটু দীর্ঘায়ত তাদের চোখে কেমন এক প্রকার ঢুলুঢুলু স্নিগ্ধ ভাব প্রকাশ পায়।

যাদের চোখের তারা সমস্তটাই দেখা যায়—তারার উপরে ও নীচে সাদা বেরিয়ে থাকে, তাহারা অত্যন্ত চঞ্চল, অস্থির, রাগী ও অবিবেচক। ৫ সংখ্যক চিত্র দেখ। লাবেটার বলেন,

“রস-কস্-হীন একটা সামান্য মুখে যদি খোলা প্রশস্ত, ও বাহিরে-বেরকরা চোখ থাকে তবে তাহাতে এই সূচিত হয় যে সেই লোকের দৃঢ়তা অপেক্ষা একগুঁয়েমি বেশি; সে অত্যন্ত ভোঁতা ও নির্বুদ্ধি—কিন্তু বিজ্ঞতার ভাণ করে; আসলে হৃদয়-হীন কিন্তু আপনাকে হৃদয়বান বলিয়া লোকের কাছে জানাইতে ইচ্ছা করে। এক এক সময়ে হঠাৎ তাহার ভাবের তীব্রতা হয়—কিন্তু উহা হৃদয়ের স্থায়ী স্বাভাবিক ভাব নহে।”

চোখের স্থায়ী সাধারণ ভাব-প্রকাশক চিহ্ন-সম্বন্ধে মোটামুটি দুই চারিটা কথা বলা গেল। তার পর হাসি কান্না, রাগ দ্বেষ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, চোখের ভাবের কি প্রকার পরিবর্ত্তন হয়, তাহা এ প্রস্তাবে উল্লেখ করিলে বাহুল্য হইয়া পড়িবে। তাই আপাততঃ ক্ষান্ত হওয়া গেল।

ভুরু।

ভুরুর যোগে চোখে নানা প্রকার ভাব প্রকাশ হয়—এই জন্য ভুরুর বিষয় এখানে একটু বলা আবশ্যক।

নানা রকমের ভুরু সচরাচর দেখা যায়। কারও ভুরু ঘন, কারও সরু, কারও সূক্ষ্ম কারও স্থূল, কারও মসৃণ কারও কর্কশ, কারও সোজা কারও ধনুকের মত বাঁকা, কারও বা ভুরু টেড়া ভাবে কতকদূর উঠিয়া আবার ঢালু হইয়া নামিয়াছে।

সাধারণতঃ বাঁকা ভুরুতে মেয়েলি ভাব ও সোজা ভুরুতে পুরুষ-চরিত্রের লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাঁকা ভুরু, সোজা ভুরু অপেক্ষা দেখিতে সুন্দর। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই বেশির ভাগ বাঁকা ভুরু দেখা যায়।

যদি ভুরু ধনুকের মত খুব বাঁকা হয় এবং যাহার ঐরূপ ভুরু সে যদি উহা কুঞ্চিত করিয়া ঘন ঘন উপর দিকে উঠায়, তাহা হইলে এই প্রকাশ পায় যে সে ব্যক্তি, গর্ব্বিত, ভাবুনে, অত্যাকাঙ্ক্ষী, সৌন্দর্য্যানুরাগী, ও সে খুব জাঁকজমক ভাল বাসে।

নীচু, বাহিরদিকে ঝোঁকা, বারণ্ডা-বেরকরা ভুরুতে বিচার-শক্তি, বুদ্ধির সূক্ষ্মতা, চিন্তার গভীরতা, ও গবেষণা-শক্তি বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। ডারুইন, গ্লাডষ্টোন্, সর্ উইল্‌ফ্রিড্ লসন্—লিবিংষ্টন প্রভৃতি অনেক বড় বড় লোকদিগের এইরূপ ভুরু।

ভুরু চোখের কাছাকাছি থাকিলে, চরিত্রের দৃঢ়তা, গভীরতা, এক-নিষ্ঠা প্রকাশ পায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি দেখ।

আর, চোখ হইতে ভুরু যার যত উর্দ্ধে থাকে সেই পরিমাণে তার চপলতা, উদ্যম-অধ্যবসায়ের অভাব প্রকাশ পায়।

যাদের ভুরু খুব পাতলা ও চোখ হইতে দূরে তাদের হৃদয়ের আগ্রহ ও শক্তি কম। যাদের এইরূপ ভুরু তারা কখনই দৃঢ়মনস্ক, সূক্ষ্মবুদ্ধি, উদ্ভাবনী-শক্তি-সম্পন্ন, কিম্বা গভীর চিন্তাশীল হয় না।

সূক্ষ্ম ও সমান ভুরুতে এই প্রকাশ পায় যে যাহার ঐরূপ ভুরু তাহার মন উচ্চ ভাবাপন্ন, বাহ্য বিষয়ের ভাব সহজে ও শীঘ্র তাহার মনে অঙ্কিত

হয়—বুদ্ধি পরিষ্কার, ও চরিত্রে সামঞ্জস্য-ভাব আছে। ভুরু সূক্ষ্ম অথচ অসমান হইলে, বিরক্তি-প্রবণতা ও উত্তেজনশীলতা প্রকাশ পায়।

ঘন ও খুব স্পষ্টব্যক্ত ভুরুতে এই প্রকাশ পায় যে যাহার এইরূপ ভুরু তাহার শরীরে অস্থি ও মাংসপেশীর প্রাবল্য—তাহার চরিত্রের বল ও সহিষ্ণুতা আছে—অধ্যবসায়, মনের আগ্রহ, এবং বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা আছে।

এই প্রকার ভুরু আবার যদি কর্কশ হয়, স্থূল হয়, অসমান হয়, তাহা হইলে ইহাতে চরিত্রের অসামঞ্জস্য, হৃদয়ের কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়। ভ্রূযুগল পরস্পর হইতে খানিকটা ছাড়াছাড়ি করিয়া থাকিলে ইহাই প্রকাশ করে যে, যাহার ঐরূপ ভুরু তাহার হৃদয়ভাব খুব তীব্র —তাহাদের ইন্দ্রিয়বোধ খুব দ্রুতগামী এবং বাহ্য বিষয় তাহাদের মনে শীঘ্র অঙ্কিত হয়।

বরিশালের পত্র।

বরিশাল কি রকম স্থান, এ অঞ্চলে আমার জাহাজের কাজ কেমন চল্‌চে জান্‌তে চেয়েছ। এখানে এসে এখানকার অবস্থা এই অল্প দিনে যত দূর জান্‌তে পেরেছি সংক্ষেপে তাই তোমাকে লিখ্‌চি।

বরিশাল সহরটি দেখ্‌তে অতি সুন্দর। সাম্‌নে দিয়ে একটী নদী বয়ে যাচ্চে। নদীটি তেমন বড় নয়। নদীর ঘাটে অনেকগুলি বজ্‌রা ও নৌকা বাঁধা থাকে। আর এখন-ত রোজই আমাদের ষ্টিমার যাতায়াত করচে। নদীর ধার দিয়ে বরাবর একটা পাকা রাস্তা গিয়াছে, এই রাস্তায় সাহেব সুবোরা গাড়ি চড়ে হাওয়া খান—অনেক ভদ্রলোক সকালে বৈকালে এখানে বেড়াতে আসেন। এই রাস্তার ও-ধারে কতকটা স্থান বোপে সারি সারি ঝাউ গাছ। এই ঝাউগাছগুলিতে নদীর ধারের বড় শোভা হয়েছে। সহরের চারিদিকেই বাগান বাগিচা। সুপারি নারিকেল ঝাউ আঁব কাঁটালের গাছে সমস্ত স্থান যেন ছেয়ে রয়েছে। চারিদিকে থেকে কোকিল পাপিয়া ডাক্‌চে, আর কত রকম পাখী শিস্‌ দিচ্চে। এই সমস্ত মিলে একটি একতান-সঙ্গীত যেন রাত দিন উচ্ছ্বসিত হচ্চে। সহরের মধ্যে রাস্তার ধার দিয়ে ছোট ছোট খাল নালা গিয়াছে, তাতে সর্ব্বদাই জল থাকে। এই খালগুলির সঙ্গে নদীর যোগ আছে। নদীর জোয়ার ভাঁটা অনুসারে খালের মধ্যে জোয়ার ভাঁটা খেলে। আবার, ইতস্ততঃ ছোট ছোট ঘাট-বাঁধান পুষ্করিণী। খালের সঙ্গে অনেকগুলি পুষ্করিণীর যোগ আছে। তাই তাদের জলও ভাল থাকে। এতেই বুঝ্‌তে পারচ, এখানকার লোকের জলকষ্ট নাই। আর, খালে জোয়ার ভাঁটা হওয়ায় সহরের ময়লা সব ধুয়ে যায়। এতেও লোকের স্বাস্থ্য অনেক ভাল থাকে। এখানে মধ্যে মধ্যে তোপের মত শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যায়—কেন যে এ শব্দ হয় তার

প্রকৃত কারণ কেউ ঠিক করে বল্‌তে পারে না। কেউ কেউ বলেন, বঙ্গোপসাগরে যে অতলস্পর্শ আছে সেইখান থেকে শব্দ হয়। সাধারণের মধ্যে সংস্কার এই যে, লঙ্কায় রাবণ রাজার বাড়ীর দরজা পড়ে, তাই এই রকম শব্দ হয়। এ অঞ্চলটাই নদনালায় পরিপূর্ণ। তাই জায়গাটা একটু স্যাঁৎসেতে, কিন্তু ভারি উর্ব্বরা। এখানে যেমন ধান হয় এমন আর কোথাও না। সমস্ত বালাম চাল এ প্রদেশ থেকেই কলিকাতায় চালান হয়। এই এক ফসলের উপরেই চাষাদের নির্ভর। অন্য ফসল যে এখানে হতে পারে না তা নয়। কিন্তু এই ধান এত প্রচুর পরিমাণে হয় যে তাহাতেই তাদের গুজ্‌রান চলে যায়। তাই তারা অন্য ফসল তৈরি করিতে মনোযোগ দেয় না শিক্ষাও করে না। একজন ভদ্রলোক আমাকে বল্‌ছিলেন, এমন কি লাউ কুমড়ার গাছটা কি করে লাগাতে হয় তাও অনেকে জানে না। চাষারা এত আল্‌সে যে তাদের শেখাতে গেলেও শিখ্‌তে চায় না। ধান তৈয়ারি কর্‌তেও বেশি পরিশ্রম কর্‌তে হয় না। বীজ ছড়িয়ে দিলে প্রায় গাছ আপনি হয়ে উঠে। গাছ তৈরি হওয়া পর্য্যন্ত তবু একরকম তারা পরিশ্রম করে—কিন্তু একবার তৈয়ারি হলে কাট্‌বার পরিশ্রম আর তারা স্বীকার কর্‌তে চায় না। অন্য প্রদেশের লোক এসে তাদের ধান কেটে দিয়ে যায়। আর তার দরুণ তাদের পয়সা দেয়। এরূপ অদ্ভুত রীতি-ত আর কোন প্রদেশে দেখতে পাওয়া যায় না।

এখানকার ভূমিতে যে অনেক প্রকার ফসল হতে পারে তার সন্দেহ নাই। এক জন ভদ্রলোক বলেছিলেন, তিনি কাঠা-কতক জমিতে এরোরুটের গাছ আর্জিয়ে এক শত টাকা লাভ করেছিলেন। এখানে সুপারি ও নারিকেল খুব জন্মে। এ অঞ্চলে নলচিটি ও ঝালোকাটি কারবারের প্রধান স্থান। নলচিটি থেকে অনেক সুপারি কলকাতায় ও রেঙ্গুনে চালান হয়। সেই জন্য অনেক মগ্‌ ও চিনে সেখানে এসে

বাস করে। ঝালোকাটি থেকে নারিকেল, চাল, কাঠ, বেশি চালান হয়। বরিশাল সহর থেকে মাল বড়-কিছু কলিকাতায় চালান হয় না। কিন্তু কলিকাতা থেকে কাপড়-চোপড় বাসন কোষন অনেক জিনিষপত্র এখানে আসে। এখানে একটি লোন-আফিস আছে। এখানে একটি দেশীয় জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী কর্ত্তৃক এই আফিসটি স্থাপিত হয়। প্রায় লক্ষ টাকা ইহার মূলধন। এ অঞ্চলে টাকার সুদ অত্যন্ত বেশি। কিন্তু উহাঁরা শতকরা ২৪ টাকার বেশি সুদ লয়েন না। হ—বাবু এই আফিসের সম্পাদক। ইনি একজন পাকা কার্য্যদক্ষ লোক—সকলেই ইঁহাকে কাজের লোক বলিয়া মান্য করে। ইঁহারই কার্য্যনৈপুণ্যে লোন্-আপিসের কাজটি বেশ চল্‌চে। তিনি বল্লেন, এইরূপ বাঙ্গালী জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী স্থাপিত অনেকগুলি লোন্ আফিসও পূর্ব্ব বাঙ্গালা-অঞ্চলে আছে ও বেশ ভাল রকম চল্‌চে। কিন্তু বাঙ্গালী জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানির দ্বারা চালিত অন্য কারবার তেমন এখানে সুসিদ্ধ হতে পারে নি। জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানি কর্ত্তৃক চালিত কারবার বাঙ্গালীদের মধ্যে তেমন ভাল চলে না, তার অর্থ এই যে, অংশিদারগণ তেমন মনোযোগ, যত্ন ও আগ্রহের সঙ্গে ষোল আনা আপনার ভেবে কাজের তত্ত্বাবধান করেন না। একজন ধনী হয়তো ১০০ টাকা কি ১০০০ টাকার অংশ ক্রয় করেছেন। তিনি মনে করেন, একশত টাকা কি এক হাজার টাকা গেলে তিনি মারা যাবেন না, কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতিতে তাঁর না গেলেও হয়; যিনি Manager আছেন তিনিই তো সব কর্‌চেন—ওর জন্য এত ভাবনা কি; সমস্ত কারবারটা যদি একলা আমার হত তাহলে বেশি দেখতে শুন্‌তে হত বটে। এই রকম মনের ভাব হওয়ায় অনেক Director অর্থাৎ কর্ত্তা-অংশিদার কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতিতে উপস্থিত হন না। হরকান্ত বাবু বল্লেন, উপস্থিত সভ্যের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ হয় না বলে' অনেকবার সভার অধিবেশন স্থগিত করতে হয়। যতটা আপনার

স্বার্থ সেই পরিমাণে আমাদের কাজে যত্ন ও আগ্রহ হয়—সকলের সমবেত চেষ্টায় একটা বৃহৎ কারবার চল্‌চে এবং এই সাধারণ কার্য্যটা যাতে ভাল চলে তার দরুণ আমাদের প্রত্যেকের ষোল আনা নিজের কাজ মনে করে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য, এই রকম মনের ভাব আমাদের হয় না। যাকে বলে Public spirit অর্থাৎ "সার্ব্বজনিক কাজে উৎসাহ", আমাদের মধ্যে এখনও তার বিলক্ষণ অভাব আছে। এই উৎসাহ ইংরাজদের মধ্যে প্রবল থাকাতে তাদের এত উন্নতি। হ—বাবু বল্‌ছিলেন, আমাদর শিক্ষিত লোকদের—বিশেষত চাকুরে শ্রেণীদের মধ্যে আর একটি দোষ আছে। যদিও বা কোন গতিকে তাঁরা একটা কারবার আরম্ভ করেন, তাঁরা পদে পদে ভয় পান। তাঁরা মনে করেন, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"—অতএব কারবার করে' যদি তাঁরা রাতারাতি বড় মানুষ না হতে পারলেন তবে ও কথার সার্থকতা কি? তার একটু এদিক ওদিক হলেই গোলযোগ বেধে যায়। প্রথমে একটু ক্ষতি দেখলেই তাঁরা ভয় পান—তাঁদের আর অধ্যবসায় থাকে না—তাঁরা তাড়াতাড়ি কারবারটা উঠিয়ে দেন। কিন্তু আমাদের অশিক্ষিত মহাজন শ্রেণী এ বিষয়টা ভাল বুঝে। হ—বাবু বল্লেন, বরিশালে একজন মহাজনের কারবার ছিল। কারবারে এক সময়ে অনেক লহনা বাকী পড়ে। ধনী তাহাতে বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর যে গদিয়ান ছিল, সে বলিল, আরও কতক টাকা আপনাকে এই কারবারে দিতে হবে, তা হলে আমি শুধ্‌রাতে পারব। ধনী সাহস করে' সেই টাকা দিলেন। এখন বরিশালের মধ্যে তাঁরই প্রধান দোকান। কারবার খুব ফলাও হয়ে উঠেছে। দু—বাবুদের বেঙ্ক ফেল হওয়ায় বাঙ্গালীদিগের মধ্যে একটা নৈরাশ্য উপস্থিত হয়েছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে জয়েণ্টষ্টক প্রণালীতে কোন কারবার হতে পারে না এইটে সকলের বিশ্বাস হয়ে পড়েছে। আসল কথা, কাজের ভাল বন্দোবস্ত থাকলে বেঙ্কটা ফেল হত না। বাস্তবিক আমাদের সাহস ও

অধ্যবসায় অত্যন্ত কম। আমরা বড়ই সাবধানী জাত। অতি-সাবধানটা ভাল নয়। ইংরাজেরা আমাদের বুঝে নিয়েছে। তুমি অবশ্য জান এখানে আমার যেমন জাহাজ চল্‌চে তেমনি ফ্লোটিলা কোম্পানি নামক একটি ইংরেজ কোম্পানিরও জাহাজ চল্‌চে। আমাদের উভয়ের মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফ্লোটিলা কোম্পানির অনেক খরচপত্র—লোক জনের ব্যয়, কিন্তু তারা প্রায়ই যাত্রী পায় না। অধিকাংশ যাত্রী আমাদের জাহাজে যায়। তাদের বিস্তর ক্ষতি হচ্চে তবু তারা সমান নিয়মিত ভাবে জাহাজ চালাচ্চে—যন্ত্রের একটু ত্রুটি কিম্বা শৈথিল্য করে না; আর তারা প্রকাশ্য ভাবে বলে—বাঙ্গালীর অধ্যবসায় নাই, তাহারা আমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে' কতদিন জাহাজ চালাতে পারবে। এখানে আমাদের জাহাজ যাতে স্থায়ী হয় তার জন্য এখানকার লোকের—বিশেষতঃ ইস্কুলের ছাত্রদের অপরিসীম উৎসাহ ও যত্ন। এমন উৎসাহ আমি কখন দেখিনি। তাদের ভাব দেখে চমৎকৃত হতে হয়। প্রত্যহ খুব ভোরে আমাদের জাহাজ এখান থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনায় যায়। ফ্লোটিলা কোম্পানীর জাহাজও সেই সময় যায়। পাছে আমাদের জাহাজে লোক না গিয়ে প্রতিপক্ষের জাহাজে যায় এই জন্য কতকগুলি ভদ্রলোক ও স্কুলের ছাত্র রাত্রি ৪টার সময় উঠে দলবদ্ধ হয়ে উৎসাহের সহিত জাহাজের ঘাটে প্রত্যহ উপস্থিত হন ও যদি কোন যাত্রী প্রতিপক্ষের জাহাজে যেতে চায়, তাকে অনেক প্রকার বুঝিয়ে এমন কি, পায়ে পর্য্যন্ত ধরে ফিরিয়ে আনেন—যেখানে জালি বোটে করে প্রতিপক্ষের জাহাজে লোক উঠছে—সেখান পর্য্যন্ত গিয়ে তাদের বুঝাতে থাকেন। "আমাদের কথাটি একবার শুনুন, তারপর যে জাহাজে ইচ্ছা হয় যাবেন। আপনারা বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর জাহাজ থাক্‌তে কেন আপনারা ইংরাজদিগের জাহাজে যাবেন? দেশের টাকা দেশে থাকে এটা কি প্রার্থনীয় নহে? প্রতিপক্ষের জাহাজে স্বদেশীয়দিগের

প্রতি কুব্যবহার করা হ'ত, অপমান করা হ'ত—আমাদের নিমন্ত্রণেই, আমাদের আহ্বানেই ঠাকুর বাবুরা এখানে জাহাজ এনেছেন—তখন কি আপনার ও-জাহাজে যাওয়া উচিত ?" "হাঁ বটে, যা বল্লে তার উত্তর নাই, চল ঐ জাহাজে যাওয়া যাক্"—এই বলে' যাত্রীরা আবার আমাদের জাহাজে অনেকে ফিরে আসেন। একটি বারবৎসর বয়স্ক বালক ঘাটে সে দিন বক্তৃতা দিয়েছিল। "হে ভাই সকল, তোমরা আপনার জাহাজ থাকতে পরের জাহাজে যাইবানা। উহাদের ঐ যে জাহাজ দেখিতেছ উহার যেরূপ গঠন তাহাতে একটু বেশি বাতাস উঠিলেই দোদুল্যমান হইয়া জলগর্ভে নিমগ্ন হইবে। তাহার সাক্ষী দেখ, উহারা এখানে জাহাজ রাখিতে পারে নাই—ওপারে লইয়া গিয়াছে এবং এই বাতাসেই দোদুল্যমান হইতেছে ; যদি তোমরা প্রাণ বাঁচাইতে চাও-ত ভাই-সকল ঐ জাহাজে যাইবা না"—এই কথা শুনে নীচশ্রেণী লোকদের ভয় হল—আর প্রতিপক্ষের জাহাজে তারা গেল না। ঝড় হোক্—বৃষ্টি হোক্—রৌদ্র হোক্—যে কোন বাধা হোক্ কিছুই না মেনে তাঁহারা জাহাজের সিটি (বাঁশিরডাক) শুনবামাত্র দৌড়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। তাঁহারা বলেন আমাদের জাহাজের সিটি তাঁহাদের এমন মিষ্টি লাগে ও তা শুনতে পেলে তাঁদের এমন আহ্লাদ হয় যে তাহা বলবার নয়। বন্ধুদের সুপরিচিত গলার স্বর দূর হতে শুনলে যেমন বুঝা যায় কে আসছে তেমনি সিটি শুনলেই কোন্ জাহাজ আস্চে তাঁরা বুঝতে পারেন। ঐ আজ "ভারত" আস্ছে, ঐ "লর্ড রিপণ" আস্ছে, ঐ "বঙ্গলক্ষ্মী" আস্ছে, ঐ "স্বদেশী" আস্ছে—এই বলে সকলে উৎসাহের সহিত হাস্য-মুখে দলবদ্ধ হয়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। সে দিন একজন বল্ছিলেন, "যেমন বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের বংশিধ্বনিতে হৃদয় আকৃষ্ট হত, সেইরূপ তাঁদেরও হৃদয় আকৃষ্ট হয়"। আবার প্রতিপক্ষের জাহাজের নাম পর্য্যন্ত তাঁরা সইতে পারেন না—তার সিটিও তাঁদের কাণে অত্যন্ত কর্কশ

লাগে। প্রতিপক্ষের জাহাজ যদি কোন দিন যাত্রী পায়—সে দিন তাঁদের আপ্‌সোসের আর সীমা থাকে না।

সে দিন আমাকে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য এখানে যে একটি বৃহৎ সভা হয়েছিল, তাতে একটি বক্তা আমার ষ্টিমারের উল্লেখ কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ আপনাকে সম্বরণ করে বল্লেন—"তাঁর ষ্টিমার ভুলক্রমে বলেছি—ইহা তো আমাদেরই ষ্টিমার"—এই কথাটি আমার বড়ই ভাল লেগেছিল। সে দিন সে সভায় অনেক লোক একত্র হয়েছিলেন—একটি প্রকাণ্ড গৃহ লোকে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এখানকার হাকিম, উকীল জমীদার দোকান্দার মহাজন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এখানকার প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। অনেকগুলি সুবক্তা সেদিন বক্তৃতা করেছিলেন। সে দিন ছাত্রদিগের আহ্লাদ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। তারা আপনারাই সভার বিজ্ঞাপন ঘরে ঘরে গিয়ে বণ্টন করেছিল, গাছের পাতা দিয়ে ঘরটি সুন্দর সাজিয়েছিল। তাদের উৎসাহ দেখলে নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়—নিরুদ্যম হৃদয়েও উদ্যমের ভাব আসে।

সে দিন এখানে জাতীয় সংকীর্ত্তন হয়েছিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" অঙ্কিত নিশান হাতে নিয়ে, খোল কর্ত্তাল বাজাতে বাজাতে, বাহু তুলে, উৎসাহের সহিত গান করতে করতে সংকীর্ত্তনের দল—বাবুর বাড়িথেকে বৈকালে বেরুলেন—যেতে যেতে রাস্তার লোকের ভীড় বাড়তে লাগ্‌ল—তারপর বাজারে পৌঁছিলে লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌ল। প্রথমে লোকেরা মনে করেছিল, বুঝি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তন, তাই অ—বাবু একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে এ কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য অল্প কথায় ও সহজ ভাষায় বেশ বুঝিয়ে দিলেন—তাতে লোকেরা বেশ বুঝ্‌তে পারলে ও উৎসাহের সঙ্গে সংকীর্ত্তনে সবাই যোগ দিলে।

নগর সংকীর্ত্তনের যে কি মাতানে ভাব আমি সে দিন বেশ বুঝতে পারলেম—এইরূপ জাতীয় সংকীর্ত্তন যদি নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে গাওয়া হয় তাহলে বড়ই উপকার হয়। সাধারণের মধ্যে জাতীয়ভাব প্রচারের ভাল উপায় এর চেয়ে আর কিছুই নেই। যে গানটা গাওয়া হয়েছিল, সেটা নিম্নে প্রকাশ করা গেল। এই গানটায় লোকে যে কি রকম মেতে উঠেছিল, সুর না শুন্‌লে শুধু কথায় বোঝা যাবে না। যাইহোক্, তবু কতকটা ভাব বুঝ্‌তে পারবে।

কে কোথায় আছিস্ ভাই, আয়রে সকলে গাই
প্রাণের সঙ্গীত আজি কাঁপায়ে গগন।
বেঁধে আজি প্রাণে প্রাণে, শত কণ্ঠে একতানে
সবে মিলে গাই গীত মৃত সঞ্জীবন।

একতালা।

(ও ভাই) দেখ সব্ ঘুমিয়ে, অচেতন হয়ে,
দেশের দশা একবার, করেনা স্মরণ।
[একবার চায়নারে কেউ নয়ন মেলে]
(একিরে কাল নিদ্রা এল)
(মোরা) সবারে জাগাব, দুর্দ্দশা ঘুচাব,
নিদ্রাগত প্রাণে, আনিব চেতন।
[এঘোর দুঃখ নিশি অবসানে]
(মহারাণীর সুশাসনে)
(ও ভাই) ভিন্ন ভিন্ন জাতি, মিলে দিবা রাতি,
ভাই ভাই হয়ে, করিব সাধন।
[মিলে প্রেমসূত্রে প্রাণে প্রাণে]
দেখ্‌বে দেশে দেশে, এ ভারতে মিশে,

কত জাতির হল, প্রেমেতে মিলন।

[ওরে এমন শোভা দেখবে কোথা]

রূপক।

আহা, জননী জন্মভূমি, স্বর্গাদপি গরীয়সী,

ভাবে মেতে কোটী কণ্ঠে কর্‌ উচ্চারণ।

মনরসই—একতালা।

শত্রু মিত্র মিলে, ঘরের বিবাদ ভুলে,

গলাগলি হয়ে গাইরে।

(আজি) দেশের কাজে মোরা, হয়ে মাতোয়ারা,

স্বার্থের কথা ভুলে যাইরে।

[দেশের প্রেমে মত্ত হয়ে]

(মায়ের চরণ সেবায়)

(করি) হয়ে এক মন, মায়েরই কীর্ত্তন,

(মোরা) পঁচিশ কোটী প্রাণী ভাইরে।

বিংশতি জাতিতে, বিংশতি ভাষাতে,

মেদিনী কাঁপায়ে গাইরে।

[জয় ভারত জননী ব'লে]

(সমস্বরে সবে)

খাম্বাজ—একতালা।

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটী মন,

এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,

আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।

আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়,

অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।

টুটে ত টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন।
তাহলে আসুক বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।

রূপক।

নব উদ্যম দেখিয়ে সবে, চমকিত হয়ে ক'বে
বুঝি ভারত হবে আবার, জগত ভূষণ।

ঝুলন।

(ওরে) চরিদিকে সবাই জেগে তোরাই ঘুমে রলি
সুধু তোরাই ঘুমে রলি, ছিছি, তোরাই ঘুমে রলি।
নবীন আলোয় হাস্‌ছে ধরা দেখ্‌রে নয়ন মেলি।
(চেয়ে দেখ্ দেখ্‌রে ও ভাই)
ছিছি, কাজের বেলা ভোরের বেলা ঘুমে বিভোর হলি!
[জেগে আয় আয়রে ভাই]
(ওরে এমন দিন আর পাবি নারে)
হায়রে ঘুমের ঘোরে বুঝলি নারে কি ছিলি কি হলি।
(একবার ভেবে দেখরে ওভাই)
ছিছি এতকাল ঘুমিয়ে আছিস্ তবু না জাগিলি।
(একি হ'লরে ভাই)
হায়রে জেগেও বুঝি জাগলি নারে, কেন এমন হলি।
(একবার উঠ উঠ সবে)
এস মহানিদ্রা ভেঙ্গে করি কোলাকুলি।
(জয় ভারত বলেরে ভাই)

এস দলাদলির বাঁধন খুলে বাঁধি গলাগলি।
(ভারতমাতার নিশান তুলে)
(আর দেরি করিস্ নারে)
(একবার আয় আয়রে সবে)

রূপক।

সবে এক প্রাণ হয়ে, ভগবানের নামটি লয়ে,
দেশের মঙ্গল সাধনে, কর প্রাণপণ।

——o——
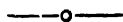
বীর-জননী।

অধিকাংশ বড় লোকের জীবন-চরিত পাঠ করিলে দেখা যায়—তাঁহাদের মাতার চরিত্রে যে সকল মহত্ত্বের লক্ষণ ও সদ্‌গুণ বিদ্যমান ছিল তাহাই পুত্রেরা মাতৃদুগ্ধের সহিত আত্মসাৎ করিয়া মহত্ত্ব-শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। ক্রমশঃ তাহার এক একটী দৃষ্টান্ত আমরা পাঠকবর্গের সমক্ষে অর্পণ করিব। কোন জাতিকে উন্নত করিতে হইলে প্রথমে সেই জাতির স্ত্রীলোকদিগকে উন্নত করা আবশ্যক। এই জন্য আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যে দেশের স্ত্রীলোক অজ্ঞান কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, দাসত্ব ব্রতে রত, সে জাতির মধ্যে বড় লোকের আবির্ভাব দুর্লভ। স্ত্রীলোকেরা নিজে বড় লোক বলিয়া প্রখ্যাত না হইতে পারেন, কিন্তু পুরুষদিগকে বড় লোক করিয়া তোলা তাঁদের কাজ; তাঁহাদের সন্তানসন্ততির চরিত্রোৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে তাঁদের জীবনের সার্থকতা অনেক পরিমাণে সংসাধিত হয়। ওয়াসিংটনের মাতার জীবন চরিত পাঠ করিলে এই কথাটি বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে।

ওয়াসিংটনের মাতার স্বামী-বিয়োগ হইলে পর, তাঁহার শিশু সন্তানের লালন পালন ও শিক্ষার ভার সমস্ত তাঁহার স্কন্ধে পড়িল। এই সঙ্কট-কালে তিনি তাঁহার পুত্রকে যে রূপে লালনপালন করিয়াছিলেন, যে প্রণালীতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে সকল মহত্ত্বের বীজ তাঁহার কোমল মনে রোপণ করিয়াছিলেন তাহারই গুণে আমেরিকার স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠাতা—আমেরিকার উদ্ধার-কর্ত্তা মহাত্মা জর্জ ওয়াসিংটন তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে এত যশ-কীর্ত্তি খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জর্জ ওয়াসিংটনের পিতৃ-বিয়োগের সময়, তাঁহার বয়স বার বৎসর

মাত্র ছিল। ওয়াসিংটন বলিতেন, তাঁহার পিতার চেহারা তাঁহার মনে পড়ে, তিনি যে তাঁহাকে আদর করিতেন তাহাও মনে পড়ে, তাঁহার বিষয় আর কিছু তিনি বলিতে পারেন না—কিন্তু তাঁহার যশকীর্ত্তি সৌভাগ্য সমস্ত মাতার স্নেহ যত্নেই যে তিনি লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সন্দেহ নাই।

ওয়াসিংটনের মাতা গৃহ-কর্ত্রী ছিলেন ও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব গৃহের মধ্যে অক্ষুণ্ণ অটল ছিল; গৃহের মধ্যে পরিপাটি শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। মাতার নিকট শিশু সন্তান যেরূপ প্রশ্রয় পাইয়া থাকে, যেরূপ আব্দার পাইয়া থাকে তাহা ওয়াসিংটন পাইয়াছিলেন—কিন্তু তাহার সহিত সংযম ও আত্মসম্বরণেরও শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা কোন বৈধ শৈশব-সুলভ আমোদ আহ্লাদ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতেন না, কিন্তু কিছুই অতিরিক্ত করিতে দিতেন না। এই রূপে আমেরিকার ভাবী কর্ত্তৃপুরুষ মাতার নিকট আজ্ঞা পালনের শিক্ষা পাইয়া আজ্ঞা দিবার অধিকারের উপযুক্ত হইয়াছিলেন। ওয়াসিংটনের মাতা পুত্রকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াও গুরুজন-সুলভ কর্ত্তৃত্ব ছাড়েন নাই, এমন কি ওয়াসিংটন যখন প্রখ্যাত বড় লোক হইয়া উঠিলেন তখনও তাঁহার মাতা নিজ কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করেন নাই। সেই কর্ত্তৃত্ব যেন এইরূপ ভাবে বলিত, "আমি তোমার মাতা—আমি তোমাকে পদচালনা করিতে শিখাইয়াছি—আমার মাতৃস্নেহে তোমার ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছে—আমার কর্ত্তৃত্ব তোমার উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিয়াছে; এখন তোমার যতই যশকীর্ত্তি হউক না কেন, (ঈশ্বরের নীচেই) তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি আমার প্রতি প্রযুজ্য।"

ওয়াসিংটনও তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই কথা রক্ষা করিয়াছিলেন।

ওয়াসিংটনের একজন শৈশব-সহচর ওয়াসিংটনের মাতৃ-গৃহের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে।

"আমি ওয়াসিংটনের সমপাঠী ও খেলার সাথী ছিলাম। আমি ওয়াসিংটনের মাতাকে যেরূপ ভয় করিতাম, সেরূপ ভয় আমার নিজের পিতামাতাকেও করিতাম না। তিনি খুব দয়ালু ছিলেন—তাঁর অজস্র দয়ার মধ্যে থাকিয়াও কেমন তাঁহাকে দেখিলে একটা সমীহ হইত। এখন-ত আমার চুল পাকিয়াছে—আমার নাতী-পুতী হইয়াছে—তবু যদি এখন আমি তাঁহাকে হঠাৎ দেখিতে পাই, আমার মনে কেমন এক রকম অবর্ণনীয় ভাব উপস্থিত হয়। আমেরিকার পিতৃস্থানীয় ওয়াসিংটনকে দেখিলে যেমন ভয়মিশ্র ভক্তি ভাবের উদয় হয়, সেইরূপ তাঁহার গৃহকর্ত্রী গৃহলক্ষ্মী মাতাকে দেখিয়া সেই প্রকার ভাবের উদয় হইত।"

এই প্রকার গার্হস্থ্য-শক্তির অধীনে থাকিয়া ওয়াসিংটনের মন গঠিত হইয়াছিল।

যখন ওয়াসিংটন আমেরিক সৈন্যের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন, তখন সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার মাতাকে বিপদ আপদ হইতে দূরে ও আত্মীয় স্বজনের নিকটে রাখিবার জন্য একটী গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার মাতা সেই বিপ্লবের সময়ে সেই গ্রামে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দূতেরা কখন জয়ের সংবাদ আনিতেছে—কখন বা পরাজয়ের সংবাদ আনিতেছে—কিন্তু তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, জয় পরাজয়ে অবিচলিত থাকিয়া অন্য বীর-মাতাদিগকে নিজ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রশমিত করিতেন।

কোন এক যুদ্ধে জয়লাভ হইলে, ওয়াসিংটনের মাতার নিকট তাঁহার বন্ধুগণ আসিয়া সেই সুসংবাদ দিলেন এবং ওয়াসিংটন সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসার কথা ছিল তাঁহারা যুদ্ধের পত্র হইতে পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। এই সুসংবাদে মাতা খুসি হইলেন কিন্তু বেশি

প্রশংসার কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তু মহাশয়গণ, এ বড় বেশি রকম স্তুতিবাদ—তবু আমি জর্জকে ছেলে বেলায় যে শিক্ষা দিয়েছিলেম, বোধ হয় সে ভুলবে না—এত প্রশংসা শুনেও বোধ হয় সে আত্মবিস্মৃত হবে না।"

প্রথম হইতে ওয়াসিংটনের মাতা যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন—ইংরাজ সেনাপতি কর্ণওয়ালিস পরাজিত হইয়াছেন এবং আমেরিকেরা জয়ী হইয়াছে তখন তিনি করযোড় করিয়া বলিয়া উঠিলেন "ঈশ্বরকে প্রণাম! এতদিনে যুদ্ধ শেষ হইল, এক্ষণ আমাদের দেশ সুখশান্তি স্বাধীনতার প্রসাদ উপভোগ করিবে।"

যখন ওয়াসিংটনের নাম জগদ্বিখ্যাত হইল—তাঁহার গৃহে সৌভাগ্য-রবি উদিত হইল; তখনও তাঁহার মাতার সাদাসিধা অভ্যাস ও তাঁহার সরল গাম্ভীর্য্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। সেই তিনি পূর্ব্বেকার ন্যায় গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, ঘোড়ায় চড়িয়া আপনার ক্ষেত পরিদর্শন করিতেন, যদিও তাঁহার টাকা কড়ি বেশি ছিল না, তবু মিতব্যয়ী হইয়া পরিশ্রমের সহিত সাংসারিক কাজ কর্ম্ম এমন গুছাইয়া করিতেন যে তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র অনটন হইত না বরং তাঁহার সঞ্চিত অর্থ হইতে অনেক গরিব কাঙ্গালকে দান করিতেন। ৮২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপ গৃহস্থালী কাজ কর্ম্ম করিয়া একটি যৎসামান্য গৃহে নিজ চরিত্রের স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষা করিয়া বরাবর সমানভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।

তাঁহার ছেলেরা ও তাঁহার নাতি-পুতিরা আসিয়া বৃদ্ধ বয়সের উপযুক্ত কোন ভাল গৃহে যাইতে সর্ব্বদা তাঁহাকে অনুরোধ করিত। কিন্তু তিনি তাঁহাদের এই উত্তর করিতেন 'তোমাদের ভালবাসা ও ভক্তির পরিচয় পেয়ে তোমাদের উপর আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, এই পৃথিবীতে আমার অভাব অতি অল্প, আর, আমার নিজের রক্ষণ ভার

আমি নিজেই নিতে পারি।” তাঁহার জামাতা একবার বলিয়াছিল যে সাংসারিক কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার তাঁহার উপর দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হউন—তাহাতে তিনি বলিলেন “আমার দৃষ্টিক্ষীণ হয়ে এসেছে—আমার বইগুলি শুধু আমার হয়ে তুমি গুছিয়ে রেখো কিন্তু সাংসারিক কাজকর্ম্ম আমিই চালাবো।”

ওয়াসিংটনের মাতা অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন—জীবনের শেষাবস্থায় তিনি আর প্রকাশ্য উপাসনা-মন্দিরে যাইতেন না—প্রতিদিন তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী পাহাড় কিম্বা গাছপালা-বিশিষ্ট কোন বিজন স্থানে—সংসার হইতে এবং সাংসারিক বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া ভগবানের পূজাঅর্চ্চনা ও ধ্যানধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন।

৭ বৎসর বিচ্ছেদের পর, মাতা পুত্রে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইল। যুদ্ধ শেষ হইলে, ওয়াসিংটন সৈন্যসামন্ত লইয়া York Town হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ঘোটক-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া, মাতার নিকট তাঁহার আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। এবং সৈন্যসামন্ত পশ্চাতে রাখিয়া তিনি একাকী পদব্রজে তাঁহার মাতৃ-গৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি জানিতেন, জাঁকজমক আড়ম্বরে তাঁহার মাতা আহ্লাদিত হইবেন না।

গৃহকর্ত্রী একাকী সাংসারিক কাজকর্ম্ম করিতেছিলেন, এমন সময়ে শুনিলেন তাঁহার পুত্র দ্বারদেশে উপস্থিত। তিনি তাঁহার ছেলেবেলার নাম ধরিয়া তাঁহাকে সস্নেহ গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন—তাঁহার স্বাস্থ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন—বলিলেন, যুদ্ধের ভাবনায় তাঁহার মুখে কষ্টের রেখা পড়িয়াছে—সে কালের কথা—পুরাতন বন্ধুদিগের বিষয় অনেক বলিলেন কিন্তু পুত্রের নবোপার্জ্জিত যশ গৌরবের বিষয়—একটি কথাও বলিলেন না!

ইতিমধ্যে গ্রামের মধ্যে মহা ধুমধাম পড়িয়া গেল—ফরাসি ও

আমেরিক সৈন্যেরা, সেনানায়কগণ এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের ভদ্র লোকেরা, বজয়ীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামবাসী-গণ নৃত্য আমোদ আহ্লাদের একটা প্রকাণ্ড আয়োজন করিল এবং বিশেষ করিয়া ওয়াসিংটনের মাতাকে নিমন্ত্রণ করিল। সকলেই মনে করিতেছিল য়ুরোপীয় প্রথা অনুসারে ওয়াসিংটনের মাতা নিমন্ত্রণ-স্থলে খুব সাজসজ্জা ও ধুমধাম করিয়া আসিবেন। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল, তাঁহার পুত্রের বাহুতে ভর দিয়া অতি সামান্য বেশে তাঁহার মাতা অভ্যর্থনা-গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন সকলেই বিস্মিত হইল। তাঁহাকে উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নানা প্রকার প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হইলেন না—এবং সেখানে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া বলিলেন—"তোমরা আমোদ আহ্লাদ কর—সুখে থাক এই আমার আশীর্ব্বাদ—আমাদের মত বুড় মানুষের এখন বাড়ি ফিরে যাওয়াই উচিত" এই বলিয়া তিনি সকাল সকাল বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

ফরাসিস্ সেনাপতি লাফাইএট্ য়ুরোপে প্রস্থান করিবার সময় ওয়াসিংটনের মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসায় তিনি ফরাসিস্ সেনাপতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাঁহার মুখে পুত্রের ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাইয়া বলিলেন—"জর্জ যাহা করিয়াছে তাহাতে আমি আশ্চর্য্য হই নাই, কারণ, সে বরাবরই খুব ভাল ছেলে ছিল।"

জর্জ ওয়াসিংটন, প্রধান মেজিষ্ট্রেট্ পদে নিযুক্ত হইয়া New York নগরে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"মা, আমাকে সকলে একবাক্যে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান পদে নিযুক্ত করিয়াছে; আমি সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই তোমার নিকটে বিদায় লইতে আসি-য়াছি। নূতন শাসন প্রণালীর বন্দোবস্ত কার্য্য শেষ হইবামাত্রই

আমি শীঘ্র বর্জ্জিনিয়াতে আসিব, আর"—তাঁহার মাতা এই সময়ে তাঁহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন : 'আর আমাকে দেখতে পাবে না। আমার যে রকম বয়স হয়েছে, আর যে রোগ আমাকে ধরেছে, তাতে এ লোকে আর বেশী দিন আমায় থাকতে হবে না। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে বোধ হয় আমি উন্নততর লোকের জন্য কতকটা প্রস্তুত হয়েছি। কিন্তু তুমি যাও জর্জ, ঈশ্বর তোমার প্রতি যে মহান্ কাজের ভার দিয়াছেন তাহা সম্পন্ন কর; যাও—ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও তোমার মায়ের আশীর্ব্বাদ তোমাকে সর্ব্বদাই রক্ষা করবে।"

ওয়াসিংটনের হৃদয় বিগলিত হইল। মাতার স্কন্ধে তাঁহার মস্তক ন্যস্ত ছিল, বৃদ্ধ মাতা তাঁর দুর্ব্বল বাহুপাশে পুত্রের কণ্ঠদেশ স্নেহ ভরে জড়াইয়া ছিলেন, যাহার কঠোর কটাক্ষে তেজীয়ান বীর-বৃন্দ ভয়ে স্তব্ধ হইয়া থাকিত, সেই নেত্র আজ স্নিগ্ধ ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া বৃদ্ধা মাতার মুখের পানে অবনত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বীর-পুরুষ শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতে লাগিল—যে মাতার স্নেহ যত্ন ও শিক্ষার গুণে তিনি যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, সেই মাতাকে জন্মের মত বিদায় দিতে হইবে—আর তাঁকে দেখিতে পাইবেন না। এই মনে করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মাতা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল—পুরাতন রোগ প্রবল হইয়া উঠিল, ৮৫ বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন।

———o———
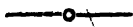
একটি অপূর্ব্ব বাড়ি।

মনুষ্য-জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, অসভ্য মানুষ প্রথমে মাটির নীচে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করিত, ক্রমে পাতার ঘর, খড়ের ঘর, খোলার ঘর প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে সভ্যতার যখন চূড়ান্ত উন্নতি হইল, তখন ইঁটের গাঁথনি পাথরের গাঁথনি পাকা ইমারৎ-সব প্রস্তুত করিতে লাগিল। আজ কালের-ত কথাই নাই। গৃহ-নিবাসীর সুখের জন্য কত রকম সুবিধাজনক আয়োজন গৃহে রাখা হইতেছে। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, গ্যাস, জলের কল, কত কি।

কিন্তু আর একটি অপূর্ব্ব বাড়ি আছে, সে বাড়িটি মানুষের সৃষ্টি হওয়া অবধি চলিয়া আসিতেছে অথচ এখনকার কালের বাড়ি নির্ম্মাণে যে সব উন্নতি হইয়াছে, বাড়ির অভ্যন্তরে যে সকল সুবিধাজনক আয়োজন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—সেই অপূর্ব্ব বাড়িটিতে প্রথম হইতেই তাহা আছে।

এই অপূর্ব্ব বাড়িটি কি বল দেখি?—মানুষের শরীর।

আমাদের ঘরবাড়ি—ইঁট বাঁশ পাথর মাটি কত কি দিয়ে তৈরি হয়। আবার তাহা কাদা বালি সুরকি চুন কতকি মস্‌লা দিয়া গাঁথা হয়। আমাদের শরীররূপ বাড়িটিও নানা উপাদানে নির্ম্মিত। রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি এই উপাদানগুলি কি। রসায়ন শাস্ত্র বলেন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন এই দুই বাষ্প মিলিয়া জল হইয়াছে এবং অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই দুই বাষ্প মিশিয়া বায়ু হইয়াছে। একটি কাঁচের টুক্‌রা পরীক্ষা করিয়া রাসায়নিক পণ্ডিত দেখিয়াছেন, সিলিসিক আসিড্ আর পোটাসা কোন নির্দ্দিষ্ট ভাগে মিশিয়া কাচ হইয়াছে। লাল নীল ও পীত এই তিনটি মূল বর্ণের মিশ্রণে যেরূপ অন্যান্য রং হয় সেইরূপ কতকগুলি মূল উপাদানের মিশ্রণে এই জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে।

যত দূর জানা গিয়াছে, ৬৩ প্রকার মূল উপাদান আছে। ইহাতে সমস্ত জগৎ নির্ম্মিত। এই মূল উপাদানের প্রায় চতুর্থাংশ আমাদের শরীরে ব্যবহৃত হয়। কি কি?—না অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন (কয়লা) গন্ধক, ফস্‌ফরস্‌, সিলিকন্‌ (অর্থাৎ চুণ) ম্যাগনেসিয়ম এবং লোহা।

লোহা থাকাতেই আমাদের রক্ত লাল হইয়াছে। চুলে, পিত্তেতে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে লোহা আছে। যাহাতে কাচ হয় সেই সিলিকা পদার্থ আমাদের চুলে এবং নখে পাওয়া যায়। আর-একটি কাচের উপাদান যে পোটাস্ তাহা আমাদের রক্ত মাংস পেশীতে এবং শরীরের তরল পদার্থ-সকলে পাওয়া যায়। হাড় ও দাঁতে চুন আছে।

গাছপালা উদ্ভিদ্—চুণ ও সিলিকা আহার করে, আমরা আবার ঐ শাক সব্জি উদ্ভিদ্ আহার করিয়া চুণ ও সিলিকা আত্মসাৎ করি। এই বিবিধ উপাদান সকল আমরা আমাদের খাদ্য হইতে অর্জ্জন করি। যদি আমাদের হাড় যথেষ্ট পরিমাণে চুণ না খায়, আমাদের রক্ত যথেষ্ট পরিমাণে লোহা না পায়, তাহা হইলেই আমাদের শরীর বেমেরামৎ হইয়া পড়ে অর্থাৎ আমরা পীড়িত হই।

আমাদের এই অপূর্ব্ব বাড়িটি কি প্রকারে গঠিত হইয়াছে তাহা ভাল করিয়া আলোচনা করা যাউক।

আমাদের শরীর অসংখ্য কোষ-সমূহের সমষ্টি। অর্থাৎ ছোট ছোট থলের মত জিনিসের মধ্যে একরকম তরল থল্‌থলে পদার্থ ভরা থাকে। এই অসংখ্য কোষ কিম্বা থোলের দ্বারা আমাদের সমস্ত শরীর গঠিত। এই কোষ সকলের মধ্যে যে থল্‌থলে তরল পদার্থ থাকে তাকে ইংরাজিতে Protoplasm বলে। এই কোষ-গুলি এত ছোট যে খুব ভাল অনুবীক্ষণ না হইলে উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল কোষ ক্রমাগত মরিয়া যাইতেছে আবার নূতন কোষ সকল প্রস্তুত হইয়া

তহাদিগের স্থান নিয়ত অধিকার করিতেছে। শরীরের মধ্যে জন্ম-মৃত্যু ক্রমাগত চলিতেছে। আমাদের প্রতি-কথাতে, প্রতি চিন্তাক্রিয়াতে, প্রতি গতিতে, আমাদের শরীরের কোন-না-কোন অংশ নষ্ট হইতেছে আবার ঠিক তাহার অনুরূপ গঠিত হইতেছে। যদি এইরূপ গঠিত না হইত তাহা হইলে আমাদের প্রিয়তম বন্ধুদিগকেও অল্পক্ষণের মধ্যে আর চিনিতে পারিতাম না।

অল্পবয়স্ক বালক বালিকারা যখন বাড়্তির মুখে থাকে তখন এত নূতন কোষ তাহাদের শরীরে যোজিত হয় যে তাহারা বড় হইয়া উঠিলে কতকটা তাহাদের চেহারার বদল হয়। কিন্তু এতটা বদল হয় না যে একেবারে চেনা যায় না। মূল আদর্শের সহিত কতকটা সাদৃশ্য থাকে। আমাদের শরীরের কোন স্থানে যদি কোন কাটা দাগ থাকে সেইস্থানের অংশ কালে একেবারে নূতন হইয়া যায় বটে কিন্তু সেই একই ছাঁচ বজায় থাকে।

আমাদের এই অপূর্ব্ব বাড়িগুলি কিরূপ করিয়া তৈরি হয়, কি করিয়া নষ্ট হয়, কি করিয়া মেরামৎ করিতে হয় তাহা জানা খুব দরকার।

আমাদের শরীরের কোষগুলির নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু আছে—সেই নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলেই তাহারা মরিয়া যায়; মরিয়া গেলে শরীর হইতে তাহাদিগকে যদি বাহির করিয়া না দেওয়া যায়, তাহা হইলেই পীড়ার কারণ উপস্থিত হয়।

শরীরের চালনায় এই কোষ সকল ধ্বংশ হয় এবং শরীর হইতে ঐ মৃত অংশ সকল বাহির করিয়া দিবারও সুবিধা হয়। এই জন্যই ব্যায়াম এত উপকারী। শরীর চালনা ও ব্যায়ামের দ্বারা নষ্ট কোষাংশ সকল বহিষ্কৃত হইলে নূতন কোষাংশ সকলের জন্য নূতন উপাদান সংগ্রহের আবশ্যকতা ও আকাঙ্খা জন্মে। এই আকাঙ্খার নামই ক্ষুধা। ক্ষুধার

উত্তেজনে আহার করিলে খাদ্যসামগ্রী হইতে নূতন কোষ সকল নির্ম্মিত হয়। এই কোষ সকলকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট জীবনকালের পূর্ব্বেই ব্যায়ামের দ্বারা ধ্বংশ করিয়া ফেলা ভাল—নচেৎ যদি তাহাদিগকে বৃদ্ধ হইয়া মরিতে দেওয়া যায়—তাহা হইলে শরীরের নিশ্চেষ্টতার দরুন মৃত অংশ সকলকে শরীর হইতে বহিষ্কৃত করা কঠিন হয়—সুতরাং সেই সকল মৃত অংশ শরীরের মধ্যে আটকাইয়া থাকে এবং নানা রোগ সৃষ্টি করে।

যদি কাজকর্ম্ম খেলাধুলা শরীর-চালনা যথাপরিমাণে কর, যদি সময়মত যথাপরিমাণে উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী আহার কর—যদি যথাপরিমাণে নিদ্রা যাও, তাহা হইলে দেখিবে তোমার চির-ভঙ্গুর শরীর-মন্দির যেমন ভাঙ্গিতেছে অমনি আপনাআপনি আবার মেরামৎ হইতেছে—নূতন তৈরি হইতেছে।

—০—
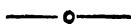
বড় লোকের মা।

যখন সর উইলিয়ম জোন্সের তিন বৎসর বয়স তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যু হইলে লেখা পড়া শিখাইবার ভার সমস্তই তাঁহার মাতার উপর পড়িল। সর উইলিয়ম জোন্সের পিতা নিজ পত্নীর চরিত্র এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—"তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। তিনি দাতা ছিলেন অথচ অপব্যয়ী ছিলেন না—মিতব্যয়ী ছিলেন অথচ ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না—প্রফুল্ল ছিলেন অথচ ঘোর আমুদে ছিলেন না। চাপা ছিলেন অথচ হাঁড়িমুখো গম্ভীর ছিলেন না—সুকৌশলী ছিলেন অথচ দাম্ভিক ছিলেন না—তাঁর তেজ ছিল অথচ তিনি ক্রোধান্ধ ছিলেন না—তিনি বন্ধুর বিশ্বস্ত ও পিতামাতার আজ্ঞাবহ ছিলেন এবং তিনি পতিপ্রাণা সতী ছিলেন।" স্বভাবত তাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল এবং স্বামীর সহিত বাক্যালাপে ও তাঁহার শিক্ষাধীনে তাহার আরও উৎকর্ষ হইয়াছিল। পতির শিক্ষাধীনে তিনি বীজগণিতে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার একটি ভাগিনেয় নাবিকবৃত্তি অবলম্বন করিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করায়—তাহার শিক্ষার ভার নিজে লইবেন স্থির করিয়া ত্রিকোণমিতি ও নৌচালন বিদ্যা ভাল করিয়া শিক্ষা করিলেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধু ম্যাক্লেস্‌ফীল্‌ডের কৌণ্টেস্‌ নিজ প্রাসাদে থাকিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন কিন্তু জোন্সের মাতা পাছে পুত্রের লেখাপড়ার ব্যাঘাত হয় এই জন্য সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না।

শিক্ষাদিবার প্রণালী এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে কঠোররূপে শাসন না করিয়া অজ্ঞাতসারে ও বিনা আয়াসে তাঁহার পুত্রের মনে জ্ঞান প্রবিষ্ট করাইয়া দিবেন। সর উইলিয়ম জোন্স কথায় কথায় তাঁহার

মাতাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতেন—তাহার উত্তরে তাঁহার মাতা বলিতেন —"পড় তাহা হইলেই জানিতে পারিবে।"

এই প্রণালীক্রমে পুত্রের জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল এবং মাতাও যত্ন-সহকারে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ৪ বৎসর বয়সের সময় সর উইলিয়ম জোন্স যে-কোন ইংরাজি পুস্তক সুস্পষ্ট উচ্চারণের সহিত দ্রুতরূপে পাঠ করিতে পারিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি পুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার মাতা তাঁহাকে সেক্‌সপিয়র হইতে বক্তৃতা ও গে-বিরচিত কথা-সকল মুখস্থ করাইতেন। এইরূপে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিসকল পরিচালন-প্রযুক্ত বলিষ্ঠ হইতে লাগিল। যখন ইস্কুলের ছুটি হইত তখনও তাঁহার মাতা যত্ন-সহকারে অবিশ্রান্ত মাতৃ-ভাষায় শিক্ষা দিতেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে ছবি-আঁকাও শিখাইয়াছিলেন। সর উইলিয়ম জোন্স যে মহা পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, সে যেমন তাঁহার নিজের বুদ্ধির প্রভাবে, তেমনি তাঁহার মাতারও অধ্যাপনা-গুণে।

ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক ও মন্ত্রী গিজোর মাতা আর একটি দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহার দুইটি পুত্র। বড় পুত্রটির বয়স যখন ৭ বৎসর তখন তিনি বিধবা হন। তাঁহার স্বামীর প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কঠোর বৈধব্য ব্রত অবলম্বন করিয়া বিপদসঙ্কুল জীবনের পথে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশীগণও তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহার প্রতি যত্ন ও মমতা প্রকাশ করিত—তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আসিত—কিন্তু তিনি এই সমস্ত সান্ত্বনা সত্ত্বেও, পুত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বন্ধুবান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া জেনিবায় চলিয়া গেলেন। পুত্রের শিক্ষা সমাপন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় গিজো মাতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আইন শিক্ষা করিবার জন্য প্যারিস নগরীতে যাত্রা করিলেন। মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন বটে কিন্তু তাঁহার মাতার

অবিচলিত কঠোর সত্যানুরাগ ও ধর্ম্মানুরাগকে তাঁহার সঙ্গের সাথী করিয়া লইলেন।

কার্লাইলের মাতা আর একটি উচ্চদরের স্ত্রীলোক। তিনি বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মিষ্ঠা। কার্লাইলের লেখায় যে সত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার কারণ তাঁহার মাতা তাঁহার শৈববাবস্থায় অতি যত্নসহকারে সেই সকল উচ্চ ও মহান্ ভাব তাঁহার মনে রোপণ করিয়া দিয়াছিলেন। এবং এই জন্য কার্লাইল তাঁহার মাতাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রসিদ্ধ প্রাকৃত-ইতিহাসতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত (Cuvier) কুবিয়ের মাতা সুশিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি অতি যত্নের সহিত পুত্রকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই মাতৃঋণ তিনি কখনই ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার মাতা তাঁকে ছেলেবেলায় যে সকল ফুল ভাল বাসিতে শিখাইয়াছিলেন সেই সকল ফুল যদি তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহার ঘরে আনিয়া দিত, তিনি আহ্লাদে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। যাঁহাদের সংস্কার, স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শেখানো ভাল নহে তাঁহারা এই সকল দৃষ্টান্ত আলোচনা করুন।

যোগসিদ্ধ জ্ঞান ও যোগানন্দ।

অনেক দিন পর্য্যন্ত এই বিশ্বাসটি সাধারণ লোকের মধ্যে বিদ্যমান ছিল যে, ভাষা গঠন করা মানব-শক্তির অতীত—উহা অলৌকিক দৈব শক্তি। অগ্নির আবিষ্কার ও ব্যবহার, গোধূমের চাষ, আঙ্গুর হইতে মদ প্রস্তুত করা, এ সমস্ত যদিও মানুষের চেষ্টায় ক্রমশঃ হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ লোকে মনে করিত, এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ দেবতার দান। দেবতার সংখ্যা যত হ্রাস হইতে লাগিল, প্রাকৃতিক কার্য্যকারণের জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এই সকল প্রাকৃতিক বস্তুর অলৌকিকতা ততই কমিয়া আসিল। কিন্তু ভাষা সম্বন্ধে এখনও অনেকের বিশ্বাস, ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট ভাষা আমরা একেবারেই প্রাপ্ত হইয়াছি,—উহা মানুষের স্বাভাবিক চেষ্টায় ক্রমশঃ বিকশিত হয় নাই।

যেমন ভাষা সম্বন্ধে, সেই প্রকার আর কতকগুলি মনোভাব সম্বন্ধে লোকের এইরূপ সংস্কার। মানুষ যখন জীবনের রহস্য চিন্তা করে—কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, সবিস্ময়ে যখন এই সকল কথা ভাবে, তখন তাহার মনে হয়, ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ছাড়া আরও কোন উচ্চতর জ্ঞানের দ্বার অবশ্যই আছে। প্রাকৃতিক জ্ঞান অর্জ্জনের পন্থা অতিশয় অনিশ্চিত এবং উহা কালবিলম্বসাপেক্ষ; সে পথ অবলম্বন করিতে হইলে অনেকটা ধৈর্য্য চাই। মানুষ জীবনের রহস্য উদ্ভেদের জন্য নিতান্ত অধীর। তাহার ইচ্ছা, কোনও অলৌকিক উপায়ে, যদি একেবারেই সেই জ্ঞান লাভ করা যায়। এই ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিবার জন্য, মানুষ আধ্যাত্মিক জগৎ-সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদ কল্পনা করিয়া তাহা হইতে অলৌকিক অতিপ্রাকৃতিক জ্ঞান অর্জ্জন করিবার উপায় চিন্তা করে।

বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দেশে, যে সকল উপায়ে এই অলৌকিক দৈবজ্ঞান লব্ধ হইয়াছে তাহা স্থূলরূপে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ—দেবতা কিম্বা দেব-দূতের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ। অনুগৃহীত ব্যক্তির নিকট দেবতারা প্রত্যক্ষ বাহ্য সঙ্কেত দ্বারা কিম্বা দৈববাণীর দ্বারা আবির্ভূত হন। দ্বিতীয়তঃ—অনুগৃহীত ব্যক্তির অন্তরে দেবতার অধিষ্ঠান হওয়ায়, তাহার দেহ ও মনে দারুণ আবেগ ও আন্দোলন উপস্থিত হয়, সে অচেতন হইয়া নানা প্রকার অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিতে থাকে—কখন বা যুক্তিযুক্ত বাক্যও উচ্চারণ করে। এই অবস্থাকে দশাপ্রাপ্তি বলে। তৃতীয়তঃ—যোগ-বলে দিব্যজ্ঞান লাভ। সাধক পরমাত্মার সহিত আত্মার সাক্ষাৎভাবে যোগ সাধন করিয়া, অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া, লৌকিক জ্ঞানের অতীত এমন সকল আধ্যাত্মিক জগতের সত্য উপলব্ধি করেন, যাহা সচরাচর বুদ্ধি জ্ঞানের একেবারেই অগম্য।

এই তিন শ্রেণীর দৈবজ্ঞান লাভের উপায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, এক এক ধাপ করিয়া যেন উন্নতির সোপান উঠিয়াছে—যেন উহা উত্তরোত্তর অধিকতর মার্জ্জিতভাব ধারণ করিয়াছে। আজকাল, দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ-সম্বন্ধে কিম্বা প্রলাপোক্ত দৈববাণীর সত্যতা-সম্বন্ধে শিক্ষিত লোকেরা বড় বিশ্বাস করেন না। যে ব্যক্তি বলে আমি দেবতাকে চাক্ষুষ দেখিয়াছি কিম্বা দৈববাণী শুনিয়াছি, তাহাকে পাগল বলিয়াই লোকে উড়াইয়া দেয়। কেবল যোগসিদ্ধ দৈবজ্ঞানের বিষয় সুসভ্য দেশের শিক্ষিত লোকেরাও অনেকে বিশ্বাস করেন।

এই যোগসিদ্ধ দৈবজ্ঞান বা আপ্তজ্ঞানের আসল ভাবটা কি? আধ্যাত্মিক জগতের সত্য জানিবার পক্ষে ইহাই কি নিশ্চিত উপায়

—প্রকৃষ্ট সাধন ? গোড়ায় এই কথাটি যেন আমাদের স্মরণ থাকে যে, এই প্রকার দৈবজ্ঞান লাভ, কোন জাতিবিশেষের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষের নিজস্ব অধিকার নহে। কি ব্রাহ্মণ, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান, সকল ধর্ম্মের উপাসকেরাই এই সাধনপদ্ধতিটি অবলম্বন করিয়াছেন। শরীর হইতে—বহির্জগৎ হইতে মনকে প্রত্যাহরণ করিয়া কিরূপে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎভাবে যোগনিবদ্ধ করিতে পারা যায়, সকলেরই সেই চেষ্টা। ইহার প্রকরণটি এই-রূপ ;—কোন বাহ্য পদার্থের উপর কিম্বা নাসাগ্র নাভিদেশ প্রভৃতি শরীরের অংশবিশেষের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কোন একটি বিশেষ বিষয়ে সুতীব্র দীর্ঘকালব্যাপী তন্ময় চিন্তা-প্রবাহ প্রয়োগ করিতে করিতে সাধকের একপ্রকার আত্মহারা অবস্থা উপস্থিত হয়—তখন জ্ঞান ও বুদ্ধির কার্য্য স্তম্ভিত হইয়া গিয়া, আত্মজ্ঞান লুপ্ত হইয়া, মনে হয় যেন জীবাত্মা পরমাত্মাতে একাকার হইয়া গিয়াছে। তখন সেই ব্রহ্মনিমগ্ন আনন্দময় আত্মার সমক্ষে যে সকল অনির্ব্বচনীয় সত্য প্রকাশ পায়, তাহা যুক্তির শৃঙ্খলানুসারে ক্রমান্বয়ে উপলব্ধি হয় না, পরন্তু একেবারেই মুহূর্ত্তের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

মড্‌স্‌লি বলেন—দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, এই পদ্ধতি অনুসারে যে আপ্তজ্ঞান বা আপ্তবচন পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিভিন্ন ধর্ম্ম-অনুসারে বিভিন্ন প্রকার। যখন খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীরা সাধন করিয়াছেন তখন খৃষ্টীয় সত্য বাহির হইয়াছে—যখন হিন্দু সাধক সাধনা করিয়াছেন, তখন অন্য প্রকার সত্য তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। সাধকভেদে সাধনার ফল যে বিভিন্ন হইয়াছে তাহা খৃষ্টসম্প্রদায়দিগের মধ্যেই দেখা যায়। সেণ্ট থেরেসা যেরূপ ঈশ্বরদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত সুইডেনবর্গের ঈশ্বরদর্শনের ঐক্য হয় না। ঈশ্বরের ত্রিত্ব-সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী মত, আবার য়ুনিটেরিয়ান-সম্প্রদায়ের

ভক্ত সাধক যে ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রাপ্ত হন তাহাতে খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব বর্জ্জিত। এই পদ্ধতিটির অসুবিধা এই যে, সত্য মূল-উৎস হইতে অবিকৃত ভাবে না আসিয়া সাধকের অবস্থা-অনুসারে একটু বিকৃত—একটু কলুষিত হইয়া পড়ে।

প্লোটাইনস্ সর্ব্বপ্রথমে খৃষ্টীয়-মণ্ডলীর মধ্যে এই যোগসাধন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। হিন্দুদিগের নিকট হইতে তাঁহার যে এই শিক্ষা হইয়াছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্লোটাইনস্ বলেন, জ্ঞানের দ্বারা অনন্তস্বরূপকে জানা যায় না, যেহেতু জ্ঞানের সীমা আছে। সসীম ব্যক্তির যদি অসীমকে জানিতে হয়, তবে সসীমকে অসীমে পরিণত হইতে হয়। কেন না, অসীমই অসীমকে জানিতে পারে। যে জীবাত্মা অনন্তজ্ঞানস্বরূপ হইতে প্রসূত, সেই অন্তবৎ জীবাত্মা যখন আপনার ক্ষুদ্র আত্মত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া পরমাত্মার সহিত যুক্ত হয়, তখনই সে মহান্ সত্যের অধিকারী হয়। এই তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পক্ষে যোগসাধনই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। এই উপায়েই দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। এই দিব্যজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞানের ন্যায় স্থায়ী বস্তু নহে। ইহা মনের একটি ক্ষণিক অবস্থা মাত্র। একপ্রকার উন্মত্ত অবস্থার মধ্যে থাকিয়া দিব্যজ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ মাত্র বিদ্যুতের ন্যায় অনুভূত হয়—দেহপিঞ্জর হইতে মনবিহঙ্গ ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়—মানব-অন্তরে যে দিব্য স্ফুলিঙ্গ অধিষ্ঠিত, তাহার অনন্ত উৎসের সহিত সে মুহূর্ত্তের জন্য মিলিত হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই, যখন জীবাত্মা আবার তাহার নিজত্ব লাভ করে, তখন তাহার এই সসীম অবস্থাতেও অসীমের কথা স্মরণ করিতে পারে। অথচ পূর্ব্বে অসীমে পরিণত না হইয়া অসীমকে জানিবার উপায় ছিল না। তা যদি স্মরণ না হইবে, তবে কি করিয়া প্লোটাইনস্ আপনার সেই তুরীয় অবস্থার কথা অন্যের নিকট পরে বর্ণনা করিতে পারিলেন? তিনি ব্যক্তিরূপে জীবাত্মারূপে পূর্ব্বে যে বিষয়ের জ্ঞানলাভে অসমর্থ

ছিলেন, ব্যক্তিরূপে জীবাত্মারূপে সেই জ্ঞানই আবার অন্যের নিকট বর্ণনা করিতে কি করিয়া সমর্থ হইলেন? সহজ বুদ্ধিতে ইহা বুঝা কঠিন। আত্মজ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবাত্মা যখন অনন্ত আত্মাতে বিলীন হইয়া যায়, তখনকার যে অবস্থা—আর পুনর্ব্বার আত্মজ্ঞানে ফিরিয়া আসিলে যে অবস্থা হয়—এই দুই অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরমাত্ম-ভাবাপন্ন অবস্থা জীবাত্মার আত্মজ্ঞানে প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। জীবাত্মার ধারণাতীত সেই পূর্ব্ব-অবস্থা জীবাত্মা স্মরণ করিবে কি করিয়া? ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক মড্‌স্‌লি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। সাধক ধ্যানযোগে যে সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করেন, তাহা যে সর্ব্বৈব সত্য তাহা না হইতে পারে, নিজের নিজের কল্পনা দ্বারাও কতকটা তাহা অনুরঞ্জিত হয়। তবে, মূলে যে তাহাতে কোন সত্য নাই এ কথাও বলা যায় না। যে সকল সাধারণ আধ্যাত্মিক সত্য সকল-ধর্ম্মেরই পত্তনভূমি তাহাই প্রকৃত আপ্তজ্ঞান। গঙ্গানদী হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া মূল প্রস্রবণ হইতে যতই দূরবর্ত্তী হয়, ততই তাহা কলুষিত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাই বলিয়া গঙ্গানদীর বিশুদ্ধ মাহাত্ম্য একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না।

পূর্ব্বতন খৃষ্টানেরা যোগসাধনে বিশেষরূপে অনুরক্ত ছিলেন। যদিও ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় যোগ-পদ্ধতিটি তাঁহাদের মধ্যে পরিপক্কতা লাভ করে নাই, তথাপি তাঁহারা যে আনন্দের বর্ণনা করেন, তাহা ঋষিদিগের পরিব্যক্ত যোগানন্দেরই কতকটা অনুরূপ।

সেণ্ট অগস্‌টিন ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রেম অর্জ্জন করিবার উদ্দেশে স্বীয় অন্তরে যে প্রকার আকুতি ও অদম্য স্পৃহা অনুভব করিয়াছিলেন তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা তিনি তাঁহার রচিত "মনের কথা প্রকাশ" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমতঃ—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহার পরীক্ষার ভার বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অর্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু

পরিবর্ত্তনশীল, আকৃতিমান আত্মার আকাঙ্ক্ষাকে বুদ্ধিও পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। অবশেষে, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি—উভয় হইতেই আত্মাকে প্রত্যাহার করিয়া এক লম্ফে অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়। তিনি বলেন, "আত্মপ্রত্যয়ের দৃষ্টিতেই আমি যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিলাম—অদৃশ্য বস্তুসকল দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহার উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া অনেকক্ষণ রাখিতে পারিলাম না। আবার আমার দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়িল—আবার আমার পূর্ব্বঅভ্যাস ফিরিয়া আসিল—পূর্ব্ব উপলব্ধির সুখজনক স্মৃতিটি মাত্র রহিল এবং যে বস্তুর আঘ্রাণটি মাত্র পাইয়াছিলাম—সম্পূর্ণ আস্বাদ পাই নাই—সেই বস্তু লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাটিমাত্র রহিয়া গেল। মডস্‌লি ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করেন;—"চিন্তা ও ভাবের একটি বিশেষ বিভাগের উপর মনের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া এবং সেই তন্ময় চেষ্টাকে স্থায়ীভাবে রাখিয়া সেণ্ট অগস্‌টিন সেই চিন্তা ও ভাবকে এরূপ সুতীব্র সপ্তম স্বরে তুলিয়াছিলেন যে অন্যান্য চিন্তা ও ভাবের প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেলে—সেই একদেশবাহী চিন্তাকে দমন করে বা অনুশাসন করে এমন আর কোন চিন্তা ও ভাব রহিল না। এইরূপে, মনের একটা অর্দ্ধ-বাতুলবৎ অর্দ্ধপ্রলাপী অবস্থা উৎপন্ন হইল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার অনির্ব্বাচ্য আধ্যাত্মিক দীপ্তি ও আনন্দের ভাব উপলব্ধি হইতে লাগিল।" সেণ্ট অগস্‌টিন বলেন, "যে শক্তির দ্বারা আত্মা শরীরের সহিত যুক্ত ও জড়িত রহিয়াছে সেই শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারিলেই আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ যে ঈশ্বর তাঁহার সহিত মিলিত হওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই শক্তিকে অতিক্রম করিয়া অধিকক্ষণ থাকা যায় না।" তিনি বলেন "প্রভু তুমি আমার অন্তরতম দেশে এমন একটি ভাবের প্রকাশ করিয়াছ, যাহা সচরাচর অনুভূত হয় না—কিন্তু এই ভাবটি পরিপক্ব হইলে, না জানি মৃত্যুর পরবর্ত্তী জীবনে কি আশ্চর্য্য ভাব ধারণ করিবে—আপাততঃ এই

হীন দেহের ভারে আমি আক্রান্ত—কিছুতেই স্বর্গের দিকে উঠিতে পারিতেছি না—পুনঃ পুনঃ হীন পার্থিব বিষয়ে নামিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছি।” মডস্‌লি বলেন, এই অবস্থা, স্নায়ু-প্রদেশ-বিশেষের অত্যুত্তেজনার ফল; সুতরাং ইহার সহিত শরীরের বিলক্ষণ যোগ রহিয়াছে। অতএব শরীরের বাধা কিরূপে অতিক্রম করা যাইবে? সুতরাং এই অত্যুত্তেজিত অবস্থা অধিক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না।

সেণ্ট অগস্‌টিনের আত্মা যখন এইরূপ ভূমানন্দে পূর্ণ হইত, তখন সেই দুর্লভ মুহূর্ত্তে তিনি ঈশ্বরের যে প্রেমামৃত পান করিতেন তাহার প্রকৃতি কিরূপ? সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের ভাব তিনি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন;—“তোমাকে যখন আমি ভালবাসি, তখন আমি কোন্ বস্তুকে ভালবাসি? সে শরীরের সৌন্দর্য্য নহে, সে তালের সুন্দর সৌসাম্য নহে, সে নয়নরঞ্জন আলোকের উজ্জলতা নহে, সে অগুরুচন্দন পুষ্পের সুগন্ধ নহে, সে শর্করা নহে, মধু নহে, আলিঙ্গন-সুখের উপযোগী দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও নহে। আমি যখন আমার ঈশ্বরকে প্রীতি করি, তখন আমি এই সকল বিষয়ে প্রীতি করি না। কিন্তু, আমি অন্তরাত্মার গভীরতম দেশের এক প্রকার আলোক, সঙ্গীত, সুগন্ধ, সুখাদ্য, আলিঙ্গন উপভোগ করি। সেখানে এমন এক জ্যোতি বিকীরিত হয়, আকাশ যাহাকে ধারণ করিতে পারে না—এমন এক সুস্বর ধ্বনিত হয়, যাহা কাল অপনীত করিতে পারে না—এমন এক সুগন্ধ অনুভূত হয়, নিঃশ্বাস যাহাকে অপসারিত করিতে পারে না—এমন একটি অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়, ভোজনে যাহার লাঘব হয় না—যে আস্বাদটি রসনাতে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে, যাহাতে কখনই অতিতৃপ্তি উৎপন্ন হয় না। আমি যখন আমার ঈশ্বরকে ভালবাসি, তখন আমি এই ভাবেই ভালবাসি।”

সেণ্ট থেরেসার বর্ণিত স্বকীয় জীবনবৃত্তান্তেও এই যোগানন্দের গূঢ় মর্ম্ম উপলব্ধি হয়। সেণ্ট থেরেসার প্রকৃতি শৈশবে অতিশয় কল্পনা-প্রবণ

ছিল—তৎকালে স্পেনদেশে নারীসেবাধর্ম্মী বীরপুরুষদিগের কাহিনী সাধারণ লোকের অত্যন্ত প্রিয় ছিল—থেরেসাও এই সকল কাহিনী গোপনে পাঠ করিতেন এবং এইরূপে তাঁহার কল্পনা-প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার যখন ১৮ বৎসর বয়স, তিন মাস কাল আপনার মনের সঙ্গে যুঝাযুঝি করিয়া অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, "চির-কুমারী ব্রত পালনে তাঁহার ইচ্ছাকে বলপূর্ব্বক নিয়োগ করিবেন।" এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তিনি কুমারী-আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং বিবিধ কঠোরতা আচরণ করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল; ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল—অবশেষে বাধ্য হইয়া বন্ধুগণের আশ্রয়ে তাঁহার নিজালয়ে গমন করিলেন। তাঁহার হৃৎপিণ্ডে একটা বেদনা অনুভূত হইত—মনে হইত যেন কেহ "তীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা কামড়াইয়া ধরিয়াছে।" কিছুই আহার করিতেন না—কেবলই পান করিতেন। চারি দিন ধরিয়া অচেতন ছিলেন। তাঁহার অবস্থা এরূপ গুরুতর হইয়াছিল যে, তাঁহার পরিজনেরা সমস্ত আশা ভরসা ছাড়িয়া তাঁহার সমাধির জন্য গোর প্রস্তুত করিতেছিল; তাঁহার জিহ্বা, নিজের দন্তাঘাতে, খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল; হাত পা মাথা কিছুই নাড়াইতে পারিতেন না—কেবল দক্ষিণ হস্তের একটি আঙ্গুল নাড়াইতে পারিতেন। একটা চাদরে জড়াইয়া তাঁহাকে ইতস্ততঃ লইয়া যাইতে হইত। তিন বৎসর কাল এই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাহার পর আরোগ্যলাভ করিলেন। এই প্রসিদ্ধ স্ত্রীলোকের ধর্ম্মজীবন এইরূপে আরম্ভ হয়। তিনি প্রত্যক্ষ দেবদর্শনাদি করিয়া অতি বিশদরূপে তাহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দশাপ্রাপ্তিকালে তাঁহার যেরূপ আনন্দ হইত তাহা এইরূপ বর্ণনা করেন:—"এইরূপে, আত্মা যখন ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করে, তখন অতীব মধুর অপার আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে বুঝিতে পারা যায়, আত্মায় এক প্রকার অচেতন সুষপ্তির অবস্থা

আসিতেছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়—শরীরের বল চলিয়া যায়—এমন কি, হাত একটু নাড়িতেও অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়; ইচ্ছা না করিলেও আপনা-আপনি চক্ষু বুজিয়া আসে—চক্ষু খোলা থাকিলেও কিছুই দেখা যায় না। কিছুই পাঠ করা যায় না; অক্ষরগুলি অপরিচিতের ন্যায় মনে হয়, চিনিতে পারা যায় না—অক্ষরগুলি যে দেখা যায় না তাহা নহে, কিন্তু বুদ্ধির সাহায্য না পাওয়ায় অনেক চেষ্টাতেও কিছুই বুঝা যায় না। কাণে শোনা যায়—কিন্তু যাহা শুনিতেছি তাহা বুঝা যায় না। ইন্দ্রিয়গণ কোনও কাজে আসে না—কাজে আসা দূরে থাক্, বরং আত্মার কাজে ব্যাঘাৎ করে—উহাদের দ্বারা স্পষ্ট ক্ষতি হয়। কথা কহিতে চেষ্টা করা বৃথা, কারণ কোন কথার ভাব মনে ধারণা হয় না; যদি বা ধারণা হয়, ব্যক্ত করিবার যথেষ্ট বল থাকে না; কারণ, সমস্ত দেহের বল অন্তর্হিত হয়। কেবল যাহাতে করিয়া আত্মার বল বাড়িতে থাকে, তোমার ভাবিবার অবকাশ না হইতে হইতেই সেই অপ্রতিহত-গতি আনন্দ তীব্রভাবে ও দ্রুতভাবে সজোরে তোমার উপর আসিয়া পড়ে। তোমার মনে হয়—যেন একটি মেঘ—যেন একটি বলবান গরুড় পক্ষী উর্দ্ধে উঠিতেছে এবং তাহার পক্ষের দ্বারা তোমাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।" প্রথম যখন এই আনন্দ উপলব্ধি হইত, তখন কোন পরিণাম-ফল প্রকাশ পাইত না—কিন্তু পরে সমস্ত শরীরে বেদনা উপস্থিত হইত—মনে হইত যেন অস্থিগ্রন্থি সকল বিযুক্ত হইয়া যাইতেছে। অপস্মার-রোগের মূর্চ্ছার পর যেরূপ শরীরের অবস্থা হয়, ইহাও সেই প্রকার।

থেরেসার যে সকল ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরু ও আচার্য্য ছিলেন, থেরেসার এই অভূতপূর্ব্ব আন্তরিক উচ্ছ্বাসের প্রকৃত ভাব কিছুই বুঝিতে পারিতেন না—ইহার আসল প্রকৃতি কি, সে বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। থেরেসার অবস্থা-বিষয়ে একটি স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত

হইবার জন্য ৫।৬ জন শাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিতের দস্তুরমত পরামর্শ-সমিতি বসিল। তাঁহারা স্থির করিলেন, থেরেসাকে সয়তানে পাইয়াছে—এবং তাঁহারা থেরেসাকে এই উপদেশ দিলেন, যেন সে কোন বিষয়ে একাগ্র-চিত্ত না হয়—নানা বিষয়ে মন দিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত রাখিবার চেষ্টা করে ও কদাপি যেন একাকী বিজনে না থাকে। তাঁহার কোন কোন উপদেষ্টা মনে করিলেন, দশাপ্রাপ্তির সময় থেরেসার অন্তরে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয় বটে, কিন্তু সেই সময় যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা কতকটা ইন্দ্রিয়লালসা-রঞ্জিত। অতএব, থেরেসার শারীরিক নির্য্যাতন প্রভৃতি কঠোর তপশ্চর্য্যা অধিকতররূপে সাধন করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের নরদেহধারী অবতার খৃষ্টকে প্রীতি করিতে হইলে কতকটা যে পার্থিব প্রেমের ছায়া আসিয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি!—থেরেসা বলেন, উহা অনিবার্য্য। তিনি বলেন "অনেকে বলে, আত্মাকে বায়ুর মধ্যে বিচরণ করাইবে—কিন্তু আত্মা যতই ঈশ্বরের আবির্ভাবে পূর্ণ হউক না—আত্মা একেবারে হাওয়ার উপর থাকিতে পারে না—একটা পার্থিব ভিত্তির উপর ভর দিয়া থাকা আবশ্যক।……আমরা তো আর এঞ্জেল নই—আমাদের শরীর আছে—পৃথিবীতে থাকিয়া আপনাকে এঞ্জেল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা—ইহা অপেক্ষা বাতুলতা আর কিছুই নাই।"

আর একটু অধিক বয়সে, থেরেসা যখন একটা কুমারী-আশ্রমের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তখন হিষ্টিরিয়া-রোগগ্রস্ত অনেকগুলি আশ্রম-ধারিণীর দশাপ্রাপ্তির সময়ে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। তখন তিনি বুঝিলেন, এই অবস্থাতে সকল সময়ে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয় না। কখন কখন সয়তানেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। আশ্রমধারিণী চিরকুমারীরা অনেক সময়ে খৃষ্টকে পতিরূপে বরণ করে—কাজেই তাহাদের প্রেমে আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা পার্থিবতা অধিক পরিমাণে থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! আমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও

কৃষ্ণপ্রেমের এইরূপ পার্থিব ভাব বর্ত্তমান। সেণ্ট অগষ্টিনের "মনের কথা প্রকাশ" পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি তাহাতে এক এক স্থলে যে আনন্দের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে জঘন্য ইন্দ্রিয়-লালসার গন্ধ পাওয়া যায়—এমন কি তাহা বিশুদ্ধমনা যুবক যুবতীদিগের পাঠেরও অযোগ্য। তাই, কোন জর্ম্মণ গ্রন্থকার বলিয়াছেন "রুসো সর্ব্ব-সাধারণের নিকট মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সেণ্ট অগষ্টিন ঈশ্বরের নিকট মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন"।

কিন্তু আমাদের দেশের ঋষিরা উপনিষদে যে যোগানন্দ—ভূমানন্দের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা কেমন আধ্যাত্মিক—কেমন উন্নত—কেমন বিশুদ্ধ—তাহাতে পার্থিবতার লেশমাত্র নাই। সেই ঋষিদিগের স্বর্গীয় আনন্দের সহিত পার্থিব কোন সুখের তুলনা হয় না বলিয়া তাঁহারা উহা তন্নতন্নরূপে বর্ণনা করিবার চেষ্টা পান নাই, কেবলমাত্র বলিয়া গিয়াছেন—উহা অনির্ব্বচনীয়।

—o—

আবেদন,—না আত্মচেষ্টা ?

স্বদেশের উন্নতি-কল্পে কোন্ পন্থা প্রশস্ত এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে যে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে, ইহা একটী শুভ চিহ্ন বলিতে হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, আমাদের অসাড় সমাজদেহে একটু চেতনার সঞ্চার হইয়াছে। আমাদের ন্যায় অন্ন-মৎস্যাহারী ক্ষুদ্রকায় একটী আসিয়িক জাতির অভিনব অসাধারণ অভ্যুদয় ও উন্নতির যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এক্ষণে আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, উহাই আমাদিগকে একটু উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে সন্দেহ নাই। কোন্ পথে গেলে, উহাদের ন্যায় আমরাও আবার উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতে পারিব সেই বিষয় আমাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আগ্রহের সহিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুখের বিষয়, ইহাতে নীচ দলাদলীর গন্ধ মাত্র নাই, কিসে স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ হয়, ইহাই সকলের আন্তরিক কামনা।

একদল বলিতেছেন, রাজদ্বারে আমাদের দুঃখ নিবেদন করা, রাজ-পুরুষদিগের কার্য্যের প্রতিবাদ করা, তাঁহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রবুদ্ধ করা, বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাই আমাদের মুখ্য কার্য্য; উন্নতি সাধনের অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা আমাদের গৌণ কর্ত্তব্য। স্পষ্ট এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে ব্যক্ত না করিলেও, তাঁহাদের কার্য্যে, তাঁহাদের অনুষ্ঠান উদ্যোগে, এই কথারই আভাস পাওয়া যায়।

আর একদল বলেন, শুধু আবেদন নিবেদনে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যদি আমরা নিজের চেষ্টায় নিজের অভাব স্বল্পমাত্রও পূরণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের আত্মনির্ভরের শিক্ষা হয়, আমরা আত্মসম্মান ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি, নিজস্ব বলে বলীয়ান হইতে পারি, জাতীয় গৌরবের প্রথম সোপানে পদার্পণ

করিতে পারি, প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি। "যাঁহারা সাধনার দ্বারা, ইংরাজি শিক্ষিত সমাজের চিত্তকে স্বদেশের কার্য্যে চালিত করিয়াছেন, স্বদেশের কার্য্যে একাগ্র করিবার আয়োজন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি ভক্তির সহিত নমস্কার করি। তাঁহারা যে পথে গিয়াছিলেন, সে পথে যাত্রা যে ব্যর্থ হইয়াছে, এ আমি কখনই বলিব না।

তখন সমস্ত দেশের ঐক্যের মুখ রাজদ্বারেই ছিল। কিন্তু যখন আমাদের হৃদয় নিজের মধ্যে সেই উপায়ে একটা বিপুল ঐক্যের আভাস উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, যাহা বিচ্ছিন্ন ছিল তাহা ঐক্যের অমৃত কথার আস্বাদে যখন আপনার মধ্যে আপনার যথার্থ বল অনুভব করিতে পারিতেছে, তখন সে আপনার সমস্ত শক্তিকে রাজপুরদ্বারে ভিক্ষাকুণ্ডের মধ্যে নিঃশেষিত করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। এখন যে চিরন্তন সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছি—এখন সে আত্মশক্তি—আত্মচেষ্টার পথে সার্থকতা লাভের দিকে অনিবার্য্য বেগে চলিবে—কোন একটা বিশেষ মুষ্টিভিক্ষা বা প্রসাদ লাভের দিকে নহে।"

অপর দলের মুখপাত্র শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায় মহাশয় আবেদন-নিবেদনের পক্ষ সমর্থন করিয়া পরিশেষে বলিতেছেন;—"আমাদের সকলেরই আত্মোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের নৈতিক শক্তির বিকাশের জন্য যথেষ্ট প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

তবেই, প্রকারান্তরে উনিও স্বীকার করিতেছেন শুধু আবেদন-নিবেদনের কার্য্যে আমাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত করিলে চলিবে না,—আত্মচেষ্টা আবশ্যক।

আসল কথা, এই দুই দলের মধ্যে বাস্তবিক-পক্ষে কোন মত-পার্থক্য নাই, যাহা কিছু প্রভেদ মুখ্য গৌণ লইয়া।

তবে "আবেদন নিবেদনের" কাজকে ভিক্ষাবৃত্তি বলায়, "ব্যাধি ও

চিকিৎসার” লেখক মহাশয় আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে, আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায়, ইহা ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন আর কি ? যখনি ইংরাজেরা আমাদের দেশ জয় করিলেন এবং যখনি আমরা পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পদানত৷ হইলাম, তখন হইতেই আমরা বাধ্য হইয়া আমাদেব সমস্ত ন্যায্য অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছি। এখন আমরা যাহা কিছু তাঁহাদিগের নিকট পাইতেছি সে কেবল তাঁহাদের অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? এখন অধিকার সমর্থনের কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে বলের অকাট্য যোগ। যেখানে বল নাই সেখানে অধিকার কোথায় ? অবশ্য বিধাতা প্রত্যেক মনুষ্যকে, প্রত্যেক জাতিকে কতকগুলি স্বাভাবিক অধিকারে অধিকারী করিয়াছেন ; কিন্তু সে অধিকার রক্ষা করা না করা আমাদের নিজের হস্তে। একটা সংস্কৃত বচন আছে “দেবা দুর্ব্বলঘাতকাঃ।” দুর্ব্বলের প্রতি দেবতারাও বিমুখ।

ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, কেবল বলের দ্বারাই এবং বহুকাল যুঝাযুঝি করিয়াই রাজাপ্রজা পরস্পরের অধিকার নির্দ্ধারিত হইয়া অবশেষে তাঁহাদেব মধ্যে একটা যোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। এখন ইংলণ্ডের রাজা প্রায় সাক্ষীগোপাল, প্রজারাই সর্ব্বেসর্ব্বা। এখন রাজার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রজার কোন বিবাদ নাই। প্রজাদের মধ্যেই দুই তিনটা দল আছে, তাহাদেরই মতামত লইয়া যাহা কিছু বাদ বিসম্বাদ চলিয়া থাকে। প্রজাদের মধ্যে যে সময়ে যে পক্ষ প্রবল হয় সেই রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব লাভ করে ; কিন্তু পুর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট রাজার নিজস্ব অধিকার বজায় রাখিয়া, সর্ব্বসাধারণ প্রজাদের অধিকার বিস্তারের চেষ্টায় ইংলণ্ডে যে আন্দোলন চলিয়া থাকে তাহাকেই Constitutonal agitation অর্থাৎ রাষ্ট্রতন্ত্র-সম্মত

আন্দোলন বলে। আমরাও এক্ষণে তাঁহাদের দেখাদেখি এই রাজ-নৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই, ইংলণ্ডের রাজ্যতন্ত্র ও আমাদের রাজ্যতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ইংলণ্ড স্বাধীন, আমরা পরাধীন, ইংলণ্ড বিজয়ী আমরা বিজিত। তাঁহাদের মধ্যে যে রাজ-নৈতিক আন্দোলন ফলপ্রদ, আমাদের মধ্যে সে রাজনৈতিক আন্দোলন ফলপ্রদ নহে।

আমরা ক্রন্দন করিব কাহার নিকট? ইংলণ্ডের রাজ্যতন্ত্র-অনুসারে, শাসন-বিষয়ে আমাদের রাজার ব্যক্তিগত কোন ক্ষমতা নাই। তাঁহার দয়া উদ্রেক করিয়া কোন ফল নাই। পার্লামেণ্টই আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। ইংলণ্ডের জনসাধারণ হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়াই ঐ মহাসভা গঠিত। এতএব জনসাধারণের মধ্যে যে ভাব ও মতামত প্রবল থাকে তাহার দ্বারাই সমস্ত পার্লমেণ্টের রাষ্ট্রনীতি অনুরঞ্জিত হয়। এক্ষণে ইংরাজ-জাতির যেরূপ ভাব ও মতামত তাহাতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট হইতে আমরা কি কিছু বিশেষ অধিকার লাভের প্রত্যাশা করিতে পারি?

হিন্দু রাজত্বের সময় প্রজার উপর হিন্দুরাজারও অসীম প্রভুত্ব ছিল বটে; কিন্তু, পুত্রের উপর পিতার যেরূপ অসীম প্রভুত্ব, উহা সেইরূপ প্রভুত্ব। তখন রাজাপ্রজার মধ্যে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ—একটী স্নেহের সম্বন্ধ ছিল। পুত্রবৎ প্রজা পালন করা কর্ত্তব্য—এই সনাতন রাজধর্ম্মের উপরেই তখনকার রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, বলার্জ্জিত অধিকারের উপরে নহে। আমাদের দেশে, প্রজার রঞ্জনার্থেই রাজা নামের সার্থ-কতা। রাজা রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য কি না করিয়াছিলেন? তখন রাজার স্বার্থ প্রজার স্বার্থ এক ছিল। সুসময়ে প্রজার নিকট রাজা যে কর চাহিতেন, তাহা তাঁহাকে প্রজা অকাতরে দান করিত! কেন না, তাহারা

বেশ জানিত, অসময়ে রাজাই তাহাদিগকে আবার রক্ষা করিবেন। তাহারা জানিত, তাহাদের প্রদত্ত ধন তাহাদের দেশেই ব্যয় হইবে। অথবা সেই ধনে রাজা যে কোন অনুষ্ঠানই করুন না কেন, তাহারাও কতকটা তাহার ফলভাগী হইবে। কোন অভাব বোধ করিলে, কিম্বা বিপদে পড়িলে, পুত্র যেরূপ পিতার নিকট আবদার করিয়া কিছু চাহে কিম্বা সাহায্য প্রার্থনা করে, প্রজারাও রাজার নিকটে ঠিক সেই ভাবেই প্রার্থনাদি করিত। তাহাতে ভিক্ষার ভাব কিছুই ছিল না, হীনতার ভাব কিছুই ছিল না। মোগল রাজত্বের অভ্যুদয় কালেও রাজা প্রজার মধ্যে এইরূপ পিতাপুত্রের সম্বন্ধ কতকটা বজায় ছিল। তাহার কারণ, মোগল রাজারা এই দেশেই বাস করিতেন, তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য এই দেশেই ব্যয় হইত। প্রজা বলিয়াই প্রজার উপর তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল। আকবর বাদশা হিন্দু প্রজার মনোরঞ্জনার্থ হিন্দু পরিচ্ছদাদি ধারণ করিতেন; এমন কি, রাজ্যমধ্যে গোহত্যা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা আইন-যন্ত্র পরিচালিত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না; তাঁহাদের শাসনকালে তাঁহাদের ব্যক্তিগত দয়া ও ন্যায়পরতা আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিতাম। পাছে কোন সামান্য প্রজা সুবিচার হইতে বঞ্চিত হয়, এই জন্য জাহাঙ্গির বাদশা তাঁহার প্রাসাদ-কক্ষে শৃঙ্খলবদ্ধ একটা ঘণ্টা রাখিয়াছিলেন, বাহিরের শৃঙ্খলটি ধরিয়া কেহ নাড়িলেই বুঝিতে পারিতেন তাঁহার নিকট কোন ব্যক্তি বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছে।

ইংরাজ-রাজের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ উহা পিতাপুত্রের সম্বন্ধ নহে, উহা বিজয়ী-বিজিতের সম্বন্ধ, ক্রেতা-বিক্রেতার সম্বন্ধ; এক কথায় নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থের সম্বন্ধ; উহাতে হৃদয়ের তিলমাত্র সংশ্রব নাই। লর্ড কর্জ্জন সেদিন ইংলণ্ডে কোন সভায় বলিয়াছিলেন, ভারত-রাজ্য শাসনে ভারতের হৃদয় স্পর্শ করা আবশ্যক। একথা খুবই ঠিক। কিন্তু তিনি

যদি বুঝিয়া থাকেন, দিল্লি-দরবারের ন্যায় বিপুল আড়ম্বরেই ভারতের হৃদয় স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি ভারি ভুল বুঝিয়াছেন। প্রথমতঃ, মোগলের অনুকরণ করিয়া, দিল্লির দরবারে তিনি যে আড়ম্বর ঘটার চেষ্টা করিয়াছিলেন, মোগল রাজত্বের সময়ে, একটা সামান্য উৎসবে যে ঘটা হইত, তাহার তুলনায় উহা কিছুই নয় বলিলেও হয়। তাছাড়া সে সকল উৎসবের বাহ্য আড়ম্বরের ভিতরেও একটা প্রাণ ছিল—সহৃদয়তা ছিল। তাহাতে লোকের যে শুধু চক্ষু কর্ণ তৃপ্ত হইত তাহা নহে, তাহাতে তাহাদের হৃদয়ও মুগ্ধ হইত। গরিব দুঃখী কাঙ্গাল-দিগকে মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া, সরকারের হিতৈষী যোগ্য ব্যক্তিদিগকে উচ্চপদে উন্নীত করিয়া, সারবান প্রসাদ বিতরণ করিয়া মোগল সম্রাট্, প্রজাদিগের অকৃত্রিম আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিতেন।

পক্ষান্তরে, প্রথম হইতেই ইংরাজ এদেশে বণিক্‌ভাবে প্রবেশ করিয়াছেন, এখনও বণিক ভাবেই রাজ্য চালাইতেছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য-কার্য্য বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের বণিক-নীতি এখনও কার্য্যতঃ অক্ষত রহিয়াছে। ইংরাজের রাজত্ব বণিক-নীতি অনুসারেই চলিতেছে। ইংরাজ ভারতের তেত্রিশ কোটি অধিবাসীকে প্রজাভাবে যতটা না দেখেন, তদপেক্ষা তাঁহাদের রপ্তানি মালের ক্রেতার হিসাবে দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদের চক্ষে, ভারত অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের নিবাস-ভূমি, একটি বিপুল রাজ্য নহে—উহা তাঁহাদের মাল কাটাইবার একটি মহা-বিপণি। এই ভাবে দেখেন বলিয়াই, ভারতীয় প্রজার স্বার্থের অপেক্ষা, ল্যাঙ্কেষ্টারের স্বার্থ তাঁহাদের নিকট গুরুতর বলিয়া বোধ হয়; এই ভাবে দেখেন বলিয়াই, সেদিন লর্ড কর্জ্জন, ইংরাজ প্ল্যাণ্টারের খাতিরে, দেশীয় কুলী প্রজার দুঃখ দুর্দ্দশার কিঞ্চিৎ উপশম করিতেও সাহসী হইলেন না। এই বণিক-নীতি অবলম্বন করিয়াই, নিজ স্বার্থ সাধনার্থ, ইংরাজ এদেশের কত শিল্প বিদলিত

করিয়াছেন, এখনও দেশীয় ব্যবসায়ের উন্নতি পক্ষে কত বাধা দিতেছেন। যতটুকু শিক্ষা দিলে, অল্প বেতনের কেরাণী পাওয়া যায় ততটুকু শিক্ষা দেওয়াই এখন তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায়; এইরূপ উচ্চ শিক্ষার পথে নানাপ্রকার কণ্টক রোপণ করিতেছেন। আমরা মনে করি, ইংলণ্ডে যখন Constitutional agitation করিয়া ইংলণ্ডের প্রজাবৃন্দ এত অধিকার লাভ করিয়াছে, তখন সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে আমরাও কেন না সফল হইব ' কি বিষম ভুল! ইসপ-কথামালার সেই রজকের ভারবাহী হেয় পশু এবং তাঁহার আদরের ও সখের গৃহ-প্রহরী জীব—এই উভয়ের প্রতি তাঁহার কিরূপ বিভিন্ন ব্যবহার এই প্রসঙ্গে কি তাহা স্মরণ হয় না? চিরঅনাথ মাতৃহীন অবোধ শিশু নিজ জননী মনে করিয়া, স্নেহাকাঙ্ক্ষায় বিমাতার ক্রোড়ে বারবার যেরূপ ঝাঁপাইয়া পড়ে, ও বারবার প্রত্যাখাত হইয়াও সে যেমন প্রকৃত অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারে না, আমাদেরও এক্ষণে সেই দশা হইয়াছে।

তাছাড়া, ইংলণ্ডে এখন "সাম্রাজ্যিকতার" ধুয়া উঠিয়াছে, ইংলণ্ডের স্বার্থপরতা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছে। যে ইংলণ্ড এক সময়ে স্বাধীনতার লীলাভূমি ছিল, পৃথিবীর দাসত্ব মোচনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, সেই ইংলণ্ড সেদিন নিজ স্বার্থের জন্য বলপূর্ব্বক চীনদেশে অহিফেন প্রবেশ করাইতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইংলণ্ডের দার্শনিক পণ্ডিত হর্বর্ট স্পেনসার সেদিন তাঁহার Facts and comments নামক গ্রন্থে, ইংলণ্ডের কতদূর নৈতিক অবনতি হইয়াছে তাহা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন। এখনকার পার্লেমেণ্টে, সে দিন্‌কার ব্রাইট্ গ্লাডষ্টোনের—মত লোকই বা কোথায়? আর তাঁহারা থাকিতেই বা ভারতের হিতের জন্য কতটুকু করিতে পারিয়াছিলেন? প্রাতঃস্মরণীয় ভারতহিতৈষী মহাত্মা লর্ড রিপণ ভারতের জন্য

যে হিতকর ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহা কি শেষে রক্ষিত হইল ?

আসল কথা, যতটুকু স্বকীয় স্বার্থের অনুকূল, ততটুকুই ইংরাজ আমাদের জন্য করিয়াছেন ও এখনও করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহার অধিক নহে। আমরা যদি তাঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি ও ন্যায়পরতার দোহাই না দিয়া, তাঁহাদের স্বার্থের দিক দিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারি, বরং তাহাতে কিছু কাজ হইতে পারে। কিন্তু এসময়ে তাহা বুঝানও বড় সহজ নহে। যখন তাঁহারা আপনারা বুঝিবেন, ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ মহামারীতে প্রভূত লোকক্ষয় হইতেছে, করভারে প্রপীড়িত হইয়া ভারতবাসী দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে এবং এই কারণেই তাঁহাদের রপ্তানি মালের তেমন কাট্‌তি হইতেছে না, তখন তাঁহাদের একটু চেতনা হইবে, তখন তাঁহারা আপনা হইতেই আমাদের দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবেন—আমাদের দুঃখদুর্দ্দশা প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিবেন। এখন আমরা তাঁহাদের নিকট যতই ক্রন্দন করি তাহাতে কোন ফল হইবে না।

কি কন্‌সর্বোটিভ কি লিবর‍্যাল ইংলণ্ডের যে কোন পক্ষই কর্ত্তৃত্ব লাভ করুক, ইঁহাদের কাহারও আমলে ‘অস্ত্র-আইন’ রহিত হইবার কি কোন সম্ভাবনা আছে ?—ভারতের আয়ব্যয়ের উপর আমাদের বাস্তবিক কর্ত্তৃত্ব লাভের কি কোন আশা আছে ? ভারতের স্বার্থের উদ্দেশে ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থ উপেক্ষিত হইবে এরূপ কখন কি আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি ? পার্লেমেণ্টে দুই একটা প্রশ্ন উত্থাপিত করিতে পারিলেই কি আমরা কৃতার্থ হইব ?—ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আর দুই একজন সদস্য বাড়িলেই কি আমাদের চতুর্বর্গ ফল লাভ হইবে ? তবে সুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের উপরেই আমাদের কেন অত আস্থা ? আবেদন নিবেদন অথবা প্রতিবাদ যে আমরা

একেবারেই করিব না আমি এ কথা বলি না—উহাতেই আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যম, সমস্ত অর্থ ব্যয় না করি, আমার বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য।

এখন তবে আমরা করিব কি ?—এ সময়ে আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্য কি ? আমাদের সমস্ত অর্থ ও উদ্যম কেবল আবেদন নিবেদনে নিঃশোষিত না করিয়া, রাজসরকারের একান্ত মুখাপেক্ষী না হইয়া, যাহাতে নিজের চেষ্টায় আত্মবলসঞ্চয় করিতে পারি তাহাই কি এখন আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্য নহে ? রাজসরকার নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন না বলিয়া আমরা কি একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব ? "ব্যাধি ও চিকিৎসার" লেখক মহাশয় ঐ মর্ম্মে বলেন,—"আমরা রাজসরকারকে এত কর দিতেছি, তাঁহাদের নিকট হইতে তদনুরূপ কাজ আদায় না করিয়া, যদি তাঁহাদের কর্ত্তব্য কাজগুলি আমরা করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের দোকর খরচ হইবে। এই দরিদ্র দেশে অত টাকা কোথায় ?" কিন্তু রাজসরকার তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিতেছেন না বলিয়া, তাঁহাদিগের নিকট সেই বিষয় আবেদন করিবার জন্য, তাঁহাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, প্রতি বৎসরে আমরা যে সার্দ্ধলক্ষেরও অধিক টাকা খরচ করিয়া থাকি, উহাও কি দোকর খরচ নহে ? সুধু আবেদনের কার্য্যে ঐ টাকা নিঃশোষিত না করিয়া, দেশের বাস্তবিক কোন হিতকর অনুষ্ঠানে উহার কিয়দংশ নিয়োগ করিলে কি ভাল হয় না ?

(আমি কংগ্রেসের বিরোধী নহি। আমি কংগ্রেসের একজন ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরবের বিষয় মনে করি। কংগ্রেসের দ্বারা দেশের বাস্তবিকই একটা মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। ইংরাজের নিকট হইতে দুই একটা প্রসাদ অর্জ্জন করা অপেক্ষা তাহার মূল্য আমি অধিক বিবেচনা করি। কংগ্রেস ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ্দ

ও একতার পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। এই কংগ্রেসকে ধ্বংস না করিয়া যাহাতে ইহার চেষ্টা উদ্যম বাঞ্ছিত পথে চালিত হয়, তৎপ্রতি স্বদেশ-বৎসল ব্যক্তিমাত্রেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর নির্ভর না করিয়া, কিসে এদেশে ব্যবসায় শিল্পের উন্নতি হয়, সাধারণ শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার হয়, অন্নকষ্ট দূর হয়, স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, নৈতিক ও দৈহিক বল সঞ্চিত হয়, ইতর-সাধারণের সহিত শিক্ষিত-মণ্ডলীর যোগ নিবদ্ধ হয়, এই সকল বিষয় লইয়া কংগ্রেস যদি আলোচনা করেন, উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এই জাতীয় মহাসভার যে সম্পূর্ণ সার্থকতা ও গৌরব বৃদ্ধি হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অধীন জাতি যতই চেষ্টা করুক না কেন, স্বীয় আকাঙ্খানুরূপ উন্নতি কখনই সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে না সত্য। তবে এ কথাও ঠিক্, আবেদন নিবেদনের উপর একান্ত নির্ভর না করিয়া, আত্মচেষ্টায় আমরা আপনাদের যতটুকু উন্নতি সাধন করিতে পারি, ততটুকুই আমাদের পক্ষে প্রকৃত মঙ্গল—তাহাতে আমাদের আত্মবল সঞ্চয় হয়—আত্মপ্রসাদ লাভ হয়।

যদিও স্বাধীন জাপানের সহিত, পরাধীন ভারতের তুলনা হয় না, তথাপি যে পথ অনুসরণ করিয়া এই আসিয়িক জাতি এত অল্প কালের মধ্যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে সেই পথটি কি তাহা আমাদের সকলেরই একবার আলোচনা ও চিন্তা করা কর্ত্তব্য। সে পথটী শিক্ষার পথ—সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার পথ।

জাপান-সম্রাট মিকাডো, টোকিও নগরে পাঠশালা ও উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়া, রাজ্যের পূর্ব্বতন অভিজাতবর্গের নিকট শিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল হস্তগত করিবার নিমিত্ত আর কিছুই

করিবার আবশ্যক নাই, কেবল জ্ঞানকে পরিস্ফুট ও হৃদয়ের বৃত্তি-সকলকে পরিমার্জ্জিত করা আবশ্যক। আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে; শিক্ষার উদ্দেশে বিদেশে গমন করিতে হইবে এবং সমস্তই হাতে-কলমে শিখিতে হইবে। গৃহে শিক্ষা করিবার বয়স যাহার অতীত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে বিদেশভ্রমণই যথেষ্ট; দেখিয়া শুনিয়া তাহাদিগের জ্ঞান-চক্ষু প্রসারিত হইবে এবং তাহাদের বুদ্ধি উন্নত হইবে। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার কোন পদ্ধতি নাই। সে কারণেও তাহাদের অনেকের মধ্যে বুদ্ধির অভাব লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত, শিশুদিগের শিক্ষার সহিত তাহাদিগের মাতাদিগের শিক্ষার একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এ বিষয়টি নিতান্ত গুরুতর বিষয়। সেই জন্য যাহারা আপন আপন স্ত্রী কন্যা ভগিনীগণকে সঙ্গে করিয়া বিদেশে গমন করে, তাহাদিগের আচরণে তিলমাত্র আপত্তি হইতে পারে না। তাহা হইলে, বিদেশে স্ত্রীশিক্ষার উৎকৃষ্ট পত্তনভূমি কিরূপ, এবং শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার প্রকৃত পদ্ধতি কি, এই সমস্ত তাহারা অবগত হইতে পারে। তোমরা সকলেই যদি এই বিষয়ে মনোযোগী হও, তাহা হইলে সভ্যতা-পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। আমরা সহজেই অর্থ ও বলের মূল পত্তন করিতে সমর্থ হইব এবং অনায়াসেই পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত সমকক্ষভাবে টক্কর দিতে পারিব। অতএব, তোমরা আমাদের এই সকল বাসনাকে তোমাদের হৃদয় মধ্যে ভাল করিয়া স্থান দেও। যাহাতে আমাদের এই মনস্কামনা পূর্ণ হয় তদ্বিষয়ে সাহায্য করিতে তোমরা প্রত্যেকে যথাসাধ্য চেষ্টা কর।"

এই নীতি অনুসরণ করিয়া জাপান আজ কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে আমরা সকলেই তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতেছি। পুনর্ব্বার

বলিতেছি, যদিও স্বাধীন জাপানের সহিত আমাদের তুলনা হয় না, যদিও জাপানীদিগের ন্যায় আমাদের কার্য্যদক্ষতা নাই, দৃঢ়তা নাই, অর্থবল নাই, নৈতিক বল নাই, স্বদেশবাৎসল্য নাই, তথাপি এই পরীক্ষিত মার্গটি অনুসরণ করিলে শুধু আবেদন নিবেদন অপেক্ষা আমাদিগের যে অধিক ফললাভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুখের বিষয় এই মার্গ অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদের আত্মচেষ্টার একটা পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। ভরসা করি ইহা কালে সুফল প্রসব করিয়া আমাদের চিরআশা পূর্ণ করিবে।

—o—

স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ।

(হর্বর্ট স্পেনসরের মত)

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই সমাজের প্রধান উপকরণ; কোন সমাজের অন্তর্ভূত স্ত্রী ও পুরুষের যেরূপ প্রকৃতি, তদনুসারে সেই সমাজের গঠন ও অনুষ্ঠান-সকলও কতকটা অনুরঞ্জিত হইয়া থাকে। তাই, এই প্রশ্নটি উপস্থিত হয়—স্ত্রী ও পুরুষ জাতির প্রকৃতি কি একই? সমাজ তত্ত্ববিৎ-দিগের নিকট এই প্রশ্নটি একটি অতি গুরুতর প্রশ্ন। যদি উভয়ের প্রকৃতি সমান হয়, তবে কোন০ সমাজে স্ত্রীজাতির প্রভাব বৃদ্ধি হইলে সেই সমাজের আদর্শে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হওয়া সম্ভব নহে, আর যদি উভয়ের প্রকৃতি সমান না হয় তবে স্ত্রীজাতির প্রভাব-বৃদ্ধি সহকারে সেই সমাজের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইবার কথা।

শারীরিক বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষ সমান এ কথা যেমন অসত্য, মানসিক বিষয়েও এ কথা তেমনি অসত্য। বংশ-সংরক্ষণে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাহার যে বিশেষ কাজ ও তদনুসারে যেরূপ তাহাদের মধ্যে শারীরিক প্রভেদ—সেইরূপ সন্তানপালনে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যাহার যেটুকু বিশেষ কাজ তদনুসারে তাহাদের মানসিক গঠনেরও ভিন্নতা উপলব্ধি হয়। ইহা যদি মনে করা যায় যে, উহাদের উভয়ের মধ্যে সন্তানবিষয়িণী উদাম-চেষ্টার তারতম্য আছে, অথচ মানসিক শক্তি ও প্রবৃত্তিবিষয়ে কোন প্রভেদ নাই, তাহা হইলে প্রকারান্তরে বলা হয়, প্রকৃতি এই স্থলেই একটী নূতন নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন; অর্থাৎ বিশেষ কার্য্যের জন্য যে বিশেষ শক্তির আবশ্যক যাহা অন্য সর্ব্বত্র দেখা যায়, প্রকৃতি এই স্থলেই তাহার ব্যতিক্রম করিয়াছেন। স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির মধ্যে শারীরিক ও মানসিক গঠন সম্বন্ধে দুই শ্রেণীর প্রভেদ লক্ষিত হয়। পিতার উপযোগী কর্ত্তব্য ও মাতার উপযোগী কর্ত্তব্য তাহার মূলে

ইত। পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে স্ত্রীলোকের ব্যক্তিগত বিকাশ অপেক্ষাকৃত একটু শীঘ্র বন্ধ হইয়া যায়; সন্তান-উৎপাদনে যে জীবনীশক্তি পরে ব্যয় হয় তাহা এইরূপে পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাবৎ না পুরুষের দেহ-পুষ্টি ও দেহ-বৃদ্ধিরূপ আয়-ব্যয়ের মধ্যে কতকটা সমতা হইয়া আসে, তাবৎ পুরুষের ব্যক্তিগত বিকাশ-ক্রিয়া চলিতে থাকে, কিন্তু স্ত্রীলোকের ব্যক্তিগত বিকাশ থামিয়া গেলেও অনেকটা তাহার শারীরিক পুষ্টির সংস্থান অবশিষ্ট থাকে; তাহা না হইলে সন্তানোৎপাদনের কোন সম্ভাবনা থাকিত না। এই জন্যই বালক অপেক্ষা বালিকারা শীঘ্র পরিপক্কতা লাভ করে। এবং এই জন্যই তাহাদের মধ্যে দৈহিক গঠনের এত প্রভেদ; দেহের যে সকল অঙ্গের সাহায্যে বাহিরের কার্য্য সকল সম্পাদিত হয় এবং শারীরিক শক্তির অধিক ব্যয় হয় সেই হস্তপদবক্ষদেশাদির অপেক্ষাকৃত বিশালতা পুরুষদেহে লক্ষিত হয়। এবং এই জন্যই স্ত্রীলোকেরা সকল সময়েই বিশেষতঃ সন্তানোৎপাদনের উপযোগী বয়সে, শরীরের গুরুতার তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ আঙ্গারিক অম্ল নিশ্বাস দ্বারা পরিত্যাগ করে; ইহাতে এই প্রকাশ পায় যে স্ত্রীলোকদিগের দৈহিক শক্তির বিকাশ স্বধু আপেক্ষিকরূপে কম নহে—আসলেই কম। স্ত্রীলোকের ব্যক্তিগত বিকাশ অপেক্ষাকৃত শীঘ্র থামিয়া যাওয়ায় তাহাদের দেহের স্নায়ব-পৌশক তন্ত্র ততটা বৃদ্ধি পাইতে পারে না—একটু ক্ষুদ্রাকারের হয়; সুতরাং, যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-সকল দেহের কাজ করে এবং যে মস্তিষ্ক অঙ্গপ্রত্যঙ্গদিগকে কাজ করায়—এ উভয়ই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে, এবং এই কারণে স্ত্রীলোকের মনের উপর দুইটি ফল হয়। তাহাদের মানসিক বৃত্তি-সমূহের প্রকাশে তেমন শক্তিমত্তা বা বিশালতা উপলব্ধি হয় না; এতদ্ব্যতীত মানবীয় ক্রমবিকাশের যে দুইটি চরম ফল,—বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাববৃত্তি, এই উভয় বৃত্তিতেই কিঞ্চিৎ ন্যূনতা দৃষ্ট হয়; সূক্ষ্মতম তাত্ত্বিক

যুক্তি তাঁহারা বুদ্ধি দ্বারা তেমন গ্রহণ করিতে পারেন না। যে অনুরাগ-বিরাগ ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি অনুভূত হয় তাহাই তাঁহারা বুঝিতে পারেন; কিন্তু ন্যায়পরতা কিনা ব্যক্তিগত অনুরাগ-বিরাগের উপর একান্ত নির্ভর করে না, তাই সে ভাবটি তাঁহারা চট্ করিয়া ধরিতে পারেন না।

এ-ত গেল স্ত্রীপুরুষের পরিমাণ-গত প্রভেদ। এখন প্রকৃতিগত প্রভেদ কি তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ ও স্ত্রী-পুরুষের সহিত নিজ সন্তানের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ হইতেই এই প্রকৃতিগত প্রভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। অপত্য স্নেহের গোড়া ধরিতে গেলে উহা নিরুপায় ও নিরাশ্রয়ের প্রতি ভালবাসা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই অপত্যস্নেহ যদিও পিতামাতা উভয়েতেই বর্ত্তমান, তথাপি উহার মধ্যে একটু ইতরবিশেষ আছে। শৈশবের নিরুপায় অবস্থা হইতে যে স্নেহ উৎপন্ন হয় তাহা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মনে যে অধিক প্রবল তাহাতে সন্দেহ নাই।

পুরুষের মনে এই ভাবটি স্ত্রীলোকের ন্যায় তত বিশেষ আকারে সংস্কার-বদ্ধ নহে—তবে সাধারণতঃ, আশ্রয়াধীন দুর্ব্বল ব্যক্তিমাত্রের প্রতি কথঞ্চিৎ পুরুষের মনেও এই ভাবের উদ্রেক হয়। স্ত্রীলোকদিগের এই বিশেষ-সংস্কার হইতেই শিশু-জীবনের রক্ষণাবেক্ষণে তাহাদের একটা বিশেষ-পটুতা জন্মিয়াছে—তাহাদের আচরণের সহিত তাহাদের স্বাভাবিক ভাবের বেশ মিল হইয়াছে। এ স্থলে শারীরিক বিশেষত্বের সঙ্গে সঙ্গে একটা মানসিক বিশেষত্বও যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না; এবং গোড়ায় যদিও এই মানসিক বিশেষত্বের সহিত সন্তান পালনেরই বিশেষ সম্বন্ধ, তথাপি স্ত্রীলোকের সমস্ত জীবনই কিয়ৎপরিমাণে ইহার প্রভাবে অনুরঞ্জিত। স্ত্রী-পুরুষের অবশিষ্ট প্রকৃতি-গত মানসিক প্রভেদ-সকল দুর্ব্বল সবলের সম্বন্ধ হইতে প্রসূত। সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সবল

পুরুষজাতির সহিত ব্যবহারে, অবলা স্ত্রীজাতি কতকগুলি বিশেষ মানসিক লক্ষণ অর্জ্জন করিয়াছে।

প্রথমতঃ দেখা যায়, যে সকল অসভ্য জাতি বলবান, সাহসী, আততায়ী, সদসৎজ্ঞানশূন্য ও অত্যন্ত স্বার্থপর ছিল তাহারাই জীবন-সংগ্রামে টিঁকিয়া গিয়াছে। এবং এই সকল বিজয়ী অসভ্যজাতি হইতেই সভ্য জাতিদিগের উৎপত্তি। সুতরাং সভ্যজাতিদিগের পূর্ব্ব-পুরুষের প্রকৃতিতে পাশব বৃত্তির যে প্রাবল্য ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কাজেকাজেই, এই সকল জাতির অন্তর্গত স্ত্রীলোকদিগের সহিত নিষ্ঠুর পুরুষদিগের সংসর্গ হওয়ায়, ঐ সকল স্ত্রীলোক পুরুষদের মন যোগাইয়া যে পরিমাণে চলিতে পারিত সেই পরিমাণে তাহারা সুখ-সম্পদের ভাগী হইত। সেই সকল স্ত্রীলোক স্বীয় বলের দ্বারা-ত নিজ স্বত্ব রক্ষা করিতে পারিত না—তবে কি উপায়ে তাহা বজায় রাখিত? বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া তাহাদের কতকগুলি বিশেষ মানসিক লক্ষণ উৎপন্ন হয়, তাহারই প্রভাবে তাহারা জীবন-সংগ্রামে সফলতা লাভ করিত।

প্রথমতঃ মনোরঞ্জন করিবার ক্ষমতা—এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসা লাভের ইচ্ছা তাহাদের বলবতী ছিল। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তৎকালে পুরুষদিগের দয়ার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া স্ত্রীলোক মাত্রকেই থাকিতে হইত, সুতরাং যে সকল স্ত্রীলোক পুরুষদের বেশী মন যোগাইতে পারিত তাহারাই টিকিয়া থাকিয়া নিজ বংশ রাখিয়া যাইত। এবং বংশানুক্রমে এই সকল গুণ স্ত্রীজাতিতে প্রবাহিত হইয়া, আদর-যত্ন পাইবার বিশেষ ইচ্ছা এবং তাহার আনুসঙ্গিক বিশেষ হাব ভাব স্ত্রীস্বভাবে যে বদ্ধমূল হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আবার যে সকল স্ত্রীলোক নিষ্ঠুর অসভ্য স্বামীকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়াও, নিজ মনকষ্ট গোপন করিয়া রাখিতে পারিত তাহাদেরই সর্ব্ব-

প্রকারে ভাল হইত। এবং এইরূপে এই ধৈর্য্যগুণও কৌলিক নিয়ম-প্রভাবে স্ত্রীজাতিতে বদ্ধমূল হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের আর একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে—তাহারও এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। স্ত্রীলোক স্বভাবতই ইঙ্গিতজ্ঞ। স্ত্রীলোকেরা আত্মীয় স্বজনের মনের ভাব, মুখের ভাব দেখিয়া চট্ করিয়া ধরিতে পারে। একটু ভাবান্তর হইলেই তাহারা বুঝিতে পারে। পূর্ব্বতন অসভ্যকালে যে সকল স্ত্রীলোক স্বামীদিগের মুখের ভাবে, গলার স্বরে, ক্রোধের পূর্ব্বলক্ষণ সকল বুঝিতে পারিত তাহারাই স্বামীদিগের রোষাগ্নিরূপ বিপদ হইতে রক্ষা পাইত এবং তাহারাই টিঁকিয়া থাকিয়া উত্তরবংশে এই গুণটি সংক্রামিত করিয়াছে।

বলবানের প্রতি আসক্তি স্ত্রীলোকদের আর একটি প্রকৃতিগত ভাব। এই গুণ থাকাতেই মানব-কুলের উন্নতি হইয়া আসিয়াছে; যে সকল স্ত্রীলোক বলশক্তির প্রাধান্যে মোহিত হইয়া স্বামী নির্ব্বাচন করিত তাহারাই তাহাদের আশ্রয়-প্রভাবে জীবন-সংগ্রামে টিঁকিয়া যাইত; পক্ষান্তরে যে সকল স্ত্রীলোক দুর্ব্বল পুরুষদিগকে স্বামীত্বে বরণ করিত তাহারা অনতিকাল মধ্যে ধ্বংস হইয়া যাইত। এইরূপে প্রতাপ-বিক্রমের প্রতি আসক্তি কৌলিকনিয়মপ্রভাবে স্ত্রীস্বভাবের লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য অনেক সময়ে এই অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখা যায়, বলবান স্বামী স্বীয় স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেও স্ত্রী সমানরূপে তাহার প্রতি আসক্ত, কিন্তু যে স্বামী দুর্ব্বল সে ভাল ব্যবহার করিলেও তাহার প্রতি স্ত্রী ততটা আসক্ত নহে। শুধু নিজ স্বামী কেন—অসাধারণ শক্তিশালী ক্ষমতাবান ব্যক্তিমাত্রেরই প্রতি স্ত্রীলোকের ভক্তি এইরূপে জন্মিয়াছে; এই শক্তিপূজা হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি। এই জন্য স্ত্রীজাতির মধ্যে ধর্ম্মভাবের বিশেষ প্রাবল্য সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। এবং এই কারণেই সকল দেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই ধর্ম্ম ও সমাজসম্বন্ধীয়

বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ আস্থা ও সর্ব্বপ্রকার শাসনকর্ত্তৃগণের প্রতি অচলা ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সঙ্গেসঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের মনের ভাব ও প্রকৃতি অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং সেই সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধও কতকটা পরিবর্ত্তিত হইবার কথা। অসভ্যকালে যখন পাশববলের প্রাধান্য ছিল তখন পুরুষের দাসত্বে স্ত্রীলোক নিযুক্ত থাকিত। এখন এই সভ্যকালে স্ত্রী, পুরুষের চির-সঙ্গিনী ও সখী; বরং পুরুষ কতকটা স্ত্রীর দাসত্বে নিযুক্ত। পাশব-বল এখন সৌন্দর্য্যের পদানত। স্ত্রীলোকের শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা যে পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হইবে (ভাষা-শিক্ষা ও আজকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের গিলাইয়া-দেওয়া বিদ্যাশিক্ষাকে উচ্চশিক্ষা বলি না) সেই পরিমাণে স্ত্রী-পুরুষের মানসিক প্রভেদও কতকটা তিরোহিত হইবে সন্দেহ নাই। স্ত্রীলোকের মধ্যে মানসিক বিকাশের উন্নতি হইলে, কতকটা সেই সঙ্গে শারীরিক বিকাশেরও বৃদ্ধি হইবে—এখনকার ন্যায় অত শীঘ্র শারীরিক বিকাশ থামিয়া যাইবে না; সুতরাং যে পরিমাণে স্ত্রীলোকের ব্যক্তিবিকাশিনী শক্তি বৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে কুল-বর্দ্ধিনী শক্তির হ্রাস হইবে। এরূপ অবস্থায় দূর-ভবিষ্যৎ সমাজ যে কি আকারে গঠিত হইবে তাহা এখন বলা অসম্ভব। বাহ্য অবস্থার সহিত লোকপ্রকৃতির সামঞ্জস্য হইয়া তখন আর এক প্রকার উন্নততর সমাজ যে সমুত্থিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

—০—

অপরাধীগণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা।

অপরাধীদিগের তথ্যানুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উহাদের কোন বিশেষ ছাঁচের চেহারা নাই—অর্থাৎ উহারা কোন বিশেষ ছাঁচের চেহারা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। তবে যাহারা চিরাভ্যস্ত অপরাধী, যাহারা বারম্বার জেল খাটিয়া আইসে তাহাদের চেহারার একটা বিশেষত্ব ক্রমে দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু সে বিশেষত্বও লক্ষ্য করা বড় সহজ নহে। ফলকথা, চেহারা কিম্বা ধরণ-ধারণ দেখিয়া অপরাধীকে চেনা কঠিন—উহা চরিত্রের অকাট্য নিদর্শন নহে।

সব সময়ে কৌলিক দোষেই যে অপরাধ-প্রবণতা প্রসূত হয় তাহাও নহে—উহা অনেকটা ব্যক্তিগত অভ্যাসের ফল। অধ্যাপক বাইস্‌মান বলেন, অর্জ্জিত অভ্যাস-সকল উত্তরবংশে সংক্রামিত হয় না। গ্যালটনও ঐ কথা বলেন। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহেরই আমরা অধিকারী হই, তাঁহাদের অর্জ্জিত অভ্যাস-সকল আমরা লাভ করি না। বাঁশ-বাজিকরের ছেলে বিনা-অভ্যাসে বাঁশ বাজিকর হয় না—অথবা কুস্তিগির পালোয়ানের পুত্র বিনা-শিক্ষায় কুস্তির মার-প্যাঁচ আদায় করিতে পারে না। চোরের ছেলে সব সময়ে যে চোর হইবে এরূপ কোন কথা নাই; তবে যদি চোর হয় সে তাহার পিতার কুদৃষ্টান্তে ও সঙ্গদোষে,—জন্মদোষে নহে।

সন্তান পিতামাতার অর্জ্জিত বৃত্তির অধিকারী হয় না বটে কিন্তু ইহা সত্য যে তাঁহাদিগের রোগের অধিকারী হইয়া থাকে। আর রোগের সহিত অপরাধ-প্রবণতার যে বিশেষ যোগ আছে তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। রোগগ্রস্ত কিম্বা শারীরিক হীনতা-গ্রস্ত ব্যক্তি অপরাধী হইবেই এরূপ কোন কথা নাই—অনেক স্থলেই হয় না। তবে, এ কথা বলা যায় যে, কৌলিক রোগ হইতে যাহারা মুক্ত তাহাদের

তুলনায় কৌলিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা অধিক। শারীরিক হীনতার পরিণামগতি কোন্ দিকে? মেজাজ বিগড়াইয়া দেওয়া, ইচ্ছাশক্তিকে হ্রাস করা ও সাধারণতঃ মানসিক সামঞ্জস্য নষ্ট করা - এই দিকেই কি তাহার স্বাভাবিক গতি নহে? এই প্রবণতা যে হতভাগ্য ব্যক্তির স্বভাবে বদ্ধমূল হয় সেই অপরাধকার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে। বুর্ত্তেমবুর্গ-রাষ্ট্রের কারাধ্যক্ষ হের্ সিখার্ট বলেন যে, অনেক অপরাধীই হীনতা-যুক্ত পিতামাতার সন্তান। ১৭১৪ কয়েদীর তথ্যানুসন্ধান করিয়া তিনি জানিয়াছিলেন যে তন্মধ্যে শতকরা ১৬ জন, মাতাল পিতামাতার সন্তান; শতকরা ৬ জন সেই সকল পরিবার হইতে সমাগত যে পরিবারে উন্মাদ রোগ ছিল, শতকরা ৪ জন আত্মহত্যা-প্রবণ পরিবার হইতে ও শতকরা ১ জন অপরাপর রোগগ্রস্ত পরিবার হইতে সমাগত। ফ্রান্স ও ইটালি দেশেও এইরূপ দেখা যায়। ডাক্তার কর্ এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ফরাসিস সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে যাহারা দুষ্কর্ম্মের জন্য দণ্ডিত হয় প্রায়ই তাহারা শারীরিক ও মানসিক হীনতাযুক্ত পিতামাতার সন্তান। ডাক্তার ভির্জিলিও বলেন, ইটালি দেশের অপরাধী অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৩২ জন ব্যক্তিতে পিতামাতার অপরাধ-প্রবণতা সংক্রামিত হয়। ইংলণ্ডের বিচার-সংক্রান্ত তথ্যতালিকা অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে ১৮৭৯ হইতে ১৮৮৮ সাল পর্য্যন্ত ১৪৩ জন অর্থাৎ শতকরা ৩২ জন উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এবং যে ২৯৯ জনের ফাঁসির হুকুম হয় তাহারও মধ্যে ১৪৫ জন—অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক—মানসিক দুর্ব্বলতা-গ্রস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় তাহাদের দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, যাহারা ইচ্ছাকৃত হত্যাপরাধে অপরাধী তাহাদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪০।৫০ জন উন্মাদগ্রস্ত কিম্বা মানসিক দুর্ব্বলতাসমন্বিত।

অপরাধীবর্গের মধ্যে কতক সংখ্যক লোক লেখাপড়া শিখিতে

একেবারেই অসমর্থ। তাহাদের স্মরণ ও বুদ্ধিশক্তি এত কম যে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা সময়ের অপব্যয় মাত্র। সচরাচর অপরাধীদিগের সাধারণ লক্ষণ এই দেখা যায় যে, তাহাদের স্মরণ কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ অভাব। শারীরিক ও মানসিক দুর্গতির সহিত অপরাধ-প্রবণতার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিলেও, অনেকটা আবার তাহা সামাজিক অবস্থার দ্বারা নিয়মিত হয়। যে হীনতাযুক্ত ব্যক্তির জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়, তাহাকে অনেক সময় বাধ্য হইয়া কুপথের আশ্রয় লইতে হয়—এবং অনেকে হীনতাগ্রস্ত হইয়াও জীবিকার সংস্থান থাকা প্রযুক্ত সুপথে থাকিয়া যায়।

——o——

স্ত্রীপুরুষভেদে অপরাধের ন্যূনাধিক্য।

সকল সভ্য জাতির আদালৎ-সংক্রান্ত তথ্যতালিকা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা এবং বালিকারা বালক অপেক্ষা বেআইনী অপরাধে কম লিপ্ত। বিশেষতঃ য়ুরোপের উত্তর-ভাগ অপেক্ষা দক্ষিণ-ভাগে স্ত্রীলোকের অপরাধ কম দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ প্রথমতঃ, য়ুরোপের দক্ষিণ ভাগে মারপিঠের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক; স্ত্রীলোকেরা দুর্ব্বল সুতরাং মারপিঠের অপরাধে তাহারা তত লিপ্ত হইতে পারে না। য়ুরোপের উত্তর ভাগে চুরি প্রভৃতি অপরাধের আধিক্য, সুতরাং ঐ সকল অপরাধে স্ত্রীলোকেরা সহজে লিপ্ত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ য়ুরোপে স্ত্রীলোকেরা অনেকটা গৃহে বদ্ধ থাকে, বাহিরের হট্টগোলের মধ্যে যায় না, সুতরাং কুসঙ্গ ও কুদৃষ্টান্তে তাহাদের চরিত্র তেমন দূষিত হইতে পারে না।

অপরাধের সংখ্যা ছাড়িয়া দিয়া যদি গুরু লঘুতার বিষয় ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা গুরুতর অপরাধে অপরাধী। মঁসিও গেরি ও কেতলে অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ফ্রান্স দেশে শিশু-হত্যা, ভ্রূণ-হত্যা, বিষ-প্রয়োগ, গৃহ চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধে স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা অধিক অপরাধী, পিতৃমাতৃ হত্যায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সমান এবং শিশুদিগের প্রতি অত্যাচার, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিক দেখা যায়।

আর এক কথা, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা দুষ্কর্ম্মে বেশী পাকিয়া যায়—বেশী অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডীয় কারাগারের তথ্য-তালিকা অনুশীলন করিয়া জানা যায় যে, স্ত্রীলোকেরা যখন একবার অপরাধে লিপ্ত হয় তখন পুরুষদিগের অপেক্ষা বারম্বার অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সমস্ত য়ুরোপের তথ্যতালিকাতেও এই কথার সত্যতা সপ্রমাণ হইয়াছে।

সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অপরাধে যে কম লিপ্ত তাহার কারণ কি? তাহার সহজ উত্তর এই যে, ধর্ম্মনীতি বিষয়ে স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্ত্রীলোকেরা যুগযুগান্তর হইতে শিশুর লালন-পালনে রত, তাহাদের এই মাতৃভাব তাহাদের মনে কতকগুলি নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তি জাগাইয়া রাখে—সুতরাং এই নিঃস্বার্থ ভাবের পরিচালনায় তাহাদের অপরাধ-প্রবণতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। আর এক কারণ এই যে, স্ত্রীলোকেরা দুর্ব্বল, সুতরাং যে সকল অপরাধ বল-সাধ্য তাহা তাহাদের ক্ষমতার অতীত। কিন্তু অনেক সময় স্ত্রীলোকেরা যে সকল অপরাধ বলসাধ্য বলিয়া নিজে করিতে পারে না, তাহা পুরুষদিগকে উষকাইয়া দিয়া সাধন করে, অথচ স্বয়ং ঐ কার্য্যে লিপ্ত নহে বলিয়া দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পায়।

ইংলণ্ডে যে সকল জাল জুয়াচুরি অপরাধে অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের পুরুষেরা দণ্ডনীয় হয়, অনেক স্থলে স্ত্রীলোকেরা তাহাতে ভিতরে ভিতরে লিপ্ত থাকে। অনেক সময়ে, স্ত্রীদিগের গাৰ্হস্থ্য-অপব্যয়িতা, পরিচ্ছদের অপব্যয়িতা ও পাড়াপ্রতিবাসীদিগের উপর টক্কর দিবার ইচ্ছা হইতে স্বামীরা দুষ্কর্ম্মে রত হয় ও অবশেষে কারাদণ্ড ভোগ করে।

যে সকল দেশে স্ত্রীলোকেরা অপ্রকাশ্যভাবে গৃহের অন্তরালে অবস্থিতি করে, সেখানকার স্ত্রীলোকদিগের অপরাধসংখ্যা অনেক কম। গ্রীস দেশে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অপরাধ যে এত কম, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। পক্ষান্তরে স্কটলণ্ডে স্ত্রীলোক-অপরাধীর সংখ্যা যে বেশী তাহার কারণ, তত্রস্থ স্ত্রীলোকেরা অনেকটা বাহিরের কাজে নিযুক্ত। অত শারীরিক শ্রমের কাজ যুরোপের আর কোন স্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে দেখা যায় না। স্কচ্ স্ত্রীরা মাঠে ঘাটে কারখানায় পুরুষদের সহিত একত্রে কাজ করে—স্বীয় জীবিকার জন্য পুরুষদের উপর তত নির্ভর করে না; তাহাদের সামাজিক উদ্যম চেষ্টা অনেকটা পুরুষদিগেরই মত,

কাজে কাজেই তাহাদের অপরাধ-প্রবণতাও অনেকটা পুরুষদিগের সমান।

অপরাধের তথ্যতালিকা আলোচনা করিয়া এই সত্যটি জানা যায় যে, যে পরিমাণে স্ত্রীলোকেরা বাধ্য হইয়া মানুষের জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করে সেই পরিমাণে তাহারা অপরাধ-প্রবণ হইয়া উঠে। আজ কাল ইংলণ্ডে যেরূপ লোক মতের গতি দেখা যাইতেছে তাহাতে ইংলণ্ডের ভাবী সমাজের অবস্থা বড় আশ্বাসজনক বলিয়া বোধ হয় না। স্ত্রীলোকদিগের জন্য সর্ব্বপ্রকার কাজের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হউক এই দিকেই লোকের মনোগতি দেখা যাইতেছে। প্রকাশ্য জীবন-সংগ্রামের কঠোর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে স্ত্রীলোকের উচ্চতর প্রবৃত্তি-সকল অক্ষত থাকিবে কি না সন্দেহ হয়। আজকাল ইংলণ্ডের মন্ত্রি-নির্ব্বাচনের সংগ্রামে স্ত্রীলোকেরাও যোগ দিতেছেন। সকলেই অবগত আছেন, এই সকল নির্ব্বাচন-ব্যাপারে কত প্রকার অসৎ উপায় অবলম্বিত হয়—সুতরাং এই সকল কাজে স্ত্রীলোকেরা ব্যাপৃত হইলে তাহাদের নৈতিক অবস্থার কিরূপ উন্নতি হইবে তাহা দেখাই যাইতেছে। শুধু তাহা নহে, তাহাদের সন্তান সন্ততির উপর এই প্রভাবের কুফল সংক্রামিত হইতে পারে। আসল কথা, গৃহই স্ত্রীলোকের কার্য্যক্ষেত্র। সন্তানের লালনপালন ও সন্তানকে শিক্ষাদান এই দুইটি স্ত্রীলোকের প্রধান কার্য্য। যদি স্ত্রীলোকেরা গৃহকে পবিত্র রাখিতে পারেন—জ্ঞানধর্ম্মের আলোকে আলোকিত করিতে পারেন—গৃহের মধ্যে সুখসচ্ছন্দতা স্থাপন করিতে পারেন—গৃহকে শ্রীসৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহাদের জীবনের কাজ করা হইল। তাঁহাদের এই কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলে, সকল প্রকার দুষ্কর্ম্ম ও অপরাধ সমাজ হইতে যে অচিরাৎ তিরোহিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

—o—

ইংলণ্ডে অপরাধীর সংশোধন-পদ্ধতি।

ইংলণ্ডে নির্ব্বাসন-দণ্ড উঠিয়া গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে দাসত্বদণ্ডের বিধান হইয়াছে। পাঁচ বৎসর কিম্বা ততোধিক কাহারও কারাদণ্ড হইলে তাহা দাসত্ব-দণ্ড বলিয়া গৃহীত হয়। দাসত্ব-দণ্ড তিন ধাপে বিভক্ত। প্রথম ধাপে, অপরাধী তাহার কারাদণ্ডের প্রথম নয় মাস কাল কোন স্থানীয় কারাগারে নিঃসঙ্গভাবে আবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয় ধাপে, তাহাকে অন্য কয়েদীর সহিত একত্রে কাজ করিতে দেওয়া হয়, এবং শেষ ধাপে, তাহার দণ্ডকাল অতিবাহিত না হইতে হইতেই তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। যদি কোন কয়েদী ভাল ব্যবহার করে, তাহাকে যদি পরিশ্রমী বলিয়া বোধ হয়, তবে মেয়াদের বার আনা কাল অতিবাহিত হইলেই তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তদ্বিপরীতে কয়েদীকে সমস্ত মেয়াদকাল দণ্ডভোগ করিতে হয়।

সামান্য কারাদণ্ডার্হ ব্যক্তির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়, দাসত্ব দণ্ডার্হ ব্যক্তির প্রতি প্রথম নয় মাস সেইরূপই ব্যবহার করা হইয়া থাকে—প্রভেদ এই মাত্র যে দাসত্ব-দণ্ডার্হ ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত একটু ভাল খাইতে পায়। সরকারী পূর্ত্ত-বিভাগ সংক্রান্ত কারাগারে যখন কোন কয়েদী আবদ্ধ থাকে তখন তাহাকে পাঁচটি উচ্চ হইতে উচ্চতর ধাপ অতিক্রম করিতে হয়। যত উচ্চতর ধাপে উঠিতে থাকে তদনুসারে তাহার অধিকার বৃদ্ধি হয়।

প্রথম ধাপটির নাম "পরীক্ষাধীন শ্রেণী"। এই শ্রেণীর ও অন্যান্য শ্রেণীর কয়েদীদিগের খাটুনির পরিমাণ সংখ্যাচিহ্নের দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। প্রকাণ্ড বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের পরীক্ষার সময় পরীক্ষকেরা যেরূপ সংখ্যা-চিহ্নের দ্বারা ছাত্রদিগের আপেক্ষিক যোগ্যতা-সূচিত করেন ইহাও তদ্রূপ। কারাগারে যে কয়েদী ৮ সংখ্যা দিনের মধ্যে প্রাপ্ত হয়,

সেই ভাল কয়েদার মধ্যে গণ্য। গড়ে দিনের কাজটা কোনরূপে শেষ করিতে পারিলে, যে-সে কয়েদী এই ৮ সংখ্যার চিহ্ন সহজে লাভ করিতে পারে। তিন মাস ধরিয়া যদি কোন কয়েদী প্রতিদিন এই সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা লাভ করে তাহা হইলে সে "পরীক্ষাধীন শ্রেণী" হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়। এই তৃতীয় শ্রেণীতে তাহাকে অন্ততঃ এক বৎসর কাল থাকিতে হয়। এই তৃতীয় শ্রেণীতে অবস্থিতিকালে, ছয় মাস অন্তর সে চিঠিপত্র লেখালেখি করিতে পারে ও কারাগারের মধ্যে আত্মীয় বন্ধুর সহিত দেখা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। তাছাড়া, প্রতি ২০ সংখ্যা-চিহ্নের উপর এক পেনি করিয়া পুরস্কার পায়—এইরূপে বৎসরে ১২ শিলিং করিয়া তাহার লাভ হয়। তৃতীয় শ্রেণীতে এক বৎসরকাল অতিবাহিত হইলে, যদি সেই কয়েদী রীতিমত ৮ সংখ্যা-চিহ্ন প্রতিদিন পাইয়া থাকে, তবে সে "দ্বিতীয় শ্রেণীতে" উত্থান করে। এই শ্রেণীতে সে প্রতি চারিমাস অন্তর চিঠিপত্র লিখিবার ও আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। আহারের নির্ব্বাচন বিষয়েও তাহার একটু হাত থাকে—এবং তাহার চিহ্ন সংখ্যারও একটু দর বাড়ে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে কয়েদী, বৎসরে ১৮ শিলিং করিয়া উপার্জ্জন করে। এক বৎসর কাল অতীত হইলে যদি তখনও কয়েদীর শ্রমাভ্যাস অক্ষুণ্ণ থাকে তবে সে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয়। যে সকল কয়েদী লেখা পড়া জানে না তাহারা প্রথম শ্রেণীতে উঠিতে পায় না—লেখাপড়া একটু শিখিলে তবে উঠিতে পায়। প্রথম শ্রেণীতে কয়েদী প্রতি তিন মাস অন্তর চিঠি পত্র লেখালেখি ও আত্মীয় স্বজনের সাক্ষাৎকার লাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়। আহার নির্ব্বাচনেও তাহার একটু বেশী স্বাধীনতা থাকে। প্রথম শ্রেণীতে কয়েদী, বৎসরে ৩০ শিলিং করিয়া লাভ করে। প্রথম শ্রেণীর উপরে "বিশেষ শ্রেণী" বলিয়া আর একটি শ্রেণী আছে। যে সকল কয়েদীর চরিত্র দৃষ্টান্ত-স্থল বলিয়া পরি-

গণিত হয় তাহারাই এই শ্রেণীভুক্ত। তাহাদের মুক্তির বার মাস পূর্ব্বে তাহাদিগকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে; কারাগারের দায়িত্বসূচক কাজ কর্ম্মে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে এবং তাহারা ৬পাউণ্ড করিয়া পুরস্কার লাভ করিতে পারে। এই সকল কয়েদীরাই, তাহাদের মেয়াদের বার আনা কাল অতিবাহিত হইলেই মুক্তিলাভ করে।

স্ত্রী-অপরাধীদিগের জন্য এই সকল নিয়ম কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও শিথিল করা হইয়াছে। নিঃসঙ্গ অবস্থিতির নিয়ম ততো কড়াক্কড় ভাবে তাহাদের প্রতি প্রয়োগ করা হয় না। মেয়াদের তিন অংশের দুই অংশ কাল অতিবাহিত হইলেই তাহাদিগকে মুক্ত দেওয়া যাইতে পারে। পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রী কয়েদীরা ১ পাউণ্ড বেশী পুরস্কার লাভ করিতে পারে। পুরুষদিগের বিশেষ শ্রেণীর ন্যায় স্ত্রী-অপরাধীদিগেরও একটি বিশেষ শ্রেণী আছে—তাহার নাম "আশ্রমী"-শ্রেণী। মেয়াদের প্রথম অবস্থায় যদি কোন স্ত্রী-কয়েদী ভাল ব্যবহার করে তবে তাহাকে এই শ্রেণীতে ভুক্ত করা হয়। এবং মেয়াদের তিন অংশের দুই অংশ কাল অতিবাহিত করিবার নয় মাস পূর্ব্বেই তাহাদিগকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া কোন "স্ত্রী-আশ্রমে" রাখিয়া দেওয়া হয়। যে দুই আশ্রম এই শ্রেণীস্থ কয়েদীকে গ্রহণ করে তাহার নাম "এলিজেবেথ ফ্রাই আশ্রম" ও "লণ্ডনের অপরাধ-নিবারক ও সংশোধক প্রতিষ্ঠান।" রাজ সরকার হইতে এই সকল আশ্রমে, প্রতি আশ্রম-বাসিনীর জন্য সপ্তাহে ১০ শিলিং করিয়া দেওয়া হয়—এই আশ্রমে কিছুকাল বাস করিবার উপযুক্ত হইলে পরে ঐ সকল কারামুক্ত স্ত্রীলোকেরা পুনর্ব্বার সংসারে প্রবেশ করে। কারামুক্ত পুরুষ-অপরাধীরাও ইচ্ছা করিলে "কারামুক্ত অপরাধীর সাহায্য-সভার" আনুকূল্যে কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে পারে। এইরূপ ইংলণ্ডে, স্ত্রী ও পুরুষ-অপরাধীর জন্য অনেকগুলি আশ্রম, সংশোধনালয় ও সাহায্য-সভা থাকাতে প্রভূত উপকার সাধিত হয়।

স্বায়ত্ত-শাসন।

লর্ড রিপণ এদেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন করিয়া আমাদিগের উন্নতি-পথ যে খুলিয়া দিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিবে। পার্লেমেণ্ট কোন কালে যে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার আশা হইয়াছে—নির্ব্বাচন-প্রণালী-অনুসারে রাজ্য-শাসনের সূত্রপাত হইয়াছে। এক কথায় আমাদিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র নগরের কাজ যদি আমরা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারি—ক্রমে আমরা বৃহৎ রাজ্য-শাসনের ভার লইতে পারিব তাহাতে আর সন্দেহ কি। সকল কার্য্যেরই আরম্ভ আছে, শিক্ষার স্থল আছে: স্বায়ত্ত পৌর-শাসন (Municipal self Government) স্বাধীনতামূলক প্রজাতন্ত্র-প্রণালীরই প্রথম সোপান। এই জন্য লর্ড রিপণের এই দানটি আমরা অমূল্য বলিয়া মনে করিতেছি।

এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য যাহাতে এই অধিকারটি আমরা স্থায়ী করিতে পারি—ইংরাজেরা না বলিতে পারে যে তোমরা ইহার উপযুক্ত নও, তাই রক্ষা করিতে পারিলে না।

যে দোষগুলি জাতীয় চরিত্রে থাকিলে স্বায়ত্ত-শাসন ব্যর্থ হইয়া যায় তাহা দূর করা আবশ্যক এবং যে সকল গুণ থাকিলে উহা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহারও উৎকর্ষ সাধন করা আবশ্যক।

শুদ্ধ বাহ্য আকার-প্রকারের অনুকরণে কোন ফল হয় না—যে ভাব হইতে সেই সকল আকার-প্রকার প্রসূত হইয়াছে তাহা আত্মসাৎ করা চাই; তবেই তাহা জীবন্ত হইয়া উঠে—তাহাতে প্রাণ আইসে। এক এক দেশের এক এক রকম রীতি নীতি অনুষ্ঠান, সেই বিশেষ বিশেষ রীতি নীতি অনুষ্ঠানগুলি সেই দেশের বিশেষ ভাব হইতে উৎপন্ন। এবং সেই ভাবগুলি মূলে থাকাতেই সেই সকল রীতি নীতি অনুষ্ঠান বাঁচিয়া

থাকে। বাঙ্গালীর অন্তরে যদি কর্ম্মিষ্ঠ-ভাব না থাকে, তবে শুদ্ধ আঁটা-সাটা ইংরাজি কাপড় পরিলেই যে সে ইংরাজের মত কর্ম্মিষ্ঠ হইবে এরূপ আশা করা যায় না।

যে-কোন জাতি, অন্য জাতির আন্তরিক ভাব আত্মসাৎ না করিয়া কেবল তাহার বাহ্য অনুষ্ঠান অনুকরণ করিতে গিয়াছে, সেই অকৃতকার্য্য ও জগতের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছে। মনে কর, ইংলণ্ড আর ফ্রান্স। ফ্রান্স ইংলণ্ডের স্বাধীন রাজ্যতন্ত্র অনুকরণ করিতে গিয়া কিছুতেই কৃত-কার্য্য হইতে পারে নাই। কারণ, মুখে ফরাসিরা যাহাই বলুক, বাস্তবিক স্বাধীনতার ভাব তাহাদিগের ততটা নাই—স্বাধীনতা অপেক্ষা যশলিপ্সা ও কর্ত্তৃত্ব-লালসা তাহাদিগের প্রবল। এই জন্য উহাদিগের এক এক জন নেতা স্বাধীনতার ধ্বজা তুলিয়া শেষে দেশকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ফেলে। এখনও সমস্ত ফ্রান্সের কার্য্য, পারিস হইতে নির্ব্বাহ হয়। এখনও ফ্রান্সে প্রাদেশিক স্বতন্ত্রতা নাই—সমস্ত রাজকার্য্যের সূত্র প্যারিসে কেন্দ্রীভূত। কোন দূর প্রদেশে একটা সামান্য সাঁকো নির্ম্মাণ করিতে হইলেও তাহার জন্য রাজধানীর প্রধান কর্ত্তৃপক্ষদিগের অনুমতির অপেক্ষা করে। সকলই রাজপুরুষদিগের উপর নির্ভর—পৌরজনদিগের নিজের প্রায় কিছুই করিবার থাকে না। এই জন্য ফ্রান্সে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব—এবং ফরাসীদের প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী ইংলণ্ডের ন্যায় দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত নহে; একজন ক্ষমতাশালী নেতা ইচ্ছা করিলেই ফ্রান্সে আবার রাজতন্ত্র স্থাপন করিতে পারে। বস্তুতঃ, এক্ষণে ফ্রান্সে যে প্রণালীতে রাজ্য-শাসন হইয়া থাকে উহা নামে প্রজাতন্ত্র, কিন্তু কাজে অনেকটা রাজতন্ত্রেরই অনুরূপ। এখনও সেখানে Bureaucracy অর্থাৎ রাজপুরুষ-শাসনতন্ত্রেরই প্রাবল্য। ইংরাজদিগের ন্যায় ফরাসিদিগের বাস্তবিক স্বাধীনতার ভাব থাকিলে এরূপ কখনই হইত না।

তাই বলিতেছি, শুদ্ধ ভাল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলেই যে কাজ হয়

তাহা নহে, তাহার উপযোগী জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা চাই, তবেই উহা স্থায়ী হইতে পারে। যাঁহারা মনে করেন ইংলণ্ডে পার্লমেণ্টে আছে বলিয়াই ইংরাজেরা এতটা স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছে—তাহাদিগের রাজকার্য্য এত ভাল চলিতেছে—তাঁহারা অত্যন্ত ভ্রান্ত। ইংরাজদিগের পার্লেমেণ্ট-প্রণালী নির্দ্দোষ নহে—উহাতে অনেক খুঁত আছে; এমন কতকগুলি নিয়ম আছে যাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলে কাজের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইতে পারে। অনেক চিন্তাশীল ইংরাজ এ কথা স্বীকার করেন, তবে যে তাঁহাদের রাজকার্য্য এত ভাল চলিতেছে তাহা যতটা ইংরাজ-জাতির চরিত্রগুণে, ততটা ভাল ব্যবস্থার গুণে নহে। আমাদের দেখা উচিত আমাদের জাতীয় চরিত্রে কি গুণ থাকিলে এদেশে স্বায়ত্ত-শাসন বদ্ধমূল ও সুসিদ্ধ হইতে পারে।

সাধারণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে গেলে, সাধারণের কিসে ভাল হয় তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। সাধারণের হিতের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে হইবে—আপনার ইচ্ছাকে সাধারণের ইচ্ছার অধীন করিতে হইবে। আমার যাহাতে প্রভুত্ব হয়, মান মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয়, আমার আত্মীয় স্বজনকে প্রতিপালন করিবার সুবিধা হয় এই জন্যই যদি আমি মিউনিসিপ্যাল কমিশনর হই,—তবে আমার মতে কাজ হইল না, আমার লোককে কাজ দেওয়া হইল না, আমার মান রহিল না—এই সকল ভাবিয়া, পৌরকার্য্য নির্ব্বাহে যত্ন স্বভাবতই শিথিল হইয়া পড়িবে। এই জন্য "সাধারণের জন্য আত্ম-বিলোপ"—ইহাই স্বায়ত্ত-শাসনের মূল-মন্ত্র।

যাঁহারা পৌর-সভার সভ্যনির্ব্বাচনের অধিকার পাইয়াছেন তাঁহাদিগের উপর কতটা দায়িত্ব তাহা অনেকে হয়তো অনুভব করেন না। একজন কমিশনর-পদপ্রার্থী তাঁহাদের একজনের নিকট আসিয়া হয়তো বলিলেন;—তিনি তাঁহার এককালে "ক্লাসফ্রেণ্ড" ছিলেন, ভোট তাঁহাকেই দিতে হইবে! বাঙ্গালী ভোট-দাতা চক্ষুলজ্জার খাতির এড়াইতে

না পারিয়া, অতি অনুপযুক্ত এক ব্যাক্তিকে হয়তো ভোট দিয়া ফেলিলেন। এই সকল স্থলে কঠোর কর্ত্তব্যের অনুসরণ করা উচিত। চক্ষুলজ্জা বাঙ্গালীর প্রধান দোষ। Eye-shame বলিয়া বোধ হয় কোন কথা আর কোন ভাষায় নাই।

সাধারণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে গেলে আপোসে মীমাংসা করিয়া অনেক সময়ে কার্য্য করা আবশ্যক। আপনার জেদ্ বজায় রাখা কিম্বা কর্ত্তৃত্ব ফলানো যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে কাজের বড়ই ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। ইংরাজদিগের রাজ্যতন্ত্রের যেরূপ প্রণালী তাহাতে সকলেই যদি আপন আপন মত বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে একটা ভয়ানক বিশৃঙ্খলা হইয়া উঠিত। তাঁহারা নাকি কাজের লোক—তাই তাঁহারা যাহাতে সহজে কাজ উদ্ধার হয় তাহাই দেখেন—কাল ও অবস্থা দেখিয়া কাজ করেন—সময়-বিশেষে পরস্পরের কথা একটু মানিয়া যান—নিয়মের অক্ষরগুলি না দেখিয়া নিয়মের ভাবের প্রতি অধিক লক্ষ্য করেন। তাঁহারা ক্ষমতা ও অধিকার পাইয়া, ক্ষমতা ও অধিকারের অপব্যবহার করেন না। ইংলণ্ডের রাজার অধিকার আছে যে, পার্লেমেণ্টে যাহা কিছু সাব্যস্ত হইয়াছে তিনি তাহা অগ্রাহ্য ও রহিত করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু William of Orrangeএর পর হইতে কোন রাজাই এরূপ করেন নাই। House of Commonsএর অধিকার আছে—রাজার সঙ্গে কিম্বা House of Lordsএর সঙ্গে মতের মিল না হইলে, তাহারা টাকার সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিতে পারে; কিন্তু এ ক্ষমতা তাহারা প্রায়ই জারি করে না—এমন কি ইহার আভাসও দেয় না। আবার House of Lords—রাজা ও House of Commons-এর কাজে বাধা দিয়া ব্যবস্থা-প্রণয়ন একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারে, কিন্তু কাজে সেরূপ কখনই হয় না।

পার্লেমেণ্টে যে দলাদলি আছে তাহাও নিয়মে বদ্ধ ও তাহাতে

আসল কাজের ব্যাঘাত হয় না—বরং তাহাতে কাজের সুবিধাই হয়। অন্য কোন দেশের সভায় এরূপ দলাদলি থাকিলে, কয়দিন টিকিতে পারিত! ইহা যে টিকিয়া আছে তাহার অর্থ এই, ইংরাজেরা নিজ স্বার্থের অনুরোধে সাধারণের স্বার্থকে বিসর্জ্জন করে না।

ইংরাজদিগের আর একটি এই গুণ আছে—তাহারা কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-শূন্য হইয়া কোন একটি ভাব লইয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে না—এক লম্ফে চরমোৎকর্ষ লাভ করিবার চেষ্টা করে না। উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া তাহারা সময় ও অবস্থা বুঝিয়া, ধীর অথচ অবিচলিত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়। এই জন্যই তাহারা রাজনীতি-ক্ষেত্রে এরূপ সফলতা লাভ করিয়াছে। ফরাসিদিগের পদ্ধতি ইহার বিপরীত। তাহারা "মনুষ্যের অধিকার" প্রথমে সাব্যস্ত করিয়া, কাল ও অবস্থা না মানিয়া, সেই সকল মূলসূত্র তাহাদিগের রাজ্যতন্ত্রে প্রয়োগ করিতে গিয়াছিল এবং সেই ভাবে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল—এইজন্য তাহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

ইংরাজদিগের এই কেজো ভাব—এই সার্ব্বজনিক কার্য্যোৎসাহ (Public spirit) যদি আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি—পরিপাক করিতে পারি—আমরা যদি আমাদের প্রত্যেক অভাবের জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী না হই, আপনাদিগের কাজ যথাসাধ্য আপনারা করিতে চেষ্টা করি * তাহা হইলে এই স্বায়ত্ত-শাসনই বল—আত্ম-শাসনই বল – স্বকীয় শাসনই বল—এই দুরনুদিত কথাটি আমাদের ঘর-কন্নার কথা হইয়া পড়িবে।

* একটি শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে—গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া ব্যক্তিগত উদ্যমে আজ-কাল কলিকাতার স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে।

—o—

শিরোমিতি-বিদ্যা।

মূল-সূত্র।

শিরোমিতি-বিদ্যা (Phrenology) এক প্রকার মনোবিজ্ঞান-তন্ত্র বিশেষ। উহা মস্তিষ্কতত্ত্বের উপর স্থাপিত। আমরা দেখিতে পাই, শরীরের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে এবং শরীর-যন্ত্রের সাহায্যে মনের কার্য্য সকল বাহিরে প্রকাশ পায়। এই সত্যটির উপরেই শিরোমিতি-বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত।

বিদ্যা মাত্রেরই এক একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। এই শিরোমিতি বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ কি ?—না,—মস্তকের আয়তন ও গঠন দেখিয়া ব্যক্তি-বিশেষের স্বাভাবিক ও মানসিক প্রবণতা ও শক্তিসকল নির্ণয় করা।

ইহা প্রথমেই বলা আবশ্যক, এই বিদ্যা, কি বিজ্ঞানকল্পে, কি ব্যবহারিক প্রয়োগকল্পে, এখনও পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। ইহার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু শিরোমিতি-বিদ্যার নিম্নলিখিত মূলসূত্রগুলির সত্যতা যে অসংখ্য প্রত্যক্ষ-ব্যাপারের দ্বারা সমর্থিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১। মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র।

২। প্রত্যেক মনোবৃত্তির এক একটি বিশেষ-বিশেষ পৃথক্ যন্ত্র মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

৩। মনোবৃত্তিগুলির নৈকট্য-সম্বন্ধ-অনুসারে উহাদের যন্ত্রগুলিও মস্তিষ্ক-অভ্যন্তরে কাছাকাছি ঘেঁসাঘেঁসি অবস্থিত।

৪। অন্যান্য বিষয়ে সমান হইলে, মস্তিষ্কের আয়তনই মনের শক্তি-মত্তার পরিমাপক।

৫। শারীরিক অবস্থার ইতর-বিশেষে, মানসিক শক্তি-প্রকাশেও ইতর-বিশেষ উপস্থিত হয়।

৬। যে কোন মনোবৃত্তি হউক না কেন, অনুশীলন দ্বারা তাহার উৎকর্ষ হইতে পারে এবং অবহেলা দ্বারা তাহার অপকর্ষ হইতে পারে।

৭। প্রত্যেক মনোবৃত্তিই স্বভাবতঃ শুভজনক, কিন্তু তাহার অপব্যবহারে অশুভজনক হইয়া পড়ে।

মস্তিষ্ক—মনের যন্ত্র।

মস্তিষ্কই যে মনের যন্ত্র, ইহা এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যে কয়েকটি তথ্যের দ্বারা এই সিদ্ধান্তটী সমর্থিত, তাহা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

১। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ অন্তরাত্মার অভ্যন্তরে অনুভব করিয়া দেখিলে এইরূপ প্রতীতি হইবে যে, মন মস্তকের মধ্যে অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যেই অবস্থিত, অন্য স্থানে অবস্থিত নহে।

২। যেখানে মস্তিষ্কের ন্যূনতা সেইখানে মানসিক শক্তিরও খর্ব্বতা দেখা যায়।

৩। যে পরিমাণে মনোবৃত্তি-সকলের বিচিত্রতা ও শক্তিমত্তা প্রকাশ পায়, সেই পরিমাণে মস্তিষ্কও বৃহৎ ও জটিল বলিয়া বোধ হয়।

৪। মস্তিষ্কে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে সেই সঙ্গে মনো-বৃত্তি সমূহের মধ্যেও গোলযোগ উপস্থিত হয়। জ্বর-রোগাক্রান্ত হইলে, কিম্বা মস্তকে কঠিন আঘাত লাগিলে, প্রখর বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকেও একেবারে উন্মাদগ্রস্ত হইতে দেখা যায়।

৫। মস্তিষ্ক হইতে রক্ত হঠাৎ অপসারিত হইলে মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়, এবং কিছুকালের জন্য চৈতন্য স্থগিত থাকে।

৬। কোন প্রকার আঘাতে কখন কখন এরূপ ঘটনা দেখা গিয়া

থাকে যে কোন ব্যক্তির মাথার খুলির কতকাংশ উঠিয়া গিয়া মস্তিষ্ক অনাবৃত হইয়া পড়ে। এইরূপ স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সেই মস্তিষ্কাংশকে কেবল অঙ্গুলীর দ্বারা চাপিয়া ধরায় সেই ব্যক্তির চৈতন্য স্থগিত হইয়াছে, এবং চাপ সরাইয়া লইলে আবার চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছে।

৭। যে সকল স্থলে মস্তিষ্ক এইরূপ দৃষ্টিগোচর হয় সেই স্থলে ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, নিঃস্বপ্ন নিদ্রার সময় মস্তিষ্ক স্থিরভাবে থাকে; স্বপ্ন যে পরিমাণে সুস্পষ্ট হয় সেই পরিমাণে উহাতে আন্দোলন উপস্থিত হইয়া থাকে এবং জাগ্রতাবস্থায় উহাতে অধিকতর গতি উপস্থিত হয়।

মস্তিষ্ক—যন্ত্রসমূহের সমষ্টি।

সমস্ত মস্তিষ্ক যেরূপ সমস্ত মনের যন্ত্র—সেইরূপ বিশেষ-বিশেষ মস্তিষ্কাংশও বিশেষ-বিশেষ মনোবৃত্তির যন্ত্র।

ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

১। শরীর-তন্ত্রের সর্ব্বাংশে—এমন কি সমস্ত প্রকৃতির মধ্যেও দেখা যায় যে, প্রত্যেক ক্রিয়ার সাধনোপযোগী এক একটি পৃথক্ যন্ত্র আছে। দৃষ্টির যন্ত্র চক্ষু; শ্রবণের যন্ত্র কর্ণ; পাকের যন্ত্র পাকাশয়; ইহা অপেক্ষা আরও অধিক বলা যাইতে পারে, যে স্থলে ক্রিয়া জটিল, সে স্থলে যন্ত্রও সেই অনুসারে জটিল হইয়া থাকে। যেমন মনে কর—জিহ্বা। জিহ্বাতে একটি স্নায়ু আছে যাহার কর্ম্ম উহাকে নাড়ানো—উহা থাকাতেই আমরা কথা কহিতে পারি। আর একটি স্নায়ু আছে, তাহার দ্বারা স্পর্শ বোধ হয়; এবং আর একটি স্নায়ু আছে, তাহাতে আস্বাদ বোধ হয়। এক কথায়, যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মানবদেহ-যন্ত্রে এমন একটিও দৃষ্টান্তস্থল দেখা যায় না যেখানে কোন

একটি স্নায়ুর দুই প্রকার ক্রিয়া আছে। এক্ষণে এই ঔপমানিক যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই অনুমানে উপনীত হওয়া যাইতে পারে, যে-সকল মনোবৃত্তি খুব ভিন্ন প্রকৃতির (যথা—পর্য্যবেক্ষণবৃত্তি ও তুলনাবৃত্তি) সেই সকল বৃত্তির অনুরূপ পৃথক্ পৃথক্ যন্ত্রও অবশ্য আছে।

২। ইহা সচরাচর দেখা গিয়া থাকে যে, কোন কোন ব্যক্তি, কোন বিশেষ ব্যবসার কিম্বা কার্য্যের কিম্বা আলোচনার উপযোগী অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকে কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে চেষ্টা করিয়াও হয়ত আদৌ কৃতকার্য্য হইতে পারে না। যদি সমগ্র মস্তিষ্কের ক্রিয়া-শক্তি একটি মাত্র হইত, তাহা হইলে তদন্তর্গত প্রত্যেক বৃত্তিই সমান মাত্রায় সেই মস্তিষ্কের দ্বারা প্রকাশিত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত দেখা যায়।

৩। মনুষ্যের সকল মনোবৃত্তি একই সময়ে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ হয় না। শিশু যে সময়ে ভয় ও ভালবাসায় চালিত হয়, তখন তাহার ভক্তি-বৃত্তি কিম্বা ধর্ম্মবুদ্ধির আবির্ভাব হয় না। সে বাহ্যবস্তুর গুণাগুণ উপলব্ধি করিতে অনেক পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ করে, কিন্তু একটু বয়স বেশি না হইলে তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করিতে পারে না। ইহাতেই বোধ হয় যে, মস্তিষ্কের কোন অংশের পরিপুষ্টি দ্বারা ভালবাসার ক্ষমতা জন্মে—কোন অংশের পরিপুষ্টির দ্বারা ভক্তি করিবার ক্ষমতা জন্মে ; কোন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা পর্য্যবেক্ষণ করি, এবং কোন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা বিচার করিয়া থাকি।

৪। যখন আমরা স্বপ্ন দেখি, তখন দেখা যায়, আমাদের কতকগুলি মনোবৃত্তি সক্রিয় থাকে এবং কতকগুলি মনোবৃত্তি নিষ্ক্রিয় থাকে। ভালবাসা, ভয়, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি কত প্রকার ভাব পরম্পরাক্রমে মনোমধ্যে উদয় হয় ; কোনটারই শৃঙ্খলা থাকে না—সকলই অসম্বদ্ধ ও অব্যবস্থিত। কখনও যুক্তিযুক্ত—কখনও বা অত্যদ্ভুত। মস্তিষ্কের সজাগ

অবস্থায় যেরূপ সুশৃঙ্খল ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি সমস্ত মস্তিষ্ক একটি মাত্র যন্ত্র হইত, তাহা হইলে মনোবৃত্তি সকলের এই রূপ আংশিক প্রকাশ হইত না—সকল মনোবৃত্তিই হয় এক সময়েই জাগ্রৎ হইত, নয় এক সময়েই নিদ্রিত থাকিত।

৫। আংশিক নির্ব্বুদ্ধিতা এবং আংশিক উন্মাদ, মস্তিষ্কের যান্ত্রিক একতা বিষয়ক মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। কোন কোন জন্ম-নির্ব্বোধ ব্যক্তি—যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির নিতান্ত অভাব,—তাহাদের মধ্যে কখন কখন বলবৎ নৈতিক ভাবের প্রাদুর্ভাব, কখন বা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রকাশ দেখা যায়। অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ নির্ব্বুদ্ধি হইলেও কাহারও কাহারও কোন বিশেষ মনোবৃত্তির পূর্ণ উন্মেষ দেখা যায়; যেমন গণনা-শক্তি—কিম্বা সুরজ্ঞান বা তালজ্ঞান। সমগ্র মস্তিষ্কেরহীনতা যদি এইরূপ আংশিক নির্ব্বুদ্ধিতার কারণ হইত, তাহা হইলে এরূপ ব্যাপার সকল দেখা যাইত না। আংশিক উন্মাদও এই বিষয়ের সত্যতা সপ্রমাণ করে।

৬। মস্তিষ্কের আংশিক হানি হইলে, এক কিম্বা ততোধিক মনোবৃত্তির ক্রিয়া স্থগিত হয়, কিন্তু অন্যান্য মনোবৃত্তি সকলের হানি হয় না। মস্তিষ্ক যদি একটি মাত্র সমগ্র যন্ত্র হইত, তাহা হইলে এরূপ ঘটিতে পারিত না।

যন্ত্রসন্নিবেশ।

প্রত্যেক মনোবৃত্তির বিশেষ বিশেষ যন্ত্রগুলি বহুল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা একে একে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কৃত হইবার পর, আলোচনা করিয়া এইরূপ দেখা যায়—যে সকল মনোবৃত্তির মধ্যে অপেক্ষাকৃত পরস্পর নৈকট্য সম্বন্ধ আছে সেই সকল মনোবৃত্তির যন্ত্রগুলিও কাছাকাছি, ঘেঁসা-ঘেঁসি সন্নিবেশিত। ইহাতেই প্রতীতি হয়, এই যন্ত্রসন্নিবেশ স্বাভাবিক সুশৃঙ্খলাক্রমেই হইয়াছে—সুতরাং সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

আয়তন—শক্তির পরিমাপক।

অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের মস্তক সাধারণতঃ ক্ষুদ্র, এবং নেপোলিয়ন ক্রমোএল ফ্রাংক্লিন প্রভৃতি প্রখ্যাত বড় লোকদিগের মস্তক বৃহৎ ইহা সকলেই জানেন। "অন্যান্য বিষয়ে সমান হইলে আয়তন শক্তির পরিমাপক"—এই নিয়মটির উপর নির্ভর করিয়াই কি গতি-বিজ্ঞান, কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কি শরীরতত্ত্ব-বিদ্যা—ইহাদের গণনা ও বিচার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। শিরোমিতি বিদ্যাও এই নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল নহে।

শারীরিক অবস্থা।

"আয়তন শক্তির পরিমাপক"—এই সাধারণ নিয়মটি যখন আমরা উপরে বলিয়াছি তাহার সহিত এই কথাটিও যোগ করিয়া দিয়াছি যে "অন্যান্য বিষয়ে সমান হইলে।" মস্তকের সম্বন্ধে এই "অন্যান্য বিষয়গুলি" কি?—না—যথা, প্রকৃতি; রকম কিম্বা গুণ; স্বাস্থ্য; শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া; রক্ত সঞ্চালন; পরিপাকশক্তি; কার্য্য-তৎপরতা; উত্তেজনীয়তা; সামঞ্জস্য ইত্যাদি। কোন ব্যক্তির চরিত্র নির্ণয় করিতে হইলে এই সমস্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। এই সকলের তারতম্যে মনোবৃত্তি সকলের শক্তি-মাত্রারও তারতম্য হয়।

উৎকর্ষণীয়তা।

বিবেচনাপূর্ব্বক কর্ষণ করিলে সকল মনোবৃত্তিকেই পরিপুষ্ট করা যায়। যেরূপ শরীরের অঙ্গবিশেষকে চালনার দ্বারা পরিপুষ্ট করা যায় সেইরূপ প্রত্যেক মনোবৃত্তিকেও চালনার দ্বারা সবল করা যায়।

সকল মনোবৃত্তিই শুভজনক।

প্রত্যেক মনোবৃত্তিই স্বতঃ শুভজনক; প্রত্যেক মানবের হিতের জন্য ও জগতের হিতের জন্য সকল মনোবৃত্তিই প্রয়োজনীয়। উহাদিগকে

অপব্যবহার ও অযথা নিয়োগ করিলেই অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে এবং উহাদিগকে অযথা খর্ব্ব করিলেও শুভ ফল প্রসব করে না। সমস্ত মনোবৃত্তি যথাযথরূপে পরিপুষ্ট হইলে, সামঞ্জস্যভাবে কার্য্য করিলে, নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তির অধীনে থাকিলে, মানবজাতির পরম মঙ্গল সাধিত হয়।

হত্যা-প্রবৃত্তির যন্ত্র স্বরূপ কোন বিশেষ মস্তিষ্কাংশ নাই। কিন্তু এমন একটি বৃত্তি আছে যাহার উদ্দেশ্য— উদ্যম, কার্য্য-তৎপরতা, বল ও তেজ প্রকাশ করা; এই বৃত্তি খুব সতেজ হইলে এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তির দ্বারা ইহাকে যথোপযুক্তরূপে দমন করিতে না পারিলে, ইহা অবশেষে হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতে পরিণত হইতে পারে। সেইরূপ মনে কর, সম্পত্তি-অর্জ্জন ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আমাদের মনে নিহিত আছে; ভবিষ্যতের জন্য সুখস্বচ্ছন্দতার উপায় ও আয়োজন করিয়া রাখা এই প্রবৃত্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য, কিন্তু উৎকৃষ্ট বৃত্তির শাসনে উহাকে না রাখিতে পারিলে ক্রমে উহা চৌর্য্য ও প্রবঞ্চনায় পরিণত হইতে পারে। সকল স্থলেই মনোবৃত্তির অনিয়ন্ত্রিত কার্য্যগুলিই অমঙ্গলের কারণ—কোন মনোবৃত্তিরই স্বাভাবিক পরিণাম অশুভ নহে।

শারীরিক অবস্থা।

১। মস্তিষ্ক ও শরীর।

মানসিক ক্রিয়া সমূহের প্রকাশ ও স্ফূর্ত্তি অধিকাংশ স্থলে যদিও মস্তিষ্কের আয়তনের উপর নির্ভর করে, তথাপি শারীরিক অবস্থার ইতর-বিশেষেও তাহার কতকটা তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যে সকল শিক্ষার্থী শিরোমিতি-বিদ্যার নিয়মানুসারে লোক-চরিত্র নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহারা যেন শারীরিক অবস্থা-সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

মস্তিষ্ক ও শরীরের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। যে সকল অসংখ্য স্নায়ু শরীরের প্রত্যেক অংশে পরিব্যাপ্ত—তৎসমস্ত মস্তিষ্কে গিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। শরীর দুর্ব্বল পরিশ্রান্ত বা রোগাক্রান্ত হইলে, মস্তিষ্ক-ক্রিয়া সেই পরিমাণে মৃদুতর হইয়া পড়ে, এবং শরীর বলীয়ান ও উত্তেজিত হইলে, মস্তিষ্ক ক্রিয়াও দ্রুতগতি হয়। পক্ষান্তরে মনের ও প্রভাব শরীরের উপর প্রকটিত হয়। আশা ও আনন্দের প্রভাবে রক্তচালনা দ্রুত হয়, স্নায়ু-সমূহ সবল হয়, এবং মাংসপেশী সকল দৃঢ় হয়। আবার, দুঃখ, নিরাশার প্রভাবে সমস্ত শরীর শিথিল হইয়া পড়ে, পরিপাক ক্রিয়া ও রসানঃসারণ ক্রিয়া মন্দীভূত হয়।

২। শরীর-প্রকৃতি।

শারীরিক প্রকৃতি চার প্রকার * তাহাদিগের নাম—শ্লেষ্মা-প্রকৃতি শোণিত-প্রকৃতি, পিত্ত-প্রকৃতি এবং বায়ু প্রকৃতি।

১। উদরের প্রাবল্যের উপর শ্লেষ্মা-প্রকৃতি নির্ভর করিয়া থাকে। যাহাদের শ্লেষ্মা-প্রকৃতি, তাহাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিঞ্চিৎ গোলাকার; তাহাদের মাংস নরম, নাড়া ক্ষীণ এবং তাহাদের সমস্ত শরীরে কেমন এক রকম "এলিয়ে পড়া" ভাব থাকে।

২। ধমনী-সমূহের প্রাবল্যের উপর শোণিত-প্রকৃতি নির্ভর করিয়া থাকে। যাহাদের শোণিত-প্রকৃতি, তাহাদের শরীর কিয়ৎপরিমাণে স্থূল, তাহাদের মাংসপেশী কথঞ্চিৎ দৃঢ়—নাড়ি সবল, এবং মুখভাব উৎসাহোজ্জ্বল। তাহারা আগ্রহান্বিত, স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট, আশু ভাবগ্রহণশীল। এবং শ্লেষ্মা-প্রকৃতির লোকদিগের অপেক্ষা অধিকতর কর্ম্মতৎপর ও উদ্যমশীল।

---

* আমাদের শাস্ত্রে তিন প্রকার। যথা, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বায়ু; রক্ত-প্রকৃতি আমাদের শাস্ত্রে নাই।

৩। পিত্ত-প্রকৃতি যকৃতের প্রবলতার উপর নির্ভর করে। পিত্ত-প্রকৃতি লোকদিগের চুল খুব কাল—চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ—মাংসপেশী সুদৃঢ়—অস্থি বড় বড়—শরীরের আকার-প্রকার কর্কশতা-ব্যঞ্জক। ইহাতে অতিমাত্র কর্ম্মিষ্ঠতা, উদ্যমশীলতা ও বল প্রকাশ পায়।

৪। স্নায়ুতন্ত্রের অতিমাত্র প্রাবল্যে বায়ু-প্রকৃতির উৎপত্তি হয়। বায়ু-প্রকৃতি লোকদিগের চুল পাতলা, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সরু, মাথা বড়, শরীর একটুতেই অসুস্থ হইয়া পড়ে—রোগা, তাহাদিগের মানসিক ক্রিয়া দ্রুত এবং ইন্দ্রিয় বোধ অত্যন্ত তীব্র। তীব্রচেতনা ও মানসিক ক্রিয়াশীলতা এই প্রকৃতির বিশেষ লক্ষণ।

উপরে যে শ্রেণীবিভাগ করা হইল তাহা পুরাতন তন্ত্রানুযায়ী। আধুনিক তন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

মনুষ্য শরীরে তিন প্রকার তন্ত্রের যন্ত্র সকল দেখা যায়। ঐ প্রত্যেক তন্ত্রের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া। যথা—গতি-প্রধান কিম্বা যান্ত্রিক তন্ত্র, প্রাণপ্রধান কিম্বা পুষ্টিতন্ত্র, এবং মন প্রধান কিম্বা স্নায়বীয় তন্ত্র। এই প্রাকৃতিক ভিত্তির উপর শরীর প্রকৃতির অভিনব শ্রেণী-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত।

যথা :—

১। গতি প্রধান প্রকৃতি।

২। প্রাণপ্রধান প্রকৃতি।

৩। মন-প্রধান প্রকৃতি।

অস্থি ও মাংসপেশী, যাহাতে শরীরের গতিক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহারই প্রবল প্রভাবে গতি-প্রধান প্রকৃতি উৎপন্ন হয়।

প্রাণন-ক্রিয়া। যন্ত্র সমূহ যাহা বক্ষ ও উদরের মধ্যে অবস্থিত তাহারই প্রাবল্যে প্রাণ-প্রধান প্রকৃতির উৎপত্তি। এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সমূহের প্রভাবে মন-প্রধান প্রকৃতির উৎপত্তি হয়।

গতি-প্রধান প্রকৃতি।

যাহার শারীরিক প্রকৃতি গতি-প্রধান, তাহার অস্থি সকল অপেক্ষাকৃত বড় বড়, চৌড়া অপেক্ষা লম্বায় বেশী, এবং সমস্ত আকৃতি কোণ প্রবণ। মাংসপেশী পরিমাণে খুব বেশি নহে, কিন্তু খুব ঘন, দৃঢ়, ও বলশালী। শরীর প্রায় দীর্ঘাকৃতি, মুখ দীর্ঘ, গণ্ড-অস্থি উঁচু, সামনের দাঁত বড়-বড়, ঘাড় কিছু দীর্ঘ, স্কন্ধদেশ চৌড় এবং বুক মাঝামাঝি প্রশস্ত, চুল কালো, শক্ত, এবং প্রচুর। মুখাবয়ব সব খুব বহিঃপ্রমুখ এবং মুখভাব কঠোরতা-ব্যঞ্জক। সমস্ত শরীর দৃঢ় শক্ত, বলশালী ও শ্রমসহ। এই প্রকৃতি যাহাদের শরীর ও মনে প্রবল তাহাদের উদ্যম, বল ও কাজ করিবার শক্তি খুব বেশী। তাহাদের চরিত্রে খুব একটা বিশেষত্ব আছে, এবং জনসমাজে তাহারা সর্ব্বজন স্বীকৃত নেতা হইয়া থাকে। মন্ত্রণা-গৃহ অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্র তাহাদের উপযুক্ত কর্ম-ভূমি। তাহারাই প্রায় রাজ্যের সৈন্য-বিভাগে ও পূর্ত্ত বিভাগে প্রাধান্য লাভ করে। তাহাদিগের চিন্তাশীলতা অপেক্ষা দর্শনশীলতা অধিক। তাহারা দৃঢ়, আত্ম-নির্ভরপ্রিয়, প্রেম ও বন্ধুতায় অটল, কার্য্য নির্ব্বাহক, উচ্চ-কাঙ্ক্ষী, এবং অধ্যবসায়শীল। তাহারা প্রভুত্ব করিতে ভালবাসে এবং এই উদ্দেশে আপনার ও অন্যের শারীরিক সুখ বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। যে সকল বক্তা এই প্রকৃতির লোক তাহারা খুব জোরাল কথা প্রয়োগ করে—অনেক কথা ঝোঁক দিয়া বলে, অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে না—যতটুকু বলা আবশ্যক ততটুকু বলে। "কামারের ঠুক্‌ঠাক্ স্যাক্‌রার এক ঘা'—এই বাক্য তাহারা সপ্রমাণ করে।

এই প্রকৃতি যাহাদের অতিমাত্র প্রবল তাহারা পাশব বলের অবতার বিশেষ। তাহাদের মস্তক ক্ষুদ্র, মস্তকের চূড়া দেশ সঙ্কীর্ণ ও তলদেশ প্রশস্ত। ঘাড় খাটো ও স্থূল; স্কন্ধ প্রশস্ত; বুক চৌড়া, মাংসপেশী

খুব স্থূল, দৃঢ়, ও পাকানো। গতি-প্রকৃতির এইরূপ অতিমাত্র বিকাশ যে ব্যক্তিতে দেখা যায়, পাশব বল ছাড়া আর তাহার কিছুই থাকে না। তবে থাকিবার মধ্যে এক নির্ব্বুদ্ধিতা। মাংস-পেশী থাকা মন্দ নহে, কিন্তু সমস্ত মস্তিষ্কের বিনিময়ে মাংস-পেশী অর্জ্জন করা বাঞ্ছনীয় নহে।

দৃঢ়তা, যুযুৎসা, জিঘাংসা গতি-প্রকৃতি লোকদিগের প্রধান লক্ষণ। হিন্দুস্থানী ও মুসলমানদিগের মধ্যে এই প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনেক দেখা

প্রাণ-প্রধান প্রকৃতি।

প্রাণন-ক্রিয়ার প্রধান যন্ত্রগুলি বক্ষ ও উদরের গহ্বর অধিকার করিয়া থাকে। এই জন্য যাহাদিগের প্রাণ-প্রধান প্রকৃতি তাহাদের শরীর যতটা প্রশস্ত ততটা দীর্ঘ নহে, কিঞ্চিৎ বর্ত্তুলাকার। বুক ভরা ভরা; উদর-প্রদেশ বেশ পরিপুষ্ট, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থূল ও ক্রম সঙ্কীর্ণ, হস্তপদ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ঘাড় খাটো ও স্থূল, স্কন্ধ প্রশস্ত ও কোণালু নহে। মস্তক ও মুখ বর্ত্তুলাকার। মুখ-ভাব প্রীতিজনক ও হাস্যময়।

যাহাদিগের এই প্রকৃতি প্রবল তাহারা কি শারীরিক কি মানসিক উভয়পক্ষেই ক্রিয়াশীল। তাহারা মুক্তবায়ু সেবনে ও শারীরিক পরিশ্রমে অনুরাগী; তাহারা আমোদে কথাবার্ত্তায় ও তর্ক বিতর্কে যোগ দিতে তাহাদের ভাল লাগে। কিন্তু গতি-প্রকৃতির লোকদিগের ন্যায় তাহারা ততটা কঠিন পরিশ্রম করিতে কিম্বা কোন গভীর আলোচনায় মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ নহে। তাহারা আগ্রহান্বিত, আবেগ-চালিত, নানা বিষয়িণীবুদ্ধিসম্পন্ন এবং কখন কখন চপল; তাহারা শ্রমসহিষ্ণু কিন্তু কোন বিষয়ে লাগিয়া-পড়িয়া থাকিতে পারে না। তাহারা খুব চটক্ লাগাইতে পারে, কিন্তু তাহাদের বুদ্ধির ততটা গভীরতা নাই। তাহারা খুব রাগী, কিন্তু তাহাদের ক্রোধ অধিককাল

স্থায়ী হয় না। যেমন অল্পেতেই তাহারা উত্তেজিত হয় তেমনি অল্পেতেই আবার শান্ত হয়। সাধারণতঃ তাহারা প্রফুল্ল, সৌম্য ও মিশুক। তাহারা আমুদে লোকের সঙ্গ ভাল বাসে এবং আহার-বিহারে খুব অনুরাগী। মাদক দ্রব্য সেবন ও অতিভোজন-দোষে লিপ্ত হইবার তাহাদিগের বিলক্ষণ প্রবণতা আছে।

যাহাদিগের প্রাণ-প্রধান প্রকৃতি তাহাদিগের সাধারণতঃ পাশব বৃত্তি-সমূহ প্রবল—বিশেষতঃ তাহাদের মিথুন-লালসা, বুভুক্ষা, এবং অর্জ্জনস্পৃহা বলবতী। দয়া, আশা, ও আমোদপ্রিয়তাও তাহাদের বেশ পরিপুষ্ট।

এই প্রাণ-প্রধান প্রকৃতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথাঃ—রক্ত-প্রধান * ও রস-প্রধান †। যাহাদের বুক খুব প্রশস্ত এবং শরীর নিতান্ত স্থূল নহে তাহারা রক্ত-প্রধান প্রকৃতির লোক। এবং যাহাদের বুক সেরূপ প্রশস্ত নহে, কিন্তু লম্বোদর ও স্থূলশরীর, তাহারা রস-প্রধান প্রকৃতির লোক।

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এই রস-প্রধান প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়।

আমাদের শাস্ত্রের সহিত ঐক্য করিবার জন্য আর এক ভাবে এই প্রকৃতিগুলির শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে।

মন-প্রধান প্রকৃতি	সাত্ত্বিক প্রকৃতি।
গতি-প্রধান	রাজসিক প্রকৃতি।
রস-প্রধান	তামসিক প্রকৃতি।

মন-প্রধান প্রকৃতি।

মন-প্রধান প্রকৃতি, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-তন্ত্রের আধিক্য হইতে উৎপন্ন হয়। যাহাদের এইরূপ প্রকৃতি তাহাদের শরীর অপেক্ষাকৃত সরু এবং

* Sanguine temperament. † Lymphatic temperament.

মস্তক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ; মুখের গঠন ডিম্বাকৃতি; উচ্চ কপাল, কপালের উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক প্রশস্ত; মুখাবয়ব-সকল সুচারুরূপে খোদিত; সমস্ত মুখ ভাব-ব্যঞ্জক; সূক্ষ্ম কোমল কেশ; কোমল চর্ম্ম এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ-গ্রামস্পর্শী ও সুনম্য। সমস্ত শরীরের গঠন সুন্দর ও পরিপাটী। কিন্তু অসাধারণ ও জমকালো নহে। সূক্ষ্মমর্ম্মিতা, মার্জ্জিত-ভাবুকতা, সুরুচি, সৌন্দর্য্যানুরাগ প্রভৃতি ভাব সকল এই প্রকৃতির মানসিক অভিব্যক্তি। চিন্তা প্রবাহ দ্রুত, ইন্দ্রিয় বোধ তীব্র, কল্পনা স্ফূর্ত্তিময়ী এবং ধর্ম্মবৃত্তিগুলিও সাধারণতঃ সক্রিয় এবং প্রভাবশালী। মন-প্রধান প্রকৃতিতে, কপালের উৎকৃষ্ট অংশ-সকল এবং মস্তকের চূড়া-প্রদেশ বিশিষ্টরূপে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে; কারণানুসন্ধান-বৃত্তি, তুলনা-বৃত্তি, ভাবুকতা, আধ্যাত্মিকতা, এবং ভক্তির প্রাধান্য হয় এবং যে বৃত্তি-স্থানগুলি মস্তকের পশ্চাৎ ও তলদেশে অবস্থিত তাহারা তেমন পরিস্ফুট হয় না। এই প্রকৃতি অস্বাস্থ্যকর সীমায় উপনীত হইলে বায়ু-প্রকৃতিতে পরিণত হয়। এই প্রকৃতির আতিশয্যে, মাংসপেশীর ক্ষীণতা, শারীরিক দুর্ব্বলতা, অনুভব-তীব্রতা এবং আশুমুগ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। মস্তিষ্কের অকালপক্কতা ও সামঞ্জস্য-হীন অতিবৃদ্ধিই এই অস্বাস্থ্যকর অস্বাভাবিক অবস্থার মূলীভূত কারণ। তা ছাড়া আলস্যকর অভ্যাসে, চা, কাফি, তামাক প্রভৃতির অপরিমিত ব্যবহারে, এবং অন্যান্য হানি-জনক বস্তুর সেবনে ইহার মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠে। সাহিত্যসেবী পণ্ডিতগণের মধ্যে এই প্রকৃতির প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রকৃতি-সামঞ্জস্য।

উপরোক্ত কোন প্রকৃতির আতিশয্য হইলে, কি মন, কি শরীর উভয়েরই সামঞ্জস্য ও সৌষ্ঠব নষ্ট হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শরীর ও মনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে একের পরিবর্ত্তনে অপরটিতেও পরি-

বর্ত্তন উপস্থিত হয়। উক্ত প্রকৃতিত্রয়ের সামঞ্জস্য যথোপযুক্তরূপে সাধিত হইলে, শরীর পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব যাহাতে এই সামঞ্জস্য নষ্ট না হয়, কিম্বা কোন প্রকৃতির আতিশয্য না হয়, তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রায় কোথাও দেখা যায় না। পূর্ণতার নিকটবর্ত্তী হওয়াই প্রার্থনীয়। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতির মধ্যে এই তিন প্রকৃতির কিছু না কিছু অংশ ন্যূনাধিক পরিমাণে বিদ্যমান—এই ন্যূনাধিক্যের পরিমাণ ও সংমিশ্রণ স্থির করাই সুকঠিন। বহুদর্শনে ও বহুপরীক্ষার পর এই প্রকৃতি-নির্ণয়-জ্ঞান জন্মে।

"মস্তিষ্কের আয়তনই মনের শক্তি-মাত্রার পরিমাপক"—ইহাই সাধারণ নিয়ম। যে সকল কারণে এই নিয়মের তারতম্য ঘটিয়া থাকে, তন্মধ্যে শারীরিক প্রকৃতির ইতর-বিশেষ একটি প্রধান কারণ। যথা:—

মস্তিষ্ক-উপাদানের উৎকৃষ্টতা।

এক খণ্ড পেটাই লোহা, আয়তনে-সমান এক খণ্ড ঢালাই লোহা অপেক্ষা বেশি শক্ত;—ঘনতার আধিক্য হেতু বেশি ভারি ও দৃঢ়। পাঁওরুটীর ন্যায় ছিদ্রালু ও বিরল পরমাণু দ্রব্য-সকল লঘু ও ভঙ্গুর হইয়া থাকে। সিংহ বলবান্ কেননা তাহার মাংসপেশী, মাংসবন্ধনী এবং অস্থিসকল অত্যন্ত ঘন ও শক্ত। কি মনুষ্যে, কি পশুতে, কি মস্তিষ্কে, কি মাংসপেশীতে এই একই নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত মহত্ত্ব কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়,—না যেখানে গুরুভার দৃঢ় মস্তিষ্ক, সুদৃঢ় স্নায়ু-সমন্বিত বলবান্ শরীরের সহিত সম্মিলিত। যাহাদিগের মাথা ছোট, তাহারা খুব চটক্‌দার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চতুর এবং কোন কোন বিষয়ে শক্তি-শালী হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহারা কখনই চৌকোষ, গভীরবুদ্ধি কিম্বা নেতৃ-গুণাক্রান্ত হয় না। পক্ষান্তরে, যাহাদিগের মাথা বড়, অথচ যাহাদিগের মস্তিষ্কের আভ্যন্তরিক উপা[illegible]ন তেমন উৎকৃষ্ট নহে, কিম্বা

রোগাক্রান্ত, তাহারা বৃহৎ মস্তক হইয়াও স্থূলবুদ্ধি কিম্বা নির্ব্বুদ্ধি হইতেও পারে। কি শরীর কি মন উভয়েরই উচ্চতম শক্তি প্রকাশের জন্য দুইটি বিষয় সমান প্রয়োজনীয়। প্রথম, উপাদানের উৎকৃষ্টতা—দ্বিতীয়, আয়তনের বৃহত্ত্ব। এই উপাদান-ঘটিত উৎকৃষ্টতা অনেক সময়ে চর্ম্ম, কেশ ও মুখাবয়ব প্রভৃতির স্থূলসূক্ষ্মতা দেখিয়া নির্ণীত হয়।

স্বাস্থ্য।

কোন ব্যক্তির চরিত্র নির্ণয় করিতে হইলে তাহার স্বাস্থ্যের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কারণ, অসুস্থ হইলে কি মন কি শরীর উভয়ই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। "সুস্থ শরীরে সুস্থ মন" ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।

শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া।

শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া শারীরিক তন্ত্রের একটি প্রধান ব্যাপার। নিশ্বাস আর জীবন প্রায় একই কথা।

বুকের আয়তন ও ফুস্ফুসের অবস্থার উপর শ্বাসপ্রশ্বাসের শক্তি নির্ভর করে। বুকের আয়তন মাপিয়া দেখিলেই ইহার নির্ণয় হইতে পারে। *

শ্বাসপ্রশ্বাস-শক্তি উত্তম হইলে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায় যথাঃ—মুখ বেশ লাল, হাত পা গরম, এবং সমস্ত শরীরের ক্রিয়া সবল। যাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের তেমন বল নাই, তাহার মুখ সাধারণতঃ পাণ্ডুবর্ণ—হাত পা ঠাণ্ডা, নীল শিরার আধিক্য এবং অল্পেতেই তাহাদের সর্দ্দি কাশি হয়।

শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া যাহার যত প্রবল তাহার সেই পরিমাণে জীবনী-শক্তি। অতএব বুককে প্রশস্ত এবং শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়াকে বলবতী করা সকলেরই নিতান্ত আবশ্যক। প্রাণায়াম ইহার একটি প্রধান সাধন। এই জন্য প্রাণায়াম সাধন করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়।

* সৈনিক বিভাগের নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক সৈনিকের বুকের বেড় তাহার শরীরের দীর্ঘতা মাপের অর্দ্ধেক হওয়া চাই।

রক্ত চালনা।

শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া ও রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া এই উভয়ের মধ্যে একটি অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জীবনীশক্তি উৎপাদনে উভয়েরই সহ-যোগিতা আছে। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে বুক যে ওঠে নাবে এবং নাড়ীতে যে স্পন্দন হয়—এই উভয়ের মধ্যেই একটা যোগ আছে।

বিশুদ্ধ খাদ্য যথোপযুক্ত রূপে শরীরাভ্যন্তরে স্বাত্মীকৃত হইলে এবং বিশুদ্ধ বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা অন্তর্নীত হইয়া ঐ খাদ্যকে অক্সিজেন-শোধিত করিলে যে রক্ত উৎপন্ন হয় উহা বিশুদ্ধ রক্ত। সমস্ত শরীর-তন্ত্রে এই রক্ত প্রধাবিত করাই হৃৎপিণ্ডের কার্য্য। এবং এই রক্ত হইতেই মাংসপেশী, স্নায়ু ও মস্তিষ্ক উৎপন্ন হয়। রক্ত বিশুদ্ধ হইলেই এই সকল পদার্থ সবল সুস্থ ও কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে।

ভাল রক্তচালনের লক্ষণ :—মুখের সুস্থ বর্ণ, হাত পা গরম, এবং নাড়ী ধীর, সবল ও সমবেগসম্পন্ন।

পরিপাক ক্রিয়া।

পাকাশয়ের অবস্থার উপর পরিপাকশক্তি প্রধানতঃ নির্ভর করে। কিন্তু রক্ত চালনা ও শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার মাত্রা ভেদেও উহার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যদি রক্তচালনা-শক্তি কম হয়, তাহা হইলে পরিপাকের সময় হয়তো যথাপরিমাণ রক্ত পাকস্থলীতে নীত হয় না। আর যদি শ্বাস-প্রশ্বাস শক্তি কম হয়, তাহা হইলে যে রক্ত পাকাশয়ে নীত হইয়াছে তাহার বল ও তেজ যথোপযুক্তরূপে থাকে না। বেশি পরিমাণে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া হইলে পরিপাকের সাহায্য হয় এবং পরিপাক-যন্ত্র ও ফুস্‌ফুস সবল হয়। দৃঢ় নিরেট মাংস, সুস্থ বর্ণ, ইহা সুস্থ পরিপাক-যন্ত্রের ও উত্তম পরিপাক-শক্তির লক্ষণ। ক্ষীণতা, পাণ্ডুবর্ণ, ব্রণময় চর্ম্ম, নৈরাশ্যযুক্ত খিটখিটে মনের অবস্থা,—এই সকল অসম্পূর্ণ পরিপাক-ক্রিয়ার নিদর্শন।

ক্রিয়াশীলতা।

ক্রিয়াশীলতা প্রধানতঃ শরীর-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যে স্থলে গতি-প্রধান প্রকৃতি এবং মন-প্রধান প্রকৃতি উভয়েই সমানরূপে বলবতী সেই স্থলে এই ক্রিয়াশীলতার বিকাশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সমস্ত শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দীর্ঘতা ও মাংসপেশীর অনতিপরিপুষ্টি ইহার লক্ষণ। হরিণ, গ্রে-হৌণ্ড কুক্কুর এবং ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া এই জন্য এত দ্রুতগামী। দীর্ঘতা, অস্থূলতা ও সুকুমার গঠনের সহিত সহজসাধ্য গতি কেমন সংলগ্ন তাহা উপরোক্ত পশুদের দৃষ্টান্তে সপ্রমাণ হয়।

উত্তেজনীয়তা।

ইহাও শরীর প্রকৃতির তারতম্যের উপর নির্ভর করে। যে স্থলে প্রাণ-প্রধান প্রকৃতি ও মন-প্রধান প্রকৃতি উভয়ই অত্যন্ত বলবতী, সেই স্থলে এই উত্তেজনীয়তার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। অতিমাত্র মদ্য, তামাক, চা, কাফি প্রভৃতি সেবনে যাহাদের স্নায়ুতন্ত্র বিকৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে উত্তেজনীয়তা, স্বাস্থ্যবহির্ভূত অস্বাভাবিক মাত্রায় প্রকাশ পায়। রস-প্রধান প্রকৃতিতে ইহার বিপরীত ভাব দেখা যায়। সকল বিষয়েতেই তাহাদের ঔদাস্য ও অনুৎসাহ—কি বর্ত্তমান কি অতীত কোন ঘটনাই তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে পারে না।

অবস্থা-সমূহের সামঞ্জস্য।

চরিত্রের পূর্ণবিকাশের পক্ষে ইহা নিতান্ত আবশ্যক, যে শরীর ও মস্তিষ্ক এবং তদুভয়ের শারীরতান্ত্রিক অবস্থা সমূহের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকে—কোথাও কিছু অতিরিক্ত না হয়, ন্যূনতাও না হয়। স্থলবিশেষে মনের উপর শরীরের কতটা প্রভাব তাহা যদি আমাদের নির্ণয় করিতে হয় তাহা হইলে শুধু যে শরীর ও মনের পৃথক্ পৃথক্

বৃত্তির ও অবস্থার বিকাশ দেখিতে হইবে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের আপেক্ষিক ক্রিয়াশীলতা ও শক্তিমাত্রাও নির্ণয় করিতে হইবে। যে স্থলে সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করে, সেই স্থলে প্রত্যেকেরই কার্য্যকারিতা ও বলের বৃদ্ধি হয়; পক্ষান্তরে এইরূপ সামঞ্জস্য ও সম্মিলনের অভাব হইলে, সকলেরই কার্য্যে ব্যাঘাত হয়।

—o—

সঙ্গীত-কলা।

অন্যের নিকট হইতে সহানুভূতি পাওয়া এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা উভয়েতেই মনুষ্য মাত্রেরই সুখানুভব হয়। মনুষ্য পরস্পরের উপর নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারে না; এই নির্ভরের ভাব হইতেই সহানুভূতির উৎপত্তি। কিন্তু মনুষ্য-বিশেষে ও সমাজ-বিশেষে এই সহানুভূতির প্রকৃতি ও আবেগ-সম্বন্ধে অনেক তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বিশেষ-বিশেষ সমাজে, বিশেষ-বিশেষ রুচি-অনুসারে, বিশেষ-বিশেষ আকারে ইহার প্রকাশ দেখা যায়। রাজনীতি, সাহিত্য, কলা-বিদ্যা, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ইহার কার্য্য-প্রবণতা দৃষ্ট হয়। যত প্রকার আদর্শের মনুষ্য আছে, তন্মধ্যে যাহাদের কলা-প্রবণ প্রকৃতি, তাহাদেরই সহানুভূতির তৃষ্ণা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহারাই সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে সমধিক আকৃষ্ট হয়। বাহিরের ও অন্তরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের মনে যে সকল ভাব, চিন্তা ও আবেগের উদয় হয়, সে সমস্ত তাহারা সুন্দর, সরস ও স্থায়ী আকারে বাহিরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে; এবং যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তাহারা নিজে উপভোগ করে, তাহার কিয়দংশ অন্যকে বিতরণ করিতেও সমুৎসুক হয়। এইরূপ সহানুভূতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেই, চিত্র, স্থপতি, সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ ললিত-কলার উৎপত্তি হইয়াছে। কলা-কবির আনন্দ এত তীব্র যে তিনি তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এবং তিনি তাহা এরূপ ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন যাহা দেখিয়া বা শুনিয়া তাঁহার নিজের ভাব কিয়ৎপরিমাণে অন্যের মনে সংক্রামিত হইতে পারে। এই সহানুভূতিই কলানুরাগী ব্যক্তির রচনা-চেষ্টার প্রথম প্রবর্ত্তক।

কলা-বিশেষে এই রচনা-চেষ্টা বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ করে।

রচনার অর্থ—উপকরণগুলি এমনভাবে যথাযোগ্যরূপে বিন্যস্ত করা যাহার দ্বারা কলা-কবির মনের ভাব অন্যের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে।

সঙ্গীতেও, স্বর-সমূহের মধ্যে পরস্পর একটা বিশেষ সম্বন্ধ থাকা চাই; ছন্দের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের মধ্যে কতকটা শৃঙ্খলা স্থাপন করা চাই; তবেই অন্যের মনে তাহা স্থায়ী আকারে প্রতিভাত হইতে পারে; এবং তখনই অন্য ললিত-কলার ন্যায় তাহারও রচনা সম্ভব হয়।

প্রত্যেক ললিত-কলার বিশেষ বিশেষ সৌন্দর্য্য এক একটি বিশেষ বিশেষ আকারে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই আকার-রচনা—এই রূপ-কল্পনা প্রত্যেক কলার মধ্যে নিতান্তই প্রয়োজনীয়। যখন কোন কলা-কবি স্বকীয় কোন সুন্দর মানস-প্রতিমাকে বাহিরে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রকাশ করেন, তখনই তাহা ললিত কলার অন্তর্গত হয়।

চিত্রকলা, মূর্ত্তিকলা, কিম্বা বাস্তুকলার রূপ-কল্পনা ও গঠন-প্রণালী কিরূপ, তাহা সচরাচর লোকে সহজে বুঝিতে পারে। কিন্তু সঙ্গীতের উপকরণ-সামগ্রী অপেক্ষাকৃত আরো সূক্ষ্ম বলিয়া, তাহার রচনা-প্রণালী বুঝিয়া ওঠা তত সহজ নহে। কেননা, চিত্রকলা প্রভৃতির উপকরণ প্রধানতঃ বহির্জগৎ হইতে, এবং সঙ্গীতের উপকরণ প্রধানতঃ অন্তর্জগৎ হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। সঙ্গীতের উৎপত্তির খুব গোড়া ধরিলে দেখা যায়, হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করিতে গিয়া যে অস্পষ্ট ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাহাই সঙ্গীতের মূল উপকরণ। এই মূল-উপকরণ গুলি হইতেই, এখনকার সুমার্জ্জিত সঙ্গীত ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আদিম অসভ্যগণ যেরূপ গোড়ায় কেবল "গোঁগানি, কাঁদুনি" রূপ কতকগুলি অস্পষ্ট স্বরের উচ্চারণেই আপনার মনোভাব প্রকাশ করিত, এবং সেই সকল অস্পষ্ট স্বর হইতেই ক্রমশঃ যেমন এখনকার এই সভ্য ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, সঙ্গীত-সম্বন্ধেও সেইরূপ

বলা যাইতে পারে, মনের আবেগ প্রকাশের নানাপ্রকার অস্পষ্ট চীৎকার, ক্রমশঃ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সুস্পষ্ট স্বরে পরিণত হইয়া সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে। অসভ্যদিগের সঙ্গীত পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, তাহারা এমন কোন সুর রচনা করিতে পারে না যাহাতে স্বর-বিন্যাসের একটা সুশৃঙ্খলা বা সৌসামঞ্জস্য আছে। তাহাদের গানের সুর এক প্রকার অস্পষ্ট একঘেয়ে কাঁদুনি সুরের মত। ইহা সঙ্গীত-কলার মধ্যে ধর্ত্তব্যই নহে। কখন কখন তাহাদের মধ্যে আর একটু এই উন্নতি দেখা যায়,—দুই তিনটি বিভিন্ন সুর যোজনা করিয়া তাহারা ক্রমাগত তাহাই আবৃত্তি করিতে থাকে। ইহার সহিত আমাদের রাগ-রাগিণীর তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, আমাদের সঙ্গীত-কলার কতটা উন্নতি হইয়াছে।

আমাদের এক একটি রাগে এক একটি বিশেষ মূর্ত্তি যেন ফুটিয়া উঠে। এই রাগের মূর্ত্তি পূর্ণাবয়ব ধ্রুপদে বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া, আমাদের মধ্যে ধ্রুপদের এতটা সম্মান; এবং এই জন্যই ধ্রুপদ-গায়কদিগকে কালোয়াৎ অর্থাৎ "কলাবন্ত" বলা হইয়া থাকে।

সারসংগ্রহ।

জাপানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

"প্রাকৃতিক বিজ্ঞান" নামক পত্রিকায় বেথর সাহেব জাপানের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-সম্বন্ধে কতকগুলি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "প্রকৃতির প্রতি জাপানীদিগের যেরূপ বদ্ধমূল আন্তরিক অনুরাগ, এমন অতি অল্প জাতিরই আছে। এই অনুরাগ, তাহাদের ধর্ম্মে, শিল্পকার্য্যে, কবিতাতে, দৈনিক কার্য্যকলাপে, অবকাশের আমোদে—সমস্ত জীবনে ওতপ্রোত। ইহাদের চারুশিল্পে, সচরাচর শিল্পের চলিত বাঁধা নিয়ম কিছুই দৃষ্ট হয় না, পরন্তু "ওকিও" ও "হকুসাই" শিল্পীদ্বয় যে জীবন্ত স্বাভাবিকতার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন তাহাই তাহাদের সমস্ত শিল্পকর্ম্মে দীপ্যমান। এই প্রাকৃতিক জগতের অতি ক্ষুদ্রতম বস্তুসমূহকেও উহারা উহাদের শিল্পকার্য্যে প্রকাশ করে—এমন কি, সেই সকল বস্তুকে উহারা কাল্পনিক ভাবে অনুরঞ্জিত করে। নিতান্ত নিয়মবহির্ভূত ও অসম্ভব হইলেও, উহাদের শিল্পকর্ম্মে স্বাভাবিকতার অভাব হয় না—উহা যেন জীবন্ত বলিয়াই মনে হয়। সুদূর কি সুমহান পদার্থ এই সকল শিল্পীদিগকে ভাব-রসে মুগ্ধ করিতে পারে না, পরন্তু যাহা অতি নিকটতম, যাহা একটু অদ্ভুত-রসাত্মক, যাহা চুট্‌কি ধরণের সুন্দর তাহাই উহাদিগের অন্তরে, ভাব-রসের দৈব-স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে। উহাদের কবিতার নিয়ম অতিশয় কঠিন ও বহুল হওয়া সত্ত্বেও, উহাদের কবিতাতে প্রকৃতির সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। কখনও, শুদ্ধ সৌন্দর্য্যটি দেখাইবার জন্য একটা ছবির অসম্পূর্ণ আদর্শ মাত্র দেওয়া হয়; কখনও বা এমন একটা কিছুর বর্ণনা থাকে, যাহা জগতের আত্মার

সহিত যেন মর্ম্মে মর্ম্মে সন্নিবদ্ধ—যাহা এত সূক্ষ্ম ও সুকুমার যে, চির-কালই আমাদিগকে মুগ্ধ-করে, অথচ নিজে কখনই ধরা দেয় না।

যদি জাপানী চরিত্রের কোন বিশেষ লক্ষণ থাকে তবে ফুল-ভালবাসা সেই লক্ষণ বলিতে হইবে। জাপানে এমন একটি ক্ষুদ্র বাড়ি দেখা যায় না যেখানে ছবির মত সাজানো একটি বাগান নাই; এবং যতই সামান্য পান্থশালা হোক্ না কেন, তত্রথা প্রত্যেক অতিথির ঘর পুষ্পগুচ্ছে সমুজ্জ্বল। জন্তুভালবাসাও খুব বেশি না হোক্, যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

প্রকৃতি-জননীর প্রতি এই প্রকৃতির শিশুদিগের যে প্রকার অনুরাগ তাহার দৃষ্টান্ত অসংখ্য। কিন্তু এই ভাবের সহিত বৈজ্ঞানিক স্পৃহার কোন সংশ্রব নাই। আজকাল, দ্রুত-আওয়াজকারী বন্দুক প্রভৃতি আধু-নিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, বৈজ্ঞানিক স্পৃহা জাপানকে আক্রমণ করিয়াছে। এই স্পৃহাটি ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া আপাততঃ কি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে তাহা প্রদর্শন করা বেধর সাহেবের লিখিত প্রবন্ধের কতকটা উদ্দেশ্য।

জাপানে এই যে আধুনিকীকরণ কিম্বা য়ুরোপীয়ীকরণ আরম্ভ হই-য়াছে, ইহা কেবল আত্মরক্ষার উদ্দেশে। জাপানীদিগের মধ্যে একদল লোক—বিশেষতঃ রাজনীতিকুশল "কৌণ্ট ইণ্টা" ও কৌণ্ট ইমুয়া" এই ব্যাপারের প্রবর্ত্তক। কিন্তু জাপানী রাজসরকারের অধীনে যে বৈদে-শিক কর্ম্মচারীরা ছিল তাহারাই এই কল্পনাটিকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। এই উন্নতিকর কার্য্যে দুইটি মহাজাতির হস্ত লক্ষিত হয়। এক—ইঙ্গ-স্যাক্‌সন্, অপর—জর্ম্মণ জাতিই ইহার প্রধান উদ্যোগী। ইংরাজেরা জীবনের কেজো দিক্‌টার প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়াছেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ধর্ম্মটাও জাপানীদিগের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরাজদিগের দ্বারা রেল-পথ হই-য়াছে—এঞ্জিনিয়ারিং কালেজ হইয়াছে, রণতরীর আয়োজন হইয়াছে,

টাঁকশাল হইয়াছে, মুদ্রাযন্ত্র হইয়াছে এবং বাইবেল-অনুমোদিত প্রার্থনা-পুস্তক হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, জর্ম্মণেরা প্রধানতঃ ইতিহাস, চিকিৎসা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব দিকে স্বীয় প্রভাব প্রকটিত করিয়াছেন।

যে সকল জর্ম্মণ পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে জাপানে গিয়াছেন তন্মধ্যে ফিলিপ ফ্রান্সিসিয়ে বোল্ট সর্ব্বাপেক্ষা বড়। তিনি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে নাগাসাকি নগবে অবতীর্ণ হন। চরিত্র বল, শিষ্টতা, চিকিৎসানৈপুণ্য—তা ছাড়া উৎকোচদানের প্রভাবে তিনি তাৎকালিক সন্দিগ্ধমনা বশ্যতা-বিমুখ জাপানীদিগকে আশ্চর্য্যরূপে বশীভূত করিয়াছিলেন। হঠাৎ একবার এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, জাপান-রাজ্যের প্রধান গুপ্তচব জাপান-দেশের একটি মানচিত্র ঐ জর্ম্মণ পণ্ডিতকে বিক্রয় করিয়াছে। পুরাতন জাপানী আইন-অনুসাবে উহা রাজদ্রোহ। জর্ম্মণ পণ্ডিত কারাগাবে অবরুদ্ধ হইলেন এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে যখন কারাগার হইতে মুক্ত হইলেন, তখন তাঁহার প্রতি কড়াক্কড় হুকুম হইল যে, তিনি যেন জাপান ছাড়িয়া আর কোথাও না যান। এই জর্ম্মণ পণ্ডিত বলেন, কিম্ভূতকিমাকারের প্রতি জাপানীদিগের প্রবল অনুরাগ, তাহাদের দৃষ্টি যেরূপ সুতীক্ষ্ণ তাহাদের হস্তও সেইরূপ কার্য্যপটু এবং তাহাদের মনের গতিও কেজো ধরণের। উদ্ভিদবিদ্যা তাহারা বিশেষরূপে অনুশীলন করিয়াছে; তাহার কারণ, ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে উদ্ভিজ্জের প্রয়োজন এবং তাহাদের খাদ্য ও পরিধেয়ের জন্যও উদ্ভিজ্জের উপর একান্ত নির্ভর করিতে হয়। নিজের সুখসাধন ও গৃহবিভূষণের জন্য অপেক্ষাকৃত দুর্লভ বৃক্ষচারাদি উহারা চাষ করিয়া থাকে। প্রাণীতত্ত্ব-বিদ্যায় উহারা ততটা উন্নতি লাভ করে নাই। কারণ, এই উদ্ভিজ্জ-ভোজী জাতির পক্ষে পশু অপেক্ষা উদ্ভিদ বেশী প্রয়োজনীয়। কিন্তু যে সকল প্রাণী তাহাদের কাজে আসিত—যেমন মৎস্য, শামুক ও খোলা-

ওয়ালা বিবিধ জীব, তাহাদের সম্বন্ধে জাপানীদিগের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান আছে বলিয়া মনে হয়। শামুক সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে উহারা নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করে। যে দ্রব্য যত কিম্ভূতকিমাকার, উহাদের নিকট সেই দ্রব্য তত মূল্যবান।

পঁচিশ বৎসরের মধ্যে জাপানীরা কি অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহা উহাদিগের বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানের তালিকা দৃষ্টেই প্রতীতি হইবে। "টোকিও"-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানশালা, ভূতত্ত্বঘটিত পরিমাপ-পদ্ধতি, "উএনো" পার্কে রাজকীয় যাদুঘর, বিদ্বজ্জন-পরিষৎ এবং অন্যান্য শিক্ষাসংক্রান্ত সভাসমিতি,—প্রাকৃতিক জ্ঞানপ্রচার যাহাদের উদ্দেশ্য—এই সকল অনুষ্ঠান দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেধর সাহেব বলেন, জাপানীদিগকে প্রকৃতরূপে বৈজ্ঞানিক করিয়া তুলিবার পক্ষে অনেকগুলি বাধা থাকা সত্ত্বেও উহাদের চরিত্রগত সকল গুণই বিজ্ঞান অনুশীলনের পক্ষে অনুকূল এবং তদুপযোগী কার্য্যক্ষেত্রও অতীব বিস্তীর্ণ।

——o——

বিংশতি শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অদ্ভুত কাণ্ড।

পিয়ার্সন সাহেব বিলাপ করিয়াছেন, বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কার সমস্তই হইয়া গিয়াছে—বিজ্ঞানের এখন বেকার অবস্থা। এই কথা শুনিয়া, লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল এল্‌স্‌ডেল্ "কণ্টেম্পোরারি" পত্রিকায় "বিজ্ঞানের ভাবী সমস্যা" বলিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি যেরূপ উৎফুল্লভাবে বিজ্ঞানের ভাবী ফলাফল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। তিনি বলেন, ঊনবিংশতি শতাব্দী অপেক্ষা বিংশতি শতাব্দীতে অধিক সংখ্যক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইবার সম্ভাবনা আছে। সেই অসংখ্য সম্ভাবিত আবিষ্কারের মধ্যে তিনি চারটির বিষয় বিবৃত করিয়াছেন।

প্রথম, বায়ু-মণ্ডলকে আয়ত্তের মধ্যে আনা। এখনই-ত ফরাসী রাজ্যের যুদ্ধ-বিভাগ হইতে এমন সকল ব্যোম-যান প্রস্তুত হইতেছে যাহার গতি-বেগ ঘণ্টায় ২৫ মাইল হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যায়। একটা উড়িবার যন্ত্র সহসা যদিও না উদ্ভাবিত হয়; ক্রমশ, অল্প অল্প উন্নতি হইতে হইতে এই প্রকারের ব্যোম-যান একদিন নিশ্চয়ই প্রস্তুত হইবে। তখন গ্যাসের আর কোন কাজ থাকিবে না, কেবল উহা বেলুনের ভারটি বহন করিবে মাত্র; আর প্রচালক ইস্ক্রু-যন্ত্র দ্বারা ঊর্দ্ধোত্তোলন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। এই প্রচালক-যন্ত্রটি ক্রমে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পাখীর ডানার ন্যায় কাজ করিবে, তখন বেলুনটি বাহুল্য হইয়া পড়িবে। ১৪ বৎসর পূর্ব্বে, তখনকার যন্ত্র-বিজ্ঞানের অবস্থা-অনুসারে, উড়িবার যন্ত্র উদ্ভাবন করা অসম্ভব,—এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। কিন্তু এখন যে প্রকার যন্ত্র-বিজ্ঞানের দিন দিন উন্নতি হইতেছে, এই উন্নতির কার্য্য আর ১৪ বৎসর সমানভাবে চলিলে, উড়িবার যন্ত্রের সম্ভাবনাটি নিশ্চয়ই বাস্তবে পরিণত হইবে। আজকাল, উড়ন্ত পাখীদিগের গতি এবং বায়ু-পথে গতিবিধি করিবার সাধারণ নিয়মসকল যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষিত হই-তেছে। যদি সুযোগ্য কার্য্যদক্ষ যন্ত্র-কুশল পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে মনো-নিবেশ করেন তবে অচিরাৎ এই সমস্যাটি পূরণ হইবে সন্দেহ নাই। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যাটি এই, কি উপায়ে "বায়ু-পথে স্থির-ভাবে লম্বমান" থাকা যায়।

যদি উড়িবার যন্ত্রটি স্থায়ী, মজবুৎ, কার্য্যোপযোগী করিয়া গঠিত হয়, তাহা হইলে গতিবিধির জন্য এমন নিরাপদ যান আর দ্বিতীয় নাই। ৩৬ কিম্বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আমরা হয়-ত লণ্ডন হইতে নিউয়র্ক নগরে উপনীত হইতে পারিব—কিম্বা প্রাতর্ভোজনান্তে লণ্ডন হইতে প্যারিসে পৌঁছিয়া, আবার মধ্যাহ্ন-ভোজনের মধ্যেই প্যারিস হইতে লণ্ডনে প্রত্যা-বর্ত্তন করিতে পারিব। লৌহ-বর্ত্ম ও বাষ্পীয় জাহাজ আবিষ্কৃত হইয়া

যেরূপ জগতের মধ্যে একটা মহাপরিবর্ত্তন আনিয়াছিল—উড়ন্ত যন্ত্রের আবিষ্কারেও তাহাই হইবে। এই উডন্ত যন্ত্রসকল মহাবেগে আকাশপথে ধাবিত হইবে—ঘণ্টায় বোধ হয় ১০০ মাইল করিয়া চলিবে।

সমুদ্র-নাবিকতাতেও মহা পরিবর্ত্তন হইবে। অধুনা, যন্ত্র কুশল পণ্ডিতেরা পরিচালক শক্তির পুষ্টিসাধন করিয়া জাহাজের বেগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। লেখক অনুমান করেন, উহাঁরা সকলেই ভুল পথ ধরিয়াছেন। উহাঁদের উচিত, "সামুদ্রিক মৎস্যদিগের ধরণধারণ গতিবিধি" অনুশীলন করিয়া দেখা এবং ইহাও প্রণিধান করিয়া দেখা, কেন শুশুক অপেক্ষা টর্পেডোর বহু পরিমাণে অধিক চালক-শক্তি আবশ্যক হইয়া থাকে। লেখক বলেন, "চর্ম্মাপরিস্থ ঘর্ষণ"ই এই প্রভেদের কারণ। এই কারণেই জাহাজ জলে অধিকাংশ বাধা প্রাপ্ত হয়। মৎস্যদিগের বহিঃত্বকের রহস্যটি আমাদের শিক্ষা করা আবশ্যক। সকল প্রকার আবরণ অপেক্ষা মসৃণ ইস্পাতের আবরণ নিকৃষ্ট। লেখক বলেন, হাঙ্গরের ত্বকের অনুকরণ করিয়া নিষ্পেষিত কাগজের আবরণ জাহাজে দিলে কাজ চলিতে পারে। তাঁহার মতে, কোন সুযোগ্য লোকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা চালাইবার জন্য যুদ্ধ-নাবীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা প্রতি বৎসর ২।৩ হাজার পৌণ্ড ব্যয় মঞ্জুর করিলে ভাল হয়। আর এক কথা, হিম-পৃষ্ঠের অনুকারী মার্কিন আদর্শের জাহাজে তরঙ্গ-জনিত বাধা নিদূরিত হইতে পারে। এইরূপ হইলে, আধুনিক জাহাজের যেরূপ চালক-শক্তি, তাহাতে জাহাজ ঘণ্টায় পঞ্চাশ 'নট্' করিয়া সমুদ্রে চলিতে পারিবে।

আর একটি সমস্যা। কয়লা না পুড়াইয়া কিরূপে উহা হইতে উহার শক্তি বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ, কয়লাকে এমন অবস্থায় কিরূপে আনা যায়, যাহাতে কয়লা বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিতে পারে। লেখক মনে করেন, এই সমস্যাটিও শীঘ্র পূরণ হইবে।

তাঁহার আর এক আশা—রসায়ন ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে উদ্ভিজ্জ খাদ্যসকল প্রস্তুত হইবে। সেই সকল খাদ্য-সামগ্রীর মধ্যে ঘাস একটি ধর্ত্তব্য। আমরা যদি ঘাসকে কোন উপায়ে পরিপাক করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের খাদ্যের আর অভাব থাকে না।

স্ত্রীলোকের কাজ করা কেন উচিত নহে ?

সিয়েঁার জি ফেরেরো সাহেব "মনিষ্ট" পত্রিকায় "সমাজতত্ত্ব ও জীবনতত্ত্বের দিক দিয়া স্ত্রী-সমস্যা" মীমাংসা করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি বলেন,—ইহা যেমন একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে, পুরুষ জীবিকার জন্য শ্রম করিবে—যুঝাযুঝি করিবে, সেইরূপ ইহাও আর একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে, স্ত্রীলোক জীবিকার জন্য শ্রম করিবে না—যুঝাযুঝি করিবে না। জীবনতত্ত্ববিদ্যা স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়াছে যে, স্ত্রীপুরুষের শ্রমবিভাগের উপরেই জাতিবিশেষের শারীরিক উন্নতি নির্ভর করে—কারণ ইহারই ঠিক্ সমানুপাতে জীবনের স্থায়িত্বকাল। উচ্চতর জীবদিগের মধ্যে যে বিবাহ-প্রথা দেখা যায় তাহা কি ?—না, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাগের উৎকৃষ্ট একটি পদ্ধতি মাত্র। ডিমে তা-দিবার সময় পুং-পক্ষীই স্ত্রীপক্ষীর সমস্ত অভাব যুগাইয়া থাকে। অন্য সময়ে স্ত্রীপক্ষী যখন আহার অন্বেষণ করে, সে কেবল পুরুষপক্ষীকে সাহায্য করিবার হিসাবে। সিংহ ও শিয়াগ্রোষের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। তবে যে, অসভ্য মনুষ্যজাতির মধ্যে স্ত্রীজাতিকে শ্রম করিতে দেখা যায়, সে কেবল পুরুষের স্বার্থপরতা-নিবন্ধন ; সুতরাং, উহা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। লেখক বলেন, যে জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের শ্রম প্রচলিত, সে জাতি অসভ্য অবস্থাতেই থাকিয়া যায়—তাহার আর উন্নতি হয় না। সভ্যজাতির মধ্যে ধনোৎপাদন কার্য্যে স্ত্রীলোকের শ্রম অনাবশ্যক।

পুরুষই ধনোৎপাদনে সমর্থ। স্ত্রীলোকে শ্রমের কার্য্য আরম্ভ করিলে পুরুষ-শ্রমের বাজার-দর কমিয়া যাইবে। আজ কাল স্ত্রীলোকেরা কারখানায় কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই জন্য য়ুরোপে কত পুরুষ পালে পালে কর্ম্মের চেষ্টায় ফিরিতেছে অথচ কর্ম্ম পায় না—মধ্যে মধ্যে অনেকেই বেকার হইয়া পড়ে। ইহা একটি ভয়ানক অমঙ্গলের কথা—ইহা একটি সামাজিক রোগের লক্ষণ। দেশবার্ত্তা-বিবরণে দেখা যায়, যে সকল দেশে মায়েরা শ্রমজীবী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, সেখানে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে। আদর্শ-রমণী, শ্রীসৌন্দর্য্য ও সুমার্জ্জিত ভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবে ইহাই বাঞ্ছনীয় এবং এই উদ্দেশে উহাদের শ্রম হইতে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রমজীবী রমণী শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহার স্ত্রীসুলভ সমস্ত লক্ষণ নষ্ট হইয়া যায়। স্ত্রীসুলভ শ্রীসৌন্দর্য্য ও স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের ভালবাসা —এই দুইটি ব্যাপার হইতেই বাৎসল্য প্রভৃতি পুরুষের কোমলতর বৃত্তি গুলি উৎপন্ন হইয়াছে।

সভ্যতার অধিকাংশ ফল পুরুষেরা নিজে অর্জ্জন করিলেও, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকে তাহা অধিক পরিমাণে ভোগ করিতেছে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। পুরুষ পূর্ব্বে যেমন খাটিয়া আসিয়াছে এখনও সেইরূপ খাটিতেছে—ইহাতে প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভাব কিছুই নাই। কারণ ইহাই পুরুষের প্রকৃত কার্য্য। অতএব, পুরুষের জীবন সংগ্রামে স্ত্রীলোক একটু সবুর করিয়া থাকিলেই যখন পুরুষেরা তাহার পদতলে তাহাদের সমস্ত পরিশ্রমের ফল আনিয়া দিতে প্রস্তুত, তখন স্ত্রীলোকের নিজের জন্য এত মাথা ব্যথা কেন?

ভাষা-শিক্ষার রহস্য।

মসিয়ো গুয়ঁ্যা নামক একজন ফরাসি পণ্ডিত, "ভাষা-শিক্ষা ও শিক্ষার রহস্য" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, দুই তিন বৎসরের শিশুরা যে কোন বিদেশীয় ভাষা ছয় মাসের মধ্যে শিখিতে পারে। তাহারা ব্যাকরণ পড়ে না, বর্ণমালাও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে না, কথা বানান করতে পারে না—কিন্তু চলনসই কথা কহিতে পারে ও বুঝিতে পারে। নিতান্ত অবোধ শিশু যদি ছয়মাসের মধ্যে একটা বিদেশীয় ভাষা শিখিতে পারে, তবে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি সেই সময়ের মধ্যে কেন না শিখিতে পারিবে? তাহার সহজ উত্তর এই। শিশু কান দিয়া কথা শেখে; এবং চোখ্ দিয়া যাহা দেখে তাহার সহিত শোনা-কথাগুলি মিলাইয়া লয়। শিশু ঘটনাগুলি চক্ষে দেখে এবং তদর্থবাচক কথাগুলি কানে শোনে; এবং এই দুই প্রকরণ একত্র হওয়ায়, আনুষঙ্গিকভাব নিয়মানুসারে, কথা কহিতে ও বুঝিতে সহজেই সমর্থ হয়। পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তিরা ইহার ঠিক্ উল্টা পদ্ধতি অবলম্বন করে। তাহারা চক্ষুর সাহায্যে বস্তুর প্রতিরূপ মনোমধ্যে গ্রহণ না করিয়া চক্ষের দ্বারা কথার প্রতিরূপটি মনোমধ্যে বসাইবার চেষ্টা করে। তাহারা কেবল চোখ্ দিয়া কথাগুলি গ্রহণ করে—ইহাতে কান তাহাদের বড় একটা কাজে আইসে না। অতএব শিশুর পদ্ধটিই ভাষা শিখিবার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি—গ্রন্থকার ইহা স্থির করিয়া শিশুরা কিরূপে ভাষা শিক্ষা করে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন; আলোচনা করিয়া কতকগুলি মূল-সূত্র নির্দ্ধারিত করিলেন। এই মূলসূত্রের উপর তাঁহার ভাষা-শিক্ষা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত, এবং এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তিনি বিলক্ষণ সফলতা লাভ করিয়াছেন।

সেই মূল সূত্রগুলি এই :—

(১) শিশুরা কতকগুলি ছাড়া-ছাড়া কথার দ্বারা ভাষা শিক্ষা করে না, পরন্তু পূর্ণাবয়ব বাক্যপরম্পরা দ্বারা ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে।

(২) বাক্যের দ্বারা যদি ভাষা শিখিতে হয়, তবে ক্রিয়াপদের উপরেই বেশি ঝোঁক্ দেওয়া আবশ্যক। কারণ ক্রিয়াপদটিই প্রত্যেক বাক্যের প্রাণস্বরূপ।

(৩) কতকগুলি বাক্যপরম্পরা মনে রাখিবার জন্য শিশু তদর্থবাচক ঘটনাগুলি যেরূপ পরে পরে ঘটিতে দেখে তাহারই ছবি মনোমধ্যে স্পষ্ট করিয়া অঙ্কিত করিয়া লয়।

ভাষা-শিক্ষার এই রহস্যটি কি করিয়া তাহার মনোমধ্যে উদয় হইল গ্রন্থকার তাহারও আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিয়াছেন। তিনি জর্ম্মণ ভাষা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রথমে তিনি মনে করিলেন, জর্ম্মণ ভাষার ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে পারিলেই তিনি জর্ম্মন ভাষা শিখিতে পারিবেন। এই উদ্দেশে তিনি জর্ম্মান ভাষার ব্যাকরণ দশ দিনের মধ্যে একরূপ বেশ আয়ত্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু হামবর্গের বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানকার আচার্য্যদিগের বক্তৃতার মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। যে ব্যভিচারী ক্রিয়া-পদগুলি এত কষ্টে তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন তাহার একটিও তিনি বক্তৃতার মধ্যে ধরিতে পারিলেন না। তাই তিনি মনে করিলেন, ভাষার মূল-ধাতুগুলি ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। এই অভিপ্রায়ে জর্ম্মান ভাষার ধাতুগুলি তিনি বিলক্ষণরূপে আয়ত্ত করিলেন। মনে করিলেন, এইবার ভাষা শিক্ষার হদিশ পাইয়াছি। একণে উৎফুল্ল হইয়া আবার সেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু বক্তৃতাস্থলে গিয়া দেখেন এখনও পূর্ব্ববৎ—কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। অতঃপর, এই সমস্ত পদ্ধতি ছাড়িয়া দিয়া, তিনি নাপিতের দোকানে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, সেখানকার খদ্দেরদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়া দুই চারিটা

দস্তুরমত ভদ্রতার বুলি শিখিলেন, কিন্তু কতকগুলি খাপছাড়া বুলি শিখিয়া বিশেষ কিছু ফললাভ হইল না। এক্ষণে তিনি অভিধানের সাহায্যে গেটে ও শিলরের রচনাবলী হইতে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতেও বিশেষ কোন ফল হইল না। বিরক্ত হইয়া অনুবাদ ছাড়িয়া দিলেন। এবার "অলেণ্ডর্ফ" ধরিলেন। একমাসের মধ্যে অলেণ্ডর্ফের সমস্ত পাঠগুলি শেষ করিলেন, শেষ করিয়াও দেখেন কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিতেছেন না—সে বিষয়ে এখনও ঠিক পূর্ব্ববৎ। তিনি সমস্ত অভিধান কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা করিলেন—কৃতকার্য্যও হইলেন। তবুও ভাষার হদিশ পাইলেন না। পরে হতাশ হইয়া ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার একটি আড়াই বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সঙ্গে খুব কথা জুড়িয়া দিল। পাকা-পাকা কত কথাই বলিতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, এ যেমন অনর্গল ফরাসি ভাষায় কথা কহিতেছে, আমি যদি ইহার মত জর্ম্মাণ ভাষায় কথা কহিতে পারি, তাহা হইলে কি সুখেরই বিষয় হয়। এই শিশুটি কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করে, তলে তলে তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। এক দিন তাহার মাতা, তাহাকে যাঁতাকলের কারখানায় লইয়া যান—শিশুটি তাহার আগাগোড়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল ও তদ্বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। আমি তাঁহার উপর চোখ্ রাখিলাম, মনে করিলাম, না জানি উহার মনে কিরূপ চিন্তা চলিতেছে, দেখা যাক্, কি করিয়া আপনার মনের ভাব কথায় প্রকাশ করে। এক ঘণ্টা পরে যাহা যাহা দেখিয়াছিল তাহা সকলের নিকটে বর্ণনা করিবার জন্য সে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার গল্প বার-বার করিয়া সকলকে বলিতে লাগিল; মধ্যে মধ্যে কথা একটু আধটু বদল হয়—দুই একটা খুঁটিনাটি ভুলিয়া যায়—মনে করিবার জন্য আবার গোড়ার

কথায় ফিরিয়া আইসে। এই প্রকারে, একটা তথ্য হইতে তথ্যান্তরে, একটা বাক্য হইতে বাক্যান্তরে স্বাভাবিক ক্রমানুসারে উপনীত হইতে লাগিল। "তার পর" "তার পর" বলিয়া এক একবার থামিতেছে আর এই অবকাশে কথাগুলা মাথার মধ্যে গুছাইয়া লইতেছে; এবং গুছাইয়া লইয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই কথাগুলা ব্যক্ত করিয়া বলিতেছে। দেখা গেল, একটা পদের নিকট অনেকক্ষণ ধরিয়া থামিতেছিল—সেই পদটি ক্রিয়া-পদ। গ্রন্থকারের হঠাৎ মনে হইল, এইবার ভাষা-শিক্ষার যথার্থ হদিশ পাইয়াছি। এই হদিশটি তিনি মনোমধ্যে বেশ করিয়া আয়ত্ত করিয়া আবার জর্ম্মনি দেশে গমন করিলেন; সেখানে গিয়া একটি ভদ্র পরিবারের গৃহে বাসা লইলেন এবং সেই পরিবারের ছেলেদিগকে তিনি ফরাসি শিখাইতে লাগিলেন। বাধ্য হইয়া তাহাদের সঙ্গে জর্ম্মণ ভাষায় তাঁহার কথা কহিতে হইত। এইরূপে অল্পকাল মধ্যে তিনি জর্ম্মণ ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন এবং এতদূর ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন যে, একটা দুরূহ উৎকট দার্শনিক বিষয়-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেও সমর্থ হইলেন।

ভৌতিক বিজ্ঞানের দুরাকাঙ্ক্ষা।

মার্চ মাসের "বিজ্ঞান-উন্নতি" নামক পত্রে, ডব্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফিস্‌জেরাল্ড্‌ সাহেব, ভৌতিক বিজ্ঞান-সম্বন্ধে এইরূপ বলেন;—"ইথর ও জড়ের গঠন কিরূপ, এই মহাসমস্যা, আজকাল, ভৌতিক তত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের সম্মুখে উপস্থিত। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, উহারা গতি-গণিতের নিয়মানুসারে গঠিত। উত্তরোত্তর এই সত্যটি আরও নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উহারা—ভার-বেগ, চেষ্টা-শক্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতি নিয়মের বশবর্ত্তী। উহাদের ক্ষুদ্রতম অংশও ঐ নিয়মের অধীন। যদি তাহাই হয়, তবে উহাদের গঠন

কিরূপ? ...... এই তমসাবৃত অজ্ঞাত রাজ্যে প্রবেশ করিবার একটা পথ আমরা বাহির করিতে চাই—জড়ের গঠন ও উহার আভ্যন্তরিক গতি আমরা অবগত হইতে চাই। এই জন্য, আমরা ভৌতিক তত্ত্বানুসন্ধ্যায়ী ও রাসায়নিক পণ্ডিতের মুখ চাহিয়া আছি। আমরা আশা করিতেছি, একদিন-না-একদিন এই সকল আভ্যন্তরিক গতি ও গঠন সম্বন্ধে এতটা জ্ঞান লাভ করিব যে, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ স্মৃতির গঠন পর্য্যন্ত আমরা অবগত হইতে পারিব; এবং চিন্তা, দয়া, প্রেম প্রভৃতি চিত্ত-বৃত্তির মূলে যে সকল গতি নিহিত আছে, তৎসম্বন্ধেও একটা অস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে সমর্থ হইব। তখন, সৌরজগতের গতির মূলে কিম্বা কোন মানব-জাতির ক্রমাভিব্যক্তির মূলে, কি কি চিন্তা নিহিত আছে তাহাও হয়-ত আমরা বলিয়া দিতে পারিব।"

যুদ্ধের অভিনব অস্ত্র।

এপ্রিল মাসের "আট্‌লাণ্টিক মন্থ্‌লি" পত্রে ব্রেট-সাহের পরামর্শ-চ্ছলে বলেন, স্বদেশের উপকূল রক্ষার্থ, বন্দুক ও সঙ্গিনের পরিবর্ত্তে, অন্য অস্ত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ-পদার্থ ও পেট্রোলিয়ম-তৈল আত্মরক্ষণকার্য্যে ব্যবহার করা মন্দ নয়। ৩০ মাইল ব্যবধানে জমির উপর এতাধিক শক্তি-সম্পন্ন বিদ্যুৎ-পদার্থ উৎপাদন করা যায় যে, স্পর্শমাত্র একটি সমস্ত অনীকিনী ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে; এবং দাহ্য-তৈল কোন স্থান হইতে ২০ মাইল পর্য্যন্ত প্রবাহিত করিয়া, ইচ্ছামত তৎক্ষণাৎ তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা যাইতে পারে। তিনি আরও একটা পরামর্শ দেন, লৌহ-বর্ম্মাবৃত রেল-গাড়িতে কামান সজ্জিত করিয়া এইরূপ ৫০টি কামান-গাড়ি প্রস্তুত রাখিলে, ১০০ মাইল পর্য্যন্ত রেল-পথ শত্রুর দুরধিগম্য হইবে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে ফ্রেডরিক হ্যারিসনের মত।

ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের সহিত নৈতিক অনুশীলনের সম্বন্ধ কি, এই বিষয়ে, হ্যারিসন সাহেব, "ইন্টরন্যাসানাল জর্নাল অফ্ এথিক্স" পত্রে বিচার করিয়াছেন।

তিনি আরম্ভেই বলিয়াছেন;—"যাহাকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, এইরূপ তাবৎ বিশ্বাস-পদ্ধতির মধ্যেই একটা সাধারণ উপাদান বর্ত্তমান।

"সেই সাধারণ উপাদানটি কি? প্রথম উপাদান;—এমন একটি মহাশক্তির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তি অপেক্ষা মহত্তর—যাহা সমস্ত সমাজ অপেক্ষা মহত্তর—যে শক্তি, শুভ ও অশুভ ফল বিতরণ করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের সহিত যাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও মমতা বিদ্যমান। দ্বিতীয় উপাদান;—এই শক্তির প্রতি ভক্তিভাব, তটস্থভাব, প্রেম ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং এই সমস্ত ভাব প্রকাশ করিবার জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির ব্যবস্থা। তৃতীয় উপাদান;—এমন কতকগুলি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা—জীবনের এমন কতকগুলি নিয়ম পালন করা, যাহা সেই শক্তির অভিপ্রেত ও প্রিয় এবং যাহা করিলে সেই শক্তির প্রসন্নতা ও অনুগ্রহ লাভ করা যায়।" হ্যারিসন সাহেব আরও বলেন;—"ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের সহিত সখ্য বন্ধন না করিলে, কোন প্রকার নৈতিক অনুশীলনই, চরিত্রের স্থিরতা সম্পাদন করিতে পারে না। ধর্ম্ম—অর্থাৎ পরাশক্তির উপর বিশ্বাস এবং তৎপ্রতি অন্তরের গভীর অনুরাগ। আর তত্ত্বজ্ঞান,—কি না, প্রকৃতির শৃঙ্খলা ও মনুষ্যের ক্রমাভিব্যক্তি-সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ মত। সমস্ত নৈতিক সমস্যা দুই প্রকারে পুনর্গঠিত হইতে পারে। এক—বুদ্ধ কিম্বা সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্ ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া যে প্রকার উৎসাহানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, সেই প্রচণ্ড ধর্ম্মোৎসাহের দ্বারা নীতি গঠিত করা; আর এক—বেন্থ্যাম্-

প্রচারিত স্বার্থ-মতের উপর নীতিকে স্থাপন করা। নীতিতন্ত্র যতই বিশুদ্ধ ও উচ্চ হউক না, চিত্ত-আবেগের ঘূর্ণ বায়ুর সহিত কিম্বা স্বার্থ-পরতার গূঢ়-প্রবর্ত্তনার সহিত তুলনা করিলে, সকল নীতিতন্ত্রই হীনবল হইয়া পড়ে। ইহা নিশ্চিত, লোভ দ্বেষের উত্তেজনায় মানব-চিত্ত যেরূপ উত্তপ্ত ও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, দয়াবৃত্তির প্ররোচনায় ততটা কখনই হয় না। ইতিহাস কেবল একটি শক্তির কথা আমাদের নিকট ব্যক্ত করে, যাহা এই সকল প্রবৃত্তির সহিত—স্বার্থ-প্ররোচনার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়াছে। কোন-না-কোন আকারে ধর্ম্মই সেই শক্তি।... স্বার্থানল অপেক্ষা ধর্ম্মানল যে প্রবলতর তাহা ইতিহাসে সপ্রমাণ হইয়াছে। সমস্ত মানব-ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা প্রবল শক্তি আর দ্বিতীয় নাই। সভ্যতা যদি কেবল নৈতিক অনুশীলনের মধ্যেই বদ্ধ থাকে, তাহাতে হত্যাকাণ্ডের দারুণতা কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হইতে পারে বটে, কিন্তু এ অবস্থায় যে সকল হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বচিন্তিত বলিয়া আরও ভয়ানক। হত্যাকাণ্ড যদিও বা কমে, জুয়াচুরী প্রবঞ্চনা প্রভৃতি ভীষণ বিষ-বৃক্ষ-সমূহ জন্মাইবার পক্ষে এই প্রকার সভ্যতা-ভূমি যে বিশেষ উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই।"

সার্ব্বজনিক ব্যাঙ্ক।

এপ্রিল মাসের "জেণ্টেল্‌ম্যানস্‌ ম্যাগাজিন্‌" পত্রে শ্রীমতী লিঞ্চ সার্ব্বজনিক ব্যাঙ্কের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। ইটালি ও জর্ম্মানিদেশে এইরূপ অনেকগুলি ব্যাঙ্ক আছে। এই ব্যাঙ্কগুলি সহযোগিতার নিয়মে স্থাপিত, প্রতিযোগিতার নিয়মে স্থাপিত নহে। আমাদের দেশে সুদের যেরূপ উচ্চ হার, তাহাতে আমাদের পল্লিগ্রামেও এইরূপ ধার দিবার কুঠি খুলিলে দরিদ্র কৃষকেরা ও মধ্যবিৎ গৃহস্থেরা মহাজনের কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

উল্‌ফ সাহেব বলেন "জর্ম্মনিদেশে, সার্ব্বজনিক মহাজনী কুঠির সাহায্যে, প্রতিবৎসরে প্রায় ১৫ কোটি পৌণ্ড সংগৃহীত হইয়া থাকে; এই সমস্ত টাকা বাণিজ্যে খাটে—একটি শিলিংও পড়িয়া থাকে না। ইহার প্রত্যেক পেনিতে বাণিজ্যের উত্তেজনা হয়, কৃষির উন্নতি হয় ও স্বদেশী শ্রমজাত সামগ্রীর কাটতি হয়।"

শ্রীমতী লিঞ্চ বলেন, "মেণ্টন-প্রদেশে, দশ বৎসর পূর্ব্বে, তত্রত্য ব্যাঙ্কসমূহ হইতে শতকরা বারটাকা হার সুদে কর্জ্জ পাওয়া যাইত, কিন্তু এক্ষণে সার্ব্বজনিক ব্যাঙ্ক খুলিবার পর হইতে, ৫ বৎসরের মধ্যে, সুদের হার শতকরা ছয়টাকায় নামিয়াছে।"

জর্ম্মনি, ইটালি, সুইট্‌জর্লণ্ড ও ফ্রান্সের সহযোগিতামূলক ব্যাঙ্কের অধিনেতারা বলেন, "সমস্ত শিল্প-ব্যবসায়ের মূলে বিশ্বাস নিহিত। অতএব, ব্যাঙ্কিং কাজও সহযোগিতার নিয়মে চালানো উচিত।"

শ্রীমতী লিঞ্চ বলেন, এইরূপ সার্ব্বজনিক ব্যাঙ্ক খুলিতে হইলে প্রথমে স্বল্পপরিমাণে আরম্ভ করা উচিত। "সাধারণ ভাণ্ডার স্থাপন কার্য্যে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এক পৌণ্ড অংশের পঞ্চাশটি অংশী মিলিয়া যে মূলধন স্থাপিত হয় তাহা পল্লিগ্রামে একটি ভাণ্ডার খুলিবার পক্ষে যথেষ্ট। ফ্রান্সদেশে, ১১ সহস্র নিবাসী-বিশিষ্ট একটি নগর ও তাহার চতুষ্পার্শ্বিক পল্লি-প্রদেশের জন্য একটি ব্যাঙ্ক খোলা হয়। এই ব্যাঙ্কটি আট শত পৌণ্ড মূলধনে আরম্ভ করিয়া বিলক্ষণ সফলতা লাভ করে।। কি ভাণ্ডার-স্থাপন,কি কর্জ্জ-কুঠী স্থাপন—এই উভয় কার্য্যেই প্রত্যেক অংশীর অংশ-ক্রয়-ক্ষমতার একটা সীমা থাকা উচিত। কেন না, এমন হইতে পারে, যাহার বেশি টাকা আছে, সে হয়-ত সমস্ত অংশ কিনিয়া ফেলিল—তাহা হইলে আর সহযোগিতার নিয়মে ভ্রাতৃভাবে কাজ চলিতে পারে না। ব্যাঙ্ককে এই মহাবিপদ হইতে রক্ষা করিবার আর একটি উপায়—সাবধানে অংশী নির্ব্বাচন করা। আর একটি উৎকৃষ্ট উপায়—আইনের

দ্বারা শতকরা পাঁচ টাকা হার পর্য্যন্ত ডিভিডেণ্টের সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া। প্রারম্ভিক সমিতিতে যদি কোন গোলযোগ না হয় তবে সমস্ত অংশগুলিরই গ্রাহক জুটিবার সম্ভাবনা; অংশগুলি উঠিয়া গেলে, সর্ব্বজন-প্রিয় ও বিশ্বস্ত এইরূপ স্থানীয় লোক দেখিয়া কর্ত্তৃ-সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। কর্ত্তৃ-মণ্ডলীও অধিকাংশের মতে নির্ব্বাচিত হইবেক—তাহাতে যেন কোন দলাদলির ভাব না থাকে। কিছুকাল পরে, এই কর্ত্তৃ-মণ্ডলীই আপনাদের মধ্য হইতে একজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন করিবেন। ইনিই ব্যাঙ্কের প্রধান ব্যক্তি—ইহাঁরই যোগ্যতার উপর ব্যাঙ্কের সফলতা অনেকটা নির্ভর করে। সাধারণ সভার ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক অধিবেশনে ও কর্ত্তৃ-মণ্ডলীর সাপ্তাহিক সম্ভাষণ-সমিতিতে অনেক কাজ করিবার থাকে। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা এই সকল কাজের বিলিবন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন কিন্তু কর্ত্তৃসভার তাহা অনুমোদন করা চাই। ব্যাঙ্কের সমস্ত কাজকর্ম্মে নজর রাখিবার জন্য একটা তত্ত্বাবধান-সমিতি থাকিতে পারে। ফ্রান্স ও ইটালিতে অংশের পরিমাণ-অনুসারে প্রত্যেক অংশীর অর্থদায়িত্বের সীমা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কিন্তু জর্ম্মনিতে এইরূপ দায়িত্বের কোন সীমা নাই। যাঁহারা অসীম দায়িত্বের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, অসীম দায়িত্ব থাকা প্রযুক্তই, এ পর্য্যন্ত কোন সার্ব্বজনিক ব্যাঙ্ক দেউলে হয় নাই। অধিকাংশ সার্ব্বজনিক ব্যাঙ্কের প্রতিদিনকার হিসাব প্রতিদিন মিটানো হয়; ব্যাঙ্ক কিরূপ চলিতেছে, যে-কেহ আসিয়া তৎক্ষণাৎ জানিতে পারে। এক বিষয়ে, সকল সার্ব্বজনিক ব্যাঙ্কেরই এক মতঃ—কোন প্রকার দূর-কল্পনা-ঘটিত ব্যবসায়ে অর্থ-নিয়োগ না করা। নবব্রতী ব্যবসায়ী যদি বিজ্ঞ হন, তবে যেন প্রথমে ফলাও করিয়া কাজ আরম্ভ না করেন—একটা ছোট-খাট বাড়িতে কার্য্যালয় স্থাপন করেন, এবং যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে, তাহারা যেন লভ্যের অংশ পায়।"

ডুবুরীর জীবন।

নিউ ইয়র্ক-নগরের ডুবুরি গুষ্টাভ-কবে, গভীর জলে কিরূপে থাকা যায়, সেই বিষয় "স্ক্রিব্‌নরস্‌ ম্যাগাজিনে" বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ১২০ ফিট্‌ জলের নীচে কোন মানুষ ডুবিয়া থাকিতে পারে না। একজন ডুবুরি ১৪৫ ফিট্‌ গভীর জলে কাজ করিয়াছিল বটে—কিন্তু তাহার পরেই তাহার পক্ষাঘাত হয়। সেই অবধি সে কোন কাজ করিতে পারিত না। আর একটি কৌতূহলজনক ব্যাপারের এইরূপ উল্লেখ করেন যে, ডুবুরীরা যখন জলের গভীর দেশে অবস্থিতি করে, তখন বোমা-কলের দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ুরাশি ক্রমাগত তাহাদিগের নিকট প্রেরিত হয়। তাহারা বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে এত অভ্যস্ত যে সচরাচর কোন ঘরের কিম্বা কোন প্রকাশ্য সভাগৃহের বদ্ধ বায়ু আদৌ সহ্য করিতে পারে না। কবে সাহেব বলেন, একবার জলের নীচে এক ঘণ্টাকাল ঘুমাইয়া ছিলেন।

—০—
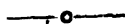
ভবিষ্য-যুগের ইংরাজ-মহিলা।

কোন কোন ইংরাজ লেখক বলেন যে, ইংরাজ-দুহিতারা আজকাল বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীমতী শেল্‌ডন্‌ অ্যামস্‌ এই কথার প্রতিবাদ করিয়া "কণ্টেম্পোরারি রিভিউ" পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে, ইহাকে বিদ্রোহ বলা যায় না—ইহা ক্রমাভিব্যক্তির একটি স্বাভাবিক প্রকরণ। শ্রীমতী বলেন :—স্ত্রীলোকের পক্ষে শুশ্রূষার কাজ যে একটি উচ্চ-অঙ্গের জীবিকাবৃত্তি, তাহা জনসমাজ এখন বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। রোগীর পরিচারিকারা এক্ষণে সকল শ্রেণীর লোক হইতেই আসিতেছে—প্রত্যেক দরিদ্র-কুটীরে, প্রত্যেক ধনীর বৈঠকখানায় উহাদিগকে

এক্ষণে দেখা যায়। এই পরিচারিকাদিগের যেরূপ সুখের স্বাধীনতা, অন্যের নিকট ইহাদের যেরূপ মূল্য ও গৌরব, জীবনের তমসাচ্ছন্ন দিক্ সম্বন্ধে উহাদের যেরূপ অভিজ্ঞতা—এই সমস্ত মিলিয়া, উহা আজকাল ঘরের মেয়েদেরও উপর শিক্ষা ও উত্তেজনার প্রভাব প্রকটিত করিতেছে। সমাজ যদি চাহে, সেকেলে ইংরাজ "লেডি"র ন্যায় এখনকার মেয়েরা অনভিজ্ঞ ও নির্লিপ্ত থাকুক্, তাহা হইলে হাসপাতাল, পল্লীর পাদ্রি, সমাজ-সংস্কারক—ইহাদেরই সহিত সমাজ বন্দোবস্ত করুক।

আমাদের সুকুমার-দেহ বালিকাদিগের নবীন কার্য্যোৎসাহকে দমাইয়া রাখাপ্রযুক্ত উহারা অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে। বালকদিগের চারিদিকে যদি এতগুলি কৃত্রিম শাসনের গণ্ডি ও আটক দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারাও বালিকাদিগের ন্যায় হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত হইত, সন্দেহ নাই। তাহাদের পরিচ্ছদের প্রত্যেক খুঁটিনাটি, তাহাদের প্রত্যেক কথা, তাহাদের প্রত্যেক যৌবন-সুলভ শ্রীসৌন্দর্য্য, তাহাদের প্রত্যেক জ্ঞানশিক্ষাকে যদি কেবল বেচিবার মাল হিসাবে দেখা হইত এবং প্রকাশ্যে সেইরূপ বলা হইত, তাহা হইলে তাহাদিগেরও আত্ম-দমন শিক্ষার কোন অবসর থাকিত না। এ সমস্ত ব্যাপার দাসত্ব যুগেরই উপযুক্ত। আমি এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি, যেখানে বিবাহের "বাজার" আছে, সেখানে প্রকৃত বিবাহ কখনই থাকিতে পারে না।

এই একই বিষয়ে শ্রীমতী হ্যারিস্, "হ্যুমানিটেরিয়ন"-পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেনঃ—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগের বর্ত্তমান সুরক্ষিত অবস্থায়—নিষ্ঠুরতা, প্রেমের অভাব, কিম্বা সহানুভূতি ও স্বাধীনতার অভাব, এই সমস্ত কারণেই যে মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া বাধিতেছে তাহা নহে; উহাদিগকে কারণ না বলিয়া, বরং কার্য্যফল বলা যাইতে পারে। কোন কিছু করিবার নাই—দায়িত্বের কোন ভার নাই, এই জন্যই এই সমস্ত ঘটিতেছে। উহার কারণ—ধর্ম্মভাবের অভাব। যে

অদম্য উদ্যম-উৎসাহ কৈশোর-স্বাস্থ্যের সহচর ও তরুণ মনের স্ফূর্ত্তি-বিধায়ক, উহা যদি বাণিজ্য, পরোপকার প্রভৃতি হিতকর কার্য্যের পথে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে "নিষ্ঠুর মাতা", "বাড়িতে অবনিবনাও", "আমার মর্য্যাদা বুঝিবার লোক নাই"—এই সকল কথা আর শুনিতে হয় না। এখন স্ত্রীলোকের, কাজ করিবারও কোন বাধা নাই—কেন না, স্ত্রীলোকের কার্য্যোপযোগিতা-সম্বন্ধে এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও উদার মতের অভ্যুদয় হইয়াছে এবং এক্ষণে রাজ-পথ সকলও নিরাপদ।... যুবকদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিয়া থাক, সেইরূপ তরুণীদিগকেও এইরূপ শিক্ষা দেও না কেন যে, আমরা প্রত্যেকেই একটি বৃহত্তর পরিবারের অঙ্গ—একটি সমগ্র জাতির উপাদান-অংশ। যেমন উহাদের আত্মরক্ষার জন্য ধর্ম্ম-তত্ত্বের শিক্ষা দিতেছ—তেমনি উহাদিগকে জ্ঞানেরও শিক্ষা দেও; মায়েরা যেন এ কথাটি বুঝেন যে, জনকজননীর সহিত দুহিতার, পতির সহিত পত্নীর যতই কেন সুখকর সঙ্গীভাব ও মনের মিল থাকুক্ না, মধ্যে মধ্যে এমন ব্যাপার উপস্থিত হইতে পারে যাহা আরও পবিত্রতর—অর্থাৎ যখন সংসার-মহাক্ষেত্রে কাজের ডাক পড়ে। যদি উহা কঠোর হাসপাতালের কাজ হয় তাহাতেই বা কি?—এ ডাক্ স্বর্গীয় ডাক্—এ আহ্বানধ্বনিকে আমোদপ্রমোদের কোলাহলে ঢাকিয়া ফেলিলে পাপ হয়। এ জীবন বাস্তব জীবন, কাজের জীবন। স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য প্রকৃতভাবে "বাহির হইয়া ফলবতী হওয়া"—কেন না, উহাই আমাদের শাস্ত্রের আদেশ। যদি বিবাহের মধুর হাসি তোমার অদৃষ্টে থাকে, তবে তাহার ছোট বড় সমস্ত দায়িত্বের জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হও। যদি তাহা অদৃষ্টে না থাকে, জীবনের অন্য অনেক পথ খোলা রহিয়াছে—তাহাতেও তোমার আত্মোন্নতি সাধনের সুযোগ হইবে। কোন অবস্থাতেই, বিবাহকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া বালিকার নিকট বর্ণনা করা উচিত নহে। এবং উভয়পক্ষে ভালবাসার পূর্ণতা না থাকিলে,

এবং অপরিজ্ঞাত অজ্ঞাত ভাবী সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ না থাকিলে, অর্দ্ধহৃদয়ে পবিত্র বিবাহাশ্রমে প্রবেশ করা উচিত নহে।

পূর্ব্বোক্ত পত্রে মর্টিমর সাহেব স্ত্রীলোকের দৈহিক বিকাশ-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন—(১) পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও একই প্রকার স্বাস্থ্য ও প্রতিরোধশক্তি লাভ করিতে শারীরবিধানানুসারে সমর্থ। (২) এখন যে প্রকার জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত, তাহার উপযুক্ত বল সংগ্রহ করিবার জন্য স্ত্রীলোকের যত প্রকার শক্তি আছে তৎসমস্ত পরিকর্ষণ করা উচিত। (৩) এইরূপে প্রস্তুত না হইলে, ভবিষ্যযুগের স্ত্রীলোকেরা সামাজিক সাম্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। পুরুষদের এখন যেরূপ দেহের সহন-শক্তি, তাহা-তেই তাহারা অধিকাংশ পেশা ও ব্যবসায় অধিকার করিয়া আছে—স্ত্রী-লোকদিগের অপেক্ষা পুরুষদের এই জন্য বেশি সুবিধা। (৪) স্ত্রীলোকের "দৈহিক বিকাশ থামিয়া যাওয়া"-সম্বন্ধে লোকের যে একটা ধারণা আছে, আসলে তাহা সত্য নহে। স্ত্রীলোকের "স্তম্ভিত বিকাশ"—সামাজিক আচার ব্যবহারের ফল, উহা প্রাকৃতিক নিয়মের ফল নহে। এইরূপে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কৃতকার্য্যতার সমান সম্ভাবনা লইয়া জীবন আরম্ভ করে; কেবল-চারিদিককার অবস্থাভেদে, স্ত্রীলোকের কৃতিত্বের সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।"

———o———
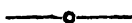
দারিদ্র্য ও অপরাধ।

বিভিন্ন দেশের আর্থিক অবস্থা ও অপরাধের সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখিলে, দারিদ্র্যের সহিত অপরাধের কি যোগ তাহা জানা যাইতে পারে। এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া যদি জানা যায় যে, যেখানে দারিদ্র্যের কষ্ট সেইখানেই অপরাধের বাহুল্য, তাহা হইলেই প্রমাণ হয় যে, দারিদ্র্য ও অপরাধের মধ্যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বিদ্যমান।

য়ুরোপের চৌর্য্য-অপরাধের তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

ইটালি,	১৮৮০—৮৪	প্রতি লক্ষ নিবাসীর হার-অনুসারে চৌর্য্য অপরাধের বাৎসরিক বিচার	২২১
ফ্রান্স,	১৮৭৯—৮৩	ঐ	১২১
বেলজিয়ম,	১৮৭৬—৮০	ঐ	১৪৩
জর্ম্মানি,	১৮৮২—৮৩	ঐ	২৬২
ইংলণ্ড,	১৮৮০—৮৪	ঐ	২২৮
স্কট্লণ্ড,	১৮৮০—৮৪	ঐ	২৮৯
আয়রলণ্ড,	১৮৮০—৮৪	ঐ	১০১
হঙ্গারি,	১৮৭৬—৮০	ঐ	৮২
স্পেন্,	১৮৮৩—৮৪	ঐ	৭৪

এক্ষণে দেখা যাউক, এই তালিকা হইতে কি প্রমাণ হয়। ইহা জানা কথা যে য়ুরোপের মধ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সদেশ সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। ইংলণ্ডের ধন-সঞ্চয় ইটালি অপেক্ষা প্রায় ছয় গুণ অধিক; তথাপি, ইটালি অপেক্ষা ইংলণ্ডে চৌর্য্য-অপরাধের সংখ্যা অধিক। আয়রলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সের ধন-ঐশ্বর্য্য অসংখ্যগুণে অধিক হইলেও, আয়রলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সে চৌর্য্য-অপরাধের সংখ্যা অধিক। স্পেন্ য়ুরোপের মধ্যে অত্যন্ত দরিদ্র, এবং স্কট্লণ্ড একটি বেশ ধনশালী দেশ—কিন্তু উহাদের অপরাধ-তালিকা তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, স্পেন অপেক্ষা স্কটলণ্ডে চৌর্য্য-অপরাধের সংখ্যা প্রায় চারি গুণ অধিক।

ইংলণ্ডের সহিত আয়রলণ্ডের অপরাধ-তালিকা তুলনা করিলে আরও আশ্চর্য্য হইতে হয়। কারণ, প্রায় একই নিয়মানুসারে ঐ উভয় দেশের অপরাধ-তালিকা প্রস্তুত হয়; উভয় দেশের রাজ-নিয়ম সাধারণতঃ প্রায় একই, উভয় দেশেই আইন বলবৎরূপে কার্য্যে পরিণত, উভয় দেশের বিচার-কার্য্য প্রায় একরূপেই নির্ব্বাহ হয়। সুতরাং

এই উভয় দেশের অপরাধ-তালিকা যেরূপ তুলনার যোগ্য এরূপ আর কোন দেশের নহে। এক্ষণে উল্লিখিত তালিকাটি মিলাইয়া দেখ, দেখিবে, আয়রলণ্ড যদিও এত গরিব তবু তথাকার চৌর্য্য-অপরাধের সংখ্যা ইংলণ্ড অপেক্ষা অর্দ্ধেকেরও কম। আবার ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের অপরাধ-তালিকা তুলনা করিয়া দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ডের অপরাধ-সংখ্যা পাঁচ ছয় গুণ অধিক। দারিদ্র্য হইতেই অপরাধের উৎপত্তি একথা যদি মানা যায়, তাহা হইলে ভারত-বর্ষ অপরাধ-বিষয়ে অগ্রগণ্য হইবার কথা; যেহেতু ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশ অতি অল্পই আছে। কিন্তু আসলে কি দেখা যায়?—ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় আইন-ভীরু জাতি আর একটি আছে কি না সন্দেহ। যদি বল, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে তুলনাই হইতে পারে না, কারণ তাহাদের মধ্যে আচার ব্যবহার ধর্ম্মে আকাশ পাতাল প্রভেদ—আমাদের বক্তব্য তো তাহাই—অর্থাৎ, শুধু দারিদ্র্যের উপর অপরাধের ন্যূনাধিক্য নির্ভর করে না।

ইহার আর একটি বলবৎ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ইংলণ্ডের কয়েদী-তালিকা তুলনা করিয়া দেখিলে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, শীত-কালে, যখন গরিবদের কষ্টের আর সীমা থাকে না, সেই সময়েই অপরাধ-সংখ্যা কম, আর গ্রীষ্ম ও শরৎকালে যখন কাজকর্ম্মের খুব সুবিধা সেই সময়েই অপরাধের আধিক্য; অতএব দেখা যাইতেছে, দেশের ভৌতিক সম্পদে অপরাধ-প্রবণতা তিরোহিত হয় না; ভৌতিক উন্নতি হইতে যেমন কতকগুলি সুফল, তেমনি কতকগুলি কুফলও উৎপন্ন হয়। ভৌতিক উন্নতি হইতে অনেক সময়ে নৈতিক অবনতি উৎপন্ন হয়—লাম্পট্য, পান-দোষ, আলস্য, বিলাসিতা ইহার অপরিহার্য্য সহচর। নৈতিক উন্নতি না হইলে শুধু ভৌতিক উন্নতিতে কোনও জাতির প্রকৃত মঙ্গল নাই। মসিয়ো ডে লাভ্‌লে বলেন, "মনুষ্যের শরীর মন হৃদয়ের

সমগ্র উন্নতিতেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা। পারিবারিক স্নেহ-মমতা, মানব-প্রেম, এবং সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য ও রচনা-সৌন্দর্য্য সম্ভোগে অনুরাগ—ইহাতেই হৃদয়ের উন্নতি প্রকাশ পায়। এই মহান আদর্শের দিকে মানব যে পরিমাণে অগ্রসর হইবে সেই পরিমাণে দুষ্কর্ম্ম ও অপরাধ মানব-সমাজ হইতে তিরোহিত হইবে। ভৌতিক ধন-ঐশ্বর্য্য যদি এই উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হয়, তবেই তাহা হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হয়। নচেৎ অর্থই অনর্থের মূল হইয়া উঠে।

জীবিত পশুর দেহচ্ছেদ।

কিয়ৎকাল হইল, একজন আগন্তুক, আচার্য্য হক্স্লির পরীক্ষাগারে উপস্থিত হইয়া জীবিত পশুর দেহচ্ছেদ-সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। জীবিত অবস্থায় দেহচ্ছেদ করিলে পশুকে যন্ত্রণা দেওয়া হয় কি না, ইহাই তাঁহার প্রশ্ন করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য। আচার্য্য হক্স্লির সহিত আগন্তুকের যে কথোপকথন হয় তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। দেহচ্ছেদ-প্রকরণে পশুদিগের যন্ত্রণা হয় কি না তাহা পাঠক বিচার করিবেন।

আগন্তুক।—প্রথমতঃ আপনি কি অস্বীকার করেন যে, জীবিত পশুর দেহচ্ছেদ আবশ্যক হইলেও উহা নিষ্ঠুর কার্য্য?

হক্স্লি।—অবশ্য। নিষ্প্রয়োজনে কষ্ট দেওয়াই নিষ্ঠুরতা। বিরোধী পক্ষীয়েরা এ কথা বলিতে পারেন, কোন্‌টা প্রয়োজন, কোন্‌টা নিষ্প্রয়োজন তাহাই অগ্রে স্থির করা আবশ্যক। কিন্তু আরও অন্যান্য উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য মনুষ্য ও পশুকে কষ্ট দেওয়া যে আবশ্যক হয়, তাহা জনসাধারণে স্বীকার করিয়া থাকে। তাহার এক দৃষ্টান্ত, আমাদের আহারের যোগান্। ইহা দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু যে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য কষ্ট স্বীকার করা নিতান্তই আবশ্যক—সেই অর্জ্জিত জ্ঞান কি মনুষ্য, কি পশু

উভয়েরই উপকারে আইসে, সুতরাং সেই কষ্টের কিয়দংশ পশুরও ভোগ করা যুক্তিসঙ্গত। এই কারণে, জীবিতাবস্থায় পশুদের দেহচ্ছেদ করায় আমি নিষ্ঠুরতাচরণ মনে করি না। যদিও কখন কখন তাহাদিগকে কিছু কষ্ট দিতে হয়, কিন্তু অধিকাংশ পরীক্ষাস্থলে তাহাদের কোন কষ্টই হয় না—কারণ, ক্লোরোফর্ম্ম-জনিত অচেতনাবস্থা হইতে জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে বধ করা হয়।

আগন্তুক।—একবার একটা খর্গসের উপর পরীক্ষা করিবার সময় ক্রেটন-তৈলপূর্ণ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাচের গোলক তাহার পৃষ্ঠের মাংসপেশীর মধ্যে গভীররূপে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যখন ঘা শুকাইয়া গেল তখন চাপ পাইয়া কাচের গোলকগুলি ভিতরে ভাঙ্গিয়া গেল। এই পরীক্ষা অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। এবং এই দীর্ঘকাল ক্রেটন-তৈল দেহ মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ায়, গভীর বিস্ফোটক-সকল উৎপন্ন হয়। ইহাতে নিশ্চয়ই সেই পশুর উৎকট যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া থাকিবে।

হক্সলি।—ক্রেটন-তৈলের ফলে ফোস্কা হইতে পারে, কিন্তু সে অধিক্ষণ স্থায়ী হয় না;—তা'ও আবার মর্ফিয়া-প্রয়োগে প্রশমিত হয়। ইহাও যেন মনে থাকে, মাংসপেশীতে চেতনশক্তি অতি অল্পই আছে। তা' ছাড়া, এইরূপে যে বিস্ফোটক উৎপন্ন হয় তাহাতে কিছুমাত্র যন্ত্রণা হয় না। এরূপ বিস্ফোটককে ডাক্তারি ভাষায় "ঠাণ্ডা" বিস্ফোটক বলে, ইহাতে আদবে দব্‌দবানি নাই—সুতরাং ইহাতে কোন কষ্ট হয় না।

আগন্তুক।—আচ্ছা মহাশয়, "কুরারে" প্রয়োগের কথা কি বলেন? ইহা কি সত্য নহে যে, আপনারা ঐ দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া পশুদিগকে একেবারে অক্ষম করিয়া ফেলেন, অথচ তাহাদের চেতনা পূর্ণমাত্রায় থাকে?

হক্সলি।—এ কথা নিতান্ত অর্থহীন। "কুরারে" একপ্রকার বিষ—

দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা তীরের ফলায় ব্যবহার করে। কিছুকাল হইল, এই দ্রব্যটি শারীরতত্ত্ব-ঘটিত পরীক্ষায় ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—ভ্রম-নিরাকরণের জন্য ইহা অতীব প্রয়োজনীয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, এই দ্রব্যটির প্রয়োগে চর্ম্মস্থিত ঐন্দ্রিয়িক স্নায়ু ও পৈশিক স্নায়ুর শেষাংশ অসাড় হইয়া পড়ে—সুতরাং ইহা দ্বারা পশুদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেবল যে অসাড় করিয়া ফেলা হয় তাহা নহে—তাহাদের চেতনাও বিলুপ্ত হয়।

আগন্তুক।—কিন্তু যখন তাহাদের চেতনা আবার ফিরিয়া আসে তখন অবশ্য তাহাদের অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

হর্সলি।—তাহাদের চেতনা আর ফিরিয়া আসে না। এই সকল পরীক্ষায়, অচেতন অবস্থায় থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকে বধ করা হয়।

আগন্তুক।—কিন্তু যে স্থলে, তাহাদিগকে আবার সচেতন করিয়া তোলা হয়, সে স্থলে কিরূপ হয়? যেমন মনে করুন, যখন তাহাদের মস্তিষ্কের অর্দ্ধ-মণ্ডল অপসারিত করা হয়, তখন কিয়ৎ সপ্তাহ ধরিয়া তাহাদের ভীষণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয় কি না?—ম্যান্‌চেষ্টারের বিশপ এই কথা বলেন।

হর্সলি।—না, তা' হয় না। আমি তাহা এখনই দেখাইয়া দিব। এরূপ পরীক্ষা-স্থলে মনুষ্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়, পশুদেরও প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ, প্রথমে তাহাদিগকে ক্লোরোফর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা অচেতন করিয়া, তাহার পর তাহাদিগকে একটা টেবিলের উপর শোয়ান হয়—গরম জলের বোতল তাহাদের চারিপার্শ্বে রাখা হয়, তাহাতে শস্ত্রক্রিয়া-জনিত অবসাদ অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া থাকে। পচন-নিবারণের বিবিধ উপায় পূর্ব্ব হইতে অবলম্বন করিয়া, অতি সাবধানে এই সকল শস্ত্র-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

আগন্তুক। কিন্তু যখন ঐ পশুসকল পুনর্ব্বার চেতনালাভ করে, তখন তাহাদের মস্তিষ্ক-খণ্ড অপসারিত হওয়ায়, নিশ্চয়ই তাহাদের উৎকট যন্ত্রণা উপস্থিত হয় ?

হর্স্‌লি। তোমাদের সহজে এইরূপ মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক সমস্ত শরীরের মধ্যে মস্তিষ্কই সর্ব্বাপেক্ষা চেতনা-হীন পদার্থ। মনুষ্যের উপর ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে—মস্তিষ্কের কিয়দংশ বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে, অথচ রোগী বুঝিতে পারিবে না যে, তাহাকে কোন প্রকারে স্পর্শ করা হইয়াছে। মনুষ্য-রোগীর সম্বন্ধে আমরা যেরূপ করিয়া থাকি, পশুদিগেরও যদি কিছুমাত্র কষ্টের লক্ষণ দেখি, অমনি আমরা তাহাদিগের ত্বকের মধ্যে মর্ফিয়া প্রবিষ্ট করিয়া দিই। মনুষ্যের ন্যায় তাহাদিগের ক্ষতস্থান পচন-নিবারণী ক্রিয়ার দ্বারা এক সপ্তাহের মধ্যেই সারিয়া উঠে। ক্ষতস্থানে পুঁজ সঞ্চিত হইবার পূর্ব্বেই তাহা জুড়িয়া যায়—চব্বিশ ঘণ্টাকাল অল্পস্বল্প বেদনা থাকে মাত্র।

আগন্তুক। পরীক্ষায় সফলতা লাভ করিবার জন্য জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা রক্ষা করা কি নিতান্তই আবশ্যক ?

হর্স্‌লি। তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি আমরা দেখি, কোন প্রকার প্রতিকূল উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছে অমনি আমরা পরীক্ষায় ক্ষান্ত হইয়া, পরীক্ষাধীন পশুকে ক্লোরোফর্ম্ম-প্রয়োগে বধ করি। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ এক্ষণে তোমাকে এমন কতকগুলি পশু প্রদর্শন করিব, যাহাদের মস্তিষ্কার্দ্ধ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে।

আগন্তুক। কিন্তু সে যাই হউক, এই সকল পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ?—উহার ঔচিত্য কি প্রকারে আপনারা সমর্থন করেন ?

হর্স্‌লি। এ সঙ্গত প্রশ্ন বটে, এই বিষয় আন্দোলন করিবার পূর্ব্বে বিশপ পাদ্রিরা এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল করিতেন। এই সকল পরীক্ষার যাহা উদ্দেশ্য, তাহা জীবিত পশুর দেহচ্ছেদ ভিন্ন আর কোন

প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে না। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—শুধু পরীক্ষা করিয়া দেখা মস্তিষ্কের কোন্ অংশে অপস্মার-রোগের আক্রমণ প্রথম আরম্ভ হয়।

পশুদিগের উপর এইরূপ পরীক্ষা করিয়া বিলক্ষণ ফললাভ করা গিয়াছে—ইহাতে কি মনুষ্য, কি পশু উভয়েরই অশেষ উপকার। বানরদিগের উপর পরীক্ষা করিয়া আমরা এক্ষণে জানিতে পারিয়াছি, অপস্মার-রোগের বীজ কোথায়—মস্তিষ্কের ঠিক্ কোন্ স্থলে তাহার মূল, আমরা অঙ্গুলী নিদর্শনপূর্ব্বক এক্ষণে দেখাইয়া দিতে পারি।

টেনিসনের ধর্ম্মবিষয়ক মত।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আর্‌ডিংটন সাইমণ্ড্‌সের সহিত টেনিসনের নানা-বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। এই কথাবার্ত্তাগুলি বিলাতের "সেঞ্চুরি" পত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যে কতকটা অদ্বৈতবাদী ছিলেন তাহা তাঁহার কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পায়। তিনি সাইমণ্ডসের নিকট এই মর্ম্মে বলিয়াছিলেন, "আমি জানিনা, জগৎকে বৃহৎ বলিয়া ভাবিব, কি ক্ষুদ্র বলিয়া ভাবিব কখনও ইহাকে ক্ষুদ্র, কখনও বা ইহাকে বৃহৎ বলিয়া আমার মনে হয়। জগতের বৃহত্ত্ব কিসে? একটি সূর্য্য বা কতক-গুলি সূর্য্য থাকায়, না সমস্ত মিলিয়া?" জগৎ কত প্রকাণ্ড তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া জান-পাউল-রিখ্‌টরের ন্যায় যেন তিনি আকাশ ভেদ করিয়া ক্রমাগত ঊর্দ্ধে যাত্রা করিতেছেন এইরূপ কল্পনা করিলেন, একটা ছায়াপথ ছাড়াইয়া আর একটা ছায়াপথ, এইরূপ অনন্ত আকাশে অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ প্রসারিত। তাহার পর জড়ের কথা। জড়ের অজ্ঞেয়তা ভাবিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। "একটা ইট যে কি বস্তু তাহার কোনও ধারনা আমার মাথায় আসে না। আমি জানি না, সে

জিনিস্‌টা কি। পরমাণু, বিস্তৃতি, বর্ণ, ভার এসব কথা বলায় কোন ফল নাই। ইঁটের মধ্যে আমার বুদ্ধি কিছুতেই প্রবিষ্ট হয় না। কিন্তু তাহা অপেক্ষা ঈশ্বর-সম্বন্ধে, প্রেম-সম্বন্ধে এবং এইপ্রকার অন্যান্য হৃদয়ের ভাব-সম্বন্ধে আমার স্পষ্টতর ধারণা আছে। আমার ক্ষুদ্র শক্তি-অনুসারে আমি ঈশ্বরের সহিত হৃদয়ের যোগ স্থাপন করিতে পারি। আমার মনে হয়, কোন না কোন প্রকারে—কি করিয়া তাহা জানি না—আত্মা ও পরমাত্মা সমান—একই। তাহাতেই প্রার্থনার এত মূল্য। প্রার্থনা, কি? না, বৃহৎ সমুদ্র ও আমাদের ছোট ছোট খাল—এই উভয়ের মধ্যে যে কল্-কপাট আছে তাহা খুলিয়া দেওয়া।" তাহার পর অনন্তকাল ও সৃষ্টির কথা। "হক্‌স্লি বলেন, আমরা সম্ভবতঃ বানর হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না। যদি ইহাই ঈশ্বরের সৃষ্টি-প্রণালী হয় ত হউক, কিন্তু তিনি সমস্ত অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এক করিয়া দেখিতেছেন।" তাহার পর ধর্ম্মনীতির কথা। "ইহা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারি না, নৈতিক উৎকর্ষই মানবের মাথার মুকুট। কিন্তু অমরত্ব না থাকিলে উহাতে কি ফল? কাল মরিতে হইবে, আজ খাইয়া-দাইয়া লই। যদি জানি, ছয় ঘণ্টার মধ্যে জগৎ বিনাশ পাইবে, তাহা হইলে কি আমি একজন অনাহারী ভিক্ষুককে অর্থদান করি?—না; আমি অমর এই বিশ্বাস না থাকিলে আমি করি না। কখনও কখনও আমি ভাবিয়াছি, পাপীরা আপনার অমরত্বকে বিনষ্ট করে। অনন্ত শাস্তির কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। খৃষ্ট যে যুগে জন্মিয়াছিলেন সেই যুগের ভাবের উপযোগী করিয়া এই সকল কথা তিনি বলিয়াছিলেন।" ধর্ম্ম-নীতি সম্বন্ধে আরও এই কথা বলিলেন; "কতকগুলি যুবক আছেন, তাঁহারা ধর্ম্মনীতিকে একেবারে ছাঁটিয়া দিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন, আমরা নীতিপরায়ণ হইব না। আমার বোধ হয়, কঁৎ ও গ্রোট্-এর মত এই যে, অমরত্বের সহিত ধর্ম্মনীতির কোনও যোগ নাই।" তাহার পর,

জড়ের বাধাবিঘ্ন হইতে নৈতিক বাধাবিঘ্নের কথা আসিল। "পৃথিবীতে মশার সৃষ্টি কেন? আমার বোধ হয় ঈশ্বরের সৃষ্টি হইয়া গেলে শয়তানের কাজ আরম্ভ হইল, এখন সেই শয়তান আরও কিছু যোগ করিয়া দিল।"

---o---
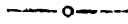
ইংরাজের উপর সূর্য্যতাপের প্রভাব।

সম্প্রতি "নাইণ্টীন্থ্ সেঞ্চুরি" নামক বিলাতী পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, ইংরাজ-বংশধরদিগের ইংরাজচরিত্র-গত বিশেষ লক্ষণসকল লোপ পাইবে। ইংরাজ, ইংলণ্ড-সুলভ কুজ্ঝটিকার ফল; তাহাকে নীল আকাশের নীচে রাখিয়া দাও, দেখিবে, রৌদ্রের তাপে তাহার সমস্ত ইংরাজিত্ব ঘুচিয়া যাইবে। এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য লেখক কতকগুলি তথ্য আমাদের সম্মুখে আনিয়াছেন। তিনি বলেন, যদিও নব-জীলণ্ডের বৃত্তরেখা ইংলণ্ড অপেক্ষা ইটালিদেশের সমতুলা, তথাপি ইংলণ্ডের অধিকৃত যত দেশ আছে তন্মধ্যে নব-জীলণ্ড অনেকটা ইংলণ্ডের সদৃশ। যদিও খুব সম্প্রতি এই দেশে ইংরাজের বসতি হইয়াছে এবং পুরাতন দেশ হইতে ক্রমাগত নূতন নূতন ঔপনিবেশিক আসিয়া ইহার লোকসংখ্যা পোষণ করিতেছে, তথাপি ইহারই মধ্যে, ইংরাজ অধিবাসীদিগের মধ্যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, ইংরাজচরিত্রের বিশেষ লক্ষণসকল লোপ পাইতেছে। নবজীলণ্ডবাসী ইংরাজ যুবকেরা আকারে দীর্ঘ ও পাৎলা, তাহাদিগের ইংরাজী উচ্চারণ অত্যন্ত জঘন্য। নবজীলণ্ডের সূর্য্য নবজীলণ্ডবাসীর চরিত্রে ঈষৎ পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। সেখানকার অধিবাসীরা বাঁচিবার সুখ অনুভব করে ও সম্পূর্ণরূপে সম্ভোগ করে—তাহারা জীবনের সুখে সুখী। নীল আকাশতলে "তাহাদের জীবন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমুজ্জ্বল ও সুখময়। এখন আর তাহারা ছট্‌ফটে, অন্ধকার-মুখ ও

উদ্বিগ্নচিত্ত নহে, পরন্তু দক্ষিণ-য়ুরোপের লোকদিগের ন্যায় প্রফুল্ল ও লঘু-হৃদয়।” তা'ছাড়া ইংলণ্ডের ন্যায় সেখানে ততটা উৎকট্ শীত নাই বলিয়া, তাহারা সহিষ্ণুতা, দূরদর্শিতা, শ্রমশীলতা এবং একপ্রকার রূঢ় অথচ কেজো ধরণের পাশবতা শিক্ষা করিবার অবসর পায় না। সুতরাং “ইহারই মধ্যে নবজীলণ্ডবাসীর প্রবল লক্ষণ এই দেখা যায় যে, উহারা আমোদ-প্রিয় ও লঘু-হৃদয়; উহারা চির-প্রফুল্লহৃদয়ে এইরূপ বিশ্বাস করে যে, একদিন-না-একদিন শীঘ্রই উহাদের গোলযোগ আপনাআপনি ঠিক্‌ঠাক্ হইয়া যাইবে—আপাততঃ বিশেষ কিছুই ভাবিবার নাই। ইংলণ্ডের উৎকট শীতে,—অমিতব্যয়িতা, হঠকারিতা ও কাজকর্ম্মে উপেক্ষার কি অবশ্যম্ভাবী ফল তাহা ইংলণ্ডের লোকেরা বিলক্ষণ বুঝে, কিন্তু নবজীলণ্ডবাসীদিগের তাহা কিছুই মনে হয় না। সেই জন্য, উহার দরুণ তাহাদের যে শাস্তিভোগ হয় তাহা অপেক্ষাকৃত লঘু। তাহারা সকল অবস্থাতেই প্রফুল্লচিত্ত, উচ্ছ্বসিত-হৃদয়, সুখানুরাগী ও সুখজীবনবাদী।” নবজীলণ্ড ছাড়িয়া লেখক আবার অষ্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্ত আনিয়াছেন। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার শিশুর মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক; প্রজাবৃদ্ধির পক্ষেও বাধাবিঘ্ন দেখা যায়। ভিক্টোরিয়াতে বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা মাতৃত্ব-দায় ঘাড়ে লইতে সহসা চাহে না। সেখানে উত্তাপ এত বেশী যে, কাজকর্ম্ম অধিক করা যায় না; এবং সিড্‌নির লোক-দিগের আকৃতি অতি শিথিল, দেখিতে অনেকটা বর্ণাডোজের অব-নতিগ্রস্ত গৌরাঙ্গদিগের মত। লেখক ফর্টেস্কিউ সাহেব মনে করেন, সেখানকার গৌরাঙ্গেরা, বর্ণেতর জাতীয়দিগের সাহায্য ব্যতীত আপনারা স্বয়ং অষ্ট্রেলিয়ার ভূমিকর্ষণে আর নিযুক্ত হইবে না। তাহারা অন্যত্র হইতে কুলির আমদানি করিয়া, বর্ণেতর জাতীয়দিগকে খাটাইয়া, আপনারা বেশ আরাম সুখ উপভোগ করিবে। “এই প্রকারে গৌরাঙ্গজাতি অতিলালিত ও কোমল-প্রকৃতি হইয়া গিয়া শারীরিক

অবনতি প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কেন না, ক্রমশই তাহারা অলস হইয়া পড়িবে এবং শারীরিক শ্রমে অনিচ্ছা-নিবন্ধন তাহাদের শরীরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।"

-o-

খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম।

"খৃষ্টধর্ম্ম ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের মধ্যে কতটা ঐক্য আছে" এই বিষয়ে ম্যাক্‌স্‌মুলর "নাইণ্টীন্‌থ্ সেনচুরি" পত্রিকায় সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রথমেই তিনি এই কথা বলিযাছেন যে, "মুসলমানেরা কতকগুলি গুরুতর বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" তাহাদিগের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা "স্বাধীন অথচ পানদোষ-বিবর্জ্জিত।" "যদি আমার তুর্কি বন্ধুদিগের কথায় বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা তো বলেন. কোন মুসলমান স্ত্রীলোক প্রকাশ্যভাবে দুর্নীতি-পরায়ণ হয় না।" যে ধর্ম্ম পানদোষ ও দুর্নীতি—এই দুই বিষম রোগের প্রতীকার করিতে সমর্থ সে ধর্ম্ম আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য সন্দেহ নাই।

অধ্যাপক মহাশয় আরও বলেন "অনেক তর্ক বিতর্কের পর শেষে সাধারণতঃ আমাদিগের স্বীকার করিতে হইল, প্রধান প্রধান বিষয়ে এই উভয় ধর্ম্মের মধ্যে অতি অল্পই প্রভেদ; পূর্ব্বে একটা বিবাদ ও মনান্তর না ঘটিলে এই উভয় ধর্ম্ম এক হইয়া যাইতে পারিত। তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিলেন যে, কোরাণ-সম্মত তাঁহাদের ছয়টি প্রধান মত ও বিশ্বাস—ঈশ্বরের একত্ব, এঞ্জেলের অস্তিত্ব, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত পুস্তকের অস্তিত্ব, বিচারের দিন, এবং ঈশ্বরের আদিষ্ট নিয়মাবলী—এইগুলি যদি মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান মত ও বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে খৃষ্টীয়ধর্ম্মের সহিত বিবাদ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। খৃষ্টীয়ান মাত্রেই এই প্রত্যেক মতগুলিতে সায় দিবেন সন্দেহ নাই।

গোল বাধে যখন অনির্দ্দেশ্য বিষয়গুলিকে নির্দ্দিষ্ট ভাবে—বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা হয়।" মুসলমানের স্বর্গ-সম্বন্ধে অধ্যাপক এইরূপ বলেন—"প্রত্যেক ধর্ম্মের মানবীকরণমূলক উপমাগুলিকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনা উচিত নহে; তা' ছাড়া, স্বর্গের সুখ বর্ণনা করিতে হইলে পার্থিব সুখের অনুরূপে বর্ণনা না করিলে চলে না। অতএব পার্থিব সুখের চরম সুখ সেই-যে স্ত্রীপুরুষের বন্ধুত্ব (যদি স্বর্গে স্ত্রীপুরুষভেদ থাকে) সেই বন্ধুত্বের সুখকে তবে কেন পরলোক হইতে বহিষ্কৃত করা হয়? যদি মহম্মদ রত্ন-কাঞ্চন অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যকে উচ্চতর মনে করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে কেন দোষ দেওয়া হয়? লোকে মনে করে, যেন মহম্মদ স্বর্গের আর কোনও সুখের কথা জানিতেন না, তাই স্বর্গকে সুন্দরীদিগের অন্তঃপুর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না। অনেক স্থলে, যেখানে তিনি স্বর্গের কথা বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকের বিষয় উল্লেখমাত্র করেন নাই। আর যে যে স্থলে স্ত্রীলোকের উল্লেখ আছে, সেখানে স্ত্রীলোকেরা পত্নী বা বন্ধুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যদি বা কোন স্থলে, পত্নী ছাড়া সুন্দরী কুমারীদিগের উল্লেখ থাকে তাতেই বা এত রাগ কেন? যে পারত্রিক সুখসম্ভোগে তত্ত্বজ্ঞানীরা সম্মতি দেন, তাহার ন্যায় এই সুখের কল্পনাটি যদিও ততটা আধ্যাত্মিক নহে, কিন্তু তাই বলিয়া যতই ছেলেমানুষি হোক্ না কেন, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, হুরিদের বর্ণনায় কোন প্রকার অশ্লীল অপবিত্র ভাব নাই।" বহুবিবাহ ও দাসত্ব-সম্বন্ধে অধ্যাপক এইরূপ বলেন—"এমনঅনেক সুশিক্ষিত মুসলমান আছেন যাঁহারা বহুবিবাহ ও দাসত্বপ্রথাকে ভাল বলেন না। বহুবিবাহ তো ক্রমশই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। মহম্মদ বহুবিবাহের আদেশ দেন নাই, তবে ইহুদিরা এই প্রথাটি রহিত করিবার পক্ষে যেরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিল তিনিও সেইরূপ কেবল উপেক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র। এই চিরস্মরণীয় কথাগুলি

তিনি পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন ঃ—"আমি মানুষ বৈ আর কিছুই নই। আমি ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যখন যাহা তোমাদিগকে আদেশ করি, সে আদেশ তোমরা গ্রহণ কর। এবং পার্থিব বিষয়-সম্বন্ধেও যখন যাহা তোমাদিগকে আদেশ করি, সে আদেশও তোমরা গ্রহণ কর। যখন আমি পার্থিব বিষয়-সম্বন্ধে তোমাদিগকে আদেশ করি তখনও আমি, মানুষের অধিক আর কিছুই নই।"

অধ্যাপক তাঁহার তুর্কি বন্ধুদের সহিত তর্কবিতর্ক করিয়া দেখিয়াছেন "একটি বিষয় তাঁহারা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, খৃষ্ট যেমন আপনাতে মানবজীবনের উচ্চ আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিলেন এমন আর কোন ধর্ম্ম-গুরু করিতে পারেন নাই।" তবে ম্যাক্সমুলর একথাও স্বীকার করেন যে, "মহম্মদ সত্য ও ন্যায়ের উদ্দেশে এবং লোকের হিতার্থে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি-যে সত্যের মধ্যেই ঈশ্বরের ভাব ধরিতে পারিয়াছিলেন ইহাতেই বুঝা যাইতেছে তিনি একজন প্রকৃত ধর্ম্মগুরু। তবে তিনি-যে স্বীয় অন্তরাত্মার নীরব বাণীকে আর্কেঞ্জেল গেব্রিএলের বাক্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, তাঁহার ভাষা আমরা বুঝি না ?"

---o---
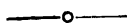
হিন্দু-বিজ্ঞান কিরূপে বিনষ্ট হইল ?

গত জানুয়ারী মাসের "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকায় "বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সহিত হিন্দু-মনের সম্বন্ধ" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বলেন, ভারতবর্ষে বিজ্ঞান দ্রুতবেগে উন্নতি লাভ করিয়া হঠাৎ এক সময়ে থামিয়া গেল এবং তাহার সহিত কাল্পনিক উপন্যাস ও ঔপধর্ম্মিক বাতুলতা সংমিশ্রিত হইয়া ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান অধোগতি প্রাপ্ত হইল। উন্নতির অবস্থায় দর্শনের যে সূক্ষ্মতা, পর্য্যবেক্ষণের যে যথাযথতা

এবং যুক্তির যে তীক্ষ্ণতা দেখা গিয়াছিল তাহা একেবারেই তিরোহিত হইল। লেখক বলেন, সম্ভবতঃ দর্শনশাস্ত্রের অভ্যুদয় বিশেষতঃ বেদান্ত-দর্শনের অভ্যুদয়ই এই পতনের প্রধান কারণ। বেদান্তদর্শনই এ দেশের ভৌতিক উন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ—অভিশাপস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। বেদান্তদর্শন পার্থিব পদার্থের প্রতি ঘোর ঔদাস্য ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দিয়া বিজ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত করিল। বেদান্ত বলিলেন, আত্মার অভ্যন্তরে মনোনিবেশ কর, অবাস্তব বাহ্য প্রকৃতির অনুসরণ করিতে গিয়া আসল সত্যকে ভুলিয়ো না। নিরাধার মূল সত্যই যোগীর ধ্যানের বিষয়।

আর এক কথা, প্রকৃতি হিন্দুর প্রতি নিতান্ত সদয় হইয়াই নির্দ্দয় হইয়াছেন; তাঁহার অতিমাত্র স্নেহই হিন্দুকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর আবার এই বেদান্তের শিক্ষা। কেবল জীবনরক্ষার জন্য যে সকল দ্রব্য আবশ্যক তাহা বিনাক্লেশে প্রকৃতির নিকট হইতে হিন্দুরা পাইয়াছে—তাহার উপর আবার বেদান্ত এই শিক্ষা দিতেছেন, জীবনরক্ষার জন্য নিতান্ত যাহা প্রয়োজনীয় তাহা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাক, তাহার অধিক অর্জ্জন করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম ও বৃথা কালহরণ মাত্র। শুধু তাহাই নহে, বেদান্ত আরও বলিলেন, আত্ম-ত্যাগ আত্ম-নির্য্যাতন অভ্যাস কর, জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন কর এবং সর্ব্বপ্রকার দৈহিক পার্থিব আরাম সম্ভোগে বীতরাগ হও। এই শিক্ষার পর বিজ্ঞানের উন্নতি আর কি করিয়া হইবে?

—o—

সাধারণ বিদ্যালয়ে কলাবিদ্যার শিক্ষা।

পাট্রিজ সাহেব "আরেনা" পত্রিকার জানুয়ারি মাসের সংখ্যায় "সত্য ও মিথ্যা শিক্ষাপ্রণালী" নামক একটি প্রবন্ধে এইরূপ বলেন, বিদ্যালয়ের

প্রাত্যহিক শিক্ষার বিষয় হইতে চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, ব্যায়াম প্রভৃতি উঠাইয়া দিবার কথা মনে করা দূরে থাকুক, বরং কি কি উপায়ে আরও প্রচুররূপে ও সম্পূর্ণরূপে ঐ সকল বিষয় প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে তাহারই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। লেখক বলেন, প্রত্যেক শিশুর অভ্যন্তরে প্রতিভাস্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করা উচিত। শিশুদিগের মানসিক বৃত্তিসমূহ ও তাহাদের সৌন্দর্য্যবোধকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার জন্ত তাহাদের জীবনের উপর সমস্ত কবিতাময় প্রভাব প্রয়োগ করা উচিত। কলাবিদ্যার মধ্যে সঙ্গীতকে ধরা কর্ত্তব্য। শুধু সমস্বরে সকলে মিলিয়া গান করা নহে--উৎকৃষ্ট সঙ্গীত মধ্যে মধ্যে শুনিতে হইবে। প্রচলিত কন্‌সার্টের সুর শুনিয়া কোন উপকার নাই—উচ্চদরের সঙ্গীত, বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। বিখ্যাত বেহালাবাদকেরা যখন নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে বাহির হন, তখন তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ে আনাইয়া শিশুদিগকে শোনান উচিত। যে ছেলেকে অতিশয় "ম্যাদা" বলিয়া মনে করিতেছ, হয়তো তাহার প্রতিভা জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে এবং সেই হয়তো ভবিষ্যতে, তৃষ্ণাতুর জগৎকে সঙ্গীতসুধা পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিবে। বড় বড় গুণী লোকদিগকে আসিতে বলিলেই তাঁহারা আসিবেন। গুণী লোকেরা মহানুভব—রাশি রাশি অর্থ পাইলে তাঁহারা যত না সন্তুষ্ট হইবেন—শিশুদের মনোরঞ্জন করিবার অবসর পাইলে তাঁহারা আরো অধিক তৃপ্তিলাভ করিবেন। ইহাতে শিশুদের কল্পনা যতটা উত্তেজিত হইতে পারে এমন আর কিছুতে না। মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে ভাল ভাল সমবেত-সঙ্গীত ও অপেরা শুনাইবার জন্য লইয়া যাওয়া উচিত। সুস্বর ও সুতানে তাহাদের শ্রবণযুগল পূর্ণ করিতে হইবে।

তা ছাড়া, বিদ্যালয়ের ঘরের দেয়াল খালি রাখা কর্ত্তব্য নহে। তাহাদের চখের সাম্‌নে কেতাব রাখা যতটা দরকার, পাঠশালার দেয়ালে বড় বড় চিত্রকরদের চিত্রের অনুকৃতি রাখাও তেমনি প্রয়োজনীয়।

এমন এক সময় আসিবে যখন পাঠ গৃহে ছবি ও মূর্ত্তি রাখা বিদ্যা-লয়ের সাজসজ্জার একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া লোকে মনে করিবে

ছেলেদিগের অন্তর সুমধুর সঙ্গীতে পূর্ণ কর, কবিদের উচ্চ চিন্তা-সকল তাহাদিগকে শুনাও।

কিন্তু এই সকল বিষয় শিখাইবার জন্য উচ্চদরের শিক্ষক আবশ্যক।

এইরূপ ধরণের শিক্ষক আবশ্যক যাঁহারা সংকীর্ণমনা নহেন—যাহাদের মনের গতি সার্ব্বভৌমিক, যাঁহাদের সহানুভূতিক্ষেত্র সুবিস্তৃত এবং যাহাদের অন্তর দয়াদাক্ষিণ্যে পূর্ণ।

অধ্যাপক টিণ্ড্যাল-সম্বন্ধে হর্বর্ট্ স্পেন্সরের উক্তি।

"ফর্টনাইট্‌লি রিভিউ" পত্রিকায় হর্বর্ট স্পেনসর তাঁহার মৃত বন্ধু টিণ্ড্যালের যশ কীর্ত্তন করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি টিণ্ড্যালের কল্পনাশক্তি-সম্বন্ধে এই কথা বলেন। "যে গঠনকারিণী কল্পনা (স্মৃতিমূলক কল্পনার কথা এখানে বলিতেছি না) এক দিকে কবির রচনায় এবং অন্যদিকে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারে প্রকাশ পায়, সেই কল্পনা-শক্তি সমস্ত মানবীয় বৃত্তির মধ্যে উচ্চতম, অধ্যাপক টিণ্ড্যালের এই শক্তিটি প্রচুর পরিমাণে ছিল।" তত্ত্ববিদ্যা-সম্বন্ধে টিণ্ড্যালের কিরূপ মতামত তৎসম্বন্ধে স্পেন্সর একস্থলে এইরূপ বলেন। "মনোবিজ্ঞান ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে তিনি তত্ত্বজ্ঞান-ক্ষেত্রের অনির্দ্দেশ্য সীমার মধ্যেও গিয়া পড়িয়াছিলেন। তত্ত্ববিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা যায় কি না সন্দেহ —কারণ তত্ত্ববিদ্যা হইতে পরিণামে অজ্ঞেয়তা-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। সচরাচর বৈজ্ঞানিকেরা যাহা আদৌ বুঝে না, তিনি তবু এ কথা বুঝিতেন যে, প্রত্যেক ভৌতিক পদার্থ-সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান

করিতে গেলে অতিভৌতিকে গিয়া উপনীত হইতে হয় এবং এমন একটি সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় যাহা মীমাংসা করা আমাদের বুদ্ধির অসাধ্য। তিনি যে সকল বিষয় বলিয়া গিয়াছেন ও লিখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে ইহাই সপ্রমাণ হয়,—তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, জ্ঞাত পদার্থ অজ্ঞাত পদার্থের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং এই অজ্ঞাত পদার্থকে একেবারে নাস্তি বলাও যায় না। বৈজ্ঞানিকদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, এক শ্রেণী যাঁহারা ফ্যারাডে প্রভৃতির ন্যায় বিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিশ্বাসকে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করিয়া রাখেন —বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে যে সকল অসঙ্গতি আছে, তাহা লইয়া তাঁহারা আপনাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত করেন না। আর এক শ্রেণী আছেন যাঁহারা একমাত্র বিজ্ঞানের বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত; তাঁহাদের কখনই মনে হয় না যে, উহাদের অন্তর্নিহিত আর কোন তত্ত্ব থাকিতে পারে। এই দুই শ্রেণীর কোন শ্রেণীর মধ্যেই টিণ্ডাল ভুক্ত ছিলেন না। এই শেষ শ্রেণীর লোকদিগের সম্বন্ধে যখন যাহা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি তাহার মধ্যে গূঢ় অবজ্ঞাই প্রকাশ পাইত।”

—o—

পুনর্জন্ম-সম্বন্ধে শ্রীমতি বেস্যাণ্টের মত।

থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান অধিনেত্রী শ্রীমতি বেস্যাণ্ট, “মৃত্যু ও মৃত্যুর পর” এই বিষয়ে “লুসিফর”-পত্রে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন;—“অনন্তের যাত্রী আমাদের অন্তরাত্মা। এই মানবআত্মা, দেহ পরিগ্রহ করিয়া, এক এক কল্পকাল-মধ্যে কি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা একবার সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। ইহজীবনের পূর্ব্বেও জীবাত্মা অনেকবার জীবনপথের যাত্রী হইয়াছে; সেই সময়ে যে সকল শক্তি অর্জ্জিত হইয়াছিল, তাহারই বলে সে এখানে

পদার্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই অভিনব যাত্রা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সে দেবাত্মারূপে বর্ত্তমান ছিল; বিশুদ্ধ পরমাত্মার নিশ্চেষ্ট ভাবকে অতিক্রম করিয়া, অতীত জীবনের আধিভৌতিক অভিজ্ঞতাপ্রভাবে আপনার মধ্য হইতে বুদ্ধিকে, অহংজ্ঞানসম্পন্ন মনকে ক্রমশঃ বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই অভিজ্ঞতামূলক ক্রম-বিকাশ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই; এখনও এতটা অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই যাহাতে উপযুক্ত শক্তি অর্জ্জন করিয়া জীবাত্মা, জড়-জগতের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রভুত্বলাভ করিতে পারে; এখনও জীবাত্মা অজ্ঞান বশতঃ যখনই স্থূল জড়ের সংসর্গে আইসে অমনি সে নানা প্রকার মায়া-বিভ্রম দ্বারা আক্রান্ত হয়। কল্পকালস্থায়ী দেহপরিগ্রহের উদ্দেশ্য এই, যাহাতে জীবাত্মা মায়াজাল হইতে মুক্ত হইতে পারে; যাহাতে স্থূল জড়েরদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াও, তাহার মধ্যে থাকিয়াও স্বীয় দৃষ্টিকে সতেজ রাখিতে পারে—মায়ায় অন্ধ হইয়া না পড়ে। এই কল্পকালস্থায়ী দেহপরিগ্রহের দুই প্রকার বৈকল্পিক অবস্থা;—একটা অপেক্ষাকৃত অল্পকাল-স্থায়ী; উহা আমাদের পার্থিব জীবন; এই জীবনকাল মধ্যে যাত্রী-দেবাত্মা স্থূল জড়ের মধ্যে নিমগ্ন থাকে। আর একটা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী; উহার নাম "দৈবযানিক"জীবন; এই অবস্থায় আত্মা সূক্ষ্মতর ব্যোমপদার্থে পরিবেষ্টিত হয়; ইহা পার্থিব পদার্থের ন্যায় ততটা মায়াময় নহে—ইহার মায়াজাল অনেকাংশে কম। এই দ্বিতীয় অবস্থাটিই, বলিতে গেলে, জীবাত্মার স্বাভাবিক অবস্থা। কেন না, এই অবস্থা অধিকতর স্থায়ী এবং জীবাত্মার স্বরূপগত দেহজীবনের অনেকটা নিকটবর্ত্তী; এই অবস্থায় জড়ের দ্বারা জীবাত্মা ততটা আচ্ছন্ন হয় না এবং দ্রুতপরিবর্ত্তনশীল বিষয়ের দ্বারা ততটা প্রবঞ্চিত হয় না। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে, পুনঃ পুনঃ লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে, স্থূল-জড়ের প্রভাব আত্মা হইতে অপহৃত হয় এবং অবশেষে আত্মা জড়ের দাস না হইয়া জড়ের উপর প্রভুত্বলাভ করে।

"দৈবযানিক" অবস্থায়, জীবাত্মা সম্পূর্ণ মুক্ত নহে; তখনও সে পার্থিব জ্ঞানকে পরিপাক করিতে থাকে; তখনও পার্থিব অভিজ্ঞতা তাহার উপর কতকটা কর্তৃত্ব করে; তখনও "দৈবযানিক" জীবনকে পার্থিব জীবনের সূক্ষ্মীকৃত অনুবৃত্তি মাত্র বলিয়া উপলব্ধি হয়। কিন্তু জীবাত্মা ক্রমশঃ যতই পার্থিব জ্ঞানকে ক্ষণস্থায়ী ও বাহ্যিক বলিয়া জানিতে পারে, ততই তাহা হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে প্রয়াস পায়; এবং যাবৎ না জীবাত্মা মনস্বী হইয়া, জিতেন্দ্রিয় হইয়া, বিমুক্ত-দেবাত্মা হইয়া, অবিচ্ছিন্ন আত্মজ্ঞান-সহকারে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোন স্থানে অবাধে ভ্রমণ করিতে পারে, তাবৎ তাহার চেষ্টার বিরাম হয় না। এইপ্রকারে দেব-প্রকৃতি, স্থূল জড়দেহের উপর জয় লাভ করে; এবং সর্ব্বপ্রকার জড়পদার্থকে বশীভূত করিয়া আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী দাসরূপে তাহাদিগকে নিযুক্ত করে।

আর একটি নিগূঢ় কথা এই;—পার্থিব জীবনের পূর্ব্বেও যেমন "দৈবযানিক" অবস্থা, পার্থিব জীবনের পরেও আবার সেই "দৈবযানিক" অবস্থা। মনুষ্য পৃথিবীতে যে জ্ঞানধর্ম্ম অর্জ্জন করে, তাহাই সে "দৈবযানিক" অবস্থাতে ভাল করিয়া পরিপাক করিতে থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে যদি মানবাত্মা অধিক বীজ বপন না করে, তাহা হইলে "দৈবযানিক" অবস্থাতে ফসলও কম জন্মায়; এবং পুষ্টিকর দ্রব্যের অপ্রতুলতা-নিবন্ধন আত্মার পোষণক্রিয়াও বিলম্বে সাধিত হয়। এই নিমিত্ত, পার্থিব জীবনের এতটা প্রয়োজন ও গৌরব; এই পার্থিব জীবন-ক্ষেত্রেই বীজ বপন হইয়া থাকে এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। "দৈবযানিক" অবস্থায় আত্মা স্বীয় অভিজ্ঞতার উপকরণ সকল "সাফাই ও বাছাই" করে; এই অবস্থায় আত্মা অপেক্ষাকৃত মুক্তিলাভ করে, এবং ক্রমশঃ পার্থিব জ্ঞান-রাশির প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়। জীবাত্মা পৃথিবীতে যে সকল কল্পনার বীজ অন্তরে ধারণ করে, "দৈবযানিক" অবস্থায় তাহা নিজ চেষ্টায়

বাস্তবিকতাতে পরিণত করিতে পারে। আত্মা যে-বীজ "দৈবযানিক" অবস্থায় প্রস্ফুটিত করিয়া তুলে, যে উন্নত ভাবকে পোষণ করে, তাহারই মানসিক প্রতিবিম্ব, শরীর পরিগ্রহ করিয়া আবার জীবলোকে অবতীর্ণ হয়। কেন না, মনোজগৎই সৃষ্টির জগৎ, এবং পৃথিবী সেই স্থান—যেখানে আসিয়া পূর্ব্ব-জন্মের চিন্তাসমূহ ভৌতিক আকারে পরিণত হয়। অত., গৃহনির্ম্মাতার ন্যায় গভীর ধ্যান-সহকারে, নিস্তব্ধতার মধ্যে, গৃহনির্ম্মা... নক্সা প্রস্তুত করে এবং বহির্জগতের যে অংশে গৃহ নির্ম্মিত হয়, সেইখানে আসিয়া আপনার নক্সাগুলি বাহির করে; অতীত জীবনে যে জ্ঞান অর্জ্জিত হয় তাহা হইতেই আত্মা, পরজন্মের কার্য্য-কল্পনা সুসম্ভব করে এবং পৃথিবীতে আসিয়া সেই কল্পনাগুলিকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলে।

প্রথম মানসিক ধ্যান—তাহার পর তাহার বাহ্যবিকাশ; প্রথমে কল্পনা, তাহার পর আকার। ..ক্রিয়া ফলবতী হইতে হইলে তাহার মূলে গভীর চিন্তা চাই, এবং নিস্তব্ধতার মধ্য হইতেই সৃষ্টিকারী মহাশক্তি সমুত্থিত হয়।